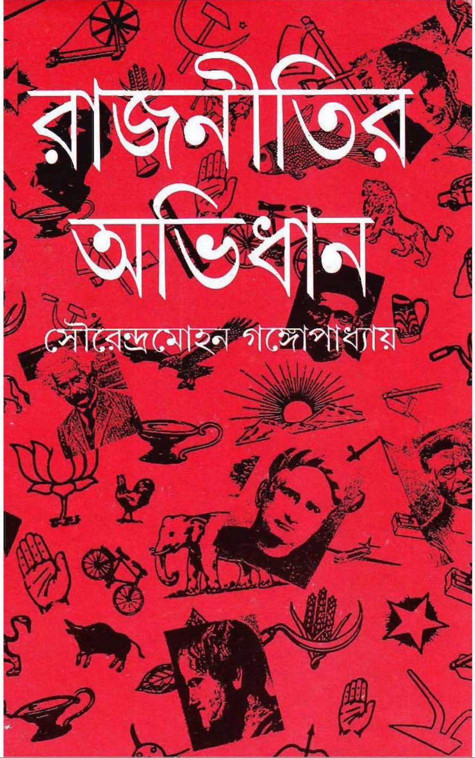
রাজনীতির অভিধান

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়



বাংলা ভাষায় সংকলিত অভিধানের বিষয় বৈচিত্র্য কম নয়। নিছক শব্দ নিয়ে শব্দাভিধান থেকে শুরু করে সেলুলয়েডের জগৎ নিয়ে চলচ্চিত্রাভিধান — কোনওটাই আজ আর দুর্লভ নয়। কিন্তু রাজনীতির অভিধান এই প্রথম। বাঙালির প্রাত্যহিক জীবন আজ নানা রাজনৈতিক বলয় দিয়ে ঘেরা। ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, সচেতনে অচেতনে আমরা রাজনীতিকে ছুঁয়ে যাচ্ছি। মোটকথা, পলিটিক্সের সংস্পর্শ এখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে, এই সময় রাজনীতির অভিধান তাই জরুরি। এক প্রয়োজনীয় সহায়ক। এই অভিধানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং সুনির্বাচিত চার শতাধিক রাজনৈতিক শব্দ সংকলিত হয়েছে। যে-সব শব্দের সঠিক সংজ্ঞা, তত্ত্ব, বিবর্তন, প্রয়োগ ইত্যাদি জেনে নেওয়া দরকার। অন্তর্দলীয় গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজ্যসভার ভূমিকা কী? বুর্জোয়া, হরিজন, ফ্যাসিবাদ, উদারনীতি, সমাজতন্ত্র, ঠাণ্ডা লড়াই প্রভৃতি শব্দের সঠিক অর্থ কোনটা? খিলাফত, ভূদান, তেভাগা প্রভৃতি আন্দোলন কোন্ সূত্রে কবে ঘটেছিল? এই অভিধানে সাম্প্রতিক তথ্যাদি এবং দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত কিছু প্রত্যয় ও সীমিত সংখ্যক রাষ্ট্রদার্শনিকের চিন্তাভাবনাও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। রাজনীতি খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। তাই শব্দ নির্বাচনে নিরপেক্ষতার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন সংকলক। সাধারণ পাঠক, ছাত্রছাত্রী এবং উৎসুক বিশেষজ্ঞের চাহিদা পূরণ করবে এই অদ্বিতীয় অভিধান।

রাজনীতির অভিধান

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭
তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১৩

ISBN 81-7215-506-9

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
জয়শ্রী প্রেস ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড
কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

RAJNITIR ABHIDHAN
[Dictionary]
by
Sourendramohan Gangopadhyay

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

২৫০.০০

নি বে দ ন

'...no dictionary of a living tongue can ever be perfect, since while it is hastening to publication, some words are budding, and some falling away.'

—Samuel Johnson, *The Dictionary of English* (1755)

বাংলায় এযাবৎকাল অনেক কোষগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণ কোষগ্রন্থ ছাড়াও বিষয়ানুগ নানা ধরনের কোষগ্রন্থ পাওয়া যায়। দর্শন, বিজ্ঞান, সংগীত, ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিষয়ে অভিধান বেরিয়েছে। সমাজবিজ্ঞান বা দর্শনের কোষগ্রন্থগুলিতে রাজনীতি কিছুটা স্থান পেয়েছে, কিন্তু এগুলির কোনটিতেই রাজনীতি মুখ্য বিষয় নয়। বর্তমান গ্রন্থের উপযোগিতা যদি কিছু থেকে থাকে, তবে সেই নিরিখেই আছে। অবশ্য রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কিছু বিষয়, যথা দর্শন, ইতিহাস, দলীয় ইতিবৃত্ত, অর্থনীতি এবং সীমিত সংখ্যক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ এই বইতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথমেই স্বীকার্য যে বইটিতে অনেক প্রসঙ্গ ও প্রত্যয় (concept) সংযোজন করা যায়নি। প্রসঙ্গ ও প্রত্যয় আছে অজস্র ; স্বভাবতই পাঠকের অনুমিত কৌতূহল অনুযায়ী প্রসঙ্গ ও প্রত্যয় বাছাই করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে সীমিত সংখ্যক সংলেখ (entry) নির্বাচিত হয়েছে এক একটি রাজনৈতিক বিষয় কিংবা ধারার অন্যূন একজন প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি অনুযায়ী। বইটির সমগ্র বিষয়-পরিধি সীমিত, ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ নয়। সংলেখগুলির আকারেও তারতম্য আছে প্রয়োজন অনুযায়ী। বেশির ভাগ সংলেখের উপর একাধিক গ্রন্থ আছে অথবা থাকা সম্ভব।

বইটিতে মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার যে কোনো দাবি নেই সেকথা সহৃদয় ব্যবহারকারীদের মনে রাখতে অনুরোধ করি। রাজনীতির অনেক দিকপাল ও কৃতী

লেখকের ইংরেজি ও বাংলায় মৌলিক চিন্তাসম্পন্ন যেসব গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে প্রধানত সেগুলির উপর নির্ভর করে এবং কিছুটা সংবাদপত্রের সংগৃহীত কর্তিকার সাহায্যে এই বই রচিত।

দু' ধরনের ব্যবহারকারীর কথা মনে রেখে বইটি লেখা হয়েছে। প্রথমত সাধারণ পাঠকবর্গ, যাঁরা প্রাত্যহিক জীবনে নানান রাজনৈতিক শব্দের অর্থ খোঁজেন— তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, অফিসকর্মী প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষজন থাকেন। দ্বিতীয় বর্গের লক্ষ্যগোষ্ঠী হলেন মাধ্যমিক থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের সাধারণ কৌতূহল মেটানোই হল উদ্দেশ্য, পরীক্ষা পাশের সহায়ক হিসেবে নয়। গবেষকদের আংশিক প্রয়োজনে এ বই হয়তো কিছুটা কাজে আসতে পারে।

পরিভাষার ক্ষেত্রে অমলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং কাউন্সিল ফর পোলিটিক্যাল স্টাডিজ-এর সদস্যবৃন্দের সম্পাদনায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষা' (১৯৮২) বইটি অনুসৃত হয়েছে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন' (১৯৯১) এবং সুভাষ ভট্টাচার্যের লেখা 'বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান' (১৯৯৪)—'আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি' সিরিজের এই বই দুটিতে বানান সম্পর্কে যে নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছে তা যথাসাধ্য অনুসরণ করেছি। তা ছাড়া সুভাষ ভট্টাচার্যের 'বিদেশী নামের উচ্চারণ' (১৯৮৮) বইটিও কাজে লেগেছে।

এ বইটির বিষয়ক্রম বাংলায় বর্ণানুসারে বিন্যস্ত। পাঠকেরা সাধারণত ইংরেজি শব্দের সঙ্গে বেশি পরিচিত বলে ইংরেজি শব্দের বাংলা পরিভাষার একটি তালিকা পরিশেষে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। খ্রিষ্টাব্দ শব্দটিকে সংক্ষেপে খ্রি এবং দ্রষ্টব্য শব্দটিকে সংক্ষেপে দ্র. লেখা হয়েছে 'see also' কথাটি বোঝাতে। কোনো কোনো সংলেখের ভিতর মোটা হরফে যে শব্দগুলি মুদ্রিত হয়েছে সেগুলি বইয়ের অন্যত্র বিষয় হিসাবে আলোচিত হয়েছে।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্তৃপক্ষ বইটি প্রকাশনার ঝুঁকি নেওয়ায় আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলের গ্রন্থাগারিক রীণা মুখোপাধ্যায় ও শিক্ষয়িত্রী বীথি মুখোপাধ্যায় বইটির মুদ্রণের কাজে সবিশেষ সাহায্য করেছেন। বইপত্র ও প্রতিলিপি দিয়ে সাহায্য করেছেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের একদা আমার সহকর্মী অনিলচন্দ্র পাল ও তারকনাথ ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মী রতনকুমার দাস এবং দিল্লি আই আই টি-র ছাত্র শুভময় গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়া আরও অনেক গ্রন্থাগারের বইপত্র ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি। অনুলিপি প্রস্তুতির কাজে সহায়তা করেছেন সুশীল ভদ্র, সংযুক্তা চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা মালাকার ও মধুমিতা নাগ। উল্লিখিত সবাইকে আমার সবিনয় কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বইটির মধ্যে যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে গিয়েছে তার জন্য আমি একাই দায়ী।

মানবাধিকার দিবস **সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়**
১৯৯৫

রাজনীতির অভিধান

অ

অকালি দল (Akali Dal)

প্রার্থনাকালে অকালপুরুষ অর্থাৎ অবিনশ্বর আত্মার উপাসক একটি শিখ সম্প্রদায় অকালি নামে অভিহিত। শিখ সম্প্রদায়ের দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহ যখন শিখদের সামরিক দীক্ষা দিয়ে খালসার সৃষ্টি করেন তখন অকালিদের উদ্ভব ঘটে। অকালি শব্দটি অমরত্ব ও দাসত্ব বোঝায়, ঈশ্বরের আদেশপালনে তাঁরা আত্মোৎসর্গীকৃত যোদ্ধা।

বিশ শতকের কুড়ির দশকের শেষাশেষি হিন্দু পুনর্জাগরণ ও মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ যখন পরস্পরের মুখোমুখি, সে সময়ে তৃতীয় একটি সাম্প্রদায়িক শক্তি অকালি আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করে। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর সরকারি নিয়ন্ত্রণে শিখ গুরুদ্বারগুলির বিষয়সম্পত্তি দুর্নীতিগ্রস্ত মোহন্তদের মৌরসিস্বত্ব থেকে উদ্ধারকল্পে অকালি আন্দোলনের সূত্রপাত। সম্পত্তিসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃষিভূমি। সেদিক থেকে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কৃষকদের ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবি।

১৯২০ খ্রি ১৪ ডিসেম্বর শিরোমণি অকালি দল গঠিত হয়। গুরুদ্বারগুলির যথোচিত প্রশাসনের উপযোগী আইনকানুন বিধিবদ্ধ করার দাবিতে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করাই ছিল সেদিন দলের প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯২১ খ্রি ইংরেজ সরকার স্বর্ণমন্দিরের কোষাগার হস্তান্তরে অসম্মত হওয়ায় অকালি আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে ও রাজনৈতিক কার্যকলাপসূত্রে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯২৫ খ্রি সরকার অকালিদের দাবি মেনে নিয়ে শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির (এস জি পি সি) কাছে স্বর্ণমন্দির সমেত পঞ্জাবের সমস্ত গুরুদ্বারের দায়িত্ব আইনের মাধ্যমে ন্যস্ত করে। এই কমিটি সমগ্র শিখ সম্প্রদায়ের একটি পার্লামেন্ট বিশেষ। গুরুদ্বারগুলির বিপুল অর্থের কোষাগার অকালি দলের রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়নির্বাহের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

গুরুদ্বার আন্দোলনে সাফল্যের পর অকালি দল দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। প্রথমটি হল জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীকে সমর্থন করা। এবং দ্বিতীয়টি হল হিন্দুদের একচেটিয়া আধিপত্য সম্পর্কে ভীতি। মুসলিম লিগের সঙ্গে সে-ব্যাপারে তাদের পার্থক্য ছিল না। তবে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে মুসলমানদের সম্পর্কে শিখদের ভীতি কম ছিল না। শেষাবধি তারা নিজেদের একাত্মতা বজায় রেখে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৩২ খ্রি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় অকালি দল আইনসভায় শিখ জনসংখ্যার চেয়ে বেশি প্রতিনিধিত্ব আদায় করে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৫ খ্রি অবধি অকালি দল শিখ সম্প্রদায়ের স্বার্থে নানা ধরনের পথ অনুসরণ করে। ১৯৪২ খ্রি অকালিরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। উধম সিং পরিচালিত এক অংশ জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। দলের প্রথমাবধি অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন মাস্টার তারা সিং। তিনি দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধে কংগ্রেসের সঙ্গে সখ্যতা কাটিয়ে ইংরেজের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন।

অকালিরা মনে করত শিখরা একটি স্বতন্ত্র জাতি। সেজন্য তারা চাইত একটি স্বতন্ত্র বাসভূমি এবং মুসলিম লিগের সঙ্গে যোগ দিয়ে শিখিস্তান নামে স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্রের দাবিতে দর-কষাকষি শুরু করে (১৯৪৪-৪৫)। ১৯৪৬ খ্রি অকালিরা পন্থিক পার্টি গঠন করে শিখ স্বাতন্ত্র্য প্রমাণের উদ্দেশ্যে। স্বতন্ত্র শিখ রাষ্ট্রের আন্দোলনসূত্রে তারা সিং ১৯৪৯ খ্রি কারারুদ্ধ হন।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে অকালি দলে নানান ধারা ও ভাঙন দেখা দেয়। ১৯৫৬ খ্রি তারা সিং-এর নেতৃত্বে অকালিরা কৌশল হিসেবে কংগ্রেসে যোগ দেয়। ১৯৬০ খ্রি শুরু হয় স্বতন্ত্র ভাষাভিত্তিক পাঞ্জাবি সুবা গঠনের দাবিতে এক নতুন আন্দোলন। ১৯৬৬ খ্রি সে আন্দোলন সফল হয়। ইতিপূর্বে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে অবসরপ্রাপ্ত কাপুর সিং নামে এক ব্যক্তি শিখদের স্বাধীন 'খলিস্তান' রাষ্ট্রের প্রস্তাব তোলেন (১৯৬০)। শব্দটির অর্থ খালসা জাতির পবিত্র দেশ। তারা সিং গোষ্ঠীর জঙ্গি নেতা জগজিৎ সিং চৌহানের কিছু অনুগামী দেশ ছেড়ে বিদেশে বিদ্রোহী শিখ সরকার গঠনের পরিকল্পনা করে। পরবর্তী দশকে অকালি দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও ভাঙন ঘটে বহুবার এবং সেগুলির মধ্যে কালক্রমে মিলনও দেখা দেয়। অকালি দল বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, জনসংঘ প্রভৃতি দলের সঙ্গে পঞ্জাবে মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়। ১৯৭৭ খ্রি অকালি দল জনতা পার্টির নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একটি আসন পেয়েছিল। পঞ্জাবের জটিল রাজনৈতিক আবর্তে অকালি দল নরমপন্থী ও চরমপন্থী ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। নরমপন্থী ধারার তিন প্রধান নেতা ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল, ধর্মগুরু হরচাঁদ সিং লঙ্গোয়াল এবং এস জি পি সি-র প্রধান গুরুচরণ সিং তোহরা। দ্বিতীয় ধারায় দল খালসা প্রবল শক্তিসম্পন্ন। এরা স্পষ্টতই খলিস্তানের সমর্থক। আশির দশকের প্রথমার্ধে এ ধারার শীর্ষে ওঠেন সন্ত জার্নাইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালে।

অকালি দলের সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্যতম প্রধান তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল আনন্দপুর সাহেব নামক স্থানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলি (১৯৭৩)। বহুমুখী প্রস্তাবগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র সম্পর্ক, মুদ্রা, যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্ষমতার সীমিতকরণ ছাড়াও পঞ্জাবে পুঁজিপতিদের

আধিপত্য হ্রাস, সেচের জলবণ্টন, খাদ্যশস্য বিক্রয় রাষ্ট্রীয়করণ, মাদকদ্রব্য নিবারণ প্রভৃতি বহু মৌলিক ও সুদূরপ্রসারী প্রস্তাবসহ ভারতের সংবিধান পরিবর্তনেরও দাবি ছিল। প্রস্তাবগুলির খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন সুরজিৎ সিং বারনালার নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবীদের একটি কমিটি। দাবিগুলির কোনও কোনওটি পরবর্তীকালে গৃহীত হয়।

আশির দশকের গোড়া থেকেই অকালি দলে চরমপন্থী ধারা ক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে। হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৪ খ্রি এপ্রিল মাসে পঞ্জাব একটি বিপজ্জনক ও উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষিত হয় এবং জুন মাসে উগ্রপন্থী দমনের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী স্বর্ণমন্দির দখল করে। তারপর দীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্ন উগ্রপন্থী শিখ গোষ্ঠী বিক্ষিপ্তভাবে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়। ১৯৯২ খ্রি ফেব্রুয়ারিতে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে অকালিরা যোগ দেয়নি। অন্যূন বারোটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত অকালি দল শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। উপগোষ্ঠীর সংখ্যাও বিস্তর। লোকসভায় নির্বাচিত (১৯৮৯) সিমরণজিৎ সিং মান পরিচালিত চরমপন্থী অকালি দল জনচিত্তে বিস্মৃতপ্রায়। নরমপন্থী অকালি নেতা প্রকাশ সিং বাদলের পিছনে কিছু জনসমর্থন আছে। গুরুচরণ সিং তোহরা, শুকদেব সিং, বলবিন্দর সিং, সুবর্ণ সিং প্রমুখ নেতারা তাঁকে সমর্থন করেন। তোহরার অনুগামীরা দলের ঐক্য ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট রয়েছেন।

১৯৯২ খ্রি বিয়ন্ত সিং-এর নেতৃত্বে কংগ্রেস পঞ্জাবে মন্ত্রিসভা গঠন করে। ১৯৯৪ খ্রি ১৩ এপ্রিল অমৃতসরে শিখ পন্থের প্রতিষ্ঠা দিবস বৈশাখী উৎসবে অকাল তখতের অস্থায়ী জাঠেদার মনজিৎ সিং বিভিন্ন ছোটবড় গোষ্ঠীতে বিভক্ত অকালিদের পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার কাজে উদ্যোগী হন। ঐক্যের শর্ত হিসেবে তিনি দুটি প্রস্তাব পেশ করেন। এক, সকল গোষ্ঠী ভেঙে ফেলতে হবে এবং দুই, বিবদমান সব গোষ্ঠীপতিকে তাঁদের ইস্তফাপত্র অকাল তখতে পাঠাতে হবে।

প্রকাশ সিং বাদল ব্যতিরেকে বাকি সব অকালি নেতা শিখ ধর্মের সর্বোচ্চ পীঠস্থানের কর্ণধার জাঠেদারের প্রস্তাবে সম্মতি জানান। এস জি পি সি-র অধিকর্তা এবং তাঁর পয়লা নম্বর দুশমন জি এস তোহরার ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়ায় বাদল প্রশ্ন তোলেন যে অকালিদের রাজনীতিতে অকাল তখত্ হস্তক্ষেপ করে কীভাবে? উল্লেখ্য, অকাল তখতের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলায় একদা সুরজিৎ সিং বার্নালাকে তংখাইয়া করা হয়েছিল। সেই আশঙ্কায় বাদল জাঠেদারকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন যে নিজের গোষ্ঠীর সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে অকাল তখতের পরিবর্তে নিজের দলের সচিবের কাছে তিনি চিঠি পাঠিয়েছেন। কৌশলে বাদল নিজেকে নিয়ে দলে একটি সভাপতিমণ্ডলী গঠন করে নেন এবং ঐক্যে সায় নেই বলে জানিয়ে দেন।

ছ'টি গোষ্ঠীর অকালি নেতারা শিরোমণি অকালি দল নামে নতুন একটি দল তৈরি করেন এবং ১৯৯৪ খ্রি ১ মে অমৃতসরে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাতে বলা হয় যে ভারতকে স্বশাসিত রাজ্য-সমষ্টির একটি কনফেডারেশনে পরিণত করা হোক। সে-দাবি মানা না হলে স্বাধীন শিখ রাজ্যের জন্য অকালিরা সংগ্রাম করবে। নরমপন্থী হিসাবে এতকাল পরিচিত নেতাদের কণ্ঠে ভিন্দ্রেনওয়ালের দাবি ধ্বনিত হওয়ায় প্রথমে কিছুটা চমক সৃষ্টি করলেও সাধারণ মানুষের কাছে সদ্যোগঠিত শিরোমণি অকালি দলের

অমৃতসর প্রস্তাব তেমন গুরুত্ব পায়নি। উল্লেখ্য, অকালি দল (লঙ্গোয়াল) নতুন এই দল গঠনের বিরোধিতা করেছিল এবং মান গোষ্ঠীর একাংশ এই দল গঠনে আপত্তি জানায়।

উগ্রপন্থী রাজনীতির ভয় মন থেকে না কাটলেও নতুন দলের এই রণহুঙ্কারে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যার ফলে রচয়িতারাই নানা রকমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বলেন যে বিচ্ছিন্নতাবাদ তাঁদের কাম্য নয়। তবে কেন্দ্রীয় সরকার ও তার তাঁবেদার মুখ্যমন্ত্রী বিয়ন্ত সিং-এর পঞ্জাবের চিরন্তন সমস্যা, যথা চণ্ডীগড়ের হস্তান্তর, নদীর জল ভাগাভাগী ও এলাকা হস্তান্তরের বিষয়গুলির মীমাংসায় বিলম্ব ঘটা অনুচিত।

পঞ্জাবের রাজনীতিতে এস জি পি সি তথা অকাল তখ্‌তের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনস্বীকার্য। নবগঠিত অকালিদলের (অমৃতসর) নেতা সিমরণজিৎসিং মান খলিস্তানের দাবিকে নতুনভাবে তুলে ধরেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক এস জি পি সি-র প্রধান জি এস তোহরা সরকারের শিখ বিরোধী আচরণের তীব্র নিন্দা করেন।

জুন মাসে আনন্দালা বিধানসভার উপনির্বাচনে বাদল পরিচালিত অকালি দলের জয় রাজ্য-রাজনীতিতে নতুন ধারা সৃষ্টি করে। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাদল বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি।

১৯৯৪ খ্রি ডিসেম্বরে লঙ্গোয়ালপন্থী এবং পন্থিক দুটি উদারনৈতিক অকালি দল অমরিন্দর সিং ও কাবুল সিং-এর নেতৃত্বে মিশে যায়। তাঁরা বাদল ও সিমরণজিৎ সিং মান-এর নেতৃত্বে পরিচালিত দল দুটিকে ঐক্যের আহ্বান জানান।

বিভিন্ন অকালি দলের মধ্যে ধর্মগুরুদের উদ্যোগে ঐক্যের প্রয়াস অব্যাহত থাকে। ১৯৯৫ খ্রি জানুয়ারিতে অকালি দল (বাদল) এবং অকালি দল (অমৃতসর) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বিভিন্ন কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি অনুসৃত হবে।

এদিকে ওই মাসেই ফতেগড়সাহেব জোর মেলায় খলিস্তান ও আজাদি স্লোগান তোলার দায়ে সিমরণজিৎ সিং মানের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি আইন অনুযায়ী সরকার দেশদ্রোহিতার অভিযোগ দায়ের করে।

দমদমা সাহেবে ১৩ এপ্রিল বৈশাখী উৎসবে অকালি দলের অমৃতসর ও বাদল গোষ্ঠী আনন্দপুরে সাহেব প্রস্তাবের (১৯৭৩) ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত দলের রাজনৈতিক বিষয়ক যৌথ প্যানেলের সভায় সাংগঠনিক বিষয়াদির আলোচনা ছাড়াও স্থির হয় ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ ধারা বাতিল, দেশে প্রকৃত ফেডারাল রাষ্ট্র কাঠামোর রূপায়ণ, কেন্দ্র ও রাজ্যের বিষয়াদির যথাযথ বিভাজন এবং যৌথ কর্মতালিকা বর্জন, ছোটবড় নির্বিশেষে সকল রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজ্যসভায় সমান সংখ্যক সদস্য, লোকসভায় বিশেষ ও ঐচ্ছিক ক্ষমতার বিলোপ দাবি করা হবে। ১৪ এপ্রিল সকল গোষ্ঠী একত্র মিশে যাবার পর প্রকাশ সিং বাদল সম্মিলিত দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। সকল গোষ্ঠীর সমস্ত শাখা, ছাত্র ও নারী সংগঠন সমূহও মিলে যায়। 'শিরোমণি অকালি দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পাকিস্তানে অবস্থিত শিখধর্মের পীঠস্থান নানকানা সাহেবকে ভ্যাটিক্যানের মতো স্বীকৃতি দিতে হবে।

অছিবাদ (Trusteeship)

মহাত্মা গান্ধীর আর্থনীতিক চিন্তার মূলকথা ; এবং পশ্চিমি পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের বিকল্প হিসাবে বিবেচিত। ১৯৪৩ খ্রি আগা খাঁর প্রাসাদে গান্ধীজি যখন বন্দি ছিলেন সে সময়ে অছিবাদের খসড়া প্রস্তুত হয়। গান্ধীজির জীবনীকার প্যারেলাল তাঁর 'লাস্ট ফেজ' নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত মর্মে সেটি উল্লেখ করেছেন :

১. বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজকে কল্যাণকারী সমাজে (Equalitarian Society-তে) রূপান্তরিত করার উপায় হচ্ছে ট্রাস্টিশিপ, যা পুঁজিবাদকে প্রশ্রয়দান করে না, কিন্তু বর্তমান মালিকশ্রেণীকে নিজেদের সংশোধন করে নেওয়ার সুযোগ দেয়। ট্রাস্টিশিপ এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে মানুষের স্বভাব সংশোধনের অতীত নয়।

২. সমাজের কল্যাণের জন্য ও সমাজের বিনানুমতিতে ট্রাস্টিশিপ সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করে না।

৩. সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তিগত ব্যবহার আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা ট্রাস্টিশিপে নিষিদ্ধ নয়।

৪. এইভাবে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ট্রাস্টিশিপে কেউ তাঁর ধন-সম্পত্তি স্বার্থপরের মতো অথবা সমাজের হিত অবজ্ঞা করে ভোগ-দখল করতে পারবেন না।

৫. ট্রাস্টিশিপে একদিকে যেমন জীবনধারণের উপযোগী পারিশ্রমিকের এক শোভন নিম্নতম হার (decent minimum living wages) স্থির করে দেওয়ার কথা বলা হয়, তেমনি অন্যদিকে সমাজের কোনও এক ব্যক্তিকে অধিকতম কত আয় করতে দেওয়া হবে তারও সীমা স্থির করে দেওয়া উচিত বলে ট্রাস্টিশিপ মনে করে। সেই নিম্নতম ও উচ্চতম আয়ের ব্যবধান যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত হওয়া চাই। উপরন্তু মধ্যে মধ্যে এই নিম্নতম ও উচ্চতম আয়ের সীমার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন যার ফলে ওই ব্যবধান ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে।

৬. গান্ধীজি-নির্দেশিত আর্থনীতিক ব্যবস্থায় কী প্রকারের উৎপাদন করতে হবে তা সমাজের প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারিত হবে। তার মধ্যে ব্যক্তিগত খামখেয়াল বা লোভের কোনও স্থান থাকবে না।

দ্র. গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ ; সত্যাগ্রহ ; সর্বোদয় ; হিন্দ স্বরাজ।

অধিকার (Rights)

কোনও কাজ করার স্বাধীনতা থাকা বা না-থাকার সূত্রে অধিকার শব্দটি উদ্ভূত। শব্দটির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমানুষ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণীত হয়। বস্তুত অধিকার রাষ্ট্রের সদর্থক উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। অধিকার প্রদানের মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধিত হয়। ব্যক্তিমানুষের কল্যাণের অস্তিত্বে প্রমাণিত হয় যে রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি নয়, ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। সমাজের অঙ্গ রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে অধিকার সৃষ্টি ও রক্ষা করে। অধিকার হল সমাজজীবনের এমন কিছু শর্ত যেগুলি না থাকলে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন বিকাশ ব্যাহত হয় (লাস্কি)। অধিকার সমূহের কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতির উপর। প্রতিটি অধিকারের একটি সামাজিক মূল্য এবং

উদ্দেশ্য থাকে। সামাজিক কল্যাণের কিছু-না-কিছু শর্তপূরণ ও সমাজের অল্পবিস্তর উন্নতি সাধনে কী ভূমিকা পালন করে তার উপর নির্ভর করে ভিন্ন অধিকারের যথার্থ বৈধতা (হবহাউস)। সমাজের প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে অধিকার যেন অনুকূল হয়।

অধিকারের নানা প্রকারভেদ আছে। সেগুলিকে মোটামুটি নৈতিক ও আইনানুগ এই দুই বর্গে ভাগ করা যেতে পারে। নৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে পড়ে নীতিবোধ, বিবেক, বিচারশক্তি ইত্যাদি মূল্যবোধ। এগুলি আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। আদর্শগত তত্ত্বে অবশ্য এগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। এ ছাড়াও আছে **প্রাকৃত অধিকার** (natural rights), সে প্রসঙ্গ পরে আসছে।

আইনানুগ অধিকারগুলি তিন ধরনের: পৌর (civil), রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক। পৌরজীবনে লোকের এমন কিছু সুবিধা বা অধিকার থাকা চাই যেগুলি ছাড়া মানুষের বিকাশ ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটে না। যেমন বাক্‌-স্বাধীনতা, লেখার কিংবা সংস্থা গঠনের, জীবন-ধারণ, ঘোরাফেরা, পরিবার-জীবন, ধর্মাচরণ, শিক্ষার্জনের অধিকার ইত্যাদি (civil rights)। রাজনৈতিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহে অংশগ্রহণ বোঝায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজনৈতিক ক্ষমতার তত্ত্ব আর অধিকার সমার্থক নয়। ক্ষমতার উৎসে যাবার সুযোগ থাকাটা একটা রাজনৈতিক অধিকার। ভোট দেবার, নির্বাচনে প্রার্থী হবার, দল গঠনের, মতামত প্রকাশ করার, স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধের, সরকারি চাকরি পাবার, সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তার সুরাহার জন্য আবেদন করার অধিকার ইত্যাদি রাজনৈতিক গোত্রের। এই সূত্রে কিছু অর্থনৈতিক অধিকারের কথা এসে পড়ে, যেগুলির আইনানুগ রূপায়ণের নিশ্চয়তা সব সময় থাকে না; যেমন চাকরি বা জীবিকানির্বাহের অধিকার। সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত মালিকানায় ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার, সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার, শ্রমিকদের কাজের সময়, ন্যায়সংগত মজুরি ইত্যাদি বিষয় আর্থনীতিক অধিকারের আওতায় পড়ে।

ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের নানা ধরনের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) হিসেবে লিপিবদ্ধ এবং তৎসহ সম্পত্তির অধিকারও সংরক্ষিত হয়েছে। অবশ্য জনস্বার্থে কোনও সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলে ক্ষতিপূরণের বিধানও আছে।

প্রাকৃত-অধিকার সম্পর্কে প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক ও চুক্তিতত্ত্বের প্রবক্তাদের অভিমত হল যে মানুষের কতকগুলি জন্মগত অধিকার থাকে; সেসব অধিকার সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠের আগে মানুষ ভোগ করত। প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের ছিল নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। সমাজ গড়ে ওঠার পরে সেগুলি লুপ্ত হয়ে যায়নি। জীবন-ধারণ, সম্পত্তি ভোগ এবং অবাধ বিচরণের অধিকার প্রাক্‌-সমাজ পর্বে বিরাজমান ছিল। অধিকারগুলি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির অপেক্ষায় থাকে না। রাষ্ট্র তথা সমাজ সৃষ্টির পূর্বে এইসব প্রাকৃত অধিকার বিরাজ করত এবং সেগুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। (হবস, লক, রুসো)।

কার্যত মানুষের যাবতীয় অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তির পর সৃষ্ট হয়। অধিকারের তখনই মূল্য দেখা দেয় যখন নিজের ক্ষমতায় রাষ্ট্র তাকে সংরক্ষণ ও

রূপায়ণ করে। কাজেই অধিকার হল রাষ্ট্রেরই সৃষ্টি (বেনথাম)। প্রাকৃত অধিকারের উৎপত্তি ও যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে।

মার্কসীয় অধিকার তত্ত্বের উৎস হল মার্কসীয় অর্থনীতি ও দর্শন। শ্রেণীগত স্বার্থের আর্থনীতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত পরিকাঠামো সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থ প্রতিফলিত করে ; অধিকার তত্ত্ব রাজনীতির অন্তর্গত ; রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি সবই আর্থনীতিক ভিত্তি অনুযায়ী পরিকাঠামোয় প্রতিফলিত হয়। শ্রেণীগত স্বার্থ দ্বারা চালিত রাজনৈতিক কর্তৃত্বের যারা অধিকারী তাদের নির্দেশে আইন তৈরি হয়। মার্কসের ঐতিহাসিক নির্দেশ্যবাদ অনুযায়ী শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক তথা সর্বহারা শ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। স্বভাবতই সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পর তাদের অভাব ও চাহিদা অনুযায়ী অধিকার সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হবে।

অধিকারী, গঙ্গাধর মোরেশ্বর (১৮৯৮-১৯৮১) (Adhikari, G. M.)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক নেতা। বার্লিনে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রভাবে মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষিত হন। ১৯২৮ খ্রি শেষদিকে তিনি রায়ের কাছ থেকে একটি পরিচয়পত্র নিয়ে ভারতে আসেন এবং অনতিকাল পরে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় কারারুদ্ধ হন। কমিন্টার্ন থেকে মানবেন্দ্রনাথ বহিষ্কৃত (১৯২৯) হবার পর অধিকারী কমিন্টার্ন-স্বীকৃত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতেই থেকে যান। আমৃত্যুকাল তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সদস্য ছিলেন (১৯৩৩-৮১)। তাঁর লেখা বিভিন্ন বইপত্রের মধ্যে পার্টির প্রথম আট বছরের দলিলসমৃদ্ধ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত ইতিহাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভারতীয় রাজনীতির বিশ্লেষণসূত্রে ১৯৪২ খ্রি এদেশের মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং ভারতভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার তথা পাকিস্তান দাবি সম্পর্কে অধিকারীর একটি থিসিস বিতর্কের সৃষ্টি করে। সমাজ-বিবর্তনে শ্রেণী-সংগ্রামের মূল ধারার অনুষঙ্গী অনেক ছোটবড় ঘটনাপ্রবাহ মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তায় স্বীকৃত। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে তার অন্যতম অভিব্যক্তি হল ধর্ম ও জাতির রাজনীতিকরণ, যার পরিণতি হল পাকিস্তান সৃষ্টির দাবি। অনুরূপ দাবি প্রাক-স্বাধীন ভারতে তুলেছিল আরও কোনও কোনও জাতি। অধিকারী গরিষ্ঠসংখ্যক মুসলমানদের আত্মস্বাতন্ত্র্য তথা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দাবিকে যুক্তিগ্রাহ্য মনে করেছিলেন, ভারত যেমন চেয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক স্বাধীন সার্বভৌম সত্তা।

মার্কসের **এশীয় উৎপাদন** পদ্ধতি ও তার উপরিকাঠামো প্রাচ্যের স্বেচ্ছাচারতন্ত্র-ভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুসরণ করে অধিকারী দেখিয়েছেন যে ভারতের **বর্ণব্যবস্থাগত** শ্রেণীবিভাজন কৃষিভিত্তিক স্বয়ম্ভর এবং এক স্থাণু সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে কীভাবে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ ও অসংখ্য ক্ষুদ্রে জাতির ভেদাভেদ ভারতীয় একজাতি (নেশন) প্রত্যয়কে ভুল প্রমাণিত করে। মার্কস ভেবেছিলেন সৃষ্টি ও লয়, রক্ষণশীলতা ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব এবং ব্রিটিশ বুর্জোয়া সভ্যতার অভিঘাতে ভারতীয় সমাজে যে দ্বান্দ্বিক (ডায়ালেকটিক্যাল) প্রক্রিয়া ঘটে তার ফলে ইংরেজের সৃষ্ট

হিন্দু-মুসলমান বিভেদ ও অন্যান্য জাতিভেদ ঘুচে যাবে। লেনিনেরও ছিল অনুরূপ প্রত্যাশা যে, খিলাফত আন্দোলন উল্লিখিত বিভেদকে প্রশমিত করবে এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সমন্বিত করবে।

অধিকারী ভারতীয় সমাজের ভিন্ন প্রবণতা প্রত্যক্ষ করেন যার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে গড়ে তোলার অভিমত তিনি পোষণ করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যে মুসলিম মানসকে আধাবিপ্লবী পথে মুসলিম লিগ চালিত করে, সেটি হিন্দু-বিরোধের রূপ নেয় এবং পাকিস্তান-রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। কালক্রমে পাকিস্তানও স্বাভাবিক দুটি ভিন্ন আবেগের তাড়নায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পশ্চিমে পাকিস্তান ও পূর্বে স্বতন্ত্র বাংলাদেশ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের রাজনীতিকরণকে মেনে নিয়ে কমিউনিস্ট রাজনীতি সঞ্চার করার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। শ্রমিক আন্দোলনে অগ্রসর তামিলনাড়ু এবং কৃষক আন্দোলনে অগ্রসর অন্ধ্রপ্রদেশে একদা শক্তিশালী কমিউনিস্ট রাজনীতি সংকীর্ণ প্রাদেশিক জাতিগত আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ব ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন নতুন এক ধর্মের মতো সুগভীর শিকড় বিস্তার করেছে।

অনুশীলন সমিতি (Anusilan Samiti)

ব্যায়ামচর্চা, চরিত্রগঠন, সমাজসেবা ও দেশাত্মবোধক নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯০২ খ্রি ২৪ মার্চ কলকাতার হেদুয়া অঞ্চলে সতীশচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন স্থাপনের জন্য বরোদা থেকে অরবিন্দ ঘোষ কর্তৃক প্রেরিত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী) অনুশীলন সমিতির সহযোগে একটি গুপ্ত বিপ্লবী আখড়া স্থাপন করেন (১৯০৩)। ১৯০৪ খ্রি বারীন্দ্রকুমার ঘোষ বরোদা থেকে এসে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। শরীরচর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠলেও সমিতি ক্রমে বিপ্লবী সংগঠনে পরিণত হয়। বরোদা গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যাবার পর প্রমথনাথ মিত্রর সভাপতিত্বে অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, সরলা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়ে সমিতির আভ্যন্তরিক গোপন চক্র গঠিত হয়। ১৯০৫ খ্রি প্রমথনাথ ঢাকা সমিতির পত্তন করেন। যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন পুলিনবিহারী দাস। সমিতির ঢাকা কেন্দ্রের অধীনে পাঁচশো শাখা গঠিত হয়; এবং তার কর্মক্ষেত্র ক্রমে পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, অসম, উড়িষ্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে প্রসারিত হয়। বাংলার খ্যাতনামা প্রায় সমস্ত বিপ্লবীই একদা এই সমিতির সদস্য ছিলেন।

প্রমথনাথ ও নিরালম্ব স্বামীর সঙ্গে বিপ্লবের কর্মকৌশল নিয়ে মতভেদ হওয়ায় বারীন্দ্রকুমার 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় একটি বিবৃতি দিয়ে পৃথক হয়ে যান এবং মানিকতলা মুরারিপুকুর বাগানবাড়িতে বোমা তৈরির এক গুপ্ত কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন হেমচন্দ্র কানুনগো, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ কর্মী। অরবিন্দ ছিলেন দলপতি। বোমা তৈরির সঙ্গে গোপনে পিস্তল সংগ্রহের কাজও চলে। অরবিন্দ-বারীন্দ্র চক্রের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (বাঘা যতীন), অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়) প্রমুখ বিপ্লবী যুক্ত হন।

১৯০৬ খ্রি থেকে বারীন্দ্রের পরিচালনায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'যুগান্তর' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। স্বভাবতই তার উপর সরকারের কোপদৃষ্টি পড়ে। বস্তুত এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সমিতির ভিতরে যুগান্তর দল নামে পৃথক একটি উগ্রপন্থী উপদল সৃষ্ট হয়। কালক্রমে মূল দলের সঙ্গে যুগান্তর দলের বিরোধ ও রেষারেষি দেখা দেয়।

সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের অভিযোগে ১৯০৮ খ্রি সমিতির মুরারিপুকুর গোষ্ঠীর সদস্য ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়। অরবিন্দ ও নিরালম্ব স্বামী গ্রেপ্তার হন। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯০৮-১০) বারীন্দ্র ও তাঁর সহযোগীরা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হন। অরবিন্দ ও নিরালম্ব স্বামী মুক্তি পান। ব্রিটিশ সরকার ১৯০৮ খ্রি সমিতিকে ও বিভিন্ন জেলায় সহযোগী অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনকে বেআইনি ঘোষণা করেন। সমিতির গোপন ক্রিয়াকলাপ অবশ্য অব্যাহত থাকে এবং ক্রমে গুপ্তহত্যা ও ডাকাতির পথে চলতে থাকে।

অনুশীলন সমিতির দীর্ঘকালের ঘটনাবহুল গতিপথে বহু শাখাপ্রশাখা গড়ে ওঠে এবং বহির্বিশ্বেও সমিতির কর্মপ্রবাহ ছড়িয়ে পড়ে। দেশের স্বাধীনতার আদর্শে নানা ধরনের 'অ্যাকশন' কর্মসূচিতে একক অথবা যৌথভাবে বহুজনেই নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেন। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মান অস্ত্রসাহায্যে দেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়াস নিষ্ফল হয়। কর্মীদের অনেকেই নিহত কিংবা কারারুদ্ধ হন। আবার অনেকে বিদেশে নির্বাসিত জীবন অতিবাহিত করেন।

মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার সূত্রে রাজনৈতিক বন্দিরা মুক্তি পান (১৯২০)। **অসহযোগ আন্দোলন** শুরু করলে কোনও রকম হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে তাঁরা আর লিপ্ত হবেন না এই মর্মে বিপ্লবীরা গান্ধীজিকে প্রতিশ্রুতি দেন। যুগান্তর ও অনুশীলন দলের নেতারা কংগ্রেসের এবং স্বরাজ্যদলের সঙ্গে যুক্ত হন। কুড়ির দশকের শেষ দিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে অনুশীলন দল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর সমর্থনে এবং যুগান্তর দল সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থনে দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিছু কিছু তরুণ বিপ্লবী হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিয়াকলাপে উদ্যোগী হন। উত্তর ভারতে বিপ্লবী প্রচেষ্টা মাথাচাড়া দেয়। বাংলাতেও চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবীদের সঙ্গে সরকারের সংঘর্ষ বাধে। সরকারের দমননীতিও প্রবল হয়ে ওঠে। ত্রিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বিপ্লবীরা জেল থেকে ছাড়া পান। তাঁদের অধিকাংশই বিভিন্ন বামপন্থী দলে যোগদান করেন। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে যুগান্তর দল একটি বিবৃতির মাধ্যমে ভেঙে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান (Institution)

মূলত সমাজতত্ত্বের একটি প্রত্যয়; নানা অর্থে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অক্সফোর্ড অভিধানে (OED) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'প্রতিষ্ঠিত আইন, প্রথা, প্রচলন, ব্যবহার, সংগঠন অথবা লোকের রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক জীবনের উপাদান; নিয়ামক বিধিনিষেধ অথবা জনজীবনে অনুসৃত নানান প্রচলন কিংবা সভ্যতার কাঙ্ক্ষিত বস্তু।' সাধারণভাবে প্রত্যয়টির বিষয় হল সামাজিক আচার-ব্যবহার যার

পিছনে থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত, সর্বজনগ্রাহ্য, সহজে নির্ণেয় এবং স্থায়ী কতকগুলি রীতিনীতি, মূল্যবোধ এবং সামাজিক অনুশাসন। সমাজতাত্ত্বিকেরা অনেক সময়ে সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিবর্তে রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেন বেশি। অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানসমূহকে মোটামুটি পাঁচভাবে দেখা হয় : রাজনৈতিক (**ক্ষমতা, অধিকার** ইত্যাদির আলোচনা-সূত্রে), অর্থনৈতিক (উৎপাদন-সম্পর্ক নির্ধারণের নিরিখে), সাংস্কৃতিক (শিক্ষা, বিনোদন, অবসরযাপন প্রসঙ্গে), আমলাতান্ত্রিক (জনপরিষেবা অর্থে), জ্ঞাতি সম্পর্ক (kinship—অর্থাৎ পরিবার, আত্মীয়-পরিজন ইত্যাদি বিবেচনাকালে) এবং সমাজতাত্ত্বিক (বিবাহ, পরিবার ইত্যাদি সূত্রে)। অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের কোনও বিধিবদ্ধ প্রকৃতি কিংবা ক্রিয়াকলাপ থাকে না। তবে তার স্তরবিন্যাস দেখা যায়। সেগুলি সমাজজীবনের এক একটি ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজ-সংগঠনের নানাবিধ রকমফের অনুযায়ী সমাজতাত্ত্বিকেরা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান প্রত্যয়টিকে শিথিলভাবে ব্যবহার করেন।

অন্তর্দলীয় গণতন্ত্র (Inner-Party Democracy)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সর্ববিধ আভ্যন্তরিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতিনির্ধারণ প্রণালী। বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী দেশে পার্টির সঙ্গে যুক্ত সরকারি সংগঠন, যুব, শ্রমিক এবং অন্যান্য সংস্থার ক্ষেত্রেও এই কর্মপ্রণালী প্রযোজ্য। এই কর্মপ্রণালীর প্রবর্তন করেছিলেন লেনিন। পার্টির ভিতরে রাজনৈতিক বিষয়ে অবাধ আলোচনা, কর্মকর্তা নির্বাচনে স্বাধীন সুযোগ, ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যস্ত দলীয় কাঠামোয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা এই কর্মপ্রণালীর মূল বৈশিষ্ট্য। **কমিন্টার্নের** (১৯১৯-৪৩) সময়ে এটা স্পষ্টই ছিল যে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যনির্বাহ সার্থক ও সফল হতে পারে যদি তার সংগঠন যথাসম্ভব কেন্দ্রাভিগ থাকে এবং যদি লৌহকঠোর শৃঙ্খলা সবাই মেনে চলে, দলের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব সবাইকার আস্থাভাজন হয় এবং তার অধিকার ও ক্ষমতা অটুট থাকে। কেন্দ্রাভিগতার অর্থ হল কেন্দ্রীয় পার্টির হাতে যাবতীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকা এবং সর্বস্তরের যাবতীয় পরিবার, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের গঠন ও বিকাশের জন্য সেই সংগঠন বা পার্টির দায়ী থাকা। এই কেন্দ্রাভিগতা এই হিসাবে কিছুটা গণতন্ত্রসম্মত যে তা জনহিতার্থে ক্রিয়াশীল থাকে, যথা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটায়, পার্টির মধ্যে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র বজায় রাখে, যার ফলে দলীয় কাঠামোর প্রতিটি স্তর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। তবে যথার্থ কেন্দ্রাভিগতা ও যথার্থ গণতন্ত্রে দলের ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের প্রয়োজনে প্রথমটির আধিপত্য বেশি। তা হলেও মোটামুটি ভাবে অন্তর্দলীয় গণতন্ত্রে দলের কর্মপন্থা নির্ধারণ ও রূপায়ণে দলীয় সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে।

উল্লিখিত প্রণালীতে দলের অধীন সমস্ত ধরনের সংস্থা নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়। সেগুলি দলের উচ্চতর সাংগঠনিক স্তরে নিয়মিত রিপোর্ট দাখিল করে। সদস্যদের সৃজনশীল কাজের উদ্যম, কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে সংখ্যালঘিষ্ঠের আনুগত্য প্রত্যাশা করা হয়। অর্থাৎ সংগঠনের উপরিস্থ কর্তৃত্বের

সিদ্ধান্ত রূপায়িত করার দায়িত্ব থাকে নিম্নস্তরের সংগঠন ও দলীয় অন্যান্য সংস্থার উপর। এটাকেই বলা হয় অন্তর্দলীয় গণতন্ত্র, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা।

দ্র. গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা।

অন্তর্ভুক্তি (Annexation)

একটি রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অধিকার। আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্গত এই প্রত্যয়টি সম্পর্কে নানারকম অভিমত আছে। বিষয়টি সম্পর্কে আইনের পুরানো ও নতুন অর্থ ও প্রয়োগেও পার্থক্য বিদ্যমান। কোনও ভূখণ্ড অধিকারভুক্ত করা (occupation) এবং জয় করে নেওয়া (conquest) সমার্থক নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক অনুসৃত mandate (আজ্ঞা) নীতি অনুযায়ী ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ইতালি প্রভৃতি রাষ্ট্রের উপনিবেশগুলির উপর কর্তৃত্ব ও অধিকার অবৈধ ছিল না। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ স্থাপনের পর ১৯৬৭ খ্রি ইজরেল কর্তৃক মিশরের গাজা ভূখণ্ড দখল করে নেওয়া আইনবিরোধী। আশ্রিত রাজ্য ও যুদ্ধে বিজিত ভূখণ্ড দখল করে রাখার মধ্যে পার্থক্য আছে। অন্তর্ভুক্তির ফলে অধিকৃত ভূখণ্ডের উপর যাবতীয় কর্তৃত্বের সুযোগ পাওয়া যায়। অধিকৃত দেশ বা ভূখণ্ডের অধিবাসীদের আনুগত্য অধিকারকারী রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। নতুন রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ না ঘটলে অধিকৃত ভূখণ্ডের পুরানো রীতিনীতি বজায় থাকতে পারে। অন্তর্ভুক্ত কোনও দেশ উপনিবেশে পরিণত হয় না। অধিকৃত অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত দেশের অধিবাসীদের আনুগত্যের সঙ্গে সম্মতি পাওয়া গেলে বিতর্ক বিশেষ থাকে না। বলপ্রয়োগ ছাড়াও চুক্তির মাধ্যমেও অন্তর্ভুক্তি ঘটে। সেক্ষেত্রে অধিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন ওঠে না। কয়েক শতক আগে নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কারের সঙ্গে সেটিকে অধিকার করে নেওয়াই ছিল স্বীকৃত নীতি। কালক্রমে সেটাই হয় সাম্রাজ্যবাদ। বর্তমানে বৃহৎ শক্তি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ভূখণ্ড অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

দ্র. যুধ্যমান অবস্থা।

অবরোধ (Blockade)

যুধ্যমান অবস্থায় শত্রুদেশের বন্দরে প্রবেশ ও বহিরাগমন রোধ করার উদ্দেশ্যে বন্দরের বাইরে যুদ্ধ জাহাজ দিয়ে অবরোধ, যাতে সে দেশে সরবরাহ ও অর্থনৈতিক বিঘ্ন সৃষ্টি করা যায়। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে নিরপেক্ষ কোনও দেশের বাণিজ্য-জাহাজ সে-অবরোধ অমান্য করলে জাহাজ বাজেয়াপ্ত করার অধিকার থাকে। উক্ত আইন অনুযায়ী নিরপেক্ষ সমস্ত দেশসহ যাবতীয় ক্ষেত্রেই ওই অধিকার প্রযুক্ত হতে হবে। লন্ডনে ১৯০৮ খ্রি একটি ঘোষণায় অবরোধের অধিকার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সেটা ফলপ্রসূ হয়নি। শান্তিবাদী অবরোধে (pacific blockade) ন্যূনতম হিংসার আশ্রয় নেবার রীতি অনুসৃত হয়; উদ্দেশ্য হল যুদ্ধ এড়ানো এবং অন্যদেশের জাহাজের যাতে অবরোধে ক্ষতি না হয়। ইতিহাসে নানা দেশের অনেক

অবরোধের নজির আছে। অনেক সময়ে শান্তিরক্ষার্থে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি অবরোধের পদ্ধতি প্রয়োগ করে। ১৯০৭ খ্রি হেগ চুক্তি অনুযায়ী পূর্ব হতে সালিশির প্রয়াস ব্যতীত ঋণ উশুলের উপায় হিসেবে অবরোধ আইনবিরুদ্ধ। অবরোধ ভূখণ্ডেও হয়ে থাকে।

অবাধ বাণিজ্য (Laissez-faire)

আর্থনীতিক বিধিব্যবস্থায় অর্থাৎ উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা বনাম সরকারি হস্তক্ষেপ সম্পর্কে বিতর্ক দীর্ঘকালের। অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সে চতুর্দশ লুইয়ের অর্থমন্ত্রীর উদ্দেশে ধ্বনিত অবাধ বাণিজ্য নীতির আদর্শ ফিজিওক্র্যাট নামে পরিচিত অর্থনীতিবিদরা গ্রহণ করেন। তাঁরা সমকালীন মার্ক্যান্টাইলিস্ট অর্থাৎ বাণিজ্যতন্ত্রী অর্থনীতিবিদদের রাষ্ট্রনির্ভর অর্থনীতি তথা সরকারি ব্যবসাবাণিজ্যের নীতি মানতেন না। ফিজিওক্র্যাটরা মনে করতেন যে রাষ্ট্রের কাজ হল স্বাভাবিক ধারানুসারী ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান। অ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ ধ্রুপদী অর্থনীতিবেত্তারা সরকারি হস্তক্ষেপ প্রবণতার বিরোধীদের শিবিরকে সংখ্যায় পুষ্ট করেন এবং অদ্যাবধি সমাজতন্ত্রের বিপক্ষ মতাবলম্বীরা অবাধ বাণিজ্য নীতিতে দৃঢ়তার সঙ্গে আস্থাশীল।

দ্র. বাজার অর্থনীতি ; সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি।

অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)

গ্রিক আরিস্তোক্রাতিয়ার বাংলা প্রতিশব্দ। অর্থ হল সর্বোত্তমের দ্বারা শাসন। আরিস্তোতলের দৃষ্টিতে পুণ্যবানদের নিয়ে অভিজাততন্ত্র রচিত হয় এবং গোষ্ঠীতন্ত্রের (oligarchy) মূলাধার হল বিত্ত। দুটি শাসনতন্ত্রই কায়েমি মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তিদের দ্বারা চালিত হয়। তবে অভিজাততন্ত্রের অভীষ্ট হল সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ, অভিজাততন্ত্র উত্তরাধিকারসূত্রে একটি সংখ্যালঘু শ্রেণী কর্তৃক চালিত হয়। তার দুটি ধারা দেখা যেত, একটি নগর রাষ্ট্রের শাসন যেখানে রাজার পরিবর্তে একটি শাসকশ্রেণী ক্ষমতাসীন থাকত। দ্বিতীয় ধারার অন্তর্গত তিনটি উপধারাই বেশি পরিচিত : ১. আইনানুগ রাজনৈতিক ধারা, যাতে উত্তরাধিকারের স্বত্বাধীনে ভূস্বামীদের আধিপত্য, রাজার কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্মান ও শক্তির নিদর্শন হিসেবে খেতাব ধারণ, রাজসভায় স্থায়ী আসনের মর্যাদা অর্জন। ২. আর্থনীতিক ধারা, আইন ও রাজনীতির পূর্বোক্ত ধারার অন্তরালে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও ক্ষমতা কাজ করে, যেটি মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভিত্তি ও উপরিকাঠামোয় বিভক্ত। ভূস্বামী জমির স্বত্বাধিকারী, তাতে ক্ষেতমজুরকে দিয়ে কাজ করানো হয়। অভিজাততন্ত্র প্রকারান্তরে সামন্ততন্ত্রেরই অবশিষ্ট একটি অঙ্গ। ৩. সামাজিক ধারা, যেটি জনমানসে বেশি স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। সাধারণ লোকে উত্তরাধিকার সূত্রে অভিজাতদের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা, অবসর বিনোদন, বিলাসিতা, ধনাঢ্যের হাবভাব প্রত্যক্ষ করে। লোকচক্ষে অভিজাতদের বংশমর্যাদা উত্তরাধিকারের সঙ্গে মিশ্রিত হয়।

দ্র. গুণতন্ত্র

অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism)

যে দার্শনিক মতবাদে বলা হয় যে সমস্ত জ্ঞানের উৎস হল অভিজ্ঞতা। যুক্তিবাদ বিরোধী এই মতবাদে সহজাত জ্ঞান ও পূর্বকল্পিত বা অবরোহী পদ্ধতিতে নির্ণীত সত্যকে স্বীকার করা হয় না। পর্যবেক্ষণ (অভিজ্ঞতা) ব্যতীত কোনও কিছুর সামান্যীকরণ এই মতবাদের পরিপন্থী। যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ এবং যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ বিংশ শতাব্দীতে সবিশেষ প্রাধান্য পায়। উভয় মতবাদেই অভিজ্ঞতার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ প্রস্তাবনাই একমাত্র বিবেচ্য। তাই কোনও বিষয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরীক্ষিত না হলে অর্থহীন। সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যেসব অভিজ্ঞতাবাদী লেখক ও তাত্ত্বিক আছেন তাঁদের এই রীতি মেনে চলতে হয়। গবেষণার কাজে লিপিবদ্ধ নথি অপেক্ষা সংশ্লিষ্ট স্থানে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ অধিক মূল্যবান। বলা হয়ে থাকে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিত্তিতে বিশ্বাসী এই মতবাদ ফ্রান্সিস বেকন থেকে জন স্টুয়ার্ট মিল অবধি যুক্তরাজ্যের দর্শনচিন্তায় আধিপত্য করে।

(শ্রী) অরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০) (Aurobindo Ghose)

দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, কবি ও শিল্পশাস্ত্রী। তিনি বৈদান্তিক ভাবধারার সঙ্গে পাশ্চাত্যের আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনের সংমিশ্রণে এক নতুন দিকের সূচনা করেছেন। ইংল্যান্ডে ছাত্রজীবনে তিনি গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন। দেশে ফিরে বরোদায় অধ্যাপনার সঙ্গে বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনার প্রচার থেকে ক্রমে প্রকাশ্য রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। এরপর কলকাতায় এসে অধ্যাপনা, 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা সম্পাদনা এবং গোপনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়াসী হন। ফলে বছরকাল কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তির পর তিনি সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা থেকে সরে যান এবং পণ্ডিচেরিতে যোগসাধনা ও দার্শনিক সৃজনকর্মে জীবন অতিবাহিত করেন। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষপাতী এবং ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধপ্রচেষ্টার সমর্থক ছিলেন।

দর্শনচিন্তায় শ্রীঅরবিন্দের প্রধান অবদান হল তাঁর অতিমানস (Supermind) তত্ত্ব। সচ্চিদানন্দের সঠিক জ্ঞান ও পূর্ণশক্তির উপলব্ধিকেই অতিমানস বলা চলে; যোগসাধনার মাধ্যমে সেই উপলব্ধির সাহায্যে জগৎ ও জীবনের ঈপ্সিত পরিবর্তন সাধিত হয়। তাঁর 'দিব্য জীবন' প্রত্যয়ের তাৎপর্য হল মানবমনের স্বভাবগত অহংবোধ ও ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে অর্থাৎ মানসস্তর থেকে অতিমানসের স্তরে উঠে চরম সত্য ব্রহ্মকে জানা। সেজন্য ধর্মীয় অনুশাসন ও আচার অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন। তিনি অধ্যাত্মভাবে পরিমার্জিত এমন এক আদর্শ সমাজের কথা ভেবেছেন যা সকলের জীবনকেই করে তুলবে সুন্দর ও সমৃদ্ধ। আধ্যাত্মিক প্রেরণাই হবে তার সঞ্চালক। সেই সঙ্গে তিনি চেয়েছেন বিশ্বের রূপান্তরের জন্য সর্বজ্ঞ ও বিশ্বচেতনাসম্পন্ন দিব্য অতিমানসের অবতরণ। মানুষকে সেজন্য মন অতিক্রম করে অতিমানস অভিমুখে বিবর্তিত হতে হবে। তখন অতিমানসিক গুণসমন্বিত একটি জাত বা গোষ্ঠী গড়ে উঠবে। তাঁর মতে অন্তর্মুখী সমচেতনার বিকাশের মাধ্যমে যাবতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে সম্প্রীতি, সমন্বয় ও ঐক্য অর্জন করা যায়। প্রকৃতিগতভাবে মানুষ চায়

চিন্তার স্বাধীনতা, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনের বিকাশ ও সৃজনকর্মের অবকাশ। কিন্তু রাষ্ট্র তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সৃজনশীল মানুষের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দানা বাঁধে নৈরাজ্যবাদ ভিত্তিক চিন্তায়। তাঁর মতে মানবিক বিকাশের পরিপন্থী প্রচলিত ব্যবস্থায় ব্যক্তিমানুষের সত্তা যখন অবদমিত হয়, তখন তার সামাজিক চাপ ও চাহিদা নৈরাজ্যবাদে বিকল্প পথের সন্ধান করে। নৈরাজ্যবাদের হিংসাত্মক দিকটিকে বাদ দিয়ে তিনি তার মানব অধিকারের আদর্শকে প্রাধান্য দেন। নৈরাজ্যবাদকে তিনি নতুন এক নামে 'কো-অপারেটিভ কমিউনিজম' বলে চিহ্নিত করেন। তাতে সমবায়ী সম্পর্কের ভিত্তিতে সকলের শ্রম ও সম্পদ সাধারণভাবে সারা সমাজের বলে গণ্য হবে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হবে না।

তিনি অনুভব করেন যে মানবসমাজের যথার্থ বিকাশ ও অগ্রগতির জন্য মানবপ্রকৃতির পরিবর্তন হওয়া কাম্য, পরিবর্তনটা তাঁর দৃষ্টিতে স্পষ্টতই আধ্যাত্মিক। তিনি চাইতেন বস্তুগত বিষয় থেকে আত্মিক স্তরে উত্তরণ। অধ্যাত্মবাদে মণ্ডিত সমাজ সর্বস্তরের মানুষকে যান্ত্রিক প্রশাসনে তাড়না বা পীড়ন না করে ছোটবড় সকলের অন্তরাত্মাকে উত্তোলন করবে, অতিমানসের স্তরে মানুষের উত্তরণ হলে আধ্যাত্মিক বিবর্তনধারায় গড়ে উঠবে এক নতুন মানব সমাজ, তাতে আর্থ-সামাজিক অসাম্য দূরীভূত হবে। তার দার্শনিক বনিয়াদকে তিনি আধ্যাত্মিক কমিউনিজম নামে অভিহিত করেন।

অর্থশাস্ত্র (Arthasastra)

হিন্দু রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে একটি প্রাচীন গ্রন্থ। রচয়িতা ছিলেন তক্ষশিলার অধিবাসী বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ। তিনি চাণক্য নামেও পরিচিত। বিশাখদত্ত রচিত মুদ্রারাক্ষস থেকে জানা যায় যে তিনি মগধে মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের (৩২২-২১৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গ্রন্থটির রচনাকাল এবং রচয়িতা কৌটিল্য সম্পর্কে মতভেদ আছে। অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি শুধু ধনসম্পদ সম্পর্কিত নয়, তাতে রাষ্ট্রনীতি, দণ্ডনীতি, আইন, প্রশাসন, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থকার আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি—এই বিদ্যা চতুষ্টয়ে তাঁর অধিকারের স্বাক্ষর ছাড়াও গ্রন্থটিতে তিনি শুল্কশাস্ত্র, বাস্তুবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি নানা জ্ঞানের ক্ষেত্রে গভীর বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

গ্রন্থটি 'অধিকরণ' নামে ১৫টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং এক একটি অধিকরণ কিছু সংখ্যক প্রকরণে বিভক্ত। মোট ১৮০টি প্রকরণ আছে। প্রকরণগুলি ১৫০টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। পরিচ্ছেদগুলির শেষে আলোচিত বিষয়বস্তুর সার প্রদত্ত হয়েছে। গ্রন্থটি ভাষ্য ও সূত্রাকারে রচিত। মাঝে মাঝে কিছু শ্লোক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শ্লোকের সংখ্যা মোট ছ' হাজার। গ্রন্থকার বৃহস্পতি, শুক্র প্রমুখ পূর্বসূরিদের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। ভাষা সহজ, কিন্তু স্থানবিশেষে দুর্বোধ্য। অর্থশাস্ত্রের একাধিক টীকা আছে। অধিকরণগুলিতে আলোচিত বিষয়সমূহের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নীচে দেওয়া হল :

আলোচনার সুবিধার্থে সুবিশাল এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধিকরণকে মোটামুটি তিনটি

পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে প্রথম, ষষ্ঠ ও অষ্টম অধিকরণে আলোচ্য বিষয় হল রাজধর্ম তথা রাজার কর্তব্য। রাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গের (সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব) মধ্যে স্বামী (রাজা), অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষ, দণ্ড এবং মিত্রের কথা বলা হয়েছে। এই সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের মধ্যেই রাষ্ট্রের প্রত্যয় সম্পর্কে আধুনিক যে সব লক্ষণের কথা বলা হয় অর্থাৎ **সার্বভৌমত্ব, সরকার**, ভূখণ্ড, জনসংখ্যা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রের তথা সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি কথোপকথনের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে যে জঙ্গলের রাজত্ব থেকে পরিত্রাণের জন্য দ্রব্যাদির বিনিময়ে মনু নামক রাজার আধিপত্য স্বীকৃতি পায়। সার্বভৌমত্বের অধিকারী রাজার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও অনেক কথা বলা হয়েছে। রাজাকে প্রদেয় ভূমিরাজস্বের হারও নির্ধারিত করা হয়। মনু প্রবর্তিত আইন ও বিধিনিষেধ অযৌক্তিক প্রতিপন্ন হলে যুক্তিগ্রাহ্য আইন অনুসরণ করা বিধেয়। জনসাধারণের সুখ ও শান্তি রাজার কল্যাণ বিধান করে। দণ্ড শব্দটি অর্থশাস্ত্রে শাসনশক্তির যষ্টিসদৃশ প্রতীক এবং শাস্তি—উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কৌটিল্য রাজনীতিকে **মাকিয়াভেল্লির** মতো ধর্ম ও নৈতিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখেন। শুভ লক্ষ্যে পৌঁছতে অশুভ মাধ্যম অনুসরণে কোনও আপত্তি নেই। তবে দেশে মাৎস্যন্যায় দেখা দিলে রাজদণ্ডের কঠোর প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। রাজার প্রাত্যহিক এবং দিবসব্যাপী ইতিকর্তব্য, যথা প্রজাপালন চিন্তা, আয়ব্যয়ের হিসাবরক্ষণ, স্নানাহার, রাজধানী পরিদর্শন, পড়াশোনা, সভাসদদের সঙ্গে মিলিত হওয়া, বিনোদন, সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন, গুপ্তচরদের সঙ্গে সংযোগ ইত্যাদি।

অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় দ্বিতীয় বিষয় হল রাজ্যের প্রশাসন। আমলাবর্গ, যাদের নামকরণ করা হয়েছে অধ্যক্ষ, তাদের দায়দায়িত্ব এবং সেইসঙ্গে ভূমিব্যবস্থা, রাজস্ব, রাজকোষ, পণ্যাদি উৎপাদন, বাণিজ্য, কৃষি, সামরিক বাহিনীর বর্গবিন্যাস, নগরের স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদির অনুপুঙ্খ আলোচনা দেখা যায় দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম অধিকরণে। বিবাহ, উত্তরাধিকার, ঋণ, সঞ্চয়, দাস **মালিকানা**; অপরাধীকে কারারুদ্ধ করা ও শাস্তিদান; শাস্তি অথবা অঙ্গচ্ছেদের পরিবর্তে **জরিমানা** আদায়; আইন ও রীতিনীতি ভঙ্গের দায়ে দণ্ডবিধান ইত্যাদি বিষয় এই পর্যায়ে সবিস্তারে বলা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অধিকরণের বিষয় হ'ল যুদ্ধ ও কূটনীতি। সপ্তম অধিকরণে কৌটিল্য ছ' ধরনের বিষয়সংক্রান্ত কর্মপন্থার কথা বলেছেন, যথা শান্তি, যুদ্ধনিরপেক্ষতা, অভিযানপ্রস্তুতি, জোটবদ্ধতা ও নিরাপত্তার চুক্তি, সন্ধি ও সংগ্রাম। নবম অধিকরণে আক্রমণকারীর মতিগতি ও শক্তির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দশম অধিকরণে যুদ্ধ, রণসজ্জা, শিবির স্থাপন, সৈন্যবাহিনীর প্রকৃতি অনুযায়ী রণকৌশল, নিরাপত্তা বিধান। দ্বাদশ অধিকরণে শক্তিশালী শত্রুপক্ষ, ত্রয়োদশ অধিকরণে দুর্গদখলসূত্রে শত্রুশিবিরে বিভেদ, গোপন কৌশলে পররাজ্যের নৃপতিদের প্রলোভন দেখানো, গুপ্তচর পাঠানো, অধিকৃত দেশে শান্তিস্থাপন; চতুর্দশ অধিকরণে শত্রুপক্ষের সঙ্গে গোপন আচরণ, ছলে বলে কৌশলে পর্যুদস্ত করা, নিজ সৈন্যবাহিনীর আহতদের নিরাময় ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

অর্থশাস্ত্রের বিধিবিধানের ফলে দেশে সমকালে একটি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী রাজ্য গড়ে উঠেছিল—একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

দ্র. কামন্দকীয় নীতিসার; রাজধর্ম; মনুস্মৃতি।

অসহযোগ আন্দোলন (Non-Co-operation Movement)

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের জনবিক্ষোভ ও সর্বাত্মক আন্দোলন (১৯২০-২২)। অসহযোগ শব্দটি গান্ধীজি বস্তুত খিলাফত আন্দোলনসূত্রে উদ্ভাবন করেছিলেন। পরে জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন দাবির সঙ্গে খিলাফত আন্দোলনের দাবিসমূহ যুক্ত হয়। অসহযোগ আন্দোলন ২ অগস্ট ১৯২০ খ্রি সূচিত হয়। কার্যত এই আন্দোলনকে পূর্ববর্তী ১৯১৯ খ্রি রাউলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পুনরাবৃত্তি বলা যায়। রাউলাট আইনের সাহায্যে সরকারের দমননীতির প্রতিবাদ, জালিয়ানওয়ালাবাগে সরকারি ফৌজের নৃশংস গণহত্যার প্রতিকার এবং খিলাফতের বিষয়ে ইংরেজদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা সমেত ১৯১৯ খ্রি ভারত শাসন আইনের ত্রুটি সমূহের ফলে যে অসন্তোষ দেখা দেয়, সে সব মিলিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের পশ্চাৎপট রচিত হয়েছিল।

আন্দোলনে হিংসার প্রয়োগ ছিল নীতিবিরুদ্ধ। অসহযোগের সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে নৈতিক সংকল্পে অবিচল থেকে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করাই ছিল লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত, আন্দোলন মূলত গঠনপ্রয়াসী হলেও সংগ্রামের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা হয়নি। তৃতীয়ত, অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে ব্যক্তিগতভাবে এবং সমবেতভাবে জনগণ নিষ্কলুষ বিদ্রোহের পথে এগোবে, সংযুক্ত প্রয়াসের মাধ্যমে মানুষ শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হয়ে স্বরাজের অভিমুখে অগ্রসর হবে। বিদ্রোহকে সুনিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য গান্ধীজি খিলাফত সম্মেলনে (নভেম্বর, ১৯১৯) সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগের আদর্শ ব্যক্ত করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের অসহযোগ নামাঙ্কিত এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তীব্র জনউদ্দীপনা দেখা দেয় এবং **ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস** কংগ্রেস একটি জাতীয় সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি ও সুসংহত রূপ লাভ করে।

১৯২০ খ্রি ১৭ এপ্রিল মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত খিলাফত সম্মেলনে চতুর্মুখী কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল : ১. সরকারি খেতাব ও কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ, ২. সরকারি পদ থেকে ইস্তফা, ৩. পুলিশ ও সামরিক বিভাগ থেকে পদত্যাগ এবং ৪. খাজনা প্রদান বন্ধ। খিলাফতি ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় রাজনীতিকে জড়িয়ে ফেলার বিরোধিতা করেন কংগ্রেসের অনেক নেতা ও কয়েকটি প্রাদেশিক কমিটি। গান্ধীজি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

সেপ্টেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সম্মেলনে বিরোধীদের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং কর্মসূচিতে আরও পাঁচটি বিষয় যুক্ত হয় : ১. যাবতীয় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কট এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ২. ইংরেজদের আদালত বয়কট ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তন, ৩. মেসোপটেমিয়াতে সামরিক ও করণিক কর্মচারী এবং শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করা, ৪. কাউন্সিল নির্বাচন বয়কট এবং ৫. বিদেশি পণ্যের শ্রমিক বয়কট।

ডিসেম্বরে নাগপুরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে অতিরিক্ত স্বরাজ দাবি যুক্ত হয়ে অসহযোগ প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এক বছরে স্বরাজ পাওয়া যাবে বলে গান্ধীজি ঘোষণা করেন। বিপুল গণউদ্দীপনায় কংগ্রেস যথার্থই একটি সর্বাত্মক জাতীয় দলে পরিণত হয়। দলের গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের মাধ্যমে খাদি বস্ত্র, গান্ধী টুপি পরিধান

বাধ্যতামূলক হয়। চরকা-খদ্দর, মাদকতা বর্জন, অস্পৃশ্যতা পরিহার, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য কর্মসূচির অঙ্গীভূত হয়। গঠনকর্মের জন্য টিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে এক কোটি টাকা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত হয়। অতঃপর সারা দেশে বিক্ষিপ্ত আকারে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তার মধ্যে মালাবারে সশস্ত্র মোপলা বিদ্রোহ (অগস্ট ১৯২১), ও বোম্বাইতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (নভেম্বর ১৯২১) ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর। শাসনতান্ত্রিক নতুন আইন (১৯১৯) অনুযায়ী ১৯২০ খ্রি ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন কংগ্রেস বয়কট করে। আন্দোলনের অনুষঙ্গী হিসেবে মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন এবং পঞ্জাবে অকালি বিক্ষোভ দেখা দেয়। ১৯২১ খ্রি নভেম্বরে প্রিন্স অব ওয়েলসের (পরে অষ্টম এডওয়ার্ড) ভারত ভ্রমণের সময়ে সর্বত্র তাঁর সভাসমাবেশকে বয়কট করা হয়। প্রিন্স বোম্বাইতে যেদিন পৌঁছন সেদিন হরতাল পালিত হয়। সেদিন এক জনসভার শেষে গান্ধীজি বিদেশি বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করেন। পরে পুলিশের গুলি চলে, ৫৩ জন নিহত ও দাঙ্গায় ৪০০ ব্যক্তি আহত হন। আত্মশুদ্ধিকল্পে গান্ধীজি পাঁচ দিন অনশন করেন।

দেশব্যাপী জনবিক্ষোভে দিশেহারা সরকার খিলাফতি ও অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনকে বেআইনি ঘোষণা করে। তাতে আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, সেইসঙ্গে সরকারি দমন ব্যবস্থাও কঠোর হয়ে দাঁড়ায়। ৩০,০০০ নরনারী গ্রেপ্তার হন। অনেক নেতা কারারুদ্ধ হন। সংবাদপত্রের উপরও বিধিনিষেধ জারি হয়।

৮ জুলাই ১৯২১ খ্রি করাচিতে নিখিল ভারত খিলাফত সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে কংগ্রেসের আসন্ন আহমদাবাদ অধিবেশনের পূর্বে দাবিসমূহ সরকার মেনে না নিলে স্বাধীন ভারত প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হবে। ইতিপূর্বে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলাভঙ্গের সৃষ্টির প্রচেষ্টার দরুন আলি ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন কারারুদ্ধ হওয়ায় হাকিম আজমল খাঁর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের আহমদাবাদ অধিবেশন বসে। গান্ধীজি ওই অধিবেশনে অন্যান্য নেতাদের অনুপস্থিতিতে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিজের হাতে রাখার জন্য একটি প্রস্তাবে নিজেকে একনায়ক হিসেবে অনুমোদন করিয়ে নেন।

১৯২২ খ্রি ১ ফেব্রুয়ারিতে গান্ধীজি ভাইসরয় লর্ড রেডিংকে একটি চরমপত্রে জানিয়ে দেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে সরকারের মনোভঙ্গি পরিবর্তিত না হলে তিনি গুজরাতের বড়দৌলি তালুকে কর বন্ধ আন্দোলন শুরু করবেন। কিন্তু ৪ ফেব্রুয়ারি গোরখপুর জেলার চৌরিচৌরায় তিন সহস্র লোকের এক ক্রুদ্ধ জনতা পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে থানায় অগ্নিসংযোগ করে; তাতে ২১ জন পুলিশ ও ১ জন সাব-ইন্সপেক্টর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। এই হিংসাত্মক ঘটনায় গান্ধীজি বিচলিত হয়ে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখেন। শুধু ব্যক্তিগতভাবে ও সীমিত ক্ষেত্রে আইন অমান্যের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকে।

এদিকে তুরস্কে কেমাল আতাতুর্ক ক্ষমতাসীন হয়ে ১৯২৩ খ্রি ২৯ অক্টোবর দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে এবং তুরস্কে খলিফার ক্ষমতাসহ খিলাফতের অবসান ঘোষণা করেন। তখন থেকে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে ১৯২৪ খ্রি পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশে বিচ্ছিন্নভাবে চলার পর স্থগিত রাখা হয়।

দ্র. আইন অমান্য আন্দোলন।

আ

আইন (Law)

প্রাত্যহিক জীবনে আইন শব্দটি সদাই ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু নানান অর্থে। সংজ্ঞাও আছে বিভিন্নরকম ; তার একটিতে বলা হয়েছে যে আইন হল কিছু সামাজিক নিয়মাবলির সংহিতা যার কাজ হল বিচারযোগ্য হিসেবে বিবেচিত মানুষের বহির্মুখ আচরণ সম্পর্কে নির্দেশকরণ। সংজ্ঞাটির বিভিন্ন উপাদান, যথা 'সামাজিক' 'নিয়মাবলি', 'নির্দেশকরণ', 'বহির্মুখ', 'আচরণ' 'বিচারযোগ্য' 'বিবেচিত' শব্দগুলির তাৎপর্যের ব্যাখ্যা প্রয়োজন :

(১) 'সামাজিক বলতে স্বতঃই আইন একাধিক মানুষের উপর প্রযোজ্য, যারা সমাজের সদস্য, (২) 'নিয়মাবলি'র মধ্যে নানাবিধ আইনের অলিখিত রীতিনীতি ও প্রচলিত প্রথা ধর্তব্য। আইন হওয়া উচিত সর্বাত্মক ; (৩) 'নির্দেশকরণ' বলতে বাধ্যতা বোঝায়, আইন মেনে চলা ঐচ্ছিক নয় ; না মানাটা দণ্ডনীয়, (৪) 'বহির্মুখ' বলতে আইনের আওতায় লোকের সমাজগ্রাহ্য ও প্রকাশ্য আচরণ বিবেচ্য ; কারও নিজস্ব চিন্তা বা মনোভাব ধর্তব্য নয়। কোনও কোনও দেশে অবশ্য লোকের নিজস্ব ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা ও আচরণে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে ; সরাসরি কোনও বিশ্বাস কারও উপর চাপিয়ে না দিলেও ধর্মীয় কিংবা দলীয় অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপে বিরুদ্ধপক্ষের লোককেও যোগ দিতে বাধ্য করে। (৫) 'আচরণ' বলতে কারও নিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিনিধির আচরণ যার কোনও দূষণীয় ব্যাপারে তাকে দায়ী করা যায় ; (৬) 'বিচারযোগ্য' বলতে রায়দানের ক্ষমতাসম্পন্ন কোনও আদালতের সামনে বিচারভাজন হওয়া ; (৭) 'বিবেচিত' মানে রাষ্ট্র কর্তৃক আইনসভায় বিবেচিত হওয়া এবং বিষয়টি সেইসব ব্যক্তির কাছে ব্যাখ্যা করা যাদের রাষ্ট্র ও আইন প্রণয়ন সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট।

সাধারণভাবে উল্লিখিত সংজ্ঞার ভিত্তিতে আইন সম্পর্কে কয়েকটি তত্ত্বের আলোচনা করা যেতে পারে।

আ

প্রাকৃত আইন (natural law), **প্রাকৃত অধিকারের** মতো কিছু প্রাকৃত আইন আছে, যেগুলির প্রয়োগ ক্ষেত্রবিশেষে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের সীমা নির্ধারণ করে। প্রাকৃত আইনে লোকের আস্থা বেশি না থাকলেও, সমাজজীবনে এমন অনেক স্থায়ী মূল্যবোধ বা নীতি আছে যেগুলি সদাচার ও যুক্তিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে সেগুলিকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মাধ্যমে সচল রাখা বিধেয়। প্রাকৃত আইন বিভিন্ন বিষয়ের প্রাকৃতিক গতির সঙ্গে সুসমঞ্জস হওয়া চাই। প্রাকৃত আইনের দু ধরনের উৎসের কথা বলা হয় : একটি হল ঈশ্বরের বিধান, অপরটি যুক্তিশীলতার আবেদন।

আইনানুগ দৃষ্টবাদ (legal positivism)। বেনথাম ও জন অস্টিন ছিলেন এর প্রধান প্রবক্তা। এই মতবাদ অনুসারে প্রাকৃত আইনের পরিবর্তে মানুষের সামাজিক প্রথা বা সর্বস্বীকৃত রীতিনীতিগুলি তাদের কর্তৃত্ব বা কার্যকারিতা আইনসভা থেকে অর্জন করে। সার্বভৌম কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি (রাজা, সম্রাট ইত্যাদি) অথবা আইন প্রণয়নের কর্তৃত্বসম্পন্ন সভা বা সংসদের অনুমোদনভিত্তিক আইন। প্রাকৃত আইনের সঙ্গে এর পার্থক্য হল যে দৃষ্টবাদী আইন সম্পূর্ণভাবে মানুষের দ্বারাই প্রস্তুত হয়। এগুলিকে **সংবিধিও** (statute) বলা চলে, যা মূলত সংসদে বিধিবদ্ধ হয়। উল্লিখিত ধরনের আইন থেকে আবার একই গোত্রের প্রচলিত আইনের (common law) পার্থক্য এই যে শেষোক্ত আইনগুলি আদালতে প্রদত্ত রায় থেকে গড়ে ওঠে আইনানুগ বাস্তববাদ (legal realism। সাধারণত আলোচনাদিতে দেখা যায় আইনের মুখ্য বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় যখন নির্দেশক বিধান কিছু থাকে না। আইন হল সমাজেরই একটি কর্মধারা, তাতে শাস্তি ও নিবৃত্তির নির্দেশক বিধানের কথা থাকা উচিত। কাজেই আইনের আলোচনায় তার নির্দেশক বিষয় সমূহ থাকা উচিত ; কারণ নির্দেশের দিকগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই আদালতে আইনের আলোচনা হয়।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে সুশৃঙ্খল ও সুসমঞ্জস সমাজজীবনের জন্য আইন অপরিহার্য। আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে মতভেদ আছে। আইনের উৎস সম্পর্কে জটিলতাই এর কারণ। অনেক সূত্রেই আইনের সৃষ্টি হতে পারে, যথা সামাজিক প্রথা, ধর্ম, আদালতের সিদ্ধান্ত, ন্যায়পরায়ণতা, আইনজ্ঞদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, আইনসভায় গৃহীত নিয়মকানুন ইত্যাদি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকে আইনকে দুভাগে ভাগ করেন : জাতীয় (national) আইন ও **আন্তর্জাতিক আইন** (international law)। জাতীয় আইনকে **সাংবিধানিক আইন** (constitutional) ও সাধারণ (ordinary) আইন, এই দু শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। সাধারণ আইনের মধ্যে পড়ে সরকারি (public) এবং বেসরকারি (private) বা ব্যক্তিগত আইন। সরকারি আইনের মধ্যে পড়ে প্রশাসনিক (administrative) এবং সাধারণ বিষয়ক (general) আইন। সাধারণ বিষয়ক আইনসূত্রে এসে পড়ে দেওয়ানি (civil), ফৌজদারি (criminal), প্রচলিত (common), সংবিধি (statute), অধ্যাদেশ (ordinance) ইত্যাদি।

আইন অমান্য আন্দোলন (Civil Disobedience Movement)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতিবাদী দার্শনিক হেনরি ডেভিড থোরো (১৮১৭-৬২) তাঁর 'অন দ্য ডিউটি অব সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স' (১৮৪৯) নামে একটি প্রবন্ধে গণপ্রতিবাদ ও আন্দোলনের এই পদ্ধতিটি তুলে ধরেন। যে-সরকার ক্রীতদাস প্রথা অনুমোদন করে সে সরকারকে কর না দেবার সিদ্ধান্তকে তিনি ওই প্রবন্ধে ব্যক্ত করেন।

উল্লিখিত প্রত্যয়টিকে গান্ধীজি তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচিতে রূপায়িত করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় জোহান্সবার্গে ১৯০৬ খ্রি থেকে গান্ধীজির নেতৃত্বে নানা বিষয়ের প্রতিবাদে সর্বপ্রথম **সত্যাগ্রহ** ও কিছুটা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়ে ১৯১৩ খ্রি অবধি চলেছিল। দ্বিতীয়বার তিনি আইন অমান্য পরিচালনা করেন ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯১৯ খ্রি রাউলাট আইনের প্রতিবাদে। বই ও পত্রপত্রিকার নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯২২ খ্রি **অসহযোগ আন্দোলনের** গোড়াতে গান্ধী গুজরাতের বড়দৌলি তালুকে আইন অমান্যের সিদ্ধান্ত ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে লেখা এক চিঠিতে ভাইসরয়কে জানিয়ে দেন। কিন্তু চৌরিচৌরায় হিংসাত্মক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় উভয় আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

ইংরেজ সরকার ভারতে শাসনতন্ত্রের মূল্যায়ন ও নতুন বিধিব্যবস্থা প্রবর্তনকল্পে সাইমন কমিশন (১৯২৭) নিয়োগ ও গোল টেবল বৈঠকের আয়োজনে ক্রমে অগ্রসর হতে থাকলে সেই সময়ে **ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস** তার লাহোর অধিবেশনে (১৯২৯) পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যের প্রস্তাব গ্রহণ করে। কংগ্রেস গান্ধীকে এই দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনের জন্যে দায়িত্ব অর্পণ করে। গান্ধী তাঁর রীতি অনুযায়ী ভাইসরয়ের কাছে লেখা কয়েকটি দাবি সমন্বিত এক পত্রে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। দাবিসমূহ প্রত্যাখ্যাত হয়। ফলে ১৯৩০ খ্রি ৬ এপ্রিল গান্ধী সমুদ্রকূলে ডাণ্ডি নামক স্থানে ৭৯ জন সহকর্মীকে নিয়ে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। ক্রমে সেই আন্দোলন দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে বিদেশি পণ্য বয়কট, পিকেটিং, সভাসমিতির আয়োজন যুক্ত হয়। সরকারও ব্যাপক দমননীতি গ্রহণ করে। ১৯৩১ খ্রি মার্চে ভাইসরয় আরউইনের সঙ্গে গান্ধীর এক চুক্তির ফলে আন্দোলন স্থগিত থাকে। গান্ধী গোল টেবল বৈঠকে যোগদান করেন। তাতে কোনও রাজনৈতিক মীমাংসা না হওয়ায় ১৯৩২ খ্রি জানুয়ারি মাস থেকে আন্দোলন নতুন উদ্যমে শুরু হয়। গান্ধী সহ বহু নেতা ও কর্মী কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৪ খ্রি কংগ্রেস অধিবেশনে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়।

আইনশাস্ত্র (Jurisprudence)

আইনের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও বিকাশ সংক্রান্ত তত্ত্বগত বিদ্যা। ত্রয়োদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রত্যয়টিকে **প্রাকৃত-আইন** হিসেবে দেখা হত এবং মনে করা হত যে প্রাকৃত আইনের পিছনে থাকে দিব্য নির্দেশ। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই নানারকম তত্ত্ব গড়ে ওঠে যে আইনের ভিত্তি সার্বভৌম কর্তৃত্বের বিধিবিধান। আবার অন্যমতে আইন হল সংস্কৃতি ও প্রথাগত বিধান যার পিছনে ধর্ম বা নৈতিকতার কোনও ভূমিকা থাকে না। আইন সম্পর্কে অন্যান্য তাত্ত্বিকেরা কেউ কেউ মনে করেন যে

আইনের পিছনে থাকে ঐতিহাসিক কার্যকারণ, অর্থাৎ বিবর্তনের ধারায় আইন রচিত হয়। কারও দৃষ্টিতে সমাজতাত্ত্বিক কার্যকারণ, অর্থাৎ জাতি ও সমাজের আধিপত্যশীল ধারায় আইন গড়ে ওঠে। আইনশাস্ত্রের কাজ আইন নিয়ে নয়, আইনের দার্শনিক ভিত্তিভূমির বর্ণনা ও বিশ্লেষণ, অর্থাৎ আইনের অন্তর্নিহিত অধিকার, বাধ্যবাধকতা, দায়দায়িত্ব, ন্যায়বিচার ইত্যাদি প্রত্যয়ের অর্থ ও সঙ্গতি প্রদর্শন করা।

আইনসভা (Legislature)

সরকারের তিনটি অঙ্গের অন্যতম আইনসভায় রাষ্ট্রের আইন বিধিবদ্ধ হয়। আইনসভা কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইনের ভিত্তিতে সরকারের অপর দুটি অঙ্গ, অর্থাৎ শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহ করে। আইনসভার প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও পরিবর্তন করা। রাষ্ট্রভেদে আইনসভার কার্যপদ্ধতি ভিন্ন। আইনসভা অনেক রাষ্ট্রে গণপরিষদের কাজ হিসেবে সংবিধান প্রণয়ন, সংশোধন প্রভৃতি কাজ করে। অনেক সময় আইনসভা নির্বাচক বর্গে (electoral college) পরিণত হয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে। সরকারের আয়ব্যয় সম্পর্কিত যাবতীয় সিদ্ধান্ত, বাজেট অনুমোদন ও আর্থিক ক্রিয়াকর্মের সমালোচনা আইনসভার অন্যতম প্রধান কাজ। আইনসভা সরকারের অন্যান্য যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের পর্যালোচনা করে। মন্ত্রিচালিত সরকারের মন্ত্রিগণকে আইনসভার সদস্য হতে হয় এবং নিজেদের কাজের জন্যে আইনসভার কাছে দায়ী থাকতে হয়। সংসদীয় গঠনতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনে আইনসভায় নির্বাচিত দলভিত্তিক প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে।

দ্র. সরকার ; প্রশাসনবিভাগ ; বিচারবিভাগ ; ক্ষমতার পৃথকীকরণ।

আইনসভা : এক-কক্ষ ও দ্বিকক্ষ (Legislature : unicameral & bicameral)

আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় এক-কক্ষবিশিষ্ট (unicameral) আইনসভা বেশি জনপ্রিয় ছিল। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ও জেরেমি বেনথাম আইনসভায় এককক্ষের ব্যবস্থাকে সমর্থন করতেন। পরে **হ্যারল্ড লাস্কিও** অনুরূপ অভিমত পোষণ করতেন। দুজনের অভিমত ছিল যে আইনসভায় প্রতিনিধিত্বমূলক একটি কক্ষ থাকাই সংগত ; তার উপরই রাষ্ট্রের অবিভাজ্য সার্বভৌমত্ব নির্ভর করলে লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা সহজে বাস্তবায়িত হতে পারে। পৃথিবীর অনেক দেশেই এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা আছে। ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার রীতি রদ করা হয়েছে। কারণ একটি কক্ষ থাকলে আইন প্রণয়নের কাজ অনেক সরল ও দ্রুত হতে পারে, নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব সরাসরি ও চূড়ান্ত হয়। দায়িত্ব ও কর্তব্যে বিভাজন ঘটে না। ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আবে সিয়েস মনে করতেন দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট ব্যবস্থায় উভয় কক্ষ কোনও বিষয়ে ঐকমত্য হলে এই ব্যবস্থা বাহুল্য বিশেষ, আবার দ্বিমত হলে ব্যবস্থাটি রদ করাই ভাল। কাজেই তাঁর মতে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা

সুবিধাজনক। ব্যবস্থাটির বিরুদ্ধে আপত্তির সবচেয়ে বড় যুক্তি হল অহেতুক ব্যয়।

উল্লিখিত নানা প্রশ্ন সত্ত্বেও কালক্রমে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। **এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়** উভয়ধরনের রাষ্ট্রেই দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তিত হয়। যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অনেক দেশই ওই দুটি ব্যবস্থাকে মডেল হিসেবে অনুসরণ করে।

তত্ত্বগতভাবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় একটি কক্ষ অপরকে নিয়ন্ত্রণ করে; কোনও বিষয়ে দ্রুততা অপেক্ষা পর্যালোচনার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। কার্যত উচ্চকক্ষের ক্ষমতা বহু দেশে প্রায়শই সংকুচিত হয়ে পড়ে। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষাপক্ষে অনেক যুক্তিতর্ক আছে। তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আপত্তি হল বিলম্ব এবং উচ্চকক্ষের সদস্যদের যোগ্যতা নির্ণয় সমস্যা। উচ্চকক্ষের সদস্যরা মনোনীত হয়ে থাকেন, তাতে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ক্ষুণ্ণ হয়।

দ্বিকক্ষ আইনসভা ব্যবস্থার সমর্থক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লেকি মনে করেন যে নিম্নকক্ষে দ্রুত গৃহীত আইনগুলি খুঁটিয়ে দেখে সেগুলির সংশোধন ও পরিবর্তন এবং নিম্নকক্ষের একাধিপত্য নিবারণ উচ্চকক্ষে সহজেই সম্ভব। বিলম্ব যা ঘটে তার মধ্যে কোনও বিল সম্পর্কে উচ্চকক্ষে সবিস্তারে পরীক্ষার পক্ষে সময়টা কাজে লেগে যায়। আইন প্রণয়নের কাজে যথোচিত সতর্কতার সুযোগ, জনমত নির্ণয়ের সুবিধা ও এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার অসতর্কতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এড়ানো দ্বিকক্ষের অনুকূলে প্রধান যুক্তি। **জন স্টুয়ার্ট মিল,** ব্রাইস, দ্যুগুই প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দ্বিকক্ষের সমর্থনে অনুরূপ অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন।

আইনের শাসন (Rule of Law)

যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বিধিবদ্ধ আইন, রীতিনীতি, বাধানিষেধ ব্যতিরেকে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় না এবং যেখানে নাগরিকেরা যে-কোনও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ও সরকারি আমলার বিরুদ্ধে সুবিচারের দাবিতে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন, যদি অভিযুক্তেরা আইন ভেঙে কিছু করে থাকেন। অবশ্য আইন সবার উপরে একথা যে-কোনও সংবিধানই ঘোষণা করে থাকুক, তার সার্থক রূপায়ণ নির্ভর করে সর্বস্তরের নাগরিকের উপর। সেজন্যে চাই বিচারালয়ের স্বাধীনতা, বিশেষ করে যদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনও আইন প্রয়োগের প্রয়োজন ঘটে। অবশ্য **ক্ষমতার পৃথকীকরণের** উপর সেটা নির্ভর করে। সব কিছু সত্ত্বেও শেষাবধি সেই রাষ্ট্রই বিচারপতি নিয়োগ ও ছাঁটাই-এর কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। আর রাষ্ট্রই আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করে। দেশের স্থিতাবস্থা নষ্ট হয়ে গেলে, আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়লে, সন্ত্রাসবাদীদের দাপট দেখা দিলে আইনের শাসন আর থাকে না। সেজন্যে প্রতিষেধক কিছু আইন বিধিবদ্ধ হয়। তাতে স্বভাবতই সন্ত্রাসবাদী ও অনুরূপ আসামিদের দমনের সময়ে মৌলিক অধিকার বিঘ্নিত হয়, তাতে তথাকথিত আইনের শাসনের সায় থাকে। সেজন্যে কি ব্যক্তিমানুষ, কি সরকার সকলকেই আইনের প্রক্রিয়ার উপর আনুগত্য রক্ষা করতে হবে। একই আইনের প্রয়োগ-পরিধির মধ্যে সকলের থাকা চাই। আইনসভা ও কার্যনির্বাহি সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচারালয়ের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার বিষয়কে যথোচিত

গুরুত্বদান করা প্রয়োজন। ব্যক্তিকে **হবস** কল্পিত লেভিয়াথানরূপী রাষ্ট্রদানবের কবল থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব হল বিচারালয়ের।

আকস্মিক বিদ্রোহ (Coup d' Etat)

ফরাসি শব্দ। সামরিক বা সরকারি শক্তিশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাঁদের হাতে ক্ষমতা আছে তাঁদের উদ্যোগে হঠাৎ বলপ্রয়োগ করে সরকার দখল। বিপ্লবের সঙ্গে তার পার্থক্য হল যে ক্যু উপর থেকে আরোপিত হয়ে চেপে বসে আর বিপ্লবের পিছনে থাকে জনগণ। ইতিহাসে ক্যুর নজির হল ১৭৯৯ খ্রি প্রথম নেপোলিয়নের, ১৮৫১ খ্রি ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়নের কিংবা ১৯২৫ খ্রি ইতালিতে মুসোলিনির অথবা ১৯৪৮ খ্রি চেকোস্লোভাকিয়ায় কমিউনিস্টদের, ১৯৫৮ খ্রি ইরাকে সামরিক গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখল। বিটিশ ইতিহাসে অলিভার ক্রমওয়েলের ক্ষমতা দখল একমাত্র নজির। লাতিন আমেরিকায় প্রায়শই ক্যু ঘটে। ক্যু সংগঠকদের কর্মকৌশল হল সরকারি বাড়ি, রেলপথ, রেডিও, টেলিভিশন কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জলসরবরাহের কেন্দ্র দখল করে সমগ্র ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করা। ক্যুর প্রয়াস বহু সময়ে ব্যর্থ হতে দেখা গেছে।

আগ্রাসন (Aggression)

অপর ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা দেশকে প্রত্যক্ষ আচরণে, কথায় অথবা মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে আঘাত, উৎখাত কিংবা অবমাননার উদ্দেশ্যে কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী, অথবা দেশের আক্রমণসূচক ব্যবহার। শব্দটির সমার্থক প্রত্যয় হল **হিংসা**, সংঘর্ষ ও **যুদ্ধ**। বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনুশীলন ও গবেষণার ক্ষেত্র। ফ্রয়েড ও অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিকেরা আগ্রাসন প্রবৃত্তিকে স্বভাবগত হতাশাসঞ্জাত বলে মনে করেন। কিন্তু আগ্রাসনকারীরা সচরাচর আগ্রাসী অভিসন্ধির কথা স্বীকার করে না; তারা প্রকৃত অথবা সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সাফাই গায় এবং অধিকাংশ সময় আইন, শৃঙ্খলা ও সভ্যতা বজায় রাখার দোহাই দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার প্রতিবেশী কয়েকটি দেশের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে (৩ জুলাই, ১৯৩৩) আগ্রাসনের সংজ্ঞা নিরূপিত হয়: যে কোনও ঘটনায় যেখানে ১. কোনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা; ২. অন্য রাষ্ট্রের এলাকায় যুদ্ধ ঘোষণা না করে হানা দেওয়া; ৩. যুদ্ধ ঘোষণা না করে কোনও রাষ্ট্রের ভূখণ্ড কিংবা নৌ, বিমান অথবা স্থলবাহিনীর উপর আক্রমণ; ৪. অপর কোনও রাষ্ট্রের বন্দর অথবা উপকূল অবরোধ; ৫. অন্য এক রাষ্ট্রের ভূখণ্ড থেকে অপর কোনও রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে সশস্ত্র জঙ্গি গোষ্ঠীকে মদত দেওয়া অথবা অনুপ্রবেশ করা এবং ওই ধরনের গোষ্ঠীকে সাহায্য অথবা আশ্রয়দান থেকে বিরত থাকার দাবি প্রত্যাখ্যান করা। অনুরূপ সংজ্ঞা ১৯৩৩ খ্রি অনুষ্ঠিত **নিরস্ত্রীকরণ** সম্মেলনে গৃহীত হয়। রাষ্ট্রসংঘের সনদে আগ্রাসন সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এবং সামরিক **অবরোধ**, **শাস্তি** (sanction) প্রভৃতির মাধ্যমে আগ্রাসন ঘটে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সামরিক বাহিনীর অভিযান ছাড়াও **গেরিলা যুদ্ধের** মধ্য দিয়েও আগ্রাসী আচরণ ফুটে ওঠে।

আগ্রাসনকে প্রমাণ করা, বিশেষ করে পরোক্ষ আগ্রাসন চিহ্নিত করা একটি জটিল ব্যাপার।

আজ্ঞা (Mandate)

১. কোনও কিছু করা বা না করা সম্পর্কে আদেশ বা অনুমতি। রাজনৈতিক নানা ধরনের ক্রিয়াকর্মে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে কোনও দল যখন কিছু প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সে দল নির্বাচিত হলে বলা হয় যে সংশ্লিষ্ট কাজ করার পিছনে ভোটদাতাদের সঙ্গে চুক্তি পূরণ তথা আদেশ পালনের দায়িত্ব রয়েছে। অর্থাৎ ক্ষমতাসীন দলের জনগণের আজ্ঞাধীনে থাকা বিধেয়। জনসাধারণের আজ্ঞা পালনের উপর দল ও সরকারের বৈধতা নির্ভর করে। গণতন্ত্রে বৈধতার উৎস হল জনগণের সম্মতি।

আজ্ঞা সূত্রে নানা প্রশ্ন ওঠে। নির্বাচনে বহুরকমের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তাই ক্ষমতাসীন দলের কাছে বিভিন্ন ভোটদাতার বিভিন্ন প্রত্যাশা থাকে। বহু ভোটদাতা প্রতিশ্রুতি ব্যতিরেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ক্ষমতাসীন দলকে ভোট দেয়, সেক্ষেত্রে তাদের কাছে সেই দলের আজ্ঞা পালনের প্রকৃতি ও পরিমাণ কী হবে? নির্বাচনের পর সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তখন নতুন প্রেক্ষাপটে আজ্ঞা নেবার প্রয়োজন সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয়।

২. আজ্ঞা প্রত্যয়টির অপর একটি প্রয়োগ ইতিহাস-বিখ্যাত। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর জার্মানি ও তুরস্কের কয়েকটি ভূখণ্ড ও উপনিবেশের প্রশাসন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি বিভাগ কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পরও ইতালি ও জাপানের কয়েকটি ভূখণ্ডের প্রশাসন অনুরূপভাবে রাষ্ট্রসংঘের অছিপরিষদের উপর ন্যস্ত হয়।

আত্ম-নিয়ন্ত্রণ (Self-determination)

একটি ভূখণ্ডের অধিবাসীদের একই ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে স্বাধীন স্বশাসিত ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের জাতীয় আবেগপ্রসূত অভিলাষ। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন তাঁর চোদ্দ দফা সনদে এই অভিলাষকে স্বীকৃতি ও উৎসাহদান করেন, যখন পূর্ব ইউরোপে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় এবং অটোম্যান সাম্রাজ্য দুটি ভেঙে ছোট ছোট রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। তাতে আফ্রিকার বিভিন্ন জনজাতির মধ্যেও অনুরূপ স্বাজাত্যবোধের ভিত্তিতে একটি প্রাক-রাজনৈতিক পশ্চাৎপট এবং রাষ্ট্রীয় আবেগ উৎসারিত হয়। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় আবেগ সঞ্জাত পশ্চাৎপট থাকা প্রয়োজন। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের একটা সুস্পষ্ট সম্পর্ক আছে। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী আবেগের কাছে পশ্চিমের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশ নতি স্বীকার করে। রাষ্ট্রসংঘে ১৯৬৪ খ্রি গৃহীত মানবাধিকার সনদের প্রথম অনুচ্ছেদেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অগ্রাধিকারকে উল্লেখ করা হয়েছে।

লেনিনের চিন্তাতেও জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি সবিশেষ গুরুত্ব পায়। তাতে

রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমস্ত জাতির **সমতা ও সার্বভৌমত্বের** পন্থা স্বীকৃতি পায়। লেনিনবাদী দৃষ্টিতে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ছাড়াও প্রতিটি দেশের বিশেষ কোনও যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগদানের অধিকার অথবা কোনও যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের অধিকার আছে।

আধিপত্য (Hegemony)

গ্রিক ভাষায় হেগেমন থেকে উৎপন্ন ইংরেজি হেগেমনির বাংলা প্রতিশব্দ। প্রত্যয়টির অর্থ জটিল। দুটি বিপরীত অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়—একটি হল জবরদস্ত আধিপত্য। অপরটি নেতৃত্ব, যার ভিতরে **সম্মতি** প্রচ্ছন্ন থাকে। কোনও শ্রেণীর দ্বারা অন্যান্য শ্রেণী বা রাষ্ট্র দ্বারা রাষ্ট্রের উপর প্রভুত্ব বা আধিপত্য করা। উনিশ শতকে ইউরোপে এক রাষ্ট্রের উপর অপর রাষ্ট্রের প্রভাব অর্থে হেগেমনিজম (প্রভুত্ববাদ) কথাটির প্রচলন ঘটে। তাৎপর্য ছিল যে এক রাষ্ট্র কীভাবে তার উপর নির্ভরশীল অথবা প্রতিবেশী অন্য দুর্বল রাষ্ট্রকে প্রভুত্বে দাবিয়ে রাখে তারই রাজনীতি।

মার্কসীয় ধারায় একটি রাষ্ট্র আর একটি রাষ্ট্রের উপর যে আধিপত্য চালায় সেটা প্রকৃত অর্থে সাম্রাজ্যবাদী নয়। নেতৃত্বের অর্থে প্রত্যয়টির ব্যবহার মার্কসীয় রাজনীতিতে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। **লেনিন** ও মেনশেভিকরা এই প্রত্যয়টির দ্বারা বোঝাতেন কীভাবে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কৃষকদের সঙ্গে মিতালি ও শ্রমিকদের নেতৃত্বের প্রভাবাধীনে কৃষকদের নিয়ে আসা হবে। বুখারিন ও **স্তালিন**ও কুড়ির দশকে প্রত্যয়টিকে ব্যবহার করতেন। তবে প্রত্যয়টিকে পুরোপুরি মার্কসীয় দৃষ্টিতে দাঁড় করিয়েছিলেন **গ্রামশি**।

রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে ভিন্ন অর্থে গ্রামশি শব্দটির উপর যে ব্যঞ্জনা আরোপ করেন তার মর্মার্থ হল অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়াও সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ব্যাপারে একটি শ্রেণীর উত্থান, যে শ্রেণী তার উত্থানের অনুকূলে অন্যান্য শ্রেণীকে প্রবৃত্ত করতে সক্ষম।

কারাগারে লিখিত নিবন্ধে তিনি প্রত্যয়টিকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের উৎখাতের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে মিতালি পাতানোর এক কৌশল হিসেবে উল্লেখ করেছেন; তার জন্য তিনি সোভিয়েত দেশের শ্রমিকদের নিজ স্বার্থে কৃষকদের অনুকূলে ত্যাগস্বীকারের কথা বলেন। কমিউনিস্ট ইন্টারনাশনালের সমসাময়িক অধিবেশনে গ্রামশি তাঁর তত্ত্ব সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর মতে একটি শ্রেণী কেবল তার সাংগঠনিক শক্তি দ্বারাই আধিপত্য করে না; সেই শ্রেণী তার সংকীর্ণ সাংগঠনিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে নৈতিক ও মননশীল নেতৃত্বের সাহায্যে প্রভাব বিস্তার করে; সেজন্য প্রয়োজনে সীমিত আপস করতে হয় বিচিত্র শক্তি সমুচয়ের সঙ্গে, যাকে গ্রামশি ঐতিহাসিক গোষ্ঠী হিসাবে অভিহিত করেন।

আনুগত্য (Loyalty)

শব্দটির মর্মার্থ হল এমন এক মানসিকতা যার মধ্য দিয়ে কারও কোনও কিছুর প্রতি বিশ্বস্ততা, অনুরাগ ও সমর্থন ফুটে ওঠে; সেটা পরিবার, চাকুরির ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা

ধর্মীয় অথবা বহুত্ববাদী সমাজে যে কোনও প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রদর্শিত হয়। আনুগত্য স্বভাবতই আত্মস্বার্থ বহির্ভূত একটি আসক্তি। রাজনীতিতে আনুগত্য হল দেশভক্তি ও **রাষ্ট্রিক বাধ্যতার** অন্তর্গত। নিজ দল বা গোষ্ঠীর অন্ধ প্রশংসা এবং অন্যদের সমালোচনা আনুগত্যের অঙ্গ। আনুগত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল দেশ, দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতা।

প্রাচীন গ্রিক ও রোমান তাত্ত্বিকেরা আনুগত্যকে রাজনীতির সর্বোচ্চ পুণ্য হিসেবে দেখতেন; এবং সেখানে সীমিত সংখ্যক যাঁরা নাগরিকত্বের অধিকারী হতেন, তাঁদের প্রথমে আনুগত্যের পাঠ নিতে হত। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যপালন ছিল শ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম এবং আনুগত্যের উপর সর্বাধিক মূল্যবত্তা নির্দেশিত হয়। **প্লাতো, আরিস্তোতল** প্লুটার্ক, থুকিডাইডিস আনুগত্যের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। মধ্যযুগের ইউরোপে জাতিরাষ্ট্র গড়ে ওঠার সময়ে একমাত্র সামন্ত প্রভুদের কাছেই সাধারণ লোকের আনুগত্যের প্রশ্ন দেখা দিত। **মাকিয়াভেল্লি** রাজনৈতিক আনুগত্যকে প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে দেখেন; সমসাময়িক যুগে আনুগত্যের মনোভাব হয়ে পড়েছিল স্তিমিত। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে আনুগত্যের বিষয়টি বড় আকারে দেখা দেয়। রুসো আনুগত্যকে আবেগমণ্ডিত করে তোলেন। উনিশ শতকের গোড়া থেকে আনুগত্যের বিষয়টি জটিল ও স্ববিরোধী হয়ে পড়ে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ প্রসারিত হবার ফলে বিশ শতকে **সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী** রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভবের সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক দল, নেতা ও আদর্শের প্রতি লোকের অবিচল আনুগত্য দাবি করা হয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সোভিয়েত দেশ কিংবা চীনের প্রতি আনুগত্য ছিল স্বাভাবিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমাবধি আনুগত্যের প্রশ্নটি গুরুত্ব পায়। আদিপর্বে সেখানকার অধিবাসীদের ছিল ইংরেজ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর কমিউনিস্ট অন্তর্ঘাতের আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার দেশের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে।

আন্তর্জাতিক (International)

বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগঠনের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরম্পরাক্রমে গঠিত মহাসংঘ, যার প্রথমটি ১৮৬৪ খ্রি লন্ডনে 'ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ওয়ার্কিংমেন' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল শ্রমজীবীদের প্রতি অবিচার ও শোষণ থেকে তাদের রক্ষা করা। তাতে ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, সুইস, পোলিশ প্রতিনিধিরা যোগ দেন। **মার্কস** সেটির কার্যনির্বাহি সমিতির সদস্য ছিলেন। গঠনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ইতালীয় প্রতিনিধি মাৎসিনিকে। ১৮৬৫ খ্রি জেনিভায় সেটির দ্বিতীয় কংগ্রেস বসে। ১৮৬৯ খ্রি পর্যন্ত প্রথম আন্তর্জাতিকের কয়েকটি বার্ষিক অধিবেশন সুইজারল্যান্ড ও বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। মার্কস ও **এঙ্গেলস** সেগুলিতে যোগ দেননি। মিখাইল বাকুনিনের সঙ্গে মতপার্থক্য হেতু ফিলাডেলফিয়ায় সেটির সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে ১৮৭৬ খ্রি অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে প্রথম আন্তর্জাতিক ভেঙে দেওয়া হয়।

১৮৮৯ খ্রি প্যারিসে ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকী দিবসে দ্বিধারায় বিভক্ত মার্কসীয় ও

অ-মার্কসীয় সমাজতন্ত্রীদের সমন্বয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গঠিত হয়। সেই থেকে দু তিন বছর অন্তর অনুষ্ঠিত বিশ্ব কংগ্রেসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মার্কসীয় মতাদর্শের মূলনীতিগুলি অনুসরণ করে। প্রথম আন্তর্জাতিকে কর্মপদ্ধতি নিয়ে মতভেদ থাকলেও সেটির একটি বৈপ্লবিক প্রবণতা ছিল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নানা ধরনের সমাজতন্ত্রী দলের সমন্বয়ে একটি শিথিল সংগঠনে পরিণত হয়। বিপ্লবের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক মনোভাব তাতে প্রাধান্য পায়। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধে পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বৈপ্লবিক উত্থানের সুযোগ না নিয়ে বিভিন্ন দেশের সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলি নিজ দেশের অনুকূলে দেশানুরাগের মনোভাব নেয়। এই অবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে **লেনিন** ১৯১৯ খ্রি মার্চ মাসে বিকল্প তৃতীয় আন্তর্জাতিক হিসেবে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল (**কমিন্টার্ন**) গঠন করেন। তৃতীয় আন্তর্জাতিক ১৯৪৩ খ্রি ভেঙে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক তার বিবর্তনধারায় বিভিন্ন নাম পরিগ্রহ করে। বর্তমানে সমাজতন্ত্রী আন্তর্জাতিক নামে সেটি বর্তমান। উল্লেখ্য, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি থেকে **ত্রৎস্কি** বহিষ্কৃত ও রুশ দেশ থেকে বিতাড়িত (১৯২৯) হবার পর তাঁর নেতৃত্বে চতুর্থ আন্তর্জাতিক গঠিত হয় (১৯৩৮) এবং সেটির অস্তিত্ব এখনও মুছে যায়নি।

আন্তর্জাতিক আইন (International Law)

বিভিন্ন রাষ্ট্র পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদে এবং একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যে আচরণবিধি প্রণয়ন করে তাকেই আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়। আন্তর্জাতিক আইন দু ধরনের হয়ে থাকে, যথা পাবলিক (অর্থাৎ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে) এবং প্রাইভেট (অর্থাৎ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। তত্ত্বগতভাবে প্রথম ধরনটি হল একত্র সুগ্রথিত আইন যার প্রয়োগ সর্বদেশীয়। দ্বিতীয়টির প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হল আইনের অধিক্ষেত্র (jurisdiction) নির্ধারণ এবং দ্বিতীয়ত দেশভেদে আইনের তারতম্য; কার্যত তাই যে দেশে মামলা দায়ের করা হয় সেই দেশেরই আইন প্রযুক্ত হয়।

আন্তর্জাতিক আইন প্রত্যয়টি ১৭৮০ খ্রি বেনথাম উদ্ভাবন করেন। অবশ্য এ বিষয়ে আধুনিক আলোচনার প্রবর্তন, আরও অনেক পূর্বে অ্যাকুইনাস, গ্রোটিয়াস, কান্ট, পুফেনডর্ফ প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকেরা করেছিলেন। তাঁরা সবাই আন্তর্জাতিক অধিক্ষেত্রের তত্ত্বগত ভিত্তি স্থাপনের প্রয়াসী হন। গ্রোটিয়াস স্বাভাবিক আইন (natural law) এবং বাস্তবানুগ আইন (positive law) দুটির মিশ্রণ চাইতেন। পুফেনডর্ফ ছিলেন **স্বাভাবিক আইন** অনুসরণের প্রবক্তা এবং ভ্যাটেল ছিলেন বাস্তবানুগ আইনের পক্ষপাতী। শেষোক্ত অর্থাৎ বাস্তবানুগ আইনের নিরিখে দুটি বা তদধিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে প্রথা ও চুক্তি হল আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গত উৎস। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণের প্রবক্তারা মানবপ্রকৃতির মধ্যে আন্তর্জাতিক আইনের উৎস সন্ধানের সুপারিশ করেন।

আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হল ছ'টি, যথা ১. রোমান আইন, ২. বিজ্ঞানসম্মত

প্রামাণ্য বইপত্র, ৩. সন্ধি এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি, ৪. আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা এবং বিচার বিভাগের সালিশির রায়, ৫. বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় আইন ও ৬. কূটনৈতিক মতামত বিনিময়। লরেন্স, হল, ওপেনহাইম, গার্নার প্রমুখ আইনবিদদের গ্রন্থাদি ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আন্তর্জাতিক আইনের বিতর্কে প্রামাণ্য উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রথাগত বিধানের আশ্রয়েও আইন গড়ে ওঠে।

কোনও একটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন যতক্ষণ মান্য ও পালন করে তদবধি তা আইনসিদ্ধ (লাস্কি)। কিন্তু আজকের দিনে নিজস্ব নিরাপত্তার তাগিদে কোনও রাষ্ট্রই সহসা আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে না। কারণ নিজ স্বার্থে সব রাষ্ট্রই চায় নিজের নিরাপত্তা ও বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে।

আন্তর্জাতিক আইন অনুমোদনের প্রধান উৎস হল জাগ্রত ও শক্তিশালী জনমত। সে জনমত সারা বিশ্বের। আন্তর্জাতিক আইন যাতে কোনও রাষ্ট্র ভঙ্গ না করে সেদিকে সদাই লক্ষ রাখা হল রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম প্রধান কাজ। রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম অঙ্গ ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তাদের সম্মতি সাপেক্ষ কেবল দেওয়ানি বিষয়ের বিরোধে আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে মীমাংসা করে।

আইনশাস্ত্রে রাষ্ট্রীয় আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে সম্পর্কসূত্রে তত্ত্বগত নানান প্রশ্ন ওঠে। কারও মতে উভয় আইন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ; রাষ্ট্রীয় আইনের উপর আন্তর্জাতিক আইনের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকে। অপরদিকে ভিন্ন মতে উভয়ের উৎস স্বতন্ত্র, তবে উভয়ের মধ্যে সংঘাতের পরিবর্তে সামঞ্জস্য বজায় রাখাই কাম্য।

রাষ্ট্রীয় আইন সর্বাত্মক। সমাজজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রই তার আওতায় পড়ে। পক্ষান্তরে আন্তর্জাতিক আইন আন্তর্রাষ্ট্রিক সম্পর্কের কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে সীমিত। যুদ্ধ, নিরপেক্ষতা এবং শান্তি আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান বিষয়। অন্যান্য বিষয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত।

দ্র. আইন ; আইনশাস্ত্র

আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্র কজগম (Anna DMK)

দ্রাবিড় মুন্নেত্র কজগম (ডি এম কে) থেকে ১৯৭২ খ্রি অক্টোবরে বিচ্ছিন্ন হয়ে তামিলনাড়ু রাজ্যে আন্না ডি এম কে দলের জন্ম হয়। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চিত্রাভিনেতা-রাজনীতিক এম জি রামচন্দ্রন। ১৯৭৪ খ্রি পণ্ডিচেরি বিধানসভার নির্বাচনে এই দল অর্ধেকের কাছাকাছি আসন লাভ করে এবং ১৯৭৬ খ্রি থেকে দলের নামে অল ইন্ডিয়া শব্দ দুটি যুক্ত হয়। ১৯৭৭ খ্রি কংগ্রেসের সঙ্গে মোর্চা গঠন এবং পরে জনতা পার্টি ও বামপন্থী বিরোধীপক্ষের সঙ্গেও যুক্ত হয়। আশি ও নব্বুইয়ের দশকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তামিলনাড়ুতে এই দল মন্ত্রিসভা গঠন ও লোকসভায় দলের সাংসদেরা কংগ্রেস (ই) মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করে। প্রতিষ্ঠাকালে প্রচারিত ইস্তাহারে (১৯৭২) দলের প্রধান দাবি হিসেবে রাজ্যের হাতে অধিকতর ক্ষমতাপ্রদান, জাতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা এবং রাজ্যস্তরে আঞ্চলিক ভাষার প্রবর্তন, মাদকদ্রব্যাদির সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণ, আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, ব্যাঙ্ক,

অত্যাবশ্যক পণ্য ও বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ, অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের **প্রত্যাহ্বানের** অধিকার (right of recall) ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য লাভ করে।

আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)

প্রশাসনিক দপ্তরের কর্তৃত্ব। আমলাতন্ত্রে আইনের দৃষ্টিতে রাজা ও প্রজা তথা সর্বোচ্চ সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ যথা রাজা, প্রেসিডেন্ট, আইনসভা ইত্যাদি এবং জনসাধারণের মধ্যবর্তী স্থানের কর্মসম্পাদনকারী ও আধিকারিকদের হাতে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। সচরাচর সিভিল সার্ভান্ট অর্থাৎ জনপালন নির্বাহি সরকারি কর্মচারী ও সামরিক বাহিনীর পদস্থ ব্যক্তিরা কি উচ্চ কর্তৃপক্ষ, কি সাধারণ লোকের কাজ আপন মর্জিমাফিক ত্বরান্বিত অথবা বিলম্বিত করতে পারেন, যাতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজে তাঁরাই যে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী সে কথা প্রতিপন্ন হয়।

প্রশাসকেরা তাঁদের কাজকর্মে ক্রমে বিপুল অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁরা সরকারি কাজে দীর্ঘকাল বহাল থাকেন, ক্ষমতা ভোগ করেন, যে সুযোগ অধিকাংশ রাজনৈতিক ও মন্ত্রীরা পান না। প্রশাসকদের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে একের পর এক সরকারের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়; যুক্তরাজ্যের মতো দেশে যেখানে লিখিত সংবিধান নেই, সেখানে তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টের হাতে উপদেষ্টা ও আধিকারিক নিয়োগের ক্ষমতা থাকায় প্রশাসনিক আমলাতন্ত্রের অগ্রাধিকার ভাঙা যায়।

কমিউনিস্ট দেশে সরকার ও প্রশাসন অভিন্ন; শাসক দলের অনুসৃত রীতি অনুসারে পার্টি ও প্রশাসনে আধিকারিক নিয়োগ করা হয়। একার্থে এই রীতি সর্বাত্মক আমলাতন্ত্রের পরিচয় দেয়। অবশ্য তাতে প্রশাসন অপেক্ষা রাজনৈতিক মতিগতি প্রাধান্য পায়। পার্টির সিদ্ধান্ত পলিটব্যুরো থেকে কলকারখানার স্তর অবধি প্রতিফলিত হয়।

দ্র. দলীয় কর্মিবর্গ

আমূল পরিবর্তনবাদী (Radical)

লাতিন radix কথাটি থেকে উৎপন্ন ইংরেজি radical শব্দের বাংলায় অর্থ হল আমূল বা মূলগত। রাজনৈতিক বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত শব্দটি আমূল পরিবর্তন নির্দেশ করে। রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার মূলে যিনি রূপান্তর ঘটাতে চান তিনি হলেন আমূল পরিবর্তনবাদী। তিনি চান সর্ববিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার গভীরে অর্থাৎ মূলে গিয়ে তার মূলোচ্ছেদ ঘটাতে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে কোনও অপরাধপ্রবণতা কঠোর পুলিশি ব্যবস্থা অথবা দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা সমাধান করা যায়। দ্বিতীয় পন্থাটিই হল আমূল পরিবর্তনবাদী। ইংরেজি 'র‍্যাডিক্যাল' শব্দটির দ্বারা অতি বাম ও উগ্র চিন্তাভাবনাও বোঝায়। সে ক্ষেত্রে ওই মনোভাবাপন্ন যাঁরা তাঁরা সাধারণত স্থিতাবস্থার বিরোধী। কারণ স্থিতাবস্থায় পরস্পর বিরোধীদের

মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। সেদিক থেকে দক্ষিণপন্থীদের মধ্যেও 'র‍্যাডিক্যাল' থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

আরব লিগ (Arab League)

১৯৪৫ খ্রি বিভিন্ন আরব দেশকে নিয়ে গঠিত এক রাষ্ট্রসমবায়। আগের বছর আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি প্রস্তুতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে ছিল মিশর, ইরাক, লেবানন, সৌদি আরব, সিরিয়া, জর্ডন এবং ইয়েমেন। পরে একের পর এক লিবিয়া, সুদান, টিউনিসিয়া, মরক্কো, কুয়েত, আলজেরিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন, বাহরিন, কাতার, ওমান এবং পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্তী আমিরশাহি রাজ্যগুলি তাতে যোগ দেয়। এটি হল আরব দেশগুলির জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আরব দেশগুলির যেসব রাজনৈতিক বিষয়ে লিগের ভূমিকা বিভিন্ন সময়ে প্রবল হয়ে ওঠে সেগুলি হল ১. ফ্রান্সের দখল থেকে সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ; ২. ইজরেল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ; ৩. আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা প্রদানে ফ্রান্সের অহেতুক বিলম্বের বিরোধিতা এবং ৪. আরব দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। ১৯৫৮ খ্রি সংযুক্ত আরব রিপাবলিক সৃষ্টির পর লিগের শক্তিবৃদ্ধি হয়।

প্রতি সদস্য রাষ্ট্রের একজন করে প্রতিনিধি এবং **প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানিজেশন** সংস্থার একজন মুখপাত্রকে নিয়ে গঠিত কাউন্সিলের সভা কাইরোতে অনুষ্ঠিত হয়। আরব দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও কারিগরি বিষয়ে সহযোগিতা, আরব সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং আরব দেশগুলির মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি লিগের কর্মসূচির অন্তর্গত। তবে আরব ভূখণ্ড থেকে ঔপনিবেশিক শক্তির উচ্ছেদ এবং ইজরেলের বিরুদ্ধে সমন্বিত সংগ্রামই এখন লিগের প্রধান কাজ হলেও সদস্য দেশগুলির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ উন্নয়ন প্রয়াসও অব্যাহত আছে।

নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে মধ্যপ্রাচ্যে ইজরেলের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির সম্পর্কে শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠতে থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন আরব লিগকে ইজরেলের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নেবার আবেদন জানান। আরব লিগ সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে এই বলে যে অধিকৃত আরব ভূখণ্ড সমূহ থেকে ইজরেল সরে না গেলে ওই প্রশ্ন বিবেচিত হবে না। আরব লিগ ইজরেলের উপর হতে অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে না নিলেও ২২ সদস্য বিশিষ্ট লিগের অন্যতম সদস্য টিউনিসিয়া ইজরেলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের কিছু সদস্য আরব লিগকে ইজরেল সম্পর্কে নমনীয় মনোভাব গ্রহণের সুপারিশ করে। তাতে সিরিয়া, লেবানন ও লিবিয়া আপত্তি জানিয়ে বলে যে ইজরেলের বিরুদ্ধে আংশিক বয়কট নীতি অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন। এদিকে শান্তির পরিবেশ ফিরে এলেও আরব ও ইজরেলি উগ্রপন্থীরা হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ থেকে সম্পূর্ণ বিরত হয়নি।

দ্র. বাথ পার্টি

আরিস্তোতল (৩৮৪-৩২২ খ্রি পূর্বাব্দ) (Aristotle)

গ্রিক দার্শনিক। তিনি প্লাতোর ছাত্র ছিলেন। পরে কিছুকাল আলেকজান্ডারের শিক্ষকতা করেন। দর্শনের অন্যতম অঙ্গ রাষ্ট্রবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর বহুবিধ মৌলিক ভাবনা বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। তার মধ্যে 'পলিটিকস' গ্রন্থে তিনি রাজনীতির নানা তত্ত্বের আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করতেন সহজাত যুক্তি প্রবণতা থাকায় মানুষ একটি রাজনৈতিক জীব। তাই স্বভাবতই মানুষ রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে সেখানে বসবাসের মধ্য দিয়ে নিজের সত্তার পরিপূর্তি খোঁজে। সর্বাঙ্গসুন্দর রাষ্ট্রে পুণ্যচরিত্র মানুষ প্রকাশ পায়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রকৃতি অনুযায়ী সেখানে পাপ-পুণ্য বিরাজ করে। তিনি রাষ্ট্রকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেন : ক্ষমতার অধিকারী কে ? এবং কার স্বার্থে সেটা ব্যবহৃত হয় ? উত্তর হল : কিছু লোক কিংবা সকলেই এবং ক্ষমতার অধিকারী ও অন্যদের স্বার্থে। আদর্শ সমাজব্যবস্থা হল অভিজাততন্ত্র, যেখানে সর্বোত্তম কিছু ব্যক্তি, যারা স্বভাবতই সংখ্যায় কম তারা সবাইকার স্বার্থে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। যেহেতু সে আদর্শের রূপায়ণ কঠিন ও বজায় রাখা আরও কঠিন, তাই আরিস্তোতল এক ধরনের মিশ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের সুপারিশ করেন যেখানে পালা করে সব নাগরিক শাসিত হয় ও শাসন করে ; নির্দিষ্ট কোনও শ্রেণী ক্ষমতার মৌরসিস্বত্ব ভোগ করে না। তিনি গুরু প্লাতোর সঙ্গে অনেক বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতেন, যেমন তিনি গণতন্ত্র ও যৌথ শিক্ষা ব্যবস্থা মানতেন না। পরিবারকে তিনি রাজনৈতিক তথা সমাজদেহের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে দেখতেন, এবং পরিবারের সঙ্গে গৃহপরিবেশের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকায় ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে কিছু মানুষ অপরের ইচ্ছাধীন থাকায় স্বভাবতই ক্রীতদাসে পরিণত হয় ; শ্রম বিভাজনও তাই স্বাভাবিক ও সংগত, তাঁর দৃষ্টিতে নাগরিক হলেন তিনি যাঁর শাসনব্যবস্থায় পদাধিকার থাকে। কালক্রমে নাগরিকদের রাজনৈতিক দায়িত্ব সঞ্চারিত হয়েছে। আরিস্তোতলের আদর্শ শাসনব্যবস্থার বর্ণনার ভিত্তিতে আধুনিক নানান নিয়মতন্ত্র গড়ে উঠেছে।

তাঁর আদর্শ শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তিমানুষের ক্ষমতা আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত ; আইন সবার উপরে ; অর্থাৎ মূলে আইনের শাসন বিরাজ করে। তাতে সরকারেরও এমন এক চরিত্র আরোপিত হয়েছে যেটা আবহমান কাল যাবৎ প্রবহমান ; তাতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটা সৌহার্দের বন্ধন থাকে। নাগরিকদের রাজনৈতিক দায়দায়িত্বের সঙ্গে থাকে সুবিচার ব্যবস্থা এবং সেই নীতির ভিত্তিতে নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সবাইকার সম্পর্ক সুসংবদ্ধ হয়ে ওঠে। সুবিচারের রীতিনীতি থেকে সমতাবোধ বিকশিত হয়। বিচারব্যবস্থাসূত্রে ব্যক্তি মানুষের অধিকার ও কর্তব্য নিরূপিত হয়। প্রচলিত ধারা থেকে উদ্ভূত অধিকার ও কর্তব্যকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিতেন, কারণ শাসনক্ষমতার অধিষ্ঠিত কর্তাদের খেয়ালখুশি মতো লিখিত আইনকানুনের রদবদল হয়। জৈব প্রত্যয়ে তিনি রাষ্ট্রকে বিচার করতেন। সমগ্র বস্তু তার অংশের অগ্রবর্তী বটে, কিন্তু তার উপর নির্ভরশীল। রাজনীতির বেলায় সমাজ সংগঠনে যোগ দেওয়ার আগে ব্যক্তি থাকে অসম্পূর্ণ। সেই সংগঠনও মূলত রাজনৈতিক, তবে সেইসঙ্গে ন্যায়সংগত বলে সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষ হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ ও সার্থক।

আলোকিত শতাব্দী (Enlightenment)

ইউরোপের ইতিহাসে সপ্তদশ শতাব্দীতে আধুনিক বিজ্ঞানের উত্থানের পর্ব থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি বিপ্লবের প্রারম্ভকাল অবধি সময় সাধারণত আলোকিত শতাব্দী হিসেবে অভিহিত। শিক্ষা ও মননজীবনে, ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী ব্যক্তিদের প্রতি প্রচলিত অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে সংশয়, মুক্তবুদ্ধি ও বিচারশক্তির বিকাশ, যুক্তিশীলতার প্রসার এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা ছিল এই শতাব্দীর লক্ষণ। এক একটি দেশের স্থানীয় ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে। ফ্রান্সে **রুসো**, **ভলত্যের**, **মঁতেসকিয়্য**, জার্মানিতে **কান্ট**, ইংল্যান্ডে **লক**, পেন প্রমুখের রচনাদিতে শতাব্দীর বুদ্ধি বিভাসিত আন্দোলনের বাণী ঘোষিত হয়। বিভাসিত শতকের রাষ্ট্রচিন্তায় যে সব যুগান্তকারী তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে সেগুলি ছিল মূলত উদারতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষ, বিশ্বজনীন এবং স্বেচ্ছাতন্ত্রবিরোধী এবং মুক্ত চিন্তা ও বাক্-স্বাধীনতার সহায়ক। ফ্রান্সে বিভাসিত ভাবাদর্শের প্রসারকল্পে নানাধরনের বিদ্বৎসংস্থা, অকাদেমী, সাঁল, কাফে এবং বিস্তর পত্রপত্রিকা ও রাজনৈতিক প্রকাশনার বিস্তার ঘটে।

পুঁজিবাদের বিকাশ ও **বুর্জোয়া** শ্রেণীর উদয় আলোকিত শতাব্দীর এক মস্ত পরিচয়। প্রথমে ইংল্যান্ড ও পরে ফ্রান্সে বুর্জোয়াশ্রেণী প্রভাবিত বিদ্বজ্জনেরা জগৎপ্রকৃতি, সমাজ ও মানবিক অস্তিত্ব সম্পর্কে এক নতুন জীবনাদর্শ তুলে ধরেন যার মূল উপাদান হল মানুষের যথার্থ মর্যাদা এবং ঐহিক সুখ। বিজ্ঞানচেতনা পুষ্ট যুক্তি, স্বাধীন বোধ ও বুদ্ধির আলোকে নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মের পীড়ন থেকে মুক্তি উৎসারিত হয়। আঠারো শতক জুড়ে বুদ্ধিবাদের যে অগ্রগতি ঘটে, তার ভাবভূমি অনেকাংশে প্রস্তুত করেছিল **লক**, **রুসো**, দালমবেয়ার, প্রমুখ দার্শনিকদের রচনাদি এবং দিদেরোর বিশ্বকোষ। উল্লেখ্য যে সর্ববিধ মননশীলতায় একতা দেখা গেলেও সমগ্র আলোকিত শতাব্দীর দর্শন একটি অখণ্ড, অবিভাজ্য ও সুসংবদ্ধ তত্ত্ব হিসেবে রূপ পরিগ্রহ করেনি। অন্তর্নিহিত যে সুরটি অনুরণিত হত সেটা ছিল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা যা সমগ্র মনুষ্যসমাজের মুক্তির অনুকূল। জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেখানে উৎপীড়ন, অনাচার, বর্বরতা ও যুক্তিহীনতা ছিল প্রবল সে-সব পরিস্থিতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করেছিলেন ওইসব দার্শনিকেরা। তাঁদের অবদান হল বুদ্ধি, পরমতে সহনশীলতা এবং মানবতার পথকে সুগম করে তোলা।

দ্র. শিল্পবিপ্লব

আশ্রিত রাজ্য (Protectorate)

কোনও রাষ্ট্রের আশ্রয়াধীন একটি রাজ্য যার উপর ওই রাষ্ট্রের আইনগত অধিকার ও ক্ষমতা থাকে, কিন্তু পূর্ণ **সার্বভৌমত্ব** থাকে না। বিভিন্ন ধরনের চুক্তি, প্রচলিত ধারা ইত্যাদির মাধ্যমে একটি দেশ আশ্রিত রাজ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। ব্রিটেনের রীতি অনুযায়ী আশ্রিত দেশের অধিবাসীরা ব্রিটেনের নাগরিক হিসেবে গণ্য হয় না এবং সে-সব আশ্রিত রাজ্য বিদেশি রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায় ; কিন্তু ওইসব নাগরিকদের

আ

ব্রিটেনের রাজশক্তির প্রতি কোনও আনুগত্য না থাকলেও আশ্রয়ের চুক্তি অনুযায়ী কিছু বাধ্যবাধকতা থাকে এবং আশ্রিত রাজ্যের অধিবাসীরা অন্য কোনও রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি কোনও সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। আশ্রয়দানকারী রাষ্ট্র আশ্রিত রাজ্যের অনেকটা অভিভাবকের মতো সে রাজ্যের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি উন্নয়নের কাজে সহায়তা করে। আশ্রিত রাজ্য উপনিবেশ নয়। রোডেসিয়া এক সময়ে ব্রিটেনের আশ্রিত রাজ্য ছিল। তবে জার্মানি কর্তৃক ১৯৩৯ খ্রি চেকোস্লোভাকিয়াকে আশ্রিত রাজ্য হিসেবে দাবি করলেও কার্যত সেটি ছিল অন্তর্ভুক্তিকরণ।

ই

ইউরোকমিউনিজম (Eurocommunism)

১৯৭৫ খ্রি ১৫ নভেম্বর তারিখে ফরাসি ও ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির নীতিগত এক যৌথ ঘোষণার পর থেকে পশ্চিম ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি উদারনীতি ও সাম্যবাদের (কমিউনিজম) সমন্বয়বিধানে সচেষ্ট হয়। তাদের 'ইউরোকমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কাজকর্মের অধিকার, সর্বহারার একনায়কত্বের আদর্শ প্রত্যাহার, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সুপারিশ, সংসদীয় পথে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং বিরোধিতার স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হয়। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এটাকে শোধনবাদ বলে নিন্দা করে ; তা হলেও ইউরোকমিউনিজম প্রভূত সমর্থন পায় ; বিশেষ করে ইউরোপীয় কমন মার্কেটের অন্তর্গত দেশগুলিতে একই ধরনের প্রতিষ্ঠান ও আইনের সুযোগ গ্রহণের তাগিদে, যাতে সমস্ত সদস্যদেশগুলিতে নিজ নিজ দেশের শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুবিধা পাওয়া যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির সমালোচনা এবং সোভিয়েত কর্তৃক নিন্দিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি সমীহা প্রদর্শন ইউরোকমিউনিস্টদের লক্ষণীয় প্রবণতা।

ইকবাল, আল্লামা মহম্মদ (১৮৭৭-১৯৩৮) (Iqbal, A. M.)

খ্যাতনামা উর্দু কবি, রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ও দার্শনিক। জন্ম পঞ্জাবের শিয়ালকোটে। ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি পড়ার সময়ে আরবি পণ্ডিত আর এ নিকলসনের সান্নিধ্যে আসেন। অন্যদিকে মির্জা গালিবের গজল তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর কাব্য ও সঙ্গীতসাধনায় একাধারে সর্বেশ্বরবাদী মরমিয়া মানসিকতা ও গভীর স্বদেশানুরাগ ফুটে ওঠে। আইন ব্যবসায়ে তিনি সাফল্য অর্জন করেন। উর্দু ও ফারসি ভাষায় রচিত তাঁর বহু কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'বাঙ্গেদরা' (১৯২৪) ও 'জাভেদ নামা' (১৯৩২) উল্লেখযোগ্য।

তাঁর দৃষ্টিতে রাষ্ট্রক্ষমতার পিছনে কাজ করে এক দিব্যতন্ত্রী পরম সত্তা এবং তার

জন্যে তিনি ইসলাম ধর্মের আদর্শ তুলে ধরেন, যাতে ব্যক্তিগত জীবনধারা, রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্ম ও ধর্মীয় অনুশাসন সমুদয় এক সুরে বাঁধা থাকে। রাজনীতিকে ধর্ম থেকে তিনি পৃথকভাবে দেখতেন না। তাঁর মতে ধর্ম নিছক ব্যক্তিগত আচরণীয় বিষয়মাত্র নয়, ধর্ম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতির একটি থেকে অপরটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। ঐহিক অথবা পারত্রিক বলে স্বতন্ত্র কিছু নেই। ইসলামি রাষ্ট্রবিধি ছাড়াও এ বিষয়ে তিনি প্লাতোর চিন্তার কথা উল্লেখ করেন। তবে তিনি দিব্যতন্ত্রী রাষ্ট্রের নামে স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে মানার বিরোধী ছিলেন। তাঁর 'আসারর-ই-খুদী' কাব্যগ্রন্থের মূলকথা হল যে জগতে সকল বস্তু ও প্রাণী স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে। ব্যক্তিত্বকে যে যতটা সুদৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন করতে পেরেছে, সৃষ্টিতে সে ততই স্থিতিবান হয়েছে এবং তার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সর্বপ্রকার শোষণের তিনি বিরোধী ছিলেন। শ্রমিক ও কৃষকদের অসন্তোষজনিত ন্যায্য দাবিদাওয়াকে তিনি সমর্থন করতেন এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের অনিবার্য বিপ্লব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। কিন্তু তিনি কোনওদিন সমাজতন্ত্রী হননি। কোরানের বাণীর নিরিখে তিনি সবকিছুর বিচার করতেন এবং বস্তুবাদী সমস্ত সমাজতন্ত্রী চিন্তাভাবনাকে পরিহার করে চলতেন। ইকবাল চাইতেন মানুষে-মানুষে সহৃদয় সমতা-বোধ গড়ে তুলতে। তবে সেটা মার্কসীয় অর্থনৈতিক সমতা নয়। তা হলেও পুঁজিবাদের তিনি কড়া সমালোচক ছিলেন।

জীবনের প্রথম দিকে দেশপ্রেম-মূলক বহু কাব্য রচনা করেন। ১৯০৪ খ্রি তাঁর বিখ্যাত তারানে হিন্দ কাব্যে 'সারে জঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা' গানটি যখন রচিত হয় তখন তাঁর মনে সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রবেশ করেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর মনে ইসলামি আবেগ ও বিশ্ব ইসলামি ঐক্যচিন্তা সঞ্চারিত হয়। অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদী থেকে তিনি ক্রমে ইসলামি নবজাগরণের পুরোধার ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইসলামি স্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁর মনে প্রবল হয়ে ওঠে। তাঁর দৃষ্টিতে ইসলামে জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বলে কিছু নেই, ইসলাম হল একটি জাতিসংঘ ; ইসলামে জাতপাত বর্ণ ও বিত্ত নির্বিশেষে সবাই সমান। তিনি অখণ্ড ভারতের বিরোধী ছিলেন, এই কারণে যে প্রথমত তাতে হিন্দুশক্তি মাথা চাড়া দেবে এবং দ্বিতীয়ত দেশপ্রেমিকতার ফলে বিশ্ব মুসলিম একাত্মবোধে বিভেদ সৃষ্টি করবে।

ইকবাল অনুভব করেন যে ভারতে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাদের জন্যে পৃথক একটি রাষ্ট্র গঠনের উপর। তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির একাত্মতার বিরোধী যাবতীয় সমন্বয়কারী মতাদর্শকে ইকবাল সমর্থন করতেন না। তিনি দ্বিজাতি-তত্ত্ব ও 'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড'-কে স্বাগত জানান। ত্রিশের দশকের গোড়ায় উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রদেশগুলির সংযুক্তির মাধ্যমে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের তিনি প্রস্তাব করেন। ১৯২৮ খ্রি মোতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে গঠিত সর্বদলীয় কমিটির কাছে ইকবাল অনুরূপ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন ; সেটি নাকচ হয়ে যায়। ১৯৩০ খ্রি এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন যে ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক ধারায় ভারতে একটি অখণ্ড রাষ্ট্র গড়ে উঠলে গৃহযুদ্ধ হবে অনিবার্য। তবে তাঁর কল্পিত স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র ভারতীয় রাষ্ট্র-সমবায়ের (confederation) সঙ্গে যুক্ত থাকার বিষয়ে তাঁর আপত্তি ছিল না। সেটা ছিল

ভারতের মধ্যে একটি মুসলিম ভারত গঠনের প্রস্তাব।

দ্র. ইসলামি রাষ্ট্র

ইনকিলাব জিন্দাবাদ (Inquilab Zindabad)

শব্দ দুটি ফারসি ভাষা থেকে আগত। অর্থ হল—'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'। ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের একটি সাধারণ ও ব্যবহারবহুল ধ্বনি। এটির উৎপত্তি ও তত্ত্বগত পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে যা জানা যায় তা হল কুড়ির দশকের মাঝামাঝি উত্তর ভারতে বিপ্লবী অনুশীলন দলের কিছু কর্মী হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশন (এইচ আর এ) নামে একটি গুপ্ত সংগঠন তৈরি করেন (১৯২৪)। তাঁরা প্রধানত ফরাসি বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের আদর্শে চলতেন; তাঁদের প্রচারপত্রে 'লং লিভ রেভোলুশন' কথাগুলি মুদ্রিত থাকত। এইচ আর এ-র ক্রমবিস্তারসূত্রে তার সঙ্গে পঞ্জাবের নওজওয়ান ভারতসভা গোষ্ঠী যুক্ত হয়। ওই গোষ্ঠীর অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ছিলেন ভগৎ সিং। তাঁদের প্রস্তাবে এইচ আর এ নামের সঙ্গে সোস্যালিস্ট শব্দটি এবং সংগ্রামী আন্দোলনের প্রয়োজনে অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তে 'আর্মি' কথাটি যুক্ত হয়। সময়টা ছিল সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন (১৯২৭) এবং দেশব্যাপী সংগ্রামী ধর্মঘটি শ্রমিক আন্দোলনে উত্তাল। উর্দুভাষী পঞ্জাবের নওজওয়ান ভারতসভার সদস্যরা জনসভা ও শোভাযাত্রায় 'লং লিভ রেভোলুশন' বাণীকে সহজবোধ্য হিসেবে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি দেওয়া শুরু করেন এবং অচিরেই ধ্বনিটি জাতীয় আন্দোলনের বিপ্লবী ও বামপন্থী ধারায় সারা দেশে ব্যাপক প্রচলন লাভ করে। উল্লেখ্য যে খিলাফত আন্দোলনের পরে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি সম্পর্কে যাঁদের আপত্তি দেখা দেয় তাঁদের কাছেও 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' গ্রহণযোগ্য হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভায় বোমা নিক্ষেপ (১৯২৮) ও ফাঁসির মঞ্চে আরোহণকালে (১৯৩১) ভগৎ সিং 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়েছিলেন।

ইসলামি রাষ্ট্র (Islamic State)

ইসলাম ধর্মের উত্থানের পিছনে ধর্মীয় আন্দোলনের চেয়ে রাজনৈতিক আবেদনই ছিল বেশি। তার ইতিহাসের গোড়ায় ছিল আরব মরুভূমির বিভিন্ন বেদুইন জাতিগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করার হৃদয়স্পর্শী আহ্বান। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকার জনপদগুলি ভগ্নপ্রায় প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা থেকে বেঁচে ওঠার তাগিদে এই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় একেশ্বরবাদী পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হয়।

মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ও ইসলামি রাষ্ট্র সমার্থক নয়। ইসলাম ধর্মের বন্ধনে আরবের বিভিন্ন গোত্র ভিত্তিক গোষ্ঠী একটি রাষ্ট্রে সমন্বিত হয়। তার শীর্ষে বিরাজ করেন ঈশ্বর আল্লাহ এবং তাঁর প্রতিভূ পয়গম্বর হজরত মহম্মদ। ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পার্থিব ও পারলৌকিক ক্ষমতার একই দেহে অদ্বৈত অবস্থান। ধর্মীয় ক্ষমতা ব্যতিরেকে রাষ্ট্র অর্থহীন, আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবিহীন ধর্ম অবাস্তব। ইসলামে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মতো রাষ্ট্র ও ধর্ম পৃথক নয়। যথার্থ ইসলামি রাষ্ট্রে বহুত্ববাদ অচল।

ই

ইসলামে ঈশ্বরই হলেন আইনের স্রষ্টা। মহম্মদের কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট যাবতীয় আইন কোরানে লিপিবদ্ধ হয়। ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রামাণ্য উৎস হল দিব্যবিধান হিসেবে রচিত কোরানের ভাষ্য শরিয়ত এবং সুন্না (মহম্মদের ব্যবহারিক জীবনে স্থাপিত অনুসরণীয় আদর্শ দৃষ্টান্ত)। আইনকানুনের বৈধতা কোরানের উপর নির্ভরশীল। কাজেই আইনের প্রামাণ্য কর্তৃত্ব পরমবাদ সম্পন্ন।

স্বয়ং মহম্মদ ইসলাম ধর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে তার রাষ্ট্রনীতিও নির্ধারণ করেন। ইসলামি যাজকতন্ত্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের কোনও প্রভেদ নেই, বরং অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ও অভিন্ন। যাজকীয় রাষ্ট্র ক্রমে রাষ্ট্রীয় যাজকতন্ত্রে পরিণত হয়। আদিপর্বে ইসলামি রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ও কেন্দ্রীভূত শক্তি ও ক্ষমতা খলিফার উপর ন্যস্ত থাকত। খলিফা ছিলেন কার্যনির্বাহি অধিকর্তা, আইনকে রূপায়িত করাই তাঁর কাজ। খলিফা কিন্তু সার্বভৌম ছিলেন না। খলিফা পয়গম্বর হজরত মহম্মদের উত্তরাধিকারী। স্বভাবত পয়গম্বরের অবর্তমানে বংশানুক্রমে এক একজন খলিফাই হন জনগণের পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়াদির অধিকর্তা। ইসলামি আইনবিদরা উত্তরকালে 'ইমাম' পদের সৃষ্টি করেন, যিনি মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও জাগতিক ক্রিয়াকর্মের ধর্মগুরু।

উল্লেখ্য, খলিফার ক্ষমতা ও খিলাফতি রাজত্ব নিয়ে পরবর্তীকালে দ্বন্দ্ব বাধে এবং ধর্মের ভিত্তিতেই একাধিক খলিফার রাষ্ট্রধারা বিরাজ করে। একাধিক খলিফার অস্তিত্ব কিন্তু ইসলামের শাস্ত্রবিরোধী। প্রাদেশিক রাজশক্তির অধিকারী সুলতানেরা স্বাধীনভাবে মাথা চাড়া দেন। পরিণামে ধর্মের ক্ষেত্রেই কেবল খলিফাদের প্রাধান্য থাকে। সুলতানেরা অবশ্য উলেমাদের পরামর্শে চলতেন। সর্বশেষ খলিফাদের মূলোচ্ছেদ করেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট কেমাল আতাতুর্ক।

আদিপর্বে ইসলামি রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কোনও ভূখণ্ডের প্রশ্ন ছিল না। ইসলামি রাষ্ট্রের প্রত্যয়ে ভূখণ্ডের প্রয়োজন নেই। এর কারণ সম্ভবত গোড়ার দিকে এক একটি গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত আরবেরা সাধারণত যাযাবরের জীবনযাপন করত। তখনও সেখানে কৃষিনির্ভর সভ্যতার প্রচলন হয়নি। তাই ভূখণ্ডের প্রশ্ন রাষ্ট্রীয় প্রত্যয়ে অনুপস্থিত। সেই নিরিখে হাল আমলে প্যালেস্তাইন নামে ভূখণ্ডবিহীন যে-রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে যার প্রেসিডেন্ট হলেন ইয়াসের আরাফত, তার যৌক্তিকতা আছে। সংগঠিত আরব রাজনীতিকে এক ধরনের অর্থনৈতিক সমবায়ী সংঘ হিসেবে দেখা হত। তাতে রাষ্ট্র, যাজকতন্ত্র ও সমবায়ী সংঘের এক ত্রিত্ব (trinity) গড়ে ওঠে। ইসলাম প্রকৃতপক্ষে একটি সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী (totalitarian) সত্তা। আধুনিক রাষ্ট্রের মতো ইসলামি রাষ্ট্রপ্রত্যয়ে ক্ষমতার পৃথকীকরণের অবকাশ নেই।

ইসলামি রাষ্ট্রে মানুষের অধিকারের প্রশ্ন উপেক্ষিত। আধুনিক সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্রের মতো ইসলামি রাষ্ট্রে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্য আছে। কোরানে ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট আইন ও নির্দেশাবলি কেউ অমান্য করলে তার ধ্বংস অনিবার্য। সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্রের মতোই ইসলামি রাষ্ট্রপ্রত্যয়ে বলা হয় যে ঈশ্বরই হলেন আইনের স্রষ্টা ; ঐশ বিধানের উত্তরণ বা বিপক্ষতা চলে না। ইসলামি বিধিব্যবস্থায় আইনই ধর্ম এবং ধর্মই আইন। কারণ উভয়ের উৎস একই, সেখানে প্রত্যাদেশই বড় কথা, বিবেকের স্থান নেই। ঈশ্বরের কাছে মানুষ নির্বিশেষে সবাইকার মর্যাদা সমান এবং সমাজের সর্বাত্মক সাম্য স্বীকৃত। কিন্তু স্বাধীনতার স্থান শূন্য। ইসলামি গণতন্ত্র হল

সাম্যের ও মৈত্রীর, স্বাধীনতার নয়। সেদিক থেকে কমিউনিজমের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। ইসলামি রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ সাম্য ও অর্থনৈতিক সমতাবিধানের জন্য কোরানে সবাইকে বৈত-উল-মল নামক রাজকোষে বাধ্যতামূলকভাবে জাকাত (দান) দেবার এক ধরনের কর-ব্যবস্থা আছে, যার উপকারিতার অধিকারী হল সমগ্র সমাজ (উম্মা)। বস্তুত ইসলামি গণতন্ত্র হল সামাজিক, রাজনৈতিক নয়।

ইসলামি আইন যেহেতু ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট, সেই কারণে অপরিবর্তনীয়। পরিবর্তনশীল সমাজকে ইসলামি আইনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। রদবদল চলে না। উল্লেখ্য, কোরানে অন্তর্ভুক্ত সব কিছুই সঠিক অর্থে আইন নয়। যা কিছু করণীয় তার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে, কিছু বিষয়ের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে। এই দুটির মাঝামাঝি অনেক কিছুর সুপারিশ, পন্থা, পদ্ধতি ও প্রবণতাকে অনুমোদিত অথবা নামঞ্জুর করা হয়েছে। শাস্তির ব্যবস্থা হিসেবে প্রায়শ্চিত্ত, লঘুদণ্ড থেকে শুরু করে অঙ্গচ্ছেদ ও প্রাণদণ্ডের শাস্ত্রীয় বিধান আছে।

ইসলামের এই পূর্বনির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয় দিব্য বিধিব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুলতানেরা প্রয়োজন অনুসারে কিছু কিছু নববিধান প্রবর্তনের প্রয়াসী হন। তার মূল কারণ আরবভূমি ছাড়িয়ে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা বহু দেশে বিস্তৃত হয়। মালিকী, শফিতি, হানবলি প্রভৃতি 'ফিখ' আইনে সংশোধনের প্রচেষ্টা হয়। কালক্রমে ইসলামি শাসনব্যবস্থায় এখনকার মতো জুরি (মুফতি), বিচারক (কাজি), প্রধান বিচারপতি (শেখ-উল-ইসলাম), দিব্য আইনজ্ঞ (উলেমা), ধর্মীয় আদেশ (ফতোয়া), বিদগ্ধজনের নির্দেশ (ইজমা) ইত্যাদির প্রচলন ঘটে। কাজির সিদ্ধান্ত থেকে অথবা ভিন্ন বিচারে প্রদত্ত রায়ের দৃষ্টান্তে নতুন আইন রচনার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। পয়গম্বরের উপদেশাবলি, বাণী কিংবা তাঁর অনুসৃত বিধিব্যবস্থার প্রথা বা ধারা (সুন্না) যেগুলি তাঁর বিশ্বস্ত সহচরেরা হদীথ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন সেগুলি অবশ্যই যাবতীয় বিধিবিধানের মানদণ্ড।

মধ্যযুগে ইসলামি ধারায় কয়েকজন রাষ্ট্রদার্শনিক গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তায় প্রভাবিত হন। তাঁরা প্লাতো, আরিস্তোতল ও নব্যপ্লাতোনীয়দের রচনাদি ভাষ্যসহ অনুবাদ করেন। তাঁরা গ্রিক রাষ্ট্রদর্শনের সঙ্গে ইসলামি দিব্যবিধানের সঙ্গতিস্থাপনের চেষ্টা করেন। তবে মুসলিম তাত্ত্বিকেরা আইনকানুনকে শুধু ইহজগতেই নয়, পরলোকেও প্রয়োগ করেন। কাজেই তাঁদের আদর্শ রাষ্ট্র মানুষের জাগতিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হয়ে পড়ে। অন্যতম ব্যতিক্রম ছিলেন ইব্‌নে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রি), যিনি রাষ্ট্রকে ঐহিক জীবনের অঙ্গ হিসেবে দেখেন, যেখানে এক একটি রাজবংশ রাজত্ব চালায়। রাজবংশ সংক্রান্ত তত্ত্বে তিনি দেখিয়েছেন যে এক একটি রাজবংশ চল্লিশ বছর ধরে মোট তিনটি প্রজন্মে শাসনে অধিষ্ঠিত থাকে। রাজত্বের উত্থান ও পতন সম্পর্কেও তিনি তিন ধরনের রাষ্ট্রের কথা বলেছেন : ১, ইসলামি দিব্যতন্ত্র, ২, তারই সমগোত্রীয় রাষ্ট্র যেটা অনেকাংশে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ৩, দার্শনিকদের কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র। খালদুনের রাষ্ট্রচিন্তায় আইনশাস্ত্রের একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উৎপাদন ও কর নির্ধারণ চিন্তার সমন্বয় দেখা যায়।

সাম্প্রতিক কালের ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তায় ধর্মীয় অনুশাসনের সঙ্গে আধুনিক ভাবনাচিন্তার সংমিশ্রণ দেখা যায়। কেমাল আতাতুর্ক খলিফার অধীন সুলতানি

শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে তুরস্কে আধুনিক রাষ্ট্রের পত্তন করেন। শিক্ষা, প্রশাসন ও আইনগত সব ধরনের প্রতিষ্ঠানকে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ করে তোলেন। বিবাহবিধির সংস্কার, নারীদের বোরখা পরিধান বর্জন থেকে শুরু করে তুরস্ক ভাষায় রোমান লিপির প্রবর্তন পর্যন্ত বহুবিধ বিষয়ে তিনি আমূল পরিবর্তন সাধন করেন।

দ্র. আল্লামা মহম্মদ ইকবাল

ইহুদি বিদ্বেষ (Anti-Semitism)

রাজনীতিতে কুখ্যাত জাতিবিদ্বেষমূলক আন্দোলন। আধুনিককালে তার সূত্রপাত ঘটে উনিশ শতক থেকে ইউরোপে ইহুদি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। সমগ্র মধ্য যুগে ইহুদিরা ধর্মীয় কারণে প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হত, বিশেষ করে তারা সুদি কারবার করত বলে। বর্তমানকালে রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও মতাদর্শগত কারণে ইহুদি বিদ্বেষের ধরন পালটে গেছে ; কতকগুলি মিথ্যা বৈজ্ঞানিক যুক্তি খাড়া করেছে কিছু ইহুদি বিদ্বেষী লেখক ও নাৎসি দর্শনবেত্তারা। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে জার্মানির একটি লেখক গোষ্ঠী ভাষাতত্ত্বের 'সেমিটিক' ও 'আর্য' শব্দ দুটির পার্থক্যকে জাতিগত প্রত্যয়ে অপব্যাখ্যা করে বলতে শুরু করে যে ইহুদিরা হল একটি স্বতন্ত্র ও নিচু জাত বা নরগোষ্ঠী। আশির দশকে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিতে ইহুদি বিরোধী নানা রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। সে সময়ে রাশিয়ায় ইহুদিদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ (pogrom) দেখা দেয়। উনিশ শতকের শেষদিকে ও বিশ শতকের গোড়ায় ইহুদিরা দলে দলে দেশ ছেড়ে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নেয়, ক্রমে ফ্রান্স, লিথুয়ানিয়া ও পোল্যান্ডে সেই ইহুদি বিদ্বেষী আন্দোলনও ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২০ থেকে ১৯৩৩ খ্রি পর্যন্ত হিটলার আর্যদের উচ্চ জাতি বলে এক নতুন তত্ত্ব খাড়া করেন এবং জার্মানির দুর্গতির জন্য ইহুদিদের দায়ী করেন। সেই কারণে নাৎসি জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বিধিবদ্ধ ন্যুরেমবার্গ আইন (১৯৩৫) অনুযায়ী ইহুদিদের জার্মান নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় ও আর্যদের সঙ্গে তাদের বিবাহ নিষিদ্ধ হয় ; ১৯৩৮ খ্রি ইহুদিদের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময়ে ৫০ লক্ষ ইহুদিকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে হত্যা করা হয়। ১৯৪৫ খ্রি থেকে বিভিন্ন দেশে ইহুদি স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলন ও ইজরেল রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইহুদি বিদ্বেষ নতুন আকার নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে ইহুদি সম্প্রদায়ের উপর হিংসাত্মক আক্রমণ ১৯৫৩ খ্রি থেকে তীব্র হতে শুরু করে। বহু ইহুদিকে সেখানে অর্থনৈতিক অপরাধে মৃত্যুদণ্ড এবং ইজরেলে যাবার অনুমতি প্রার্থনার জন্য বন্দি করা হয়।

ইহুদি বিদ্বেষের ইতিহাস দীর্ঘ এবং তার রকমফের আছে। নাৎসিরা ইহুদিদের সঙ্গে আর্যদের জাতিগত, রক্তগত ও চরিত্রগত পার্থক্যের তত্ত্ব প্রচার করে। তাদের উপর নাৎসিরা ধূর্তামি, লোভ, শক্তিমত্ততা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি দোষ আরোপ করে ; নাৎসিদের প্রচারে ইহুদিরা হল সুদখোর ও অত্যাচারী। তবে ইহুদি বিদ্বেষের সঙ্গে ইহুদিদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের ধর্মের বিরোধ স্বতন্ত্র। ইহুদিরা যিশু খ্রিস্টকে অস্বীকার করে, তবে যারা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে বিরোধ মিটে যায়। ইহুদি বিদ্বেষ সম্পর্কে নানারকম ব্যাখ্যাও আছে। যেমন, ঋণদাতার বিরুদ্ধে ঋণগ্রহীতার বিদ্বেষ আবহমানকালের। ইজরেল রাষ্ট্র সৃষ্টির পর বিশ্বের মুসলমানদের মনে ইহুদি বিদ্বেষ বদ্ধমূল হয়ে গেছে।

ই

ইহুদি স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলন (Zionism)

ইহুদিদের আন্দোলন। জেরুজালেমের কাছে Zion পাহাড়ের নাম দিয়ে ইহুদি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কিছু ব্যক্তি উনিশ শতকে Zionism নামে একটি আন্দোলন গড়ে তোলেন। উদ্দেশ্য ছিল সারা বিশ্বের ইহুদিদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং ইহুদিদের আদি পবিত্র বাসস্থান প্যালেস্তাইনে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে তোলা। এই অভীপ্সার রূপায়ণের জন্য থিয়ডোর হার্তজেল (১৮৬০-১৯০৪) নামে হাঙ্গেরির জনৈক সাংবাদিক ১৮৯৭ খ্রি সুইজারল্যান্ডের ব্যাসল শহরে ইহুদিদের নিয়ে সারা বিশ্বের প্রথম জিওনিস্ট সম্মেলন আহ্বান করে ওয়ার্ল্ড জিওনিস্ট কংগ্রেস নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। প্রতিষ্ঠিত হয় ইহুদিদের জাতীয় তহবিল এবং জমি-ব্যাঙ্ক। হার্তজেল ছাড়াও মাক্স নর্ডো, কেম্ উইজম্যান প্রমুখ ব্যক্তির নেতৃত্বে আন্দোলন ক্রমে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাঁরা অনুভব করেন যে নিজস্ব একটি রাষ্ট্র ব্যতীত ইহুদিদের নিরাপত্তা বিপন্ন। ১৯১৭ খ্রি ২ নভেম্বর ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব আর্থার জেমস ব্যালফুরের এক ঘোষণায় ইহুদিদের দাবি স্বীকৃতি পায়। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির সঙ্গে চারশ বছরের তুর্কি অটোম্যান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯২০ খ্রি মধ্যপ্রাচ্যে ট্রান্সজর্ডন সহ সমগ্র প্যালেস্তাইনের শাসনভার (ম্যানডেট) গ্রেট ব্রিটেনের উপর ন্যস্ত করে। সেখানে ইহুদিদের উপনিবেশ সেই সময় থেকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪৫ খ্রি ব্রিটেন ইহুদি উদ্বাস্তু উপনিবেশ স্থাপনের নিয়মকানুন কড়াকড়ি করে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর অত্যাচারিত ইহুদিদের দাবি প্রবল হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রসংঘ প্যালেস্তাইনকে দ্বিখণ্ড করে দেয়। ইজরেল নামে ইহুদি রাষ্ট্র জন্ম নেয় (১৪ মে, ১৯৪৮)। ওয়ার্ল্ড জিওনিস্ট কংগ্রেস সেইসময় থেকে পৃথকভাবে সক্রিয়।

দ্র. আরব লিগ; প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন

উ

উৎপাদন ব্যবস্থা (Mode of Production)

মার্কসীয় **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ** তত্ত্বের অন্যতম উপাদান। ইতিহাস নির্দেশিত একটি প্রণালী যার মাধ্যমে উৎপাদন ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে পণ্য সংগৃহীত হয়। **উৎপাদিকা শক্তি** ও **উৎপাদন সম্পর্কের** যোগফলে উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে—উপাদান দুটি পরস্পর নির্ভর ও সম্পৃক্ত। ইতিহাসে পরম্পরাক্রমে পাঁচ ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা দেখা যায়: আদিম গোষ্ঠীগত, দাসমালিকানা প্রথা, সামন্ততন্ত্রী, ধনতন্ত্রী এবং সমাজতন্ত্রী। পুরানো একটা উৎপাদন ব্যবস্থার জায়গায় নতুন একটির স্থাপনা অনিবার্য, কারণ ক্রমবর্ধিষ্ণু উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে সাবেকি উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ ও বৈসাদৃশ্য দেখা দেয়।

দ্র. উৎপাদন সম্পর্ক ; উৎপাদিকা শক্তি ; ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

উৎপাদন সম্পর্ক (Production Relations)

মার্কসীয় দর্শনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ** বিষয়ক প্রত্যয়, যাতে পণ্যের উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের প্রক্রিয়ায় যুক্ত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। উৎপাদনী যন্ত্র বা মাধ্যমের মালিকানার প্রকৃতির উপর উৎপাদন সম্পর্ক নির্ভর করে। **উৎপাদন ব্যবস্থার** উপাদান হল দুটি : **উৎপাদিকা শক্তি** ও উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদিকা শক্তির নিরন্তর উন্নয়নের দরুন এবং শ্রমযন্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের ফলে পুরানোর পরিবর্তে নতুন উৎপাদন সম্পর্কের প্রয়োজন হয়, যা উচ্চস্তরের উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবে। উন্নত উৎপাদিকা শক্তি এবং সাবেকি উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে ক্রমবর্ধিষ্ণু সংঘর্ষের অনিবার্য পরিণাম হল সমাজ বিপ্লব, যেটা নতুনটির দ্বারা পুরানো উৎপাদন সম্পর্কের অবসান ঘটায় এবং উৎপাদিকা শক্তির উত্তরোত্তর বিকাশের পথ সুগম করে। প্রাক-সমাজতন্ত্রী

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উৎপাদন সম্পর্কের স্বরূপ হল আধিপত্য, অবদমন, শোষন ও পীড়ন। সমাজতন্ত্রী উৎপাদন সম্পর্ক শিল্প-বাণিজ্যে ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে জনসাধারণের মালিকানা কায়েম করে।

দ্র. উৎপাদন ব্যবস্থা ; উৎপাদিকা শক্তি ; ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

উৎপাদিকা শক্তি (Productive Forces)

মার্কসীয় **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ** তত্ত্বের অন্যতম উপাদান। পণ্যের উৎপাদনযন্ত্র বা মাধ্যম এবং যারা এসব মাধ্যমকে ব্যবহার করে। উৎপাদিকা শক্তি এবং **উৎপাদন সম্পর্ক** একযোগে **উৎপাদন ব্যবস্থা** গড়ে তোলে। পণ্য উৎপাদনের বিকাশ ও উন্নয়নের একটি নির্দিষ্ট স্তরে উৎপাদন ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় উপাদান উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে সাবেকি উৎপাদন সম্পর্কের সংঘর্ষ বাধে। কারণ ওই উৎপাদন সম্পর্ক উন্নয়নের পরিপূরকতার পরিবর্তে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে বৈসাদৃশ্য কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন হয় সমাজ বিপ্লবের, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন এক উৎপাদন ব্যবস্থা।

দ্র. উৎপাদন ব্যবস্থা ; উৎপাদন সম্পর্ক ; ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

উদারনীতি (Liberalism)

ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং অবাধ ব্যবসাবাণিজ্যের স্বাধীনতা সমন্বিত মতাদর্শ উদারনীতি নামে অভিহিত। উদারনৈতিক মতবাদ ইতিহাসের বিশেষ কোনও সময়ে অথবা একক কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি দ্বারা উদ্ভাবিত হয়নি। উদারনৈতিক ভাবধারা দীর্ঘদিন ধরে বিকাশ লাভ করে। কারও কারও মতে প্রাচীন গ্রিসেই উদারনীতির প্রধান দুটি অঙ্গ, অর্থাৎ চিন্তার স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধিকার বিরাজ করত। অবশ্য গ্রিসে মুষ্টিমেয় অভিজাত ব্যক্তিই ওইসব সুযোগসুবিধার অধিকারী ছিল। খ্রিস্টান ধর্ম প্রবর্তনের গোড়ার দিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদারনীতিকে সমর্থন করা হত; তার সুদূরপ্রসারী সুফল দেখা দেয় ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনে এবং রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় স্বাধীনতার সমর্থনে। ক্রমে রাষ্ট্রদার্শনিকদের চিন্তায় উদারনীতির প্রত্যয়গুলি স্পষ্ট হতে শুরু করে। স্পিনোজা রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি থেকে চার্চকে পৃথক করার প্রস্তাব করেন। জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে রোমান ক্যাথলিক নিয়ন্ত্রণ থেকে প্রোটেস্ট্যান্টদের মুক্তির আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ডে **হবস**, **লক** ও ফ্রান্সে **রুসো**, গিজো প্রমুখ রাষ্ট্র দার্শনিকদের মধ্যে উদারনৈতিক ভাবধারা বিকশিত হতে শুরু করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উদারনৈতিক চিন্তায় প্রকারভেদ ফুটে ওঠে।

ইতিহাসের ধারায় উদারনীতির উদ্ভব ঘটে সামন্ততন্ত্রী ভূস্বামীদের দাপট, অভিজাত শ্রেণীর কুক্ষিগত রাষ্ট্র এবং খ্রিস্টান যাজকদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে লোকের একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে। লোকে চেয়েছিল ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেফারসন মনে করতেন যে মানুষের অধিকার হস্তান্তর করা যায় না এবং তা রক্ষা করাই হল সরকারের বড় কাজ। **জন লক** তাঁর সমকালীন বৈপ্লবিক যুগের মুক্তির আকুতিকে সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ও ফরাসি বিপ্লবে মানবাধিকারের সনদ রচিত হয়।

কার্যত উদারনীতি হল জীবনযাত্রার একটি মনোভঙ্গি, শুধুই এক মতাদর্শ মাত্র নয়, তাতে মানুষের শুভসত্তা ও যুক্তিবোধের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল ও সুখবহ করার জন্য জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত সংস্কার সাধনের মাধ্যমে যেসব রীতিনীতি ও মূল্যবোধ প্রাধান্য পায় তা কালক্রমে গণতন্ত্রের সারবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। জন ডিউই প্রমুখ দার্শনিকগণ উদারনীতির মধ্যে একটি মনোভঙ্গি এবং সেইসঙ্গে কার্যক্রমের কথা বলেন। মনোভঙ্গি হিসাবে যুক্তিবোধ ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

উনিশ শতক থেকে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদার্শনিকেরা এই উদারনৈতিক ভাবধারাকে তাত্ত্বিক সূত্রে বিবৃত করেন, সমন্বিত রূপে তত্ত্বগুলি ক্রমে একটি আন্দোলনের পথে বিকশিত হয়। উনিশ শতকের সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশ ইংল্যান্ডে উদারনীতি জাতীয় দর্শন ও রাষ্ট্রীয় কর্মপন্থার মাননির্ধারক হিসেবে প্রথম মর্যাদা লাভ করে, ইংল্যান্ডে হুইগ দল পরবর্তী কালে লিবার‍্যাল অর্থাৎ উদারনৈতিক দল নামে অভিহিত হয়।

বেনথাম, জেমস মিল ও জন স্টুয়ার্ট মিল উদারনীতির দার্শনিক বনিয়াদ প্রস্তুত করেন। শেষোক্ত জন ছিলেন উদারনীতির প্রাগাধুনিক ও আধুনিক পর্যায়ের মধ্যবর্তী।

প্রাগাধুনিক পর্যায়ে উদারনীতির সমাজ-দর্শন ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত সংস্কারের পদ্ধতি। সেই পদ্ধতি বেনথামের হিতবাদী প্রত্যয় সর্বজনের সর্বাধিক সুখবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উদারনীতির অর্থনৈতিক ভাবনা অ্যাডাম স্মিথ-এর 'ওয়েলথ অফ নেশনস' থেকে উৎসারিত। তাতে অবাধ ব্যবসাবাণিজ্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিধিব্যবস্থাকে সমর্থন করা হয়। উদারনীতির রাষ্ট্রদর্শনও ছিল বেনথামের হিতবাদী দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই নিরিখে বেনথাম নানা রকম সংস্কারের সুপারিশ করেন, তার অন্যতম ছিল পার্লামেন্টের বার্ষিক অধিবেশন, সর্বজনীন ভোটাধিকার, আমলাতন্ত্র তথা সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থাকে আইনসভার অধীনস্থ করা। ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল ও আন্দোলন গড়ে ওঠে উদারনীতির পক্ষপুটে; তাতে সংবিধানসম্মত রাষ্ট্রব্যবস্থায় সর্বসাধারণের জীবন ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তা আইনের দ্বারা সুরক্ষিত। আদালতে আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ এবং মতামত প্রকাশ, সংঘবদ্ধ হওয়া এবং মুদ্রণের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাও উদারনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

বিশ শতকে দুটি চিন্তাধারা মিশে গিয়ে উদারনীতির একটি আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করে। তার একটি হল রাজনৈতিক গণতন্ত্র আর অপরটি হল শ্রমিক আন্দোলনে সংস্কারবাদী সমাজতন্ত্র। এটি কেবল আর মধ্যবিত্তের মতাদর্শ হয়ে রইল না, সর্বসাধারণের মতাদর্শে পরিণত হল।

উদারনৈতিক ভাবুকদের মধ্যে লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপযোগী মাধ্যম সম্পর্কে ঐকমত্যের অভাব দেখা যায়। সমাজতন্ত্রী নানান দলের উত্থান, গণতন্ত্রী দল সমূহের উদারনৈতিক আদর্শ গ্রহণ এবং সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী (totalitarianism) মতাদর্শের চাপে উদারনীতির পতন সূচিত হয়।

উদারনীতিতে বিশ্বাসীদের পক্ষে কোনও দলে যোগ দেওয়া এখন অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছে। তাঁরা চান চিন্তা ও কাজের অবাধ স্বাধীনতা, সেটা দলীয় আনুগত্য ও

পুঁজিবাদী শ্রেণী শ্রমিককে তার ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে। শোষণ থেকে যে মুনাফা পাওয়া যায়, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্য, সেটা পুঞ্জীকৃত মূলধনে (accumulation of capital) পরিণত হয়। তখন তার দুটি প্রবণতা দৃষ্ট হয় : প্রথমটিতে পুঁজিপতির হাতে যতই মূলধন জমতে থাকে, শ্রমিকেরা ততই সংগঠিত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়টিতে পুঁজিপতির মূলধন যতই নতুনভাবে বিনিয়োগ করা হবে, কর্মহীন শ্রমিক বাহিনীর (reserve army of labour) ততই কর্মসংস্থান হবে। ক্রমান্বয়ে এই প্রক্রিয়ার ফলে বিনিয়োগের অনুপাতে শ্রমিক পাওয়া যাবে না এবং মুনাফার পরিমাণও কমতে থাকবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পরিপূর্ণ হয়ে উঠলে পুঁজিপতির মুনাফা কমে আসে। তখনই দেখা দেয় পুঁজিবাদের অনিবার্য সংকট।

উপদল (Faction)

একই দলের মধ্যে এক একটি গোষ্ঠী বিশেষ রাজনৈতিক মনোভঙ্গির ভিত্তিতে দানা বাঁধে এবং সেইসব গোষ্ঠী অপরাপর গোষ্ঠীর সঙ্গে অল্পবিস্তর বিষয়ে প্রতিপক্ষতা করে। দল ছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কিংবা সংগঠনের মধ্যেও সমমনোভাবাপন্ন সদস্যদের গোষ্ঠীগতভাবে উপদল গড়ে তুলতে দেখা যায়। কোনও উপদল যখন ক্ষমতার শীর্ষে উঠতে চায় এবং নিজেদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে সদস্য বৃদ্ধি করে চলে তখন সেটা একটি পুরোপুরি দলেই পরিণত হয়। যে সব দলে উপদল গড়ার প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, সে সব দলেও ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপদল থাকে। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উপদল গঠনের প্রবণতাকে সংযত করা হয়ে থাকে। তবে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন উপদল বিরোধী পক্ষ হিসেবে রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে।

উপশালা (Lobby)

রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী এবং বিশেষ করে আইনসভার সদস্যদের উপর কোনও কাজের অনুকূলে প্রভাব বিস্তার কিংবা চাপ সৃষ্টির পদ্ধতিকে ইংরেজিতে 'লবি' করা বলা হয়। এই পদ্ধতিতে আইনসভা কিংবা সচিবালয়ের সংলগ্ন উপশালায় (অলিন্দে) প্রভাব বিস্তারী বা চাপসৃষ্টিকারী বিশেষ গোষ্ঠীর পক্ষে এক বা একাধিক ব্যক্তি কোনও সাংসদ বা বিধায়ক কিংবা কোনও মন্ত্রী অথবা পদস্থ সরকারি আধিকারিককে সেই গোষ্ঠীর স্বার্থানুকূলে কোনও সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা গ্রহণে প্রবৃত্ত করেন। প্রভাব বিস্তার বা চাপ সৃষ্টি সমানে সমানেও হয়ে থাকে। আইন সভার সদস্যরা ভিন্ন দলের সদস্যদের সমর্থন লাভের জন্যও উপশালায় এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং তাঁর কার্যনির্বাহি সহকারীদের বিবেচ্য কোনও বিষয়ে কংগ্রেসের সদস্যদের ভোট সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করেন। সেখানকার উপশালায় প্রভাব বিস্তার বা চাপ সৃষ্টির জন্য তালিকাভুক্ত কিছু পেশাদার লোক থাকেন, যাঁরা তাঁদের মক্কেলদের স্বার্থে সমর্থন অর্জনের চেষ্টা করেন। ব্রিটেনে সংবাদ সংস্থাগুলি উপশালার কাজ করে। তাদের মাধ্যমে সুকৌশলে গোপনীয় খবর বেরিয়ে যায় জনমত যাচাই অথবা লোকের সেইসব সংবাদে প্রতিক্রিয়া জানার উদ্দেশ্যে।

শৃঙ্খলার জন্য সম্ভব নয়। উদারনীতিকেরা সাধারণ ভাবে কথা বলতে অভ্যস্ত, কিন্তু লোকে চায় সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচি রূপায়ণের ইঙ্গিত। কাজেই বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে তাদের খাপ খাইয়ে চলা মুশকিল।

উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy)

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থারই একটি রূপ-বিশেষ। যুক্তরাষ্ট্রের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে' (১৭৭৬) বিবৃত হয়েছিল যে মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মায়, সেই স্বাধীনতার ভাবভূমিতে মানুষ সমাজিক, রাষ্ট্রিক ও আর্থনীতিক জীবনের সর্বস্তরে সমতার অধিকারী। জীবনের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সুখের সন্ধানে মানুষ আজন্মকাল নানাবিধ অধিকার ভোগ করে এসেছে। এই ঘোষণাপত্র ছাড়াও ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮) এবং ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) উদারনৈতিক গণতন্ত্রী ভাবধারার সূচনা করেছিল।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অন্তঃসার হল **ব্যক্তিস্বাধীনতা**, নানাবিধ **অধিকার** এবং শাসিতের **সম্মতি**-সাপেক্ষ বৈধতা সম্পন্ন সরকার। নাগরিকজীবনের যাবতীয় পৌর ও রাষ্ট্রিক অধিকারের স্বীকৃতি, **আইনের শাসন** এবং রাষ্ট্রের প্রশাসনের গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে **উদারনীতির** সুসংবদ্ধ সম্পর্ক হল এই প্রত্যয়ের মূলকথা। কালপ্রবাহে গণতন্ত্রেরও বিবর্তন হয়েছে। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে **মিশ্র অর্থনীতি** ও গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা **অবাধ বাণিজ্যের** স্থান অধিকার করেছে। আর্থনীতিক সমতার নীতি প্রাধান্য পাওয়ায় উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অবাধ গতি অনেকাংশে রুদ্ধ হয়েছে।

দ্র. গণতন্ত্র, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus Value)

প্রত্যয়টি মার্কসের শ্রমভিত্তিক মূল্যতত্ত্বের (labour theory of value) প্রধান অঙ্গ। মার্কস উৎপাদনের মাত্র একটি উপাদান আছে বলে মনে করতেন, সেটা হল শ্রম। পুঁজিপতি শ্রমিককে তার শ্রম বা শ্রমশক্তির বিনিময়ে যে মূল্য প্রদান করে, সেটা তার শ্রমশক্তির সমতুল বলে ধরে নেওয়া হয়, বস্তুত সেই মূল্য শ্রমিকের কাজের মোট সময়ের মূল্য অপেক্ষা কম। শ্রমিক যে কাজ করে তার দুটি সময় থাকে। একটি হল সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের সময় (socially necessary labour time) এবং অন্যটি হল অতিরিক্ত শ্রমের সময় (surplus labour time)। শ্রমিক যে বস্তু উৎপাদন করে সেটা অতিরিক্ত দামে পুঁজিপতি বিক্রয় করে, অনুপাতে শ্রমিক মজুরি পায় কম, অর্থাৎ অতিরিক্ত যে সময়ের কাজের মূল্য শ্রমিক কম পায় সেটা তার উদ্বৃত্ত মূল্য হিসেবে প্রাপ্য। শ্রমিক যতটা মজুরি পায় সেটা হল সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের সময়ের মূল্য। এবং যতটা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয় সেটা তার অতিরিক্ত শ্রম সময়ের মূল্য।

মার্কসের তত্ত্বে উদ্বৃত্ত মূল্যের দৃষ্টিতে মুনাফাকে বিচার করা হয়েছে। শ্রমভিত্তিক মূল্যতত্ত্বে বলা হয় যে কোনও জিনিস উৎপাদন করতে হলে যে সামাজিক সময় লাগে সেটাই হল তার মূল্য। মুনাফা ও দাম হল বাহ্য আকার, যার পিছনে অতিরিক্ত শ্রমের মূল্য থাকে অন্তর্নিহিত।

এ

এ. এন. সি. (African National Congress)

দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের সৃষ্টি হয় প্রধানত শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে। এর বিরুদ্ধে মুক্তি-আন্দোলন গড়ে ওঠে ১৯১২-তে। এই প্রথম মুক্তি-আন্দোলনেরই নাম আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এ. এন. সি.)। এই মধ্যবিত্ত পার্টির আদর্শ ছিল : ব্যক্তিস্বাধীনতা, বহুজাতীয়তা এবং অহিংসা। ১৯৪০ পর্যন্ত দেশে বা বিদেশে এ. এন. সি.-র কোন প্রভাব দেখা যায়নি। চল্লিশের দশকে এ. এন. সি. জনগণের মধ্যে তার রাজনৈতিক ভিত্তি প্রসারিত করে। ১৯৪৩-এ নেলসন ম্যান্ডেলা এবং অলিভার ট্যাম্বোর নেতৃত্বে যুবলিগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০-এ সরকারবিরোধী আন্দোলনে এ. এন. সি. এই যুবলিগের বামপন্থী কর্মসূচীকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। একই সময় ১৯৪৮-এ বর্ণবৈষম্যে দৃঢ় বিশ্বাসী একটি 'জাতীয় দল' সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের দশকে এ. এন. সি. গণআন্দোলনের পথ নেয় এবং একটি যুক্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত করে। (এটি কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বারা প্রভাবিত ছিল)। ১৯৫৫-এ এ. এন. সি.-র স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে বলা হয়, দক্ষিণ আফ্রিকাতে যে থাকে, দক্ষিণ আফ্রিকা তারই। এর ফলে অস্ত্রসংগ্রামে বিশ্বাসী কিছু সংখ্যালঘু বিপ্লবীর এক সংঘটন জন্ম নেয় যার নাম হয় প্যান আফ্রিকান কংগ্রেস। ১৯৬০-এ শার্পভিল অস্ত্রসংগ্রামের পরে দুটি আন্দোলনই বেআইনি ঘোষিত হয়।

এর পরে সশস্ত্র সংগ্রামের উদ্দেশ্যে এ. এন. সি. একটি গোপন সামরিক শাখা তৈরি করে। ১৯৬৩-৬৪-তে প্রায় সমস্ত নেতৃত্বের বিচার ও কারাবাস হয়।

পরের দশকে এ. এন. সি. প্রায় নিশ্চুপই ছিল। ১৯৭৬-এ সোয়েটোতে ছাত্র-অভ্যুত্থান হয় এবং প্রচুর যুব-বিপ্লবী দেশের বাইরে এ. এন. সি-র বিভিন্ন অস্ত্রশিক্ষা শিবিরে চলে যান। দেশের ও বিদেশের চাপের মুখে পড়েন প্রিটোরিয়ার সরকার ; এ. এন. সি. আবার আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে চলে আসে। ১৯৮৪-৮৬-তে এক সংবিধান প্রণীত হয় যাতে কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাধিকদের প্রতিনিধিত্বের কোনও ব্যবস্থা রাখা হয় না।

চতুর্দিকে অসন্তোষ ও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এ. এন. সি.-র যথেষ্ট প্রভাব বাড়ে।

১৯৮৯-তে আফ্রিকান সরকারের নেতৃত্ব পরিবর্তিত হয়। এফ. ডব্লু. ডি. ক্লার্ক নেলসন ম্যান্ডেলাকে মুক্ত করেন। পরের বছর সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনকে আইনসম্মত বলে গ্রহণ করা হয়। একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সব আফ্রিকাবাসীর ভোটের অধিকার নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এ. এন. সি. অস্ত্রসংগ্রাম থেকে বিরত হতে সম্মত হয় এবং সরকার-সহ বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হয়। ১৯৯২-তে সরকার ও এ. এন. সি.-র মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়। ১৯৯৪-তে এ. এন. সি. নির্বাচনে জয়ী হয় এবং নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি হন।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা (Unitary Government)

যে-শাসন ব্যবস্থায় দেশে একটি সরকার ও একটি আইনসভা থাকে। সংবিধান লিখিত অথবা অলিখিত হতে পারে। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভারই প্রাধান্য বজায় থাকে। স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। এই শাসনব্যবস্থায় সারা দেশে একই ধরনের আইন ও একই শাসননীতি অনুসরণ করা হয়। ফলে শাসনতন্ত্র কখনও জটিল ও বিপুল হয়ে পড়ে না। ছোট ছোট যে সব দেশে ভৌগোলিক সংবদ্ধতা থাকে না, সেখানে এ ধরনের শাসনব্যবস্থা কার্যকর হয়ে থাকে। যে সব দেশে লোকের রাষ্ট্রচেতনা অনুন্নত এবং স্বায়ত্তশাসনের পরিবেশ অনুকূল নয় সেখানেও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা উপযোগী। যুক্তরাজ্যে এই ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে চলে আসছে।

পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে সামঞ্জস্য, শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনে দ্রুত পরিবর্তন, জরুরি বিষয়ে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি দিক থেকে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা সুবিধাজনক। তবে অসুবিধাও আছে। গণতন্ত্রের যুগে যথার্থ স্বায়ত্তশাসনের অভাব, বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী আইন না থাকা, আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, ভৌগোলিক সংযোগ না থাকলে প্রশাসনে বিলম্ব ও সংযোগের অসুবিধা দেখা দেয়।

দ্র. যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)

একনায়কতন্ত্র কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ ডিক্টেটরশিপ লাতিন দিক্তাতুরা (dictatura) থেকে উৎপন্ন। অর্থ হল কোনও ব্যক্তির অথবা গোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ ও একচ্ছত্র শাসনব্যবস্থা, যাতে শাসিতদের কোনও **সম্মতির** প্রয়োজন হয় না। প্রত্যয়টি রোমান রিপাবলিক আমল থেকে প্রচলিত যখন আপৎকালে সেনেটে কোনও ব্যক্তিকে ছ' মাসের জন্য একনায়ক হিসেবে নিয়োগ করা হত। সে সময়ে তিনি নিরঙ্কুশ শাসনের একচ্ছত্র অধিকারী হতেন। সমস্ত আইনকানুন রদ করার ক্ষমতা থাকত তাঁর। সময় অতিক্রান্ত হলে নিয়মতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হত, একনায়ক অবসর নিতেন। কালক্রমে ইংরেজি ডিক্টেটর শব্দের অর্থে ব্যতিক্রম ও বিকৃতি ঘটে।

মুক্তির উদগাতা ফরাসি দার্শনিক রুসো প্রাচীন রোমান রীতি অনুযায়ী আপৎকালে রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য ডিক্টেটরি প্রথার অনুবর্তন সমর্থন করেন। রোমানরা মনে করত

যে ডিক্টেটরের কার্যকাল বেশি হলে ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটবে। তা ছাড়া যে আপৎকালের জন্য ডিক্টেটর নিয়োগের সাময়িক প্রয়োজন হয় তার পক্ষে ছ' মাসই যথেষ্ট।

একালের ডিক্টেটররা কিন্তু একবার একচ্ছত্র ক্ষমতার স্বাদ পেলে আর ছাড়তে চান না। স্পেন ও পর্তুগালসহ তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশেই একনায়কেরা স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছিলেন ও এখনও আছেন কিছু কিছু। বর্তমানকালের একনায়কদের স্বৈরতন্ত্রী বলাই ভাল। এযুগের একনায়কেরা সংশ্লিষ্ট দেশের পূর্বতন রাজার ন্যায় আচরণ করেন। ভাল ও মন্দ উভয় দিকই থাকে। একনায়কদের মধ্যে অনেকেই আপামর জনগণের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়। সব রাজা, একনায়ক বা একচ্ছত্রাধিপতি, অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী নন। প্লাতো, বেকন ও মধ্যযুগের কোনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি সদয় একচ্ছত্রাধিপতির (benevolent despot) গুণগান করেছেন। ফরাসি বিপ্লবের পর গণতন্ত্রের প্রবর্তন হবার ফলে একচ্ছত্রাধিপতিদের কাল শেষ হলেও নতুন আকারে একনায়কতন্ত্র বা ডিক্টেটরশিপ দেখা দিয়েছে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, পার্টি, শ্রেণী ইত্যাদি ধরনের একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে।

এঙ্গেলস, ফ্রিডরিখ (১৮২০-১৮৯৫) (Engels, F.)

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পথিকৃৎ, যিনি **কার্ল-মার্কস**-এর সঙ্গে একত্রে মার্কসবাদী রাষ্ট্রদর্শন, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বের স্রষ্টা। জার্মানির বার্মেন শহরে জন্ম। একজন মিলমালিক হলেও যৌবনকাল থেকেই তিনি সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। জীবনের বড় একটা সময় তাঁর ইংল্যান্ডে কাটে। ছাত্রাবস্থায় তরুণ হেগেলপন্থীদের বামপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন। এই সময়ে হেগেলীয় রক্ষণশীলতা ও হেগেলের ভাববাদী দর্শনের স্ববিরোধিতা সম্পর্কে এঙ্গেলস অনেক প্রবন্ধ লেখেন। পিতার নির্দেশে ইংল্যান্ডে বাণিজ্য বিষয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে তিনি বিপ্লবী আদর্শে প্রভাবিত হন এবং শিল্পোন্নত দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সংস্পর্শে আসেন এবং ক্রমে একজন সমাজতন্ত্রী হয়ে পড়েন। ১৮৪৪ খ্রি ইংল্যান্ড ছেড়ে পারিতে আসার পর তাঁর সঙ্গে মার্কসের পরিচয় ঘটে। পরবর্তী বছর দুয়েকের মধ্যে প্রকাশিত 'দ্য হোলি ফ্যামিলি' এবং 'জার্মান আইডিয়লজি' বই দুটির যুগ্ম-লেখক ছিলেন দুজনে। জার্মান দর্শনে হেগেল ও ফয়েরবাকের সমকালীন আধিপত্যের বিরুদ্ধে মার্কস ও এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। একই সঙ্গে তাঁরা সর্বহারার বিপ্লবী সংগঠন হিসেবে কমিউনিস্ট লিগ গড়ে তোলেন। এঙ্গেলস লিগের খসড়া কর্মসূচি তৈরি করেছিলেন (১৮৪৭) যার ভিত্তিতে উভয়ের যুগ্ম লেখনীতে **কমিউনিস্ট ইস্তাহার** (১৮৪৮) রচিত হয়। বলা যায় এই সময় থেকে শ্রমজীবী শ্রেণীর মতাদর্শ হিসেবে মার্কসবাদের প্রচার শুরু হয়। সাংবাদিকতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয় তাঁর সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রামে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জার্মানিতে ১৮৪৮-৪৯ খ্রি বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে এঙ্গেলসের ভাবনাচিন্তা প্রয়োগের সুযোগ পায়। বিপ্লবের ব্যর্থতায় তিনি জার্মানি ছেড়ে নির্বাসিত জীবনে প্রবেশ করেন।

ইংল্যান্ডে তিনি আবার মার্কসের সঙ্গে মিলিত হন এবং শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করে প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচালনা করেন (১৮৬৪-৭৬)। পরবর্তী প্রায় চার দশক যাবৎ এঙ্গেলস মার্কসের যাবতীয় রচনাদি বিশেষ করে 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থটি প্রস্তুতির কাজে সাহচর্যে যুক্ত থাকেন। মার্কসের চিন্তা ও রচনায় এঙ্গেলসের প্রভাব ছিল অপরিমেয়। মার্কসের বহু তত্ত্বকে এঙ্গেলস বিস্তারিত ও বর্ধিত করেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তত্ত্বকে প্রকৃতপক্ষে এঙ্গেলসই প্রযুক্তিগত দিক থেকে তুলে ধরেন। 'অ্যান্টি ডুরিং' গ্রন্থে লিখেছেন যে দ্বন্দ্ববাদের প্রতিফলন মনুষ্যপ্রকৃতিতে ছাড়াও বস্তুজগতেও দেখা যায়। তিনি মনে করতেন একই নিয়মে মানুষ ও প্রকৃতি আবদ্ধ। 'ডায়ালেকটিকস অব নেচার' সেই নিরিখে লিখিত। 'পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্র' গ্রন্থে তিনি নারীবাদী তত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন যে এক-বিবাহ প্রথা পুরুষ অথবা নারী, একের উপর অপরের আধিপত্য থেকে উদ্ভুত, যাতে বংশধরেরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারে পিতৃত্বের বিতর্কে জড়িয়ে না পড়ে। সামাজিক শ্রেণীবিরোধের আদি উৎস হল নারী-পুরুষের এক-বিবাহের বিরোধ ; এবং শোষণ ও পীড়নও আদিকালে ঘটেছিল স্ত্রী-পুরুষের একজনের উপর অপরজনের আধিপত্য থেকে। গভীর অধ্যয়ন ও মৌল গ্রন্থাদি রচনার সমসময়ে এঙ্গেলস রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সমধিক সক্রিয় থাকতেন।

এশীয় উৎপাদন-পদ্ধতি (Asiatic mode of production)

মার্কস ও এঙ্গেলস 'নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউন' পত্রিকায় ব্রিটেনের বৈদেশিক নীতির সমালোচনাসূত্রে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধে (১৮৫৩) এই প্রত্যয়টির সূত্রপাত করেন যার মর্মার্থ হল কৃষিভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকায় ভারত এবং দক্ষিণ, পূর্ব ও মধ্য এশীয় সমাজে একটি নিশ্চলতা বিরাজ করে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বংশানুক্রমিক শাসন থাকার ফলে সামরিক সংগ্রাম ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এশীয় সমাজের গতিহীনতার পশ্চাতে প্রাচীন গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা লক্ষিত হয়, যেখানে কৃষি ও কুটিরশিল্পের সমন্বয়ে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা দেখা যায়। স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের অধীন গ্রামীণ জীবন স্বনির্ভর। সীমিত শ্রমবিভাজনসহ ঐতিহ্যগতভাবে ভোগ্যপণ্য উৎপাদিত হয় ; সেখানে নতুন প্রযুক্তি ও পদ্ধতি অনুসরণের অবকাশ নেই।

উল্লিখিত প্রত্যয়ের তাৎপর্য হল উৎপাদন-শক্তি বিকশিত হয়ে উৎপাদন-সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটানোর প্রধান মার্কসীয় তত্ত্বের সঙ্গে এটি সঙ্গতি বজায় রাখে না। মার্কস প্রত্যক্ষ করেন যে এশীয় উৎপাদন-ব্যবস্থায় একই পদ্ধতি ওই সকল কৃষিজীবী ও কুটিরশিল্পী নিরন্তর একভাবে চালিয়ে যায়। সেগুলির বিকাশ ঘটলেও আবার একই জায়গায়, একই নামে ও প্রকারে গড়ে ওঠে। সেই কারণে মার্কস মনে করতেন যে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন অপরিহার্য, কারণ তার মাধ্যমে সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে গতিশীল পরিবর্তন দেখা দেয় সেটি মার্কসীয় ইতিহাস-তত্ত্বকে কার্যকর করে তোলে।

ঐ

ঐকমত্য (Consensus)

কোনও সংস্থা অথবা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কোনও সিদ্ধান্তে সকলের মতের মিল বা অভিন্নতা। রাষ্ট্রচিন্তায় প্রত্যয়টির প্রবর্তন করেছিলেন রোমান তাত্ত্বিক মার্কুস তুল্লিয়ুস কিকেরো। বিচারের রায়প্রদানে একমত হওয়াকে তিনি প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করতেন।

ঐকমত্য স্বতঃই দেখা দেয় যখন সংশ্লিষ্ট সকলের কোনও বিষয়ে স্বার্থ, চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভূতি এবং কর্মপ্রণালীর মধ্যে একতা ফুটে ওঠে। মতভেদ থাকলেও অনেক সময় পরস্পরবিরোধী স্বার্থ সমন্বিত হয় যখন সকলের হিতার্থে কোনও প্রশ্ন ওঠে, বিশেষ করে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিলে। এক একটি দেশের ঐতিহ্যের মধ্যেই বিভেদের পরিবর্তে সমন্বয়ের ধারা প্রাধান্য পায়; সেখানে বিভেদের বিরুদ্ধে লোকের ঐকমত্য গড়ে ওঠে। এই ধরনের ঐকমত্যে জনস্বার্থমুখী মনোভাব প্রতিফলিত হয় যেটাকে মঁতেসকিয়্য প্রজাতন্ত্রের গুণ বলে মনে করতেন। জনহিতাকাঙ্ক্ষী মনোভাবের কাছেই ঐকমত্যের আবেদন বেশি। এই ধরনের রাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হল সর্বাধিক-সংখ্যক মানুষের সন্তোষবিধান এবং সম্ভাব্য ন্যূনতম-সংখ্যক মানুষের কাছে বিরাগ-ভাজন হওয়া। তাতে এমন এক রাজনৈতিক কর্মধারা অনুসরণ করা হয় যেটা যে কোনও মতাদর্শেই চলুক না কেন সেটা সদাই সুপরীক্ষিত ও সর্বজন অনুমোদিত পথে পারম্পর্য বজায় রেখে অগ্রসর হয়।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)

মার্কসবাদের একটি প্রধান তত্ত্ব। এটিকে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাও বলা হয়ে থাকে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে মার্কস ও তাঁর সহযোগীরা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হন যে সমাজের বিবর্তন প্রত্যক্ষ কয়েকটি নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং শ্রমশক্তিসম্পন্ন মানুষই ইতিহাসের যথার্থ স্রষ্টা। এই তত্ত্বে দেখানো হয়েছে যে উৎপাদিকা শক্তি এবং

উৎপাদন সম্পর্কের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তথা শ্রেণী সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় সমাজ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে। তাতে পুরানো উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙে পড়ে এবং প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন উন্নত সম্পর্ক, যার সঙ্গে বর্ধিত নতুন উৎপাদিকা শক্তির সাযুজ্য থাকে।

প্রত্যয়টি সমাজে মানুষে মানুষে সম্পর্কের নির্দিষ্ট এক ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগ বিশেষ। 'ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি' গ্রন্থের মুখবন্ধে মার্কস প্রশ্ন তোলেন যে কোন্ নীতি মানুষে-মানুষে সব সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে ? উত্তরে তিনি বলেন যে, সব মানুষ একটাই যে লক্ষ্য অভিমুখে চলে, সেটা হল জীবন ধারণের জন্য পণ্য উৎপাদন এবং তারপর উৎপন্ন বস্তুর বিনিময়। চিরন্তন সত্যের কিংবা সামাজিক সুবিচারের মধ্যে পরিস্ফুট চিন্তাভাবনা নয়, সমাজ বিবর্তনের প্রকৃত নিয়ন্তা হল উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থা। উৎপাদনের উপাদান দুটি প্রকৃতিদত্ত সম্পদ ছাড়াও উৎপাদনে শ্রম ও মানুষের কর্মদক্ষতা (আদিম সমাজে) এবং যন্ত্রপাতি থাকে, যাকে মার্কস উৎপাদিকা শক্তি (productive forces) আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু উৎপাদনে মানুষে-মানুষে সম্পর্কের প্রশ্নও থাকে, যার নাম দিয়েছেন তিনি উৎপাদন সম্পর্ক (productive relations)। মানুষ ও বস্তুর (উৎপাদিকা শক্তি) সম্পর্ক মানুষকে দ্বিতীয় একটি সম্পর্ক অর্থাৎ মানুষ ও মানুষ (উৎপাদন সম্পর্ক) সম্পর্কে নিয়ে যায়। প্রথমটির পরিবর্তন হলে দ্বিতীয়টিরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

আদিম সমাজে উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি ছিল সহযোগিতা। ইতিহাসের ধারায় আদিমকালের কোনও এক পর্যায়ে সমাজের কিছু মানুষ উৎপাদিকা শক্তি নিজেদের কুক্ষিগত করে। এই প্রক্রিয়া ক্রমে পুঁজিবাদের জন্ম দেয়, সংখ্যাগরিষ্ঠদের শ্রমের উপর সংখ্যালঘিষ্ঠরা আধিপত্য শুরু করে। উৎপাদনে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে উৎপাদন সম্পর্ক দুটি পরস্পর বিরোধী শ্রেণীর সংঘর্ষে পরিণত হয়।

সমস্ত উৎপাদনের যোগফলে রচিত হয় সমাজের আর্থনীতিক কাঠামো, যে বস্তুগত ভিত্তির উপর অবস্থান করে আইন ও রাজনীতির অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উপরিকাঠামো। উৎপাদনের সেই ভিত্তি অনুযায়ী মানুষের রাজনৈতিক চেতনা গড়ে ওঠে। সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেটাকে তিনি নিম্নকাঠামো বলেছেন, সেটাই ধর্ম, নৈতিকতা, আইন, রাজনীতি প্রভৃতি উপরি-কাঠামোর প্রকৃত ভিত্তি। নিম্নকাঠামো উপরিকাঠামোকে নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। উপরিকাঠামোর উপাদানগুলি শাসক শ্রেণীর স্বার্থ চরিতার্থ করে।

প্রাকৃতিক সম্পদের নতুন কোনও ব্যবহার কিংবা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যখন আবিষ্কৃত হয়, উৎপাদিকা শক্তি তখন সাবেকি উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়—বিশেষ করে সম্পদের মালিকানাগত বিষয়ে পুরানো আইনকানুন ও বিধিব্যবস্থা উন্নতিসাধনের পরিবর্তে মানুষকে শৃঙ্খলিত করে। তখন একটা সমাজ বিপ্লব ঘটে। ধরা যাক একটি কৃষিপ্রধান দেশ, যেখানে জমি, যন্ত্রপাতি ও কৃষকের দক্ষতা উৎপাদনের মূল উপাদান। কৃষকদের সঙ্গে সঙ্গতিশীল সম্পর্ক থাকে ভূস্বামীদের। যদি সেখানে কয়লা বা লোহার খনি আবিষ্কৃত হয় তা হলে উৎপাদিকা শক্তি দেখা দেবে। উৎপাদন সম্পর্কেও পরিবর্তন হবে। তখন কৃষকের স্থানে নেবে খনির শ্রমিক, শিল্পপতিরা নেবে ভূস্বামীর স্থান। পুরানো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থান নেবে নতুন

ঐ

ব্যবস্থা। তাতে সংঘর্ষ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক।

মার্কস সমাজ বিবর্তনের ধারায় পাঁচ ধরনের আর্থনীতিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন : আদিম, দাসমালিক, সামন্ততন্ত্রী, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক। এই বিশ্লেষণে নতুন যুক্তিবাদী ভাবনাচিন্তা অথবা ন্যায়নীতি ও সত্যের বিষয়ে নতুন কোনও প্রত্যয় সমাজ বিবর্তনকে প্রভাবিত করে না। কারণ সেগুলি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরিকাঠামোর অন্তর্গত।

দ্র. উৎপাদন ব্যবস্থা, ভিত্তি ও উপরিকাঠামো

ও

ওয়ার্স চুক্তি (Warsaw Pact)

পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ার্স মহানগরীতে ১৪ মে ১৯৫৫ তারিখে পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রী দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও সাহায্যের ভিত্তিতে ২০ বছরের জন্য সম্পাদিত চুক্তি। তাতে আলবানিয়া (১৯৬৮ খ্রি নাম প্রত্যাহার করে), বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, রুমানিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন যুক্ত হয়েছিল। দেশগুলির একটি যৌথ সশস্ত্র বাহিনী গঠিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী শীর্ষে একটি রাজনৈতিক পরামর্শ সমিতি ছিল।

১৯৫৪ খ্রি অক্টোবরে পশ্চিম জার্মানি নাটো রাষ্ট্রজোটে যোগ দেওয়ার ফলে সমাজতন্ত্রী দেশগুলির নিরাপত্তার তাগিদে ওয়ারস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির অন্তর্গত কোনও দেশ আক্রান্ত হলে জোটের অন্যান্য দেশগুলি তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে বলে চুক্তি হয়েছিল। জোটবদ্ধ দেশগুলি বছরে একবার যৌথ মহড়ায় অংশ নিত। ১৯৬৮ খ্রি চেকোস্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে একবার সামরিক অভিযান করা হয়েছিল। স্বাক্ষরকারীরা অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান চায়, পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা হ্রাস ও বিনষ্টকরণ, রাসায়নিক অস্ত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি এবং যাবতীয় নতুন মারণাস্ত্র উৎপাদন রদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে নাটো সংগঠন যদি ভেঙে দেওয়া হয় তা হলে ওয়ার্স জোটও ভেঙে দেওয়া হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়। ১৯৯১ খ্রি সংযুক্ত জার্মানির নাটো থেকে বেরিয়ে আসার পর ওয়ার্স চুক্তির জোট ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

ওয়েন, রবার্ট (১৭৭১-১৮৫৮) (Owen, Robert)

ইংরেজ সমাজ-সংস্কারক, মানবতাবাদী এবং সমাজতন্ত্র, ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় আন্দোলনের আদি প্রবক্তা। স্কটল্যান্ডের নিউ লানার্ক নামক স্থানে তাঁর একটি কাপড়ের মিল ছিল; সেটিকে তিনি তাঁর সমাজতন্ত্রী ভাবনার পরীক্ষানিরীক্ষার কেন্দ্র

৩

হিসেবে স্থানীয় শ্রমিকদের নিয়ে একটি আদর্শ শিল্পনগরী গড়ে তোলেন ; একদিকে তাতে তিনি শ্রমিকদের সর্ববিধ সুযোগসুবিধা দেন, অন্যদিকে তার পিছনে তাঁর মুনাফার লক্ষ্য ছিল সীমিত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ন্যায্য মজুরি ও শ্রমিকদের কাজের উপযুক্ত সুবিধাদি দিলে পরিণামে সেটা ব্যবসায়ী সাফল্যের পক্ষে সহায়ক হয়। কাজের সঙ্গে সমাজ জীবনেরও চাই সামঞ্জস্য। সেই দৃষ্টিতে নিজের কারখানায় শ্রমিকদের যথোচিত শিক্ষার সংস্থান ও কল্যাণ বিধান করেন। উৎপাদনে ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধী না হলেও বন্টন ও বিনিময়ে তিনি সামাজিক মালিকানার পক্ষপাতী ছিলেন।

১৮১৯ খ্রি তাঁর উদ্যমে কারখানা আইন বিধিবদ্ধ হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা রাজ্যে নিউ হারমনি নামে একটি সমবায়ী সমাজ তথা কমিউনিস্ট উপনিবেশ স্থাপন করেন (১৮২৫)। সেই সঙ্গে তাঁর উদ্যোগে একটি শ্রমিক ইউনিয়নও গঠিত হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস ওয়েনের সমাজতন্ত্রী ভাবনা ও ক্রিয়াকলাপকে স্ববিরোধী ও কল্পনাপ্রবণ হিসেবে অভিহিত করেন।

ঔ

ঔপনিবেশিকতাবাদ (Colonialism)

ঔপনিবেশিকতাবাদ শব্দটি দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধোত্তরকালে বিশেষ করে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাম্রাজ্যবাদ শব্দটির সমার্থে ব্যবহারবহুল হয়েছে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল যে সব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মপন্থার সাহায্যে একটি সাম্রাজ্যশক্তি অন্যান্য দেশ কিংবা অধিবাসীদের উপর নিয়ন্ত্রণ অথবা সম্প্রসারণ বজায় রাখে। শব্দটির অর্থ সাম্রাজ্যবাদের সমতুল। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের আগে শব্দটির দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তার ও শিল্পোন্নয়নের জন্য আইনকানুন বিধিবদ্ধকরণে যে ঔপনিবেশিক রীতিনীতি বা কর্মপন্থা অনুসৃত হত সেকথা বোঝাত।

আগেকার কালে শব্দটির দ্বারা বোঝাত যে এক এক স্থানের কিছু অধিবাসী যখন নিজ দেশ ছেড়ে সাগরপারে সুদূর কোনও দেশে গিয়ে যে বসতি বা উপনিবেশ স্থাপন করত। ইউরোপের অধিবাসীরা দলে দলে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে এবং তারও আগে গ্রিসের অধিবাসীরা সিসিলি, দক্ষিণ ইতালি প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে বসবাস করত।

অবশ্য ইদানীং শব্দটির বহুল প্রচলন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনসূত্রে বিস্তার লাভ করেছে। সপ্তদশ শতক থেকে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পূর্বাবধি ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, পোর্তুগাল, হল্যাণ্ড, ইতালি, জাপান প্রভৃতি ধনতন্ত্রী দেশ বিশ্বের বিভিন্ন অনুন্নত দেশ জবরদস্ত দখল করে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করে। উদ্দেশ্য ছিল নিজ দেশের উদ্বৃত্ত মূলধন উপনিবেশে লগ্নি করা, উপনিবেশে শ্রমিকের শস্তা মজুরি এবং সেখানকার কাঁচামাল সস্তায় শিল্প বাণিজ্যে নিয়োগ করা। উপনিবেশগুলিতে আর্থনীতিক শোষণের দ্বারা স্বদেশের প্রভূত উন্নতিবিধান করা হয়। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধে কিছুটা এবং দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধে বহুলাংশে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষয়-ক্ষতি এবং দায়দেনার ফলে ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ আর্থিক দিকে সবিশেষ পর্যুদস্ত হয়। সেকারণে উপনিবেশগুলির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে রাখা নিরর্থক হয়ে দাঁড়ানোয় সেগুলি সাম্রাজ্যবাদীরা ছেড়ে চলে যায়।

দ্র. বি-উপনিবেশন তত্ত্ব

ক

কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি (Congress Socialist Party)

ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধে আইন অমান্য আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ায় কংগ্রেসের যুব কর্মীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও হতাশা দেখা দেয় ; তাঁরা সংগ্রামী পথে অগ্রসর হবার সংকল্প গ্রহণ করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী গড়ে উঠতে শুরু করে। পুনাতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে (১৯৩৩) একটি সমাজতন্ত্রী কর্মসূচি গৃহীত হয়। পাটনাতেও ইতিপূর্বে অনুরূপ এক সম্মেলন (১৯৩১) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সময়ে নাসিক জেলে আইন অমান্য আন্দোলনে ধৃত কিছু যুবকর্মী একটি সমাজতন্ত্রী দল গঠনের এক খসড়া কর্মসূচি প্রস্তুত করেন (১৯৩৩)। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, অশোক মেহতা, অচ্যুৎ পট্টবর্ধন, ইউসুফ মেহেরালি, এম. আর. মাসানি, এন. জি. গোরে, এস. এম. যোশী, এম. এল. দাঁতওয়ালা প্রমুখ ব্যক্তি। ১৯৩৪ খ্রি এপ্রিল মাসে জব্বলপুরে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ও আর. এস. রুইকরের কিছু সংখ্যক অনুগামীও একটি সমাজতন্ত্রী দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। মানবেন্দ্রনাথ তখন কারাগারে।

১৯৩৪ খ্রি মে মাসে পাটনায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে সংসদীয় কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতিপূর্বে ভগ্নপ্রায় স্বরাজ পার্টিকে পুনর্গঠিত করার প্রয়াস চলেছিল। সংগ্রাম বিমুখ এই প্রবণতাকে প্রতিরোধ করার জন্য উল্লিখিত অধিবেশনের পূর্বে পাটনায় সমাজতন্ত্রীরা আচার্য নরেন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে এক সম্মেলনে মিলিত হন। সেখানে একটি নিখিল ভারত সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী গঠিত হয়। বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ ও সমন্বয়ের জন্য একটি প্রস্তুতি সমিতি গঠিত হয় ; তার সাধারণ সচিব হন জয়প্রকাশ। ওই বছরের অক্টোবর মাসের শেষদিকে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে নিখিল ভারত কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়।

বোম্বাই সম্মেলনেই পার্টির উদ্দেশ্য সংবলিত গঠনতন্ত্র এবং কর্মসূচি গৃহীত হয়।

কংগ্রেসের ভিতরে থেকেই কার্যনির্বাহ ছিল পার্টির বৈশিষ্ট্য। প্রথম সম্মেলনে গৃহীত মূল দুটি উদ্দেশ্য ছিল : ১. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে অবস্থিত থেকে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ২. দেশে একটি সমাজতন্ত্রী সমাজের প্রতিষ্ঠা। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সাংবিধানিক বিষয়ে আপসমূলক আলোচনা যথার্থ স্বাধীনতা অর্জনের পরিপন্থী বলে এই দল মনে করত। উল্লিখিত দ্বিতীয় লক্ষ্যের সমর্থনে ১৫ দফার এক কর্মসূচি গৃহীত হয়, যার মূলকথা ছিল উৎপাদনকারী জনগণের কাছে যাবতীয় ক্ষমতার হস্তান্তর, ভারী শিল্প-বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়করণ, যৌথ কৃষিব্যবস্থা ও সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন ও বণ্টন, দেশীয় রাজ্য ও জমিদারি ব্যবস্থার অবসান, কাজের অধিকারকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দান, সর্বজনীন ভোটাধিকার, রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ ইত্যাদি।

কংগ্রেসের ভিতরে থেকে তার আদর্শ ও কর্মসূচির রূপায়ণ ছাড়াও কংগ্রেসের বাইরে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন সমূহে যোগ দিয়ে সেগুলিকে শ্রেণী সংগ্রামের অনুকূলে শক্তিশালী করে তোলা ছিল দলের দ্বিমুখী কর্মধারা। দ্বিতীয় ধারার কর্মসূচির অন্যতম অঙ্গ ছিল যুব, নারী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা।

পার্টি গঠনের গোড়ার দিকে মানবেন্দ্রনাথের অনুগামীদের অনেকেই সেটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রি নভেম্বরে মানবেন্দ্রনাথ জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তাঁরা দলত্যাগ করেন। অন্যদিকে ১৯৩৫ খ্রি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল তার পূর্ব অনুসৃত উগ্র কর্মপন্থা বাতিল করে পপুলার ফ্রন্ট নীতি গ্রহণ করে। এযাবৎকাল ভারতীয় কমিউনিস্টরা সি এস পি দলের তীব্র সমালোচনা করতেন। অতঃপর ওই দলে প্রকাশ্যে যোগদানের মাধ্যমে নিষিদ্ধ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে সি এস পি থেকে কমিউনিস্টরা বহিষ্কৃত হন। অন্যান্য বাম নেতাদের মধ্যে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র এই দলের সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত হননি। ১৯৩৫ খ্রি ভারত শাসন আইনের বিরুদ্ধে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ও মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়ে বিরোধিতাসূত্রে বামপন্থী জোটে বিভিন্ন দল ও নেতা সাময়িকভাবে যুক্ত হন।

সি এস পি দলের আদর্শ ও কর্মসূচি যাই থেকে থাকুক না কেন, প্রতিষ্ঠানকাল থেকেই তার নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিচিত্র ও বহুমুখী মতাদর্শ দেখা যেত। কেউ ছিলেন ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রী, কেউ বা কট্টর মার্কসবাদী, কেউ আবার নিখাদ গান্ধীবাদী কিংবা বৈদান্তিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। পার্টির মুখপত্র 'কংগ্রেস সোসালিস্ট' প্রথমে কলকাতা ও পরে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হত।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের (১৯৩৯) প্রাক্কালে সি এস পি সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করে, কিন্তু অধিবেশনে গোবিন্দ বল্লভ পন্থের প্রস্তাব উত্থাপনের সময়ে নিরপেক্ষ থাকে ; এবং পরোক্ষে দক্ষিণপন্থীদের পক্ষ অবলম্বন করে। অনতিকাল পরে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত লেফ্ট কনসলিডেশন কমিটি যখন কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করে তখন সি এস পি কমিটি থেকে সরে আসে এবং বাম মোর্চা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় রামগড় কংগ্রেসের প্রাক্কালে সভাপতি পদের নির্বাচনে মানবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী প্রার্থী মৌলানা আজাদকে সমর্থন করে। গান্ধীজির নেতৃত্বে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে সংগ্রাম শুরু করাই ছিল সি এস পি দলের অভীষ্ট বস্তু। ভারত ছাড় আন্দোলনে দলের বিভিন্ন নেতা নেতৃত্বদান করেন। আন্দোলন

নিষ্ফল হয়ে যাওয়ার পরে জয়প্রকাশ, নরেন্দ্র দেব প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পূর্ব পরিকল্পিত সুষ্ঠু কর্মসূচি না থাকাকেই ব্যর্থতার কারণ বলে অভিমত প্রকাশ করেন। ১৯৪৬ খ্রি জেল থেকে মুক্তির পর দলের কোনও কোনও নেতা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গণপরিষদে যোগদানের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে নতুন রূপে আবার ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রস্তাব করেন। পার্টির কানপুর কনভেনশনে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৪৭) মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাবসহ কংগ্রেসের অনুসৃত নীতিকে নিন্দা করা হয় এবং দলের নাম থেকে কংগ্রেস শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। ১৯৪৮ খ্রি ফেব্রুয়ারি মাসে এ আই সি সি অধিবেশনে স্থির হয় যে স্বতন্ত্র মতাদর্শ ও গঠনতন্ত্র সংবলিত কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য অতঃপর কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে থাকতে পারবেন না। ওই বছরেই নাসিক সম্মেলনে পার্টির সদস্যদের বড় একটি অংশ গণপরিষদ এবং স্বাধীনতার মূলস্রোতে নিজেদের বিচ্ছিন্নতা উপলব্ধি করেন, ফলে সমগ্র দলের কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দ্র. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

কঁৎ, অগ্যুস্ত (১৭৯৮-১৮৫৭) (Comte, Auguste)

ফরাসি দার্শনিক। দৃষ্টবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী সমাজতত্ত্বের প্রবর্তক। ফরাসি বিপ্লবের উত্তরকালে তিনি পারির প্রগতিশীল ইকল পলিটেকনিকে যোগ দেন। রাষ্ট্রদার্শনিক স্যাঁ-সিমঁ-র সচিব হিসেবে তাঁর কল্পরাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্রী চিন্তার বিকাশে কঁৎ সহায়তা করেন। পরে মতপার্থক্যের দরুন দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। অতঃপর গণিতের শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ এবং ১৮৪৮ খ্রি কঁৎ দৃষ্টবাদী সমিতি গঠন করেন। বিপ্লবের পর ফ্রান্সে দুরূহ রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে তিনি দৃষ্টবাদী রাষ্ট্রদর্শনের যে বিস্তার ঘটিয়েছেন সেটা মূলত স্যাঁ-সিমঁ-এর ভাবভূমিতেই রচিত হয়। সাধারণভাবে ফরাসি বিপ্লবের গুণগ্রাহী হলেও কঁৎ সাম্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি ধরনের তত্ত্বকে বিপ্লবের কারণ হিসেবে নিন্দা করেন। তিনি চাইতেন একাধারে প্রগতি ও সামাজিক শৃঙ্খলা। বস্তুত তিনি ছিলেন একজন মধ্যপন্থী। বিপ্লব ও রক্ষণশীলতার দ্বৈতধারার মাঝে পথ খুঁজতে গিয়ে তিনি দৃষ্টবাদে পৌঁছন। উদ্দেশ্য ছিল সমাজের বিজ্ঞানসম্মত একটি রাজনৈতিক মতবাদ দাঁড় করানো।

কঁৎ মানবমন ও সমাজের তিন পর্যায়ে যে বিবর্তনধারা দেখিয়েছিলেন সেগুলি হল দেবতত্ত্ব অর্থাৎ কাল্পনিক, অধিবিদ্যা অর্থাৎ বিমূর্ত, এবং **দৃষ্টবাদ**। দৃষ্টবাদ শব্দটি তিনি বিজ্ঞানের সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেন। নিয়মনিয়ন্ত্রিত চরাচরের একমাত্র দৃষ্টবাদী প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। উল্লিখিত দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় পর্যায়ে উন্নীত মানুষকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ করা যায়। দৃষ্টবাদী পর্যায়ে মানুষ ঈশ্বর ও অন্যান্য ভ্রান্তি থেকে মুক্তি পায়। অবশ্য নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একটি জীবনদর্শনের প্রয়োজন ঘটে। সাধারণ নৈতিকতামণ্ডিত ভাবনাচিন্তা ও আচরণের তিনি একটি নিরীশ্বরবাদী উৎসের সন্ধানী ছিলেন। তার জন্য চেয়েছিলেন যাবতীয় সামাজিক সম্পর্কের ন্যায়সঙ্গত রূপায়ণ ও সর্বগ্রাহ্য কিছু মূল্যবোধের সমন্বয়। মূল্যবোধ স্থাপনের তাগিদে তিনি শেষাবধি দৃষ্টবাদী এক

চার্চ-সংগঠন গড়ে তোলেন। কিন্তু দৃষ্টবাদী প্রত্যয় অভিজ্ঞতা-সম্পৃক্ত ইহজগতের মধ্যে সীমিত ; জ্ঞানাতীত অলৌকিকতা অথবা বস্তুর অন্তরালে নিগূঢ় সত্তা কিংবা অজ্ঞেয়বাদে আস্থাশীল নয়। বিজ্ঞানই জ্ঞানের উৎস। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তাতেও তিনি কাজের মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্তের সমন্বয়ে বৈজ্ঞানিক বিধিবিধান গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু শেষাবধি তিনি এক প্রকার মানবপূজার পত্তন করেন। তার মধ্যে অবশ্য তিনি কোনও ধর্মবিশ্বাস সঞ্চার করেননি। কঁৎ-এর ইহলৌকিক উগ্র ভাবনাচিন্তা উত্তরকালে হিতবাদী মতাদর্শ থেকে শুরু করে মার্কসবাদী সমাজতত্ত্বকেও বিক্ষিপ্তভাবে প্রভাবিত করে।

দ্র. দৃষ্টবাদ ; হিতবাদ

কমিউন (Commune)

এক ধরনের সমিতি যেখানে সদস্যদের শ্রমের মাধ্যমে লব্ধ উৎপন্ন সামগ্রী এবং অন্যান্য সম্পদের মালিকানা সাধারণভাবে সকল সদস্যের সমান। প্রাচীন কাল থেকেই এই ধরনের সমিতি আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। হাল আমলে ব্রিটেনে রবার্ট ওয়েন এবং ফ্রান্সে ফ্রাঁসোয়া ফুরিয়ে সমিতির প্রত্যয়টিকে নতুনভাবে রূপায়িত করেন। ১৮৭১ খ্রি কমিউনার্ডরা গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে অবরুদ্ধ পারি নগরীতে স্বাধীন এক সরকার হিসেবে স্বল্পকালীন পারি কমিউন গঠন করেছিলেন। তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন যে শহরের অধিবাসীরা সেখানকার সর্ববিষয়ের সাধারণভাবে সমান মালিকানার অধিকারী, কারও কোনও অংশে মালিকানা কম কিংবা বেশি নয়। কমিউন সম্পর্কে মার্কসেরও ছিল অনুরূপ কল্পনা। রুশ বিপ্লবের পর সেখানে কয়েকটি কমিউন পরীক্ষামূলকভাবে গঠিত হয়েছিল। পরে সেগুলি যৌথ খামারে পরিণত হয়। বিপ্লবের পর চীনেও যৌথ কৃষি ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত কমিউন গঠিত হয়েছিল, যেগুলির অধিকাংশই পরে বিলুপ্ত হয়। তবে কমিউনের আদর্শে ইজরেলে শরণার্থীদের নিয়ে কিবুজ নামে এক ধরনের সমিতি গঠিত হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানা পরিহার করে সাধারণভাবে সব কিছুর সমান অধিকারের কমিউন ব্যবস্থায় নানারকম জটিলতা ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়।

কমিউনিজম (Communism)

শব্দটি বিবিধার্থে ব্যবহৃত হয়। মাধ্যম ও লক্ষ্যও বিভিন্ন জনের কাছে সব সময় সমান নয়। যে সমাজ ব্যবস্থায় সম্পত্তির মালিকানা হয় সর্বসাধারণের ; প্রতি ব্যক্তি তার প্রয়োজন অনুযায়ী সব কিছু পায় এবং তার ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করে ; এবংবিধ ব্যবস্থা বৈপ্লবিক আন্দোলন এবং ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন ব্যবস্থায় সর্বহারার একনায়কত্ব গড়ে ওঠে। সমগ্র এই ব্যবস্থার পিছনে ক্রিয়াশীল থাকে মার্কসীয় মতাদর্শ।

মার্কস উল্লেখ করেছেন যে আঠারো শতকের ত্রিশের দশকে পারিতে বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতিতে শব্দটির উদ্ভব হয়, যা দুটি ভিন্ন কিন্তু সম্পৃক্ত অর্থে ব্যবহৃত হত,

ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকদের বৈপ্লবিক আন্দোলন এবং তার মাধ্যমে বিশেষ এক সমাজব্যবস্থার পত্তন, যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না।

রবার্ট ওয়েনের অনুগামীরা ফরাসি communisme শব্দের অনুসরণে ইংল্যান্ডে ১৮৪০-এর দশকে শব্দটিকে ব্যবহারবহুল করেন। ফরাসি ভাষায় পুরানো গ্রামভিত্তিক সমাজ le commune নামে অভিহিত হত।

১৮৪৮ খ্রি মার্কস ও এঙ্গেলস **কমিউনিস্ট ইস্তাহার**[১] প্রকাশ করেন। ইংরেজ ও ফরাসি স্বপ্নবিলাসীদের ব্যবহৃত 'সোসালিজম' শব্দ থেকে বৈজ্ঞানিক সোসালিজম পৃথক করার উদ্দেশ্যে তাঁরা কমিউনিস্ট শব্দটি ব্যবহার করেন। তা হলেও শ্রমিক আন্দোলনে সোসালিজম ও কমিউনিজম শব্দ দুটি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও সমার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমটির ব্যবহারই বরং বেশি। এমনকী সোসাল ডেমোক্রেটিক শব্দেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু শব্দ দুটির মধ্যে কালক্রমে যথার্থ অর্থগত পার্থক্য প্রাধান্য পায়।

১৯১৭ খ্রি রুশ বিপ্লবের পর ১৯১৯ খ্রি মার্চ মাসে তৃতীয় (কমিউনিস্ট) আন্তর্জাতিক **(কমিন্টার্ন)** প্রতিষ্ঠার সময়ে অন্যান্য সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের সঙ্গে পার্থক্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট শব্দটি অগ্রাধিকার পায়। যেমন উনিশ শতকের মধ্যকালেও শব্দটি অন্যান্য সংস্কারবাদী সাংবিধানিক পরিবর্তনকামী সমাজতন্ত্রীদের থেকে ভিন্ন সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল।

দ্বিতীয় যে অর্থে শব্দটি প্রযুক্ত হয়— অর্থাৎ সমাজব্যবস্থা— সে সম্পর্কে মার্কসের অভিমত ছিল যে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। কমিউনিস্ট সমাজকে মার্কস দুটি স্তরে বিন্যস্ত করেন। প্রথম স্তরে যখন সমাজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সদ্য বেরিয়ে এসেছে তখন লোকে মজুরি পাবে ভোগ্য বস্তু কেনার জন্য (বিনিময়-ব্যবস্থা অনুসারে) এবং উচ্চতর স্তরে লোকে সমাজকে তাদের সাধ্যানুসারে দেবে এবং সামাজিক সাধারণ ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী নেবে। লেনিন তাঁর 'স্টেট অ্যান্ড রেভল্যুশন' গ্রন্থে স্তর দুটির সোসালিজম ও কমিউনিজম নামকরণ করেন। উচ্চতর কমিউনিস্ট স্তরে শ্রেণীহীন ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টনে সম্পত্তির মালিকানা হবে সর্বসাধারণের এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যথার্থ সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদিকা শক্তির পরিপুষ্টি তথা মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটবে।

সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং কমিউনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা মার্কসীয় মতানুসারে অবশ্যম্ভাবী। ফলে গড়ে ওঠে সর্বহারার একনায়কত্ব। পরিশেষে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি (wither away) ঘটে। সোসালিস্ট বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হল সর্বধরনের কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য।

দ্র. সমাজতন্ত্র

কমিউনিস্ট ইস্তাহার (Communist Manifesto)

১৮৪৮ খ্রি কমিউনিস্ট লিগের পক্ষ থেকে জার্মান ভাষায় মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত ইস্তাহার এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের মুখ্য দলিল।

প্রথম পরিচ্ছেদে মার্কসের ইতিহাসতত্ত্বের সারাংশে পুঁজিবাদী দেশে উৎপাদনী শক্তির ক্রমবিকাশের বিবরণসহ সামন্ততন্ত্রী যাবতীয় সম্পর্ক ও স্তরবিভাগের অবক্ষয়, সমস্ত দেশের জাতীয় সীমানা এবং প্রচলিত ব্যবসাবাণিজ্য, জীবন ও চেতনার বিলুপ্তি হয়ে যাবার বিবরণ আছে। তার অনুষঙ্গী পরিণতি হিসেবে বলা হয়েছে কীভাবে নগরাঞ্চলে সর্বহারার উত্থান ঘটে, যেটা একটি শ্রেণীতে সুসংবদ্ধ হয়ে একটি দলে সংগঠিত হচ্ছে। ইস্তাহারে সর্বহারা শ্রেণীর দুঃসহ জীবনকথাসূত্রে সর্বত্র ওই শ্রেণীর সঙ্গে কমিউনিস্ট দলের স্বার্থ সম্পর্কিত একাত্মতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে শ্রেণী সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত সম্পর্কের উপর কমিউনিস্টদের তত্ত্বগত অবস্থিতি নির্ভর করে।

ইস্তাহারের বাকি পরিচ্ছেদগুলিতে সর্বহারা শ্রেণীর অনুকূলে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রমের নানাবিধ পর্যালোচনা আছে। তার মধ্যে আলোচনায় যে বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে সেটা হল সমস্ত বুর্জোয়া সম্পত্তির বিলোপ সাধন; তার ভিত্তিতে কমিউনিস্টদের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান দানা বেঁধেছে। তত্ত্বটির যৌক্তিকতা এই যে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা থাকার ফলেই সর্বহারা শ্রেণী বিত্তহীন হয়ে পড়েছে এবং সর্বনিম্ন মজুরি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। কাজেই ব্যক্তিগত মালিকানার অবসানে তাদের শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই এবং সর্বজনের তথা সামাজিক মালিকানাতেই তাদের মঙ্গল। তা ছাড়া সর্বজনের মালিকানার ঐতিহাসিক প্রয়োজনও আছে; কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন শক্তির নিরন্তর বিকাশ যেন একটি অপ্রতিরোধ্য দৈত্যের সৃষ্টি করেছে, যেটা কালক্রমে পুঁজিবাদের সংকট ও ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠেছে।

ইস্তাহারে আর যেসব বিষয়ের অবসান চাওয়া হয়েছে সেগুলি হল বুর্জোয়া আইন ও শিক্ষা ব্যবস্থা, পরিবার, মোটা আয়কর, রাষ্ট্রায়ত্ত পুঁজি ও পরিবহণ ব্যবস্থা। ইস্তাহারে সমসাময়িক বিভিন্ন কাল্পনিক ও আবেগপ্রবণ তত্ত্বের সমাজতন্ত্রী বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা হয়েছে, কারণ সেগুলি ত্রুটিবহুল ও অবৈজ্ঞানিক। সর্বপ্রকার প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে বলপ্রয়োগ করে উচ্ছেদ ঘটানোর প্রস্তাব করা হয়েছে; পরিশেষে সারা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর কাছে ঐক্যের আহ্বান জানানো হয়েছে।

কমিউনিস্ট নৈতিকতা (Communist Morality)

মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী ধর্ম, রাজনীতি, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয় সামাজিক শ্রেণীসম্পর্ক ও উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিত্তির উপর গঠিত উপরিকাঠামোর অন্তর্গত। কিন্তু নতুন সমাজ অভিমুখে সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে কতকগুলি নৈতিক মান ও আদর্শ অনুসরণ করার কথা বলা হয়, যেগুলি কমিউনিস্টদের জয়যাত্রার পক্ষে অপরিহার্য। ১৯৬১ খ্রি অক্টোবর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি অব দ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বাবিংশ

কংগ্রেসে কিছু নৈতিক আচরণবিধি গৃহীত হয়। সংক্ষেপে সেগুলি হল: ১. প্রগতিবাদী সামাজিক শক্তি বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণী যে সব রীতিনীতি নির্ধারণ করে ; ২. নৈতিক উন্নতির জন্য সমাজতন্ত্রী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জিত সুফল সমূহ আচরণবিধিতে প্রতিফলিত হয় ; ৩. অধিকতর নৈতিক সুফল অর্জনের পথে অগ্রসর হবার জন্য চাই কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি সানুরাগ আত্মনিয়োগ ; সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি এবং অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশের প্রতি ভালবাসা ; সমাজের উন্নয়নে বিবেকসম্পন্ন দায়িত্ব পালন— যে মানুষ কাজ করে না সে মানুষ খাদ্যের অধিকারী নয় ; জনসম্পদ বৃদ্ধি ও রক্ষার জন্য প্রত্যেকের মমত্ববোধ ; জনস্বার্থে কর্তব্যবোধ ; অসহিষ্ণুতা জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর ; যৌথস্বার্থের মানসিকতা এবং সহকর্মীসুলভ (comradely) পারস্পরিক সাহচর্য ; একে সকলের তরে, সকলে একের তরে ; সৌহার্দপূর্ণ মানবিক সম্পর্ক এবং সকলের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন— মানুষের কাছে মানুষ বন্ধু, সহকর্মী (কমরেড) এবং ভাই ; সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে সততা, সত্যানুরাগ, নৈতিক পবিত্রতা ; শালীনতা ও মুক্তমানসিকতা ; পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানপ্রদর্শন এবং সন্তানসন্ততি পালনে নিষ্ঠা ; অবিচারের প্রতি আপসহীন মনোভাব ; পরান্নজীবিকা ও সুযোগসন্ধানে অনাসক্তি ; সারা দেশের সকলের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের মনোভাব ; জাতিবিদ্বেষ পরিহার ; কমিউনিজমের শত্রুদের প্রতি আপসহীন মনোভাব ; সকল জাতির শান্তি ও স্বাধীনতা কামনা ; সকল দেশের শ্রমজীবীদের সঙ্গে সুসংবদ্ধ মৈত্রীর বন্ধন।

দ্র. ভিত্তি ও উপরিকাঠামো

কমিউনিস্ট পার্টি (Communist Parties)

উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে মার্কস ও এঙ্গেলস কমিউনিজম শব্দটি ব্যবহার করেন। একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন হিসেবে কমিউনিস্ট লিগ গঠনসূত্রে তাঁরা **কমিউনিস্ট ইস্তাহার** (১৮৪৮) গ্রন্থে একটি দল অর্থে কমিউনিস্ট শব্দটির সূত্রপাত করেন। কার্যত কমিউনিস্ট শব্দটি ব্যাপক প্রচলন লাভ করে অক্টোবর বিপ্লবের পর। দ্বিতীয় **আন্তর্জাতিকে** বলশেভিকদের সঙ্গে অন্যান্য সোসাল ডেমোক্র্যাটদের শব্দটি নিয়ে তীব্র মতবিরোধের ফলে ১৯১৭ খ্রি থেকে রাশিয়ান সোসাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির নামের শেষে **বলশেভিক** কথাটি যুক্ত হয়েছিল। ১৯১৮ খ্রি মার্চ থেকে পার্টির নামকরণ হয় রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) এবং ১৯২৫ খ্রি ডিসেম্বর থেকে অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)। ১৯৫২ খ্রি যখন পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি অব দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে পরিবর্তিত হয় তখন বলশেভিক শব্দটি বাদ পড়ে।

১৯১৯ খ্রি মার্চ মাসে তৃতীয় (কমিউনিস্ট) আন্তর্জাতিক গঠিত হয়। সেই সময় থেকেই পশ্চিম ইউরোপের সোসাল ডেমোক্রেটিক দলগুলি ক্রমে কমিউনিস্ট নাম পরিগ্রহ করে। অন্যান্য দেশেও **কমিন্টার্নের** বিশ্ববিপ্লবের আন্দোলনের কর্মসূচির ভিত্তিতে ক্রমে ক্রমে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে।

১৯১৯ খ্রি অক্টোবর মাসে রাশিয়ার বাইরে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল

মেক্সিকোয় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যোগে। ওই বছর ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠার পক্ষকালের মধ্যে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির দুই প্রধান নেতা রোজা লুক্সেমবুর্গ ও কার্ল লিবনেক্ট সরকারি বাহিনীর হাতে নিহত হন। হাঙ্গেরিতে বেলা কুন-এর নেতৃত্বে পার্টি গঠিত হয়, একটি গুপ্ত দল হিসেবে। ১৯২০ খ্রি বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, ব্রিটেন, স্পেন, ফ্রান্স এবং তাসখন্দে মানবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে প্রবাসী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতালিতে গ্রামশির উদ্যোগে পার্টি গঠিত হয় (১৯২১)। একই বছরে চীনে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক চেন তু-সিউ এবং লি তা-চাও পার্টি-প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে পূর্ব ইউরোপের সব দেশেই প্রতিষ্ঠার অনতিকাল পরে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বেআইনি ঘোষিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর সেগুলি আইনগত অধিকার পায়। কমিন্টার্নের ২১ দফা শর্ত পূরণ সাপেক্ষ বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি তার সঙ্গে যুক্ত হবার অধিকার লাভ করত। লেনিনের পার্টি-সংক্রান্ত থিসিসের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। শর্তপূরণে সমর্থ না হওয়ায় কোনও কোনও দেশের পার্টির সদস্যপদ চলে যায়। কমিন্টার্নের অধিকাংশ দেশের সদস্য-পার্টিই ছিল সেদিন বেআইনি গুপ্তদল।

কমিন্টার্ন প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন অল্পবিস্তর তাৎপর্যপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। ইতালিতে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফ্রান্সের শ্রমিক আন্দোলনেও কমিউনিস্টদের ছিল প্রবল প্রভাব। কিন্তু ব্রিটেনে কমিউনিস্ট পার্টি একটি নগণ্য দল হিসেবে পরিগণিত হয়। ব্রিটিশ পার্টির নির্দেশে ভারতীয় কমিউনিস্টদের চিরকাল নীতি নির্ধারিত হত। দুটি যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে চেকোস্লোভাকিয়ায় পার্টি খুবই শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। ওই সময়ে বুলগেরিয়ায় কমিউনিস্টদের এক বিপ্লব-প্রয়াস ব্যর্থ হয়। স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু কমিউনিস্টরা সোভিয়েতের সাহায্যে বামপন্থী সরকারের সঙ্গে সবিশেষ সহায়তা করে। হাঙ্গেরিতে কুড়ির দশকে কমিউনিস্টরা কিছুকাল ক্ষমতাসীন হয়েছিল। লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪) পর কমিন্টার্নে স্তালিন ও ত্রৎস্কির বিরোধ এবং পরে স্তালিনের একচ্ছত্র ক্ষমতা ও উগ্র কর্মপন্থা বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনেও সঞ্চারিত হয়। সোসাল ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে বিরোধসূত্রে জার্মান কমিউনিস্টরা কুড়ির দশকে নাৎসিদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে (১৯২৮) লেনিনের যুক্তফ্রন্ট নীতি পরিত্যক্ত হয়। ভারতে জাতীয় কংগ্রেস সহ নেহরু-বসু-আয়েঙ্গারের নেতৃত্বে উদীয়মান বামপন্থী আন্দোলনকে নিন্দা জানানো এবং ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস পার্টি ভেঙে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয় ভারতীয় কমিউনিস্টদের। ত্রিশের দশকের গোড়ায় ইউরোপে ফ্যাসিবাদী শক্তি উত্তরোত্তর প্রবল হয়ে ওঠে ও কমিউনিস্ট নিধন শুরু করে। সপ্তম কংগ্রেসে (১৯৩৫) সচকিত কমিন্টার্ন তার পরিত্যক্ত যুক্তফ্রন্ট নীতি পুনর্গ্রহণ করে ; সোসাল ডেমোক্র্যাট ও অন্যান্য গণতন্ত্রীদের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থতার ফলে, জার্মানি কর্তৃক রুশদেশে অভিযানের পূর্বে ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে অগ্রগামী নাৎসিদের সঙ্গে কমিউনিস্টরা সখ্যতা স্থাপন করেছিল ; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক

দেশে জাপানি বাহিনীকে স্বাগত জানানো হয়। অচিরেই ইউরোপে কমিউনিস্টদের উপর খাঁড়া নেমে আসে। যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশে কমিউনিস্টরা তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যুদ্ধের পর সোভিয়েত সরকারের সহায়তায় পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্টরা ক্রমে ক্ষমতাসীন হয়। চীন, কোরিয়া, ইন্দোচীনেও কমিউনিস্ট বিপ্লব সফল হয়।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভূখণ্ডে কমিউনিস্ট শাসন কায়েম হয়। ক্রমে মার্কসীয় তত্ত্ব ও কমিউনিস্ট প্রশাসনের নানাবিধ অসঙ্গতি নিয়ে সারা বিশ্বে বিতর্ক ও বিভেদ দেখা দেয়। ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি যে সব দেশে পার্টি ছিল প্রবল, সেগুলিতে মতাদর্শের পরিবর্তন ও কমিউনিস্ট শব্দটিরও বর্জন দেখা দেয়। নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত দেশে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান এবং চীনে ব্যক্তিগত মালিকানায় বাজার অর্থনীতির প্রবর্তন বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (Communist Party of India)

১৯১৭ খ্রি রুশ বিপ্লবের পর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকে **লেনিন** তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করে ১৯১৯ খ্রি মার্চ মাসে তৃতীয় (কমিউনিস্ট) আন্তর্জাতিক সংক্ষেপে **কমিন্টার্ন** গঠন করেন। কমিন্টার্নের পরিচালনায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্প্রসারণের কর্মসূচি গৃহীত হয়। এর কিছুকাল আগে মেক্সিকোয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী **মানবেন্দ্রনাথ** রায় মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষিত হয়ে রুশ দেশের বাইরে প্রথম একটি কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লেনিনের আমন্ত্রণে মানবেন্দ্রনাথ নবগঠিত কমিন্টার্নের মস্কোয় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯২০) যোগদান করেন। উপনিবেশগুলিতে কমিউনিস্টদের ভূমিকা সম্পর্কে লেনিনের সঙ্গে বিতর্কে মানবেন্দ্রনাথের সম্পূরক থিসিসসমূহ কয়েকটি সংশোধনের পর গৃহীত হয়। অনতিকালের মধ্যে কিছু ভারতীয় বিপ্লবী ও খিলাফতিদের নিয়ে মানবেন্দ্রনাথ তাসখন্দে প্রবাসী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন (১৭ অক্টোবর ১৯২০); বার্লিনে পার্টির সদর দপ্তর খোলা হয়।

'ভ্যানগার্ড' নামক পত্রিকা ও চিঠিপত্র পাঠিয়ে এবং দূত মারফৎ মানবেন্দ্রনাথ ইউরোপ থেকে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে নতুন কর্মসূচির খসড়া প্রস্তাব ও ইস্তাহার পাঠানো ছিল তাঁর নিয়মিত একটি কাজ। ক্রমে বিভিন্ন সংগঠনের সাহায্যে কলকাতা (মজফ্‌ফর আহমেদ), বোম্বাই (ডাঙ্গে), মাদ্রাজ (সিঙ্গারভেলু), কানপুর (উসমানি) ও লাহোরে (গোলাম হুসেন) কমিউনিস্ট কেন্দ্র গড়ে ওঠে। পেশওয়ার ও কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করে। ১৯২৫ খ্রি কানপুরে সত্যভক্তের উদ্যোগে একটি আইনানুগ কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়, যার সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় কমিউনিস্টরা যুক্ত থাকলেও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না। পরে সত্যভক্তের সঙ্গে দলের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

কুড়ির দশকের শেষদিকে ভারতে কমিউনিস্টরা শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে

শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস পার্টি নামে গঠিত (১৯২৬) সংগঠনের অন্তরালে কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রকাশ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। অবৈধ ছিল বলে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ চলত গোপনে। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পরে জাতীয় কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তা ও স্বরাজ্য দলের নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচি অনুসরণের ফলে কংগ্রেসের সংগ্রামী সম্ভাবনা সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের মনে যে নৈরাশ্য দেখা দিয়েছিল ১৯২৭ খ্রি সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে বামপন্থী নেতৃত্বের উত্থান দেখে সেটা কেটে যায়। তিনি কমিউনিস্টদের কংগ্রেসে যোগ দিয়ে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের প্রভাবাধীন বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

১৯২৮ খ্রি ষষ্ঠ কংগ্রেসের সময় কমিন্টার্নের মধ্যে স্তালিনের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রবল এক গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব চলেছিল। শেষাবধি স্তালিনের অনুগামীরাই ক্ষমতা দখল করেন; এবং এযাবৎকাল লেনিন-অনুসৃত যুক্তফ্রন্ট নীতি পরিত্যাগ করে কমিন্টার্ন একটি উগ্র অতিবাম কর্মপন্থা গ্রহণ করে। সে সময়ে ইউরোপে ফ্যাসিবাদের বিস্তার ঘটে চলেছিল। স্তালিনপক্ষীয়রা বুখারিনের বিরুদ্ধে মানবেন্দ্রনাথকে নিজেদের দলে টানতে না পেরে মানবেন্দ্রনাথের প্রবন্ধাদি কমিন্টার্নের পত্রপত্রিকায় প্রকাশের সুযোগসুবিধা বন্ধ করে দেন। ফলে মানবেন্দ্রনাথ জার্মানিতে বিক্ষুব্ধ বিরোধী কমিউনিস্টদের পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন; বিক্ষুব্ধ পক্ষের পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার দায়ে কমিন্টার্ন থেকে তিনি বহিষ্কৃত হন (১৯২৯)। অতঃপর কমিন্টার্নের নির্দেশে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিও উগ্র অতিবাম কর্মসূচি গ্রহণ করে। শ্রমিক-কৃষক নেতৃত্বে অবিলম্বে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত হয়। কংগ্রেসের নেহরু-সুভাষ-আয়েঙ্গার প্রমুখ বামপন্থীদের বিরুদ্ধে তীব্র ও কটু ভাষায় সমালোচনা শুরু হয়। এর আগে ১৯২৯ খ্রি মার্চ মাসে সরকার ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস পার্টির ৩১ জন নেতা যাঁরা ছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুরোধা তাঁদের সহসা গ্রেপ্তার করে তাঁদের বিরুদ্ধে মিরাট ষড়যন্ত্র নামে এক মামলা রুজু করে। ত্রিশের দশকে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনকে কমিউনিস্টরা একটি বুর্জোয়া ক্রিয়াকৌশল বলে প্রচার করেন।

১৯৩৫ খ্রি কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসে বিশ্ব পরিস্থিতির দ্রুত অবনতিদৃষ্টে নিজেদের ভ্রান্তি উপলব্ধি করে পূর্বতন যুক্তফ্রন্ট নীতির পুনরাবর্তন ও উগ্র বামঘেঁষা নীতি পরিহার করা হয়। নতুন পপুলার ফ্রন্ট কর্মসূচি গ্রহণের ফলে ভারতীয় কমিউনিস্টরা অতঃপর **কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির** (সি এস পি) সমালোচনা বন্ধ করে ওই দলে যোগদান করেন এবং ওই দলের মধ্যে দিয়ে পরোক্ষে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন।

সি এস পি-র ছত্রছায়ে এবং এ আই টি ইউ সি, ভারতীয় কিষাণ সভা, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি শক্তি সঞ্চয় করে চলে। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধে জার্মানি কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হবার মাস ছয়েক পরে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধের ফ্যাসিবিরোধী স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে যুদ্ধের সমর্থনে নতুন নীতি গ্রহণ করে (১৯৪২)। সরকার অচিরে কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয়। যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর কংগ্রেস থেকে কমিউনিস্টদের বহিষ্কার করা হয়। ১৯৪৭ খ্রি ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার স্বরূপ নিয়ে পার্টির মধ্যে প্রবল মতদ্বৈধ ছিল।

১৯৪৮ খ্রি কলিকাতায় সি পি আই-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে পি সি যোশীর নরমপন্থী কর্মসূচি পরিহার করে বি টি রণদিভের নেতৃত্বাধীনে উগ্র অতিবাম কর্মসূচি গৃহীত হয়। অন্ধ্রের তেলেঙ্গানায় সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গে পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হয়, নেতারা কারারুদ্ধ হন। ১৯৫০ খ্রি মে মাসে অন্তর্দলীয় বিতর্কে রণদিভের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তীব্র হয়ে পড়ায় তাঁর পরিবর্তে সি রাজেশ্বর রাও সেক্রেটারি হন ও নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। রাজেশ্বর রাও-এর চীনপন্থী বিপ্লবের মডেল অনুযায়ী মধ্য বুর্জোয়া ও ধনী কৃষকদেরও বিপ্লবের যুক্তফ্রন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরিস্থিতি সশস্ত্র বিপ্লবের আদৌ অনুকূল নয় বলে ডাঙ্গে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁকে ব্রিটিশ নেতা রজনী পাম দত্ত সমর্থন করেন। ১৯৫১ খ্রি ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পার্টিতে মধ্যপন্থীরা শক্তিসম্পন্ন হন। অজয় ঘোষকে জেনারাল সেক্রেটারি করা হয়।

১৯৫৩ খ্রি মাদুরাইতে পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে নিয়মতান্ত্রিক ও সংসদীয় কর্মসূচি অনুসরণের সিদ্ধান্ত হয়। নেহরু সরকারকে সমর্থনের সুপারিশ আসে পাম দত্ত ও প্রাভদা পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় থেকে। ১৯৫৬ খ্রি পালঘাটে চতুর্থ কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ ও কার্যকলাপকে সমর্থন করা হবে। ১৯৫৭ খ্রি কেরলে প্রথম একটি কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয়। অমৃতসরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম পার্টি কংগ্রেসে জাতীয় কংগ্রেস দল পরিচালিত সরকার ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে যুগপৎ লড়াই চালানোর সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকে।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিনবাদের প্রভাব দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে এবং রুশ ও চীনের বন্ধুত্বে ফাটল ধরে। হাঙ্গেরির ঘটনা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে. ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বাম ও দক্ষিণ ঘেঁষা নেতৃবৃন্দ যথাক্রমে চীন ও রাশিয়ার প্রতি সমর্থন এবং মতাদর্শ, মৌলিক ক্রিয়াকৌশল ও কর্মসূচির পার্থক্যের ভিত্তিতে দুটি স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত হয়ে যান (১৯৬৪)। নবগঠিত সি পি আই (মার্কসবাদী) দল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের আহ্বান জানায়। পুরানো সি পি আই দল জাতীয় গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতেই আবদ্ধ থাকে। পুরানো দলকে নতুন সি পি আই (এম) দল শোধনবাদী বলে অভিযুক্ত করে।

১৯৬৪ খ্রি-এর পরও সি পি আই-তে একাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। একটি হল পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নেতা শ্রীপৎ অমৃত ডাঙ্গের অপসারণ এবং তাত্ত্বিক নেতা মোহিত সেনের বহিষ্কার। পার্টির মতাদর্শ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এন ই বলরামের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। ১৯৯২ খ্রি এপ্রিলে হায়দ্রাবাদে পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসের পূর্বেই জাতীয় পরিষদে কমিশনের সুপারিশগুলি নাকচ হয়ে যায়। গৃহীত প্রস্তাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পথনির্দেশ, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ইত্যাদি কর্মসূচির উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। পার্টির একটি অংশ সি পি আই (এম) দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। সে জন্য শেষোক্ত দলের সাধারণ সচিব হরকিষেণ সিং সুরজিৎকে অধিবেশনে ভাষণদানের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান হয়।

কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী) (Communist Party of India (M))

১৯৬৪ খ্রি জুন মাস অবধি নতুন সি পি আই (এম) ও পুরানো সি পি আই দলের পূর্বের ইতিহাস ছিল একই। জুলাই মাসে তেনালিতে নতুন দল আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়। পুরানো অবিভক্ত দলের বহু বিশিষ্ট নেতা নতুন দলে যোগদান করেন। তাঁদের পুরানো দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়। শতকরা ৩০ থেকে ৪০ জন অবিভক্ত দলের সদস্য নতুন দলে যোগ দেন। ওই সময় ত্রিচুরে এক ভাষণে ই এম এস নামবুদ্রিপাদ বলেন যে পুরানো নেতৃত্বে মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণী সমন্বয়ের আদর্শ রূপায়িত হচ্ছিল বলে দলে ভাঙন ধরে। ১৯৬৪ খ্রি অক্টোবর-নভেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সপ্তম কংগ্রেসে নতুন কোনও মতাদর্শগত প্রশ্ন না তুলে ১৯৬০ খ্রি মস্কোয় অনুষ্ঠিত বিশ্বের ৮১টি দেশের পার্টি সমূহের সম্মেলনে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য বজায় রাখার প্রশ্নে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মধ্যপন্থীদের বাম পক্ষে টানার প্রচেষ্টাকালে নামবুদ্রিপাদ পার্টির দক্ষিণপন্থীদের অতি বেশি চীনবিরোধী মনোভাবের নিন্দা করেন। কলকাতা কংগ্রেসেই (১৯৬৪) অবিভক্ত পার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলনে (১৯৫১) গৃহীত কর্মসূচি পালটে 'বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র ও সরকার'-এর অপসারণের উদ্দেশ্যে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ার নীতি গৃহীত হয়। স্থির হয়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদবিরোধী যে সব শক্তি আত্মপ্রকাশ করবে, কেবল তাদের নিয়েই ফ্রন্ট গড়া হবে। কর্মসূচি রচনার আগে বি টি রণদিভেকে আহ্বায়ক করে একটি কমিশন গঠিত হয়।

১৯৬৭ খ্রি সাধারণ নির্বাচনে সি পি আই (এম) দলের অংশ গ্রহণের ফলে দলের কট্টর বামপন্থীরা রুষ্ট হন। তাঁরা চেয়েছিলেন সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা দখল। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার (১৯৬৭) পর দার্জিলিং জেলার তিন জায়গায় ভূমিহীন কৃষকদের বিদ্রোহে সি পি আই (এম) সচকিত হয়ে ওঠে। পার্টির মধ্যে **নকশালপন্থী** নামে অভিহিত একটি সশস্ত্র বিপ্লবকামী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। কেরলেও ১৯৬৮ খ্রি নভেম্বরে কুন্নিকল নারায়ণন ও তাঁর কন্যা অজিথা উইনাদ পার্বত্য অঞ্চলে একটি বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ে তোলেন। উভয় রাজ্যেই মার্কসবাদীপ্রধান সরকার উগ্রপন্থীদের দমন এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় তৎপর হয়ে ওঠে।

১৯৬৯ খ্রি পার্টির বর্ধমান প্লেনামে মতাদর্শগত প্রথম দলিলে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হিসেবে সর্বহারার একনায়কত্বের আদর্শ তুলে ধরা হয়। পরবর্তী কংগ্রেসগুলিতে সে আদর্শ বজায় থাকে। ১৯৭২ খ্রি সামান্য সংশোধন ছাড়া দলের কর্মসূচির কোনও পরিবর্তন হয়নি। অবশ্য ১৯৭০-৭১ খ্রি তৃণমূল স্তরে মেহনতি মানুষের ফ্রন্ট গঠন এবং ১৯৭৫ খ্রি জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ভ্রষ্টাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগদানের কর্মসূচি গৃহীত হয়। ১৯৭৮ খ্রি ডিসেম্বরে হাওড়ায় সালকিয়ার প্লেনামে দলের সাংগঠনিক বিষয়াদি প্রাধান্য পায়। ১৯৮১ খ্রি বিজয়ওয়াদায় একাদশ পার্টি কংগ্রেস থেকে ১৯৮৫ খ্রি কলকাতায় দ্বাদশ কংগ্রেস পর্যন্ত পার্টির সদস্য সংখ্যা সারা দেশে প্রায় নব্বই হাজারে পৌঁছয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের আমূল পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ১৯৯২ খ্রি জানুয়ারিতে

পার্টির মাদ্রাজ কংগ্রেসে মূল কর্মসূচি পুনর্মূল্যায়নের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে।

১৯৯৫ খ্রি চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেস এই অভিমত প্রকাশ করে যে বিশ্বে কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব হিসাবে সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব যথারীতি বিদ্যমান ; মার্কসবাদ পূর্বের মতই প্রাসঙ্গিক রয়েছে ; প্রয়োগে পার্থক্য থাকতে পারে। জাতীয় ক্ষেত্রে (১) অর্থনৈতিক, (২) জাতীয় ঐক্য, (৩) বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও (৪) দুর্নীতিকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবক্ষয় স্বরূপ চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সমাবেশের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক শক্তি সমূহকে কোণঠাসা করা হবে। বি জে পি এবং কংগ্রেসের দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা এবং উভয় শক্তির বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক, পেটি বুর্জোয়া এবং একচেটিয়া নয় এমন বুর্জোয়া শ্রেণীর মৈত্রী গঠন করা কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অন্তর্বর্তীকালীন কৌশলগত স্লোগান থেকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে উত্তরণের কর্মসূচি অনুসরণ, যার চালিকাশক্তি হবে শ্রেণী সংগ্রাম।

দ্র. কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া ; জনগণতন্ত্র

কমিন্টার্ন (Comintern)

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সংক্ষিপ্ত নাম। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংগঠন ও পরিচালনা ও বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয়ের জন্য অক্টোবর বিপ্লবের পর রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ১৯১৯ খ্রি মার্চ মাসে মস্কোতে কমিন্টার্ন প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিকে তৃতীয় আন্তর্জাতিক বলা হয়। ১৮৬৪ খ্রি কার্ল মার্কসের নেতৃত্বে লন্ডনে প্রথম আন্তর্জাতিক নামে অভিহিত ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৭৬ খ্রি মার্কস সেটির অবলুপ্তি ঘটান। ১৮৮৯ খ্রি মার্কসের অনুগামিগণসহ বিভিন্ন দেশের সব ধরনের রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংগঠনকে নিয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গঠিত হয়। নিয়মতান্ত্রিক, নরমপন্থী ও বিপ্লববিরোধী দল ও শ্রমিক গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে একত্র কাজ করা সম্ভব নয় বুঝে লেনিনের নেতৃত্বে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা হয়। লক্ষ্য ও পথ সুচিহ্নিত ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকে পৃথকীকরণের সুবিধার্থে সেটির নামের সঙ্গে কমিউনিস্ট শব্দটি যুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ খ্রি মিত্রপক্ষের সঙ্গে সৌহার্দ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্তালিন তৃতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দেন।

দ্র. আন্তর্জাতিক

কর্তৃত্ববাদ (Authoritarianism)

যে মতবাদে জনগণের সম্মতি অপেক্ষা কোনও ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর কর্তৃত্বে সরকার পরিচালিত হয়। কর্তৃত্ববাদীরা মনে করেন যে তাঁদের মনোমত সুশৃঙ্খল পথে সরকার পরিচালিত হওয়া মঙ্গলজনক অথবা নিদেনপক্ষে প্রয়োজনীয়। দুটি বিশ্বাস

থেকে ধারণাটি গড়ে ওঠে : ১. লোকের কর্তৃত্বাধীন থাকাই কল্যাণকর, এবং ২. কর্তৃত্ব জনগণের সম্মতিসাপেক্ষ নয়, বরং বলা ভাল যে কর্তৃত্ব সম্মতির পূর্বশর্ত। আরও উগ্র কর্তৃত্ববাদীদের দৃষ্টিতে **রাষ্ট্রিক বাধ্যতার** যুক্তিসিদ্ধ কোনও উৎস নেই। সেজন্য অসন্তোষের প্রতিকার তথা রাষ্ট্রের সুস্থিতির জন্য কর্তৃত্ববাদের প্রয়োজন থাকে ; প্রচলিত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্যের তাগিদেও কর্তৃত্ববাদ অপরিহার্য বলে তাঁদের অভিমত। উল্লিখিত তাত্ত্বিক প্রত্যয় ছাড়াও অনেক সময়ে ক্ষমতাসীন কায়েমি শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর আচরণেও কর্তৃত্ববাদ ফুটে ওঠে।

কল্পরাষ্ট্র (Utopia)

প্রাচীন গ্রিস থেকে প্রত্যয়টি এসেছে। অর্থ হল কুত্রাপি নহে। তাই থেকে উদ্ভূত ইংরেজি ইউটোপিয়া কথার বাংলা প্রতিশব্দ। সার টমাস মোর 'ইউটোপিয়া' (১৫১৬) শব্দটি চয়ন করেন। তিনি এমন এক নিখুঁত সমাজব্যবস্থা কল্পনা করেছিলেন যেখানে হিংসা, নিপীড়ন অথবা সম্পত্তি বলে-কিছু থাকবে না ; তাঁর চিন্তায় এক আদর্শ সমাজের পূর্ণাঙ্গ কল্পচিত্র পাওয়া যায়। শব্দটি সেই থেকে চলে আসছে ; প্রত্যয়টির অন্যতম প্রবক্তা কার্ল ম্যানহাইম বর্তমান ঐতিহাসিক সামাজিক অবস্থার রূপান্তরে পরিবেশগত এক কাল্পনিক ভাবনা হিসেবে শব্দটি ব্যবহার করেন। অনুরূপ যে-কোনও চিত্র বোঝাবার সুবিধার্থে এবং সমালোচনার সময় এটি ব্যবহৃত হয় যখন আদর্শ মানবচরিত্র অঙ্কনে তার বিরূপ প্রকৃতিসমূহ বাদ থাকে।

প্রথম দিকের সমাজতন্ত্রী যেমন **ফুরিয়ে** ও **ওয়েনকে মার্কস** ও **এঙ্গেলস** কল্পনাবিলাসী আখ্যা দিয়ে সমালোচনা করেন এই বলে যে আদর্শ সমাজচিত্র কল্পনার সঙ্গে তার রূপায়ণের মধ্যে বাস্তব সঙ্গতি নেই। মার্কসীয় সমাজতন্ত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি করা হয়, তা ছাড়াও তাতে প্রকৃত সামাজিক অবস্থার সম্যক অবগতি এবং সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় রূপান্তরের প্রশ্ন যথোচিত গুরুত্ব পায়। মার্কসীয় দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্র হল ঐতিহাসিক বিবর্তনধারায় অনিবার্য, নিছক তত্ত্বালোচনামাত্র নয়। ভবিষ্যতের জন্য আদর্শ পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই, চাই বর্তমান অবস্থা ও তার অন্তর্নিহিত নানান প্রবণতার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। মার্কসীয় চিন্তাতেও অবশ্য রাষ্ট্রের অবলুপ্তির ভাবনা কল্পরাষ্ট্রের গোত্রে পড়ে।

কল্পরাষ্ট্র চিন্তার সমালোচনা শুধু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দিক থেকেই করা হয়নি ; বাস্তব রাজনীতি ও স্থিতাবস্থার পক্ষপাতী ও পরিবর্তনবিমুখ রক্ষণশীলেরাও তার সমধিক সমালোচনা করেন। কল্পরাষ্ট্র সমাজ নিখুঁত আদর্শ সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সচেতনভাবেই সমষ্টিবাদী। কল্পরাষ্ট্র ব্যবস্থার বিভিন্ন সমালোচনায় একথাও বলা হয় যে অশুভ পরিবেশ থেকে মুক্তি এবং আদর্শ সমাজের প্রতিষ্ঠাকল্পে এর সমর্থকেরা বিশ্বকে ক্রমান্বয়িতভাবে এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার জন্য উৎসাহ দান করেন। সঠিক দৃষ্টিতে 'কুত্রাপি নহে' হল কল্পরাষ্ট্রের তত্ত্বগত চরিত্র ; শিল্পসাহিত্যের জগতে এটি একটি মননক্রিয়া বিশেষ ; সমাজবিজ্ঞানে প্রযোজ্য নয় ; উদ্দেশ্য হল প্রশ্নসূচক ও সমালোচনাশীল চেতনাকে জাগিয়ে তোলা, রূপায়ণের জন্য সুস্পষ্ট কোনও নকশা তুলে ধরা নয়।

কল্যাণরাষ্ট্র (Welfare State)

যে রাষ্ট্র আইন ও প্রশাসনের মাধ্যমে অভাবগ্রস্ত অর্থাৎ রুগ্ণ, দরিদ্র, বার্ধক্য পীড়িত, পঙ্গু, দুস্থ প্রভৃতি ধরনের নাগরিকদের জীবনে প্রয়োজনীয় নানাবিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধিব্যবস্থা করে। প্রত্যয়টির উৎপত্তি ও সময় সম্পর্কে মতদ্বৈধ থাকলেও ১৯৪২ খ্রি ব্রিটেনের শ্রমমন্ত্রী লর্ড উইলিয়াম হেনরি বিভারিজের সামাজিক নিরাপত্তা ও অন্যান্য পরিষেবা সংক্রান্ত এক রিপোর্টে কল্যাণরাষ্ট্রের প্রসঙ্গ প্রথম দেখা যায়। জার্মানিতে উনিশ শতকের আশির দশকে বিসমার্ক কিছু সমাজকল্যাণমূলক আইন প্রবর্তন করেন; সেই নিদর্শনে ইউরোপে উনিশ শতকে আরও কয়েকটি দেশে পুয়োর ল ইত্যাদি আইন প্রচলন লাভ করে।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী উভয় প্রকার রাষ্ট্রেই জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, বেকারভাতা ও পেনসন বাবদ সরকারের অর্থ বরাদ্দ হতে শুরু করে। ওইসব বিধিব্যবস্থার বিরোধীদের বক্তব্য ছিল যে সরকারের সে সব ব্যয়নির্বাহ অবৈধ এবং তার জন্য অবৈধভাবে কর আরোপ করা হয় তাতে লোকের আত্মনির্ভরতার অভাব ও দারিদ্র্য বেড়েই চলে। সমাজকল্যাণে ব্যয়নির্বাহের বিকল্প হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে বেসরকারি বিমা ব্যবস্থারও সমালোচনা করা হয়। পক্ষান্তরে সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার সমর্থকেরা মনে করেন যে ওই খাতে সরকারি অর্থবরাদ্দ সামাজিক সুবিচার হিসেবে সরকারের একটি কর্তব্য।

কাজের অধিকার (Right to Work)

প্রত্যয়টি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমটি হল বাধাহীনভাবে জীবিকাকর্মে যোগ দেবার অধিকার; বাধা আসে ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালিত পিকেটিং, অবস্থান, বিক্ষোভ ইত্যাদির মাধ্যমে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও কোনও অঙ্গরাজ্যে ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে লোকের কাজের অধিকারে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। সভা, মিছিল, ধর্মঘট, হরতাল, বনধ্ ইত্যাদির ফলেও দোকানি, দিনমজুর, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি স্বনিয়োজিত মানুষের জীবিকার্জনের অধিকার ব্যাহত হয়।

প্রত্যয়টির দ্বিতীয় অর্থই হল প্রধান। তাতে সবাইকার জীবিকার্জনের জন্য কর্মপ্রাপ্তির অধিকারের কথা বলা হয়। প্রথম প্রত্যয়টির যেমন মর্ম হল স্বাধীনতা, দ্বিতীয়টির হল দাবি। ভারতীয় সংবিধানের ৩৯ (এ) এবং ৪১ ধারায় অধিকারটি সম্পর্কে নির্দেশদান (Directive Principles) করা হয়েছে। অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানেও কাজের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছিল, এবং ১৯৭৫ খ্রি হেলসিঙ্কি চুক্তি অনুসারে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিও অনুরূপ নীতি গ্রহণ করে। এ ধরনের অধিকারের অযৌক্তিকতার প্রসঙ্গে বলা হয় যে কর্মপ্রাপ্তির অধিকারকে একটি সর্বজনীন মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া কঠিন। কারণ অধিকারের সূত্রেই দায়দায়িত্বের প্রশ্ন ওঠে, যেটা এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সহজসাধ্য নয়। নিজের জীবন রক্ষার যদি অধিকার থাকে, তা হলে অপরের জীবন রক্ষার প্রশ্নকে মান্য করা আবশ্যক। কার্যত বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের অধিকারকে সর্বজনীনভাবে একটি দায়িত্ব হিসেবে মান্য করা সম্ভব নয়।

অতএব কাজের অধিকারকে রূপায়িত করার দায়দায়িত্ব হল রাষ্ট্রের। মার্কসীয় দৃষ্টিতে শ্রমের মাধ্যমেই মানুষের যথার্থ আত্মোপলব্ধি ও মনুষ্যত্বের পরিপূর্তি ঘটে। কাজের অধিকার এবং শ্রমের অধিকার একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে সর্বজনীন দায়দায়িত্বের অধিকার অর্জন করে।

কান্ট, ইমানুয়েল (১৭২৪-১৮০৪) (Kant, Immanuel)

জার্মান ভাববাদী দার্শনিক। দর্শনবিদ্যায় তাঁর বিপুল অবদানের মধ্যে রাষ্ট্রদর্শনেরও বেশ কিছুটা অংশ ছিল। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস। সরকার, সংবিধান ইত্যাদি বিষয় অপেক্ষা আইন, রাষ্ট্র, স্বাধীনতা অথবা মানবাধিকারের প্রত্যয় তাঁর চিন্তায় বেশি প্রাধান্য পায়। **রুসোর** প্রভাবে রাষ্ট্রের প্রত্যয় এবং **মঁতেসকিয়্য**-র প্রভাবে সরকারের প্রত্যয় দানা বাঁধে। কান্টের ভাববাদী উত্তরসাধক **হেগেল** রাষ্ট্রকে একচ্ছত্র আধিপত্যের অধিকার দেন। পক্ষান্তরে কান্ট ছিলেন উদারতন্ত্রের উদ্গাতা। তাঁর কাছে ব্যক্তিমানুষ ছিল লক্ষ্য, মাধ্যম নয়। তাঁর মতে মানুষ যুক্তিশীল এবং সাম্য ও স্বাধীনতা যুক্তিশীল মানুষের মৌল সত্তা। তিনি একদিকে চাইতেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, অন্যদিকে তিনি ছিলেন বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের বিরোধী। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারি বিধিব্যবস্থায় জোরালো সমর্থন থেকেই তাঁর গণতন্ত্রী ও উদারনৈতিক মনোভঙ্গি প্রকাশ পায়।

রুসোর বাস্তব তথা **গণ-অভীপ্সার** প্রভাব কান্টের রাষ্ট্রদর্শনে নৈতিক স্বাধীনতা হিসেবে মূলবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যয়টির প্রতিপাদ্য বিষয় হল যে মানুষের প্রকৃতি দ্বিবিধ: একদিকে তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ইচ্ছা ও অনুভূতি। অন্যদিকে অতীন্দ্রিয় সত্তা যেটা তার নৈতিক ও যুক্তিশীল আত্মবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং যেটা তাকে উচিতকর্মে প্রণোদিত করে। অতীন্দ্রিয় সত্তার ফলে মানুষ ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। সেই সূত্রেই মানুষ নৈতিক স্বাধীনতা পায়।

মূলত নৈতিক স্বাধীনতার প্রত্যয় ও মানুষের ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতির উপর কান্টের রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। রুসোর **সামাজিক চুক্তি** প্রত্যয়টিকে তিনি নিজের ভিন্ন দৃষ্টির প্রেক্ষাপটে গ্রহণ করেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষকে রাষ্ট্রের অনুগত করাকে তিনি পছন্দ করতেন না। তবে বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রের পরিবর্তনেও তাঁর সায় ছিল না। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করলেও রাষ্ট্রের কর্মপরিধিকে সীমিত রাখাই ছিল তাঁর অভিমত। নৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন ব্যক্তির নিজস্ব আবেগ ও কর্তব্যের বিষয়, রাষ্ট্রের নয়। সুন্দর জীবনের প্রতিবন্ধকতাকে অপসারণ করাই রাষ্ট্রের কাজ। লোকের নৈতিক স্বাধীনতায় কোনও রকম হস্তক্ষেপ করা রাষ্ট্রের পক্ষে অনুচিত। কান্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করতেন। ব্যক্তির অধিকার হল তার নৈতিক স্বাধীনতার অঙ্গ এবং অপরের অনুরূপ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গতিশীল। অপরের স্বাধীনতাকে কোনওভাবে ব্যাহত না করে ব্যক্তিমানুষ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। সম্পত্তির ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার অর্জিত, সহজাত নয়। অধিকারের সঙ্গে মানুষের অনেক দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে।

কান্টের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষের একটি যুক্তিশীল অভীপ্সা থাকে যেটা অন্যান্য আত্মসর্বস্ব ইচ্ছা, চাহিদা ও অনুভূতি থেকে স্বতন্ত্র। সেই যুক্তিশীল অভীপ্সাই মানুষের

প্রকৃত পরিচয়, যেটা মূলত নীতিসম্মত ও স্বাধীন এবং রাষ্ট্র ও তার আইনকানুনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। রাজনীতির সঙ্গে নৈতিকতার পরিমিশ্রণ ঘটিয়ে কান্ট রাষ্ট্র, আইন, অধিকার সম্পত্তি ইত্যাদির এক নবরূপায়ণ করেন। রাজনীতি, নৈতিকতা ও আইনকানুনের মূলে সত্যকে স্থাপন করাই ছিল তাঁর আদর্শ।

কান্টের রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে স্থায়ী শান্তির প্রত্যয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি মনে করতেন যে বিভিন্ন জাতি তথা রাষ্ট্র মানুষের মতই প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদবিরোধে লিপ্ত হয়। তাই প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য, **পুরসমাজের** মতো যেখানে ব্যক্তির অধিকার সুনিশ্চিত, অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি থাকা উচিত। কালক্রমে সব রাষ্ট্রেরই সেনাবাহিনী লুপ্ত হওয়া আবশ্যক। তাঁর দৃষ্টিতে সামরিক প্রস্তুতি ও সম্প্রসারণের কারণ হল বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক বাজার দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তারপর ঘটে উপনিবেশের অধিবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষ, শোষণ ও নিপীড়ন, দুর্ভিক্ষ, বিদ্রোহ ইত্যাদি। ফলে সারা বিশ্বে শান্তি বিঘ্নিত হয়। কান্ট মনে করতেন যুদ্ধবিগ্রহ নিবারণ ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রথমত সব দেশে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, এবং দ্বিতীয়ত স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহের সংঘবদ্ধতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইন প্রণীত হওয়া প্রয়োজন, নইলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়। তাই থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে তিন ধরনের শান্তিমূলক আইন চাই: ১. সাংবিধানিক বা রাজনৈতিক আইন; ২. আন্তর্জাতিক আইন এবং ৩. সর্বজনীন বিধিবিধান। বস্তুত উত্তরকালে কান্টের সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ** প্রতিষ্ঠায় প্রতিফলিত হয়।

দ্র. শান্তি

কামন্দকীয় নীতিসার (Kamandakiya Nitisar)

এটি একটি হিন্দু রাজনীতি গ্রন্থ। গ্রন্থটির রচনাকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আনুমানিক পঞ্চম খ্রি শেষদিকে অর্থাৎ ভারতে গুপ্তযুগের শেষ পর্যায়ে কামন্দক পণ্ডিত কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয় বলে অনেকের অভিমত। জয়সওয়াল মনে করতেন যে গুপ্ত আমলের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী শিখরস্বামী গ্রন্থটির রচয়িতা ছিলেন। কোনও কোনও প্রাচীন গ্রন্থে এই নীতিসারের উল্লেখ দেখা যায়। ছন্দে রচিত কামন্দকীয় নীতিসারের কয়েকটি পৃথক সংস্করণ আছে।

কৌটিল্যের **অর্থশাস্ত্র**, **শুক্রনীতিসার** ও কামন্দকীয় নীতিসার—এই তিনটি নীতিগ্রন্থের মধ্যে কামন্দকীয় নীতিসার অন্য দুটি অপেক্ষা ক্ষুদ্র; অন্যান্যগুলিতে রাজনীতি ছাড়াও অন্যান্য কথাও আছে; কিন্তু এটির বিশেষত্ব যে এতে কেবল রাজনীতির কথাই বেশি।

গ্রন্থের মোট কুড়িটি সর্গের প্রথমটির প্রারম্ভে বিষ্ণুগুপ্ত অর্থাৎ চাণক্যকে নমস্কার জানিয়ে বলা হয়েছে যে গ্রন্থটি সংক্ষেপে অর্থশাস্ত্রের অনুসরণে লিখিত। কামন্দকের এই নীতিসারে রাজার কর্তব্য ও অকর্তব্য বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে যথাবিহিত দণ্ডবিধান, যথোচিত রাজ্যশাসন, প্রজাদের মঙ্গলের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা ও বিষপ্রয়োগের প্রয়োজন দর্শিয়েছেন। গ্রন্থটিতে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হিসেবে ষোলো প্রকার সন্ধি, কী কী কারণে যুদ্ধ বিগ্রহের সূত্রপাত ঘটে, মন্ত্রীদের সঙ্গে

কার্যনির্বাহের কৌশল, উপযুক্ত গুণসম্পন্ন দূত ও গুপ্তচর নিয়োগ, যুদ্ধনীতি, শস্ত্রবিজ্ঞান, রথ-অশ্ব-নৌকা-হস্তী পরিচালনে এবং ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতা, শিবির স্থাপন, সৈন্যসমাবেশ এবং সতেরো প্রকার ব্যূহসজ্জা ইত্যাদির উপর অনুপুঙ্খ আলোচনা ও নির্দেশ আছে।

কুইসলিং, ভিদকুন (১৮৮৭-১৯৪৫) (Quisling, V.)

নরওয়ে-র ফ্যাসিবাদী নেতা ও ন্যাজোনাল সামলিং (জাতীয় ঐক্য) দলের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৩৩)। নাৎসি জার্মানির নরওয়ে আক্রমণে তিনি সহায়তা করেন (১৯৪০)। জার্মানি নরওয়ে দখল করে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করে (১৯৪০, ১৯৪২-৪৫)। যুদ্ধের পর দেশদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। রাজনৈতিক পরিভাষায় কুইসলিং শব্দটি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে পরিগণিত।

কুয়োমিনতাং (Kuomintang)

চীনের জাতীয়তাবাদী প্রধান রাজনৈতিক দল। গণতন্ত্র ও উদারনৈতিক সমাজতন্ত্রী আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৮৯১ খ্রি দলটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সান ইয়াত সেন (১৮৬৭-১৯২৫)। চীন তখন সামরিক অধিকর্তাদের শাসনাধীন। ১৯১১ ও ১৯১২ খ্রি কুয়োমিনতাং-এর নেতৃত্বে মার্শাল উয়ান শি-কাই-এর বিরুদ্ধে পরপর দু'বার বিদ্রোহের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। কুয়োমিনতাং-এর প্রভাব দক্ষিণ চীনে ক্যানটনকে কেন্দ্র করে সীমাবদ্ধ ছিল (১৯১৮-২১)। উত্তরাঞ্চল সামন্ততন্ত্রী ও সামরিক অধিকর্তাদের শাসনাধীনেই থাকে। কুড়ির দশকের দ্বিতীয়ার্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় (১৯২২-২৪) কুয়োমিনতাং নানকিঙ শহর অভিমুখে উত্তরাঞ্চলে সামরিক অভিযান চালায়। নেতৃত্ব দেন ১৯২৫ খ্রি সান ইয়াত সেনের স্থলাভিষিক্ত চিয়াং কাই-শেক। দলের ভিতরে বাম ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে বিরোধ তখন তুঙ্গে। কমিউনিস্টদের সঙ্গেও বিবাদ ঘটে। দক্ষিণপন্থীদের নেতৃত্বে কুয়োমিনতাং ১৯২৮ খ্রি অক্টোবর মাসে সরকার গঠনে সমর্থ হয়। ক্রমে ১৯৩০ খ্রি মধ্যে সমগ্র চীন তাদের শাসনাধীন হয়। ১৯৩১ খ্রি মে মাসে একটি সংবিধানও গৃহীত হয়। ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধে শুরু হয় চীনের ভূখণ্ডে আগ্রাসী জাপানি বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘসূত্রী সামরিক সংঘর্ষ। জাপানিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে কমিউনিস্টদের ঐক্য গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময় চীন ছিল মিত্রশক্তির অন্যতম। যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর কমিউনিস্টদের সঙ্গে কুয়োমিনতাং সরকারের বিরোধের ফলে তীব্র গৃহযুদ্ধ দেখা দেয় (১৯৪৬-৫০)। অভ্যন্তরীণ কলহ ও দুর্নীতিতে দীর্ণ কুয়োমিনতাং দল পরিচালিত সরকার মূল ভূখণ্ডে শাসনক্ষমতা হারিয়ে ১৯৫০ খ্রি ফরমোসা দ্বীপপুঞ্জে (তাইওয়ান) স্থানান্তরিত হয়। সেই স্থানেই তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় একচ্ছত্র শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে।

কূটনীতি (Diplomacy)

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থে সাহায্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক। কূটনীতির সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক নিবিড়। নিজ নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নতি ও অন্যান্য প্রয়োজনে প্রতিটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন করে। কূটনীতির মাধ্যমে সেই নীতি রূপায়িত হয়। প্রাচীন গ্রিসের বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিরাজ করত। প্রয়োজনে সেইসব নগররাষ্ট্রের মধ্যে দূত বিনিময় হত। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতেও দূত বিনিময়ের রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। পঞ্চদশ শতক থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রে দূতাবাস স্থাপন শুরু করে। কংগ্রেস অব ভিয়েনা চুক্তি অনুযায়ী পারস্পরিক আচরণ বিধি ও সুযোগসুবিধা-দানের নিয়মাবলি প্রবর্তিত হয়। কূটনৈতিক ধারায় প্রচলিত সুযোগসুবিধাগুলি হল দূতাবাসে ধর্মানুষ্ঠান পালনের অধিকার, স্থানীয় পুলিশের এখতিয়ারভুক্ত না হওয়া, স্থানীয় প্রশাসন ও করধার্যের আওতায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়া ইত্যাদির সুবিধা দূতাবাস সমূহ ভোগ করে। অবশ্য উক্ত কূটনৈতিক দায়মুক্তি সম্পর্কে বিতর্ক দেখা যায়।

দুটি দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগ ব্যতিরেকে বিবাদ ও বিরোধের মীমাংসাই হল কূটনীতির প্রধান কাজ। আন্তর্জাতিক সালিশি নিয়মিত প্রযুক্ত হলে কূটনীতির দায়দায়িত্ব হ্রাস পায়। অপর রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণে প্রবৃত্ত করা কূটনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বর্তমান কালে নানা ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সাহায্যে এবং রাষ্ট্রনায়কেরা স্বয়ং মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে কূটনীতির কার্যনির্বাহ করেন।

কে জি বি

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সংক্ষিপ্ত নাম। রুশ ভাষায় তার পুরো নাম হল কমিতেত গসুদার্স্‌ৎভেনয় বেজপাসনস্তি (ইংরেজিতে কমিটি ফর স্টেট সিকিউরিটি)। ১৯৫৪ খ্রি গঠিত এই সংস্থার কর্মপরিধি একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক। রাজনৈতিক নিরাপত্তা বিধান ও পুলিশের কাজ সম্পন্ন করা এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় খোঁজখবর সংগ্রহ করা সংস্থাটির অন্যতম দায়িত্ব। প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্ববিধ রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহ, সোভিয়েত দেশের রাজনৈতিক নেতাদের নিরাপত্তা বিধান, অভ্যন্তরীণ বিশেষ নিরাপত্তা ফৌজের ব্যবহার, আন্তর্জাতিক সীমানায় সেনাবাহিনীর উপর নজর রাখা, রাষ্ট্র ও সমর বিভাগের গোপনীয় বিষয়াদি সংরক্ষণ করা, রাজদ্রোহ ও অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকর্ম দমন করা, বিভিন্ন দেশে পাতা গুপ্তচরদের জাল পরিচালনা। সেনসরজনিত ক্রিয়াকর্মের তত্ত্বাবধান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশি পর্যটক এবং প্রবাসে দেশের নাগরিকদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এই সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ।

যে বিবর্তনের ধারায় কে জি বি তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে তার উৎপত্তি ঘটে ১৯১৭ খ্রি বলশেভিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর। প্রারম্ভে সংক্ষিপ্ত নাম ছিল তার 'চেকা'। রাজদ্রোহী ও প্রতিবিপ্লবীদের দেশের শত্রু হিসেবে গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড ও

মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ছাড়াও গোয়েন্দাকর্ম ছিল তার মূল দায়িত্ব। ১৯২২ খ্রি চেকার স্থলাভিষিক্ত হয় ওগপু নামে অনুরূপ এক সংস্থা। তার উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে শ্রমশিবির পরিচালনা এবং কিছু বিচার বিভাগীয় কাজ ন্যস্ত হয়। যৌথ খামার গঠনে কৃষকদের প্রবৃত্ত করা, কুলাকদের দেশান্তরে পাঠানো এবং মেনশেভিকদের গণআদালতে বিচার ইত্যাদি দায়িত্বও এসে পড়ে। ওগপুর হাতে সশস্ত্র বাহিনী, বিমান, ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য যুদ্ধের সরঞ্জাম দেওয়া হয়। ১৯৩৪ খ্রি ওগপুর স্থান নেয় নবগঠিত এন কে ভি ডি নামে এক সংস্থা। ১৯৪৩ খ্রি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সংস্থাটি পৃথক করে গঠিত হয় এন কে জি বি নামে। সেটিও ১৯৪৬ খ্রি থেকে এম ভি ডি এবং এম জি বি নামে যথাক্রমে অভ্যন্তরীণ বিষয় ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব সমন্বিত দুটি মন্ত্রকের অধীনে চলে যায়। স্তালিনের মৃত্যুর পর ওই দুটির সমন্বয়ে কে জি বি গঠিত হয়। বিশ্বের বৃহত্তম গুপ্ত পুলিশ ও গুপ্তচর সংগঠন হিসেবে কে জি বি সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক জীবনে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। নব্বইয়ের দশকে অবলুপ্তির পূর্বে কে জি বি কমিউনিস্ট পার্টির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চালিত হত।

দ্র. সি আই এ

কেমাল আতাতুর্ক (১৮৮০-১৯৩৮) (Kemal Ataturk)

আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা। তরুণ তুর্কি বিপ্লবের (১৯০৮) সময় তিনি একজন সেনানায়ক ছিলেন। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় ঘটলে তিনি ন্যাশনালিস্ট পার্টি গঠন এবং সেনাবাহিনীর সাহায্যে গ্রিক ও অন্যান্য বিদেশি শক্তিকে পরাভূত করে তুরস্কের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন (১৯২১-২২)। তুরস্কে সুলতানি শাসন ও মুসলিম ধর্মের প্রতিভূ খলিফার পদ লুপ্ত করে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। বার চারেক তুরস্কের একনায়কতন্ত্রী প্রেসিডেন্ট (১৯২৩-৩৮) ছিলেন ; সেই সময়ে তিনি তুরস্ককে পাশ্চাত্য ধারায় একটি আধুনিক সেকিউলার রাষ্ট্রে পরিণত করেন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের যাবতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে তিনি ইসলাম ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করেন। শরিয়তি দণ্ডবিধির পরিবর্তে সুইস বেসামরিক ও ইতালীয় দণ্ডবিধি প্রবর্তিত হয়। পোশাক-পরিচ্ছদ, বিবাহবিধি ইত্যাদি ইসলামি রীতিনীতির আমূল পরিবর্তন এবং আধুনিকতা ও সেকিউলারিজমের গোড়াপত্তন তাঁর প্রধান কীর্তি। তুর্কি ভাষার লিপি হিসেবে আরবি লিপির পরিবর্তে রোমান বর্ণমালা তিনি প্রবর্তন করেন। ক্রমবর্ধিষ্ণু জাতীয় একাত্মভাব বজায় রেখে কেমাল ইসলামি সংস্কৃতির পরিবর্তে পাশ্চাত্যের আধুনিক মানসিকতা দেশবাসীর মনে সঞ্চারিত করেন। তাঁর অনুসৃত বিধিব্যবস্থা কেমালবাদ নামে পরিচিত।

ক্ষমতা (Power)

ঈপ্সিত যে-কোনও কিছু বিনা বাধায় অথবা বাধার মধ্য দিয়ে অর্জনের সামর্থ হল ক্ষমতা। ক্ষমতার তারতম্য থাকে। খেতাব হিসেবে কিংবা প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ক্ষমতা প্রদত্ত হয় ; সীমিতভাবে অথবা ভাগাভাগি করে কিংবা সম্মতিক্রমে অথবা

বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন সম্ভব। প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটে।

কর্তৃত্ব, **বৈধতা**, **অধিকার** ইত্যাদি সমার্থক শব্দ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষমতা প্রত্যয়টি হল রাজনীতির যথার্থ সারবস্তু ; এ বিষয়ে অনেক তত্ত্ব আছে, তার মুখ্য উপজীব্য হল ক্ষমতার রূপান্তর, সীমিতকরণ ও লোকের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলা।

ক্ষমতার প্রকারভেদ আছে। অর্থনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করা যায় ; ক্ষমতা যদি রাজনৈতিক হয়, তা হলে তার সাহায্যে আইন প্রস্তুতির কাজকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ; ক্ষমতা ব্যক্তিগত হলে সব কাজেই লোককে লাগানো চলে। কারও কারও বিশেষ করে মার্কসীয় দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক ক্ষমতাই হল প্রধান। অনেকের মতে সব ক্ষমতাই কার্যত একই ক্ষমতার রূপভেদ মাত্র।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ক্ষমতার সঙ্গে কর্তৃত্বের অধিকার হল বড় প্রশ্ন। সাধারণত ক্ষমতার সঙ্গে অধিকারের প্রত্যয়কে মিশিয়ে ফেলা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ হল জনজীবন থেকে সেইসব ক্ষমতা অপসারণের ইঙ্গিত দেওয়া যার পিছনে জনসমর্থনপুষ্ট অধিকার থাকে না। জনগণ নগ্ন ক্ষমতালিপ্সাকে প্রশ্রয় দেয় না। যদি মনে হয় যে কর্তৃত্বের অধিকার অর্জনই আসলে প্রয়োজন, তা হলে সেটাও ক্ষমতালিপ্সার মত দেখাবে।

ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Power)

অধিকারভুক্ত ক্ষমতা ক্রমনিম্নবর্তী ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে ন্যস্ত করা, যিনি বা যাঁরা সেই ক্ষমতা লাভ করেন তাঁরা আদেশক্রমে প্রয়োগ শুধু নয় ঊর্ধ্বতনের অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিভূ হিসেবে কার্যনির্বাহ এবং তাঁর হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও ক্ষমতা অর্জন করেন। অর্পিত ক্ষমতা ও অধিকারপ্রাপ্ত যিনি হন তিনি ঊর্ধ্বতনের নির্দেশ অথবা মতাদর্শ অনুযায়ী চলেন অর্পিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং প্রতিনিধি সমার্থক নয়। ক্ষমতা অর্পণের ভাল নিদর্শন হল সামরিক কিংবা পুলিশের প্রশাসনে ঊর্ধ্বস্থানীয় আধিকারিকের ক্ষমতা ক্রমনিম্ন স্তরে বিন্যস্ত হয়।

দ্র. বিকেন্দ্রীকরণ

ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ (Separation of Power)

সরকার তথা রাষ্ট্রের কার্যধারা বিধানিক (legislative), নির্বাহী (executive) এবং বিচারবিভাগের (judiciary) মধ্যে বিভক্ত রাখার নীতি রাষ্ট্রব্যবস্থার বিবর্তনক্রমে গৃহীত হয়েছে। স্বতন্ত্রীকরণের তত্ত্ব আরিস্তোতলের চিন্তায় নিহিত ছিল ; সেটিকে পৃথক আকারে স্পষ্ট করে তোলেন হ্যারিংটন ও লক ; কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিতে তত্ত্বগত বিষয় হিসেবে এটি দানা বাঁধে ফরাসি দার্শনিক **মঁতেসকিয়্যর** লেখায় তার আগে ব্রিটেনের জনগণের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে সেখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি স্বীকৃতি পেয়েছিল। অবশ্য লক পররাষ্ট্রনীতি ও সামরিক বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগের প্রস্তাবনা করেন ; সেটাকে মঁতেসকিয়্য নির্বাহী বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি

ক

প্রত্যক্ষ করেন যে স্বেচ্ছাচারী রাজা বা শাসক যাবতীয় ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করে রাখেন ; বিশেষ করে স্বেচ্ছাচারী শাসক কোনও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থাকে বরদাস্ত করে না, যে-ব্যবস্থা তার প্রতিটি বিতর্কমূলক ক্রিয়াকলাপে বাধা সৃষ্টি করে। স্বৈরতন্ত্রী রাজত্বে ক্ষমতার কাঠামোয় এমন কোনও ব্যবস্থা থাকে না যা দিয়ে ক্ষমতার রাস টেনে ধরা যায়, স্বভাবতই তাতে স্বাধীনতার কোনও নিশ্চয়তা থাকে না। ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখার জন্য মঁতেসকিয়্য উল্লিখিত তিন ভাগে ক্ষমতার পৃথকীকরণের মাধ্যমে সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক ভারসাম্য বজায়ের প্রয়াসী হন। তদনুযায়ী বিধানসভার সদস্যরা নির্বাহী কাজে অংশ নিতে পারবেন না। অবশ্য রাজা থাকলে তিনি কেবল পারবেন, যদি বেআইনি কাজের দরুন তাঁর বিরুদ্ধে **মহাভিযোগ** (impeachment) দায়ের করা যায়। এই ব্যতিক্রম রাখা হয়েছিল সদ্যসৃষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে প্রেসিডেন্টের একচ্ছত্র ক্ষমতার দিকে তাকিয়ে।

ব্রিটেনে নির্বাহী ক্ষমতা ক্যাবিনেট অর্থাৎ মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত থাকে, পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্য হতে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। পার্লামেন্ট মন্ত্রিসভা নিয়ন্ত্রণ করে। ঠিক তেমনি বিচারব্যবস্থায় সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হাউস অব লর্ডস বিধানিক সংস্থার অঙ্গ ; স্বভাবতই বিচারকেরা বিধানিক কাজে প্রভাব বিস্তার করেন। সেটা যাতে না ঘটে তার জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা আছে। মঁতেসকিয়্যর আদর্শের সঙ্গে ব্রিটেনের সাংবিধানিক ধারার পুরোপুরি সামঞ্জস্য নেই ; স্বাধীনতার প্রশ্নও তাই অংশত সংকুচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ পূর্ণাঙ্গ নয় ; তাতে অবশ্য সরকারের ত্রিবিধ কর্মক্ষেত্রের মধ্যে একটা ঐক্য আছে। ঐক্য না থাকলে সরকার চালানোও কঠিন হত।

খ

খাকসার আন্দোলন (Khaksar Movement)

অমৃতসরের অধিবাসী ইনায়াতুল্লাহ্ খাঁ (১৮৮৮-১৯৬৩) ইসলাম ধর্ম ও তার আদি ঐতিহ্যের আদর্শে খাকসার দল গঠন করেন (১৯৩১)। খাকসার কথাটি পারসি ভাষা থেকে গৃহীত। অর্থ (খাক + সার) মাটির ধূলা। 'খাক'-এর অর্থ ধূলা এবং 'সার' মানে জীবন। যিনি খাকসার হবেন তাঁকে মাটির ধূলার মতো বিনয়নম্র হতে হবে। আন্দোলনের মূল আদর্শ হল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ ও প্রাণীর সেবা এবং ব্যক্তিপূজার বিরোধিতা। ভারতে ইসলামের প্রাধান্য স্থাপনই ছিল দলের উদ্দেশ্য। আধ্যাত্মিক আদর্শের সঙ্গে সামরিক ভাবভঙ্গি থাকলেও সেবা ও ভ্রাতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপের দরুন এই মতবাদে ধর্মান্ধতা ও জাতিবিদ্বেষ স্থান পায়নি।

জাতীয় কংগ্রেস কিংবা মুসলিম লিগের প্রতি অথবা হিজরত ও খিলাফত আন্দোলনের দিকে ইনায়াতুল্লাহ আকৃষ্ট হননি। ইসলাম ধর্ম আরবদেশে প্রবর্তিত হবার পর সেখানকার প্রথম আমলের মুসলমান সমাজজীবনে তাঁকে প্রভাবিত করে। অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি ইসলাম যথোচিত উদার, এই মনোভাব নিয়ে তিনি ভারতে মুসলমান শাসন ও কোরান ব্যাখ্যা করেন। বিপুল বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ইনায়াতুল্লাহ কোরানের মূল বিষয়কে নিয়ে উর্দু ভাষায় গদ্যে 'তাজকেরা' (১৯২৪) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার জন্য কায়রোর জামেউল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'আল্লামা মশরেকি' অর্থাৎ প্রাচ্যের বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রদান করেন। তিনি মনে করতেন যে ভারতবর্ষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও গোঁড়া মোল্লা ও মৌলবীরা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করে মুসলমান সমাজকে অকর্মণ্য করে রেখেছে। ফলে ভারতের মৌলবীরা ফতোয়া জারি করে তাঁকে কাফের বলে নিন্দা করেন। তাঁর মতে ইসলাম ধর্ম হল সৈনিকের ধর্ম এবং মুসলমানেরা যদি ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে প্রমাণিত করতে চায় তা হলে তাদের কর্তব্য হবে সৈনিকের জীবন যাপন করা ; তা হলে হজরত মহম্মদের নির্দেশ সামনে রেখে ভারত তথা সারা পৃথিবীতে

মুসলমানেরা পুনরায় আধিপত্য স্থাপন করতে পারবে।

ইনায়াতুল্লাহ একথা উপলব্ধি করেন যে, ভারতের মতো দেশে খাকসার আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে কতকগুলি কর্মপন্থার উপর, যেমন ১. অমুসলমানদের ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি যথোচিত মর্যাদা প্রদর্শন, ২. তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা এবং ৩. বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সহনশীলতা রক্ষা করা। ১৯৩৭ খ্রি ইনায়াতুল্লাহ চোদ্দ দফা এক কর্মসূচি প্রচার করেন। সেগুলির মধ্যে বিভিন্ন নির্দেশের মধ্যে অন্যতম ছিল মৌলবীতন্ত্রের পরিবর্তে ইসলামের বিধিবিধানের প্রবর্তন, প্রতি ধর্মের অধিকার বজায় রাখা, জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপন, ব্যবসায়ীদের পারস্পরিক সহযোগিতা, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মুসলমান সমাজের ভিতর ভেদাভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী নেতা, সম্পাদক, সাংবাদিক ও অনুরূপ অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতিরোধ করা ইত্যাদি। ইংরেজদের তিনি ভারতের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধকরূপে দেখেননি, সেজন্যে জাতীয় স্বাধীনতার কোনও আন্দোলনে যোগ দেননি। অবশ্য তিনি একথা মনে করতেন যে খাকসারদের বিশ্বে আধিপত্য স্থাপনের অন্তরায় হল ব্রিটেন। সে হিসেবে ইংরেজরা খাকসারদের রাজনৈতিক শত্রু। তিনি কমিউনিজমের সমর্থক না হলেও বিরোধী ছিলেন না। তবে সাধারণ খাকসাররা নাৎসিদের গুণগ্রাহী ছিল।

ইনায়াতুল্লাহ ছিলেন খাকসার আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক ; প্রদেশগুলিতে কেন্দ্রের অধীনে প্রাদেশিক নেতারা ছিলেন কর্তা। তদধীনে থাকত জেলা শাখা। খাকসারদের শ্রেণীবিভাগ ও কর্মবিভাগ ছিল। পরিধানে সামরিক পোষাক, মাথায় রঙিন রুমাল এবং শক্তির প্রতীক হিসেবে সবাইকে বেলচা বহন করতে হত। মুসলমান খাকসারদের নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক এবং হিন্দু খাকসারদের মন্দিরে গীতাপাঠ ও উপাসনা হত। লাহোরে ছিল সদর দপ্তর।

খাকসার দল ক্রমে ২৫০০ শাখায় শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং সারা ভারতে বিস্তৃত হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রে সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ বৃদ্ধি পায়। সরকারের কাছে স্বীকৃতি হিসেবে নানারকম দাবিদাওয়া উত্থাপন করা হয়। উত্তর প্রদেশ, সিন্ধু ও পঞ্জাবে খাকসারদের প্রতাপ বেশি থাকায় প্রাদেশিক সরকারগুলিও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। ত্রিশের দশকের শেষদিকে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস সরকার সেবামূলক কাজের জন্য খাকসারদের প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে। উত্তরপ্রদেশে শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের দীর্ঘকালের বিরোধ ও হিংসাত্মক সংঘর্ষ নিবারণের জন্য খাকসারেরা হস্তক্ষেপ করায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। সরকারের সঙ্গেও খাকসারদের বিরোধ শুরু হয়। লখনৌতে ইনায়াতুল্লাহ গ্রেপ্তার হন। সারা প্রদেশে খাকসারদের সরকার-বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম লিগ খাকসার সমস্যা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। ইনায়াতুল্লাহ লিগকে প্রশ্রয় দেননি। নিঃশর্তে মুক্তির পর তিনি দিল্লি চলে যান। অচিরে পঞ্জাবে খাকসাররা লিগ সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রাদেশিক সরকার খাকসার দলকে নিষিদ্ধ করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুতেও খাকসার দলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। বহু খাকসার নিহত ও কারারুদ্ধ হন।

১৯৪১ খ্রি খাকসারেরা গোপন বিদ্রোহের আয়োজন করে। কেন্দ্রীয় সরকার

তাদের বেআইনী ঘোষণা করে। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময় ইনায়াতুল্লাহ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব করেন। তখন তিনি পুনরায় কারাগারে আবদ্ধ হন। তিনি অনশন শুরু করেন, পরে বেলচাসহ সামরিক কুচকাওয়াজের রীতি পরিহারের শর্তে তিনি মুক্তি পান (১৯৪২)। কংগ্রেস ও লিগ ইনায়াতুল্লাহকে তাদের দলে যোগ দেবার আহ্বান জানায়। কিন্তু তিনি গান্ধী নীতির প্রতি যেমন বিরূপ ছিলেন, তেমনি জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বকে সমর্থন করতেন না। যুদ্ধের সময়ে তিনি কোনওভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিব্রত করার বিরোধী ছিলেন; সাম্প্রদায়িক বিভেদমুক্ত ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারত গঠনে সচেষ্ট হন। গান্ধী ও জিন্নার কাছে তিনি ঐক্যের আবেদন জানান। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষে (১৯৪৩) খাকসারেরা সেবামূলক কাজে অংশ নেয়। ১৯৪৬ খ্রি সাধারণ নির্বাচনে মুসলমান আসনে কোনও প্রদেশেই খাকসার দল সফল হয়নি। মুসলিম লিগ প্রার্থীরা জয়ী হন। খাকসার দল মুসলমান সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দল ক্রমে অবলুপ্ত হয়ে যায়। দেশবিভাগের পর ইনায়াতুল্লাহ ও অন্যান্য খাকসার নেতারা পাকিস্তানে থেকে যান। কিন্তু শাসকদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল না। তিনি পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির বিরোধী ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রি তিনি বহুসংখ্যক সমর্থক নিয়ে কাশ্মীরের মুক্তির জন্য এক অভিযানে যুক্ত হন; পরে অভিযানের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।

খিলাফত আন্দোলন (Khilafat Movement)

খলিফা শব্দ থেকে উৎপন্ন। শব্দটির অর্থ উত্তরাধিকারী; হজরত মহম্মদের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার যে-সংস্থার প্রতিভূর উপর বিভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমে বর্তিয়েছিল সেই সংস্থার নাম খিলাফত। মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের প্রধান হিসাবে খলিফার নানান কর্তব্যের মধ্যে ধর্মরক্ষা, আইন নির্দেশ ও বিচার, শান্তিরক্ষা, শাস্তিবিধান, রাষ্ট্ররক্ষা, জিহাদ, লুণ্ঠিত দ্রব্য বিতরণ, সৈন্যদের বেতন ও পুরস্কার প্রদান, রাজকর্মে নিয়োগ ও রাষ্ট্রকার্যে অংশগ্রহণ ছিল প্রধান। পোপের মতো খলিফার কোনও আধ্যাত্মিক অধিকার ছিল না। বিভিন্ন সময় ও স্থানে উম্মেয়দ, আব্বাসিদ, অটোম্যান প্রভৃতি রাজবংশের অধিকারে খিলাফত পরিচালিত হয়।

প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের কালে খিলাফত আন্দোলন সবচেয়ে বড় ধর্মীয় পুনর্জাগরণের জোয়ার সৃষ্টি করে ও ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন যোগায়। এর পশ্চাৎপট ছিল তুরস্কের অটোম্যান বংশের সুলতান যিনি খলিফা হিসেবে ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগের উৎস ছিলেন, তাঁর ক্রমিক অবমাননা ও অবলুপ্তি।

১৯১১-১২ খ্রি তুরস্কের সঙ্গে ইতালির যুদ্ধ এবং ১৯১২-১৩ খ্রি তুরস্কের বিরুদ্ধে দুটি বলকান যুদ্ধের সময় ভারতীয় মুসলিম সমাজে বিরাট চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ১৯১৪-১৮ খ্রি প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধে তুরস্ক ইংরেজদের বিরুদ্ধে জার্মানির পক্ষে ছিল। তুরস্ক ও জার্মানির পক্ষকে সমর্থনের জন্য যুদ্ধের সময় সৌকত আলি ও মহম্মদ আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে ভারত সরকার অন্তরিন করে। যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর মিত্রপক্ষ যখন অটোম্যান তুরস্কের ক্ষমতা খর্ব করে, তখন ভারতীয় মুসলিম সমাজে প্রবল অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় মুসলিম সমাজ ও সেনানীদের সমর্থন অর্জনের জন্য ইংরেজ সরকার তুরস্ক সাম্রাজ্য সম্পর্কে যেসব প্রতিশ্রুতি দেয় সেগুলি যুদ্ধের পর

রক্ষা করা হয়নি বলে মুসলিম নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন।

১৯১৯ খ্রি সেপ্টেম্বরে জাতীয় স্তরে একটি খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। ২৭ অক্টোবর তারিখটি সারা দেশে খিলাফত দিবস হিসেবে পালিত হয়। আবুল কালাম আজাদ, ফজলুল হক, আক্রাম খাঁ, লখনৌ-এর উলেমারা ও দেওবন্দ বিদ্যায়তনের শিক্ষকেরা দিবসের তাৎপর্য প্রচার করেন। ২২ নভেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত খিলাফতিদের প্রথম সম্মেলনে গান্ধী, শ্রদ্ধানন্দ, মালব্য এবং মুসলিম নেতৃবর্গের মধ্যে মৌলানা আবদুল বারি, হসরত মোহানি, হাকিম আজমল খাঁ ও আসফ আলি উপস্থিত ছিলেন। এই খিলাফত সম্মেলনেই গান্ধীজির মনে অসহযোগের চিন্তা প্রথম দানা বাঁধে।

আলি ভ্রাতৃদ্বয় অন্তরিন থেকে মুক্তি পান। ৩১ ডিসেম্বর দ্বিতীয় খিলাফত সম্মেলন বসে। পরে জানুয়ারিতে এম এ আনসারি বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিষয়টি আন্তর্জাতিক ছিল বলে কোনও ফয়সালা হয়নি। ফেব্রুয়ারিতে সৌকত আলি ঘোষণা করেন যে যুদ্ধের পরে শান্তি চুক্তিতে মুসলিম ধর্মীয় আবেগে আঘাত লাগায় মুসলমানেরা অতঃপর ইংরেজ সরকারের প্রতি অনুরক্ত থাকবে না। গান্ধী বিবৃতি দেন (১০ মার্চ ১৯২০) যে মুসলমানদের খিলাফতি দাবি না মিটলে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবে। ১৭ মার্চ ভারত থেকে একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল লন্ডনে প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাঁরা নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন।

তুরস্কের সঙ্গে মিত্রপক্ষের সম্পাদিত চুক্তিতে তুরস্কের অখণ্ডতা বিনষ্ট হয়। ১৯২০ খ্রি ১৭ এপ্রিল মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত খিলাফত সম্মেলনে চতুর্মুখী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। মে মাসে বেনারসে এ আই সি সি এবং জুন মাসে এলাহাবাদে কেন্দ্রীয় খিলাফত সম্মেলনে গান্ধীজি তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবে অনড় থাকেন। বিষয়টি মূলত ধর্মীয় এবং দ্বিতীয়ত ইসলামের একজন ধর্মগুরুর পূর্বতন মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে ইংরেজ সরকারের উচ্ছেদকল্পে আফগানিস্তানকে ভারত অভিযানে আমন্ত্রণ জানানোর অভিপ্রায় থাকায় অ্যানি বেসান্ত, মোতিলাল নেহরু, লাজপত রায়, টিলক ও মালব্য অসহযোগ আন্দোলন অবাস্তব বলে মনে করেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের আবেগের তাড়নায় বহির্ভারতীয় কোনও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে ভারতের জাতীয় দাবিকে যুক্ত করার কুফল সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল দেশবাসীকে সাবধান করে দেন। অধিকাংশ কংগ্রেস কমিটি গান্ধীজির এই প্রস্তাবে সায় দিতে পারেনি। সেপ্টেম্বরে কলকাতায় এক বিশেষ অধিবেশনে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ভোটে গান্ধীজির অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই অধিবেশনে কংগ্রেস ভারতে জাতীয় দাবি সমূহের সঙ্গে খিলাফতকে যুক্ত করে এবং চতুর্মুখী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচিকে সম্প্রসারিত করা হয়।

এরপর ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে মূল প্রস্তাবের সঙ্গে স্বরাজ অর্জনের লক্ষ্যও যুক্ত হয়। নাগপুর অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন ও লাজপত রায় বিরোধিতা ছেড়ে গান্ধীজির প্রস্তাব সমর্থন করেন। মালব্য ও জিন্নার বিরোধিতা ছিল নগণ্য।

অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যৌথভাবে খিলাফত আন্দোলন বৎসরাধিককাল চলে। নেতৃবৃন্দের অনেকেই কারারুদ্ধ হন। আন্দোলন ক্রমে হিংসাত্মক হয়ে পড়ে, যেটা গান্ধীজির আদর্শের বিরোধী ছিল। ১৯২২ খ্রি ফেব্রুয়ারি মাসে গোরখপুর

জেলায় চৌরিচৌরা থানা অঞ্চলে হত্যাকাণ্ডসূত্রে তিনি অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

১৯২২ খ্রি নভেম্বরে মুস্তাফা কেমাল পাশা ক্ষমতাসীন হয়ে খিলাফতের বিলোপ সাধন করেন। একই দেশে দুটি সমান্তরাল রাষ্ট্রশক্তির অবসান ঘটিয়ে তিনি তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ করায় ১২৯০ বছরের প্রাচীন খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে। তুরস্কের শেষ সুলতান ও খলিফা সুইজারল্যান্ডে জীবন অতিবাহিত করেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে মুসলমানদের সম্পর্ক ও সমর্থন কালক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে।

খুদাই খিদমতগার (Khudai Khidmatgar)

অবিভক্ত ভারতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খাঁ আবদুল গফুর খাঁর নেতৃত্বে ১৯২৯ খ্রি জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত একটি মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠন, যেটি সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন করত। শুরুতে এক একটি স্থানীয় যুব সংগঠন হিসেবে তৈরি হয়েছিল। বিভিন্ন আফগান উপজাতির জির্গাগুলির ভিত্তিতে গঠিত সেই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল গদিচ্যুত আফগান রাজা আমানুল্লার পুনর্বাসন। ওই বছরের এক সরকারি রিপোর্টে বলা হয় যে, আবদুল গফুর খাঁ শ্রমিক স্বার্থে একটি সংস্থা গঠন এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সিয়াল ইউথ লিগ (আঞ্জুমান-ই-নওযোয়ান-ই-সরহাদ) স্থাপন করেন। খুদাই খিদমতগার একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে পরিণত হয়। সেটি যুব লিগের অঙ্গ হিসেবে কাজ করত। প্রদেশবাসীর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ছিল প্রধান লক্ষ্য। অনতিকালের মধ্যে লিগ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়। নভেম্বরে কোহাটে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে কংগ্রেসের আদর্শ লিগের আদর্শ বলে ঘোষিত হয়। তদানীন্তন ইংরেজ সরকার লিগকে একটি কমিউনিস্ট দল হিসেবে দেখত। তার সম্ভাব্য কারণ ছিল খুদাই খিদমতগারের 'রেড শার্ট' নামে পরিচিতি। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আংশিক আদর্শ থাকলেও খুদাই খিদমতগার রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে প্রাধান্য লাভ করে। সেটি আবদুল গফুর খাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেসের সঙ্গে সমতালে গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেয়। গফুর খাঁ ১৯৩০ খ্রি এপ্রিল মাসে গ্রেপ্তার হন। খুদাই খিদমতগারের ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত থাকে। মে মাসে সরকার সেটিকে ফৌজদারি আইনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

খ্রিস্টীয় গণতন্ত্রী (Christian Democrat)

নরমপন্থী (মডারেট) রোমান ক্যাথলিক রাজনৈতিক দলের সদস্য। বিভিন্ন নামে দলগুলি বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পূর্বতন ফেডারাল রিপাবলিক অফ জার্মানি, ইতালি এবং হল্যান্ডে সক্রিয়। বাম ও মধ্যবাম এই দলগুলির মধ্যে উরুগুয়ের দল ১৯১০ খ্রি এবং ইতালিতে ১৯১৯ খ্রি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোনও কোনও দেশে তারা সোসালিস্ট ও কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে জোট বাঁধার চেষ্টা করে। ১৯৬৫ খ্রি চিলির ক্রিসটিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি পুঁজিবাদকে 'নির্দয়' ও মানবিক মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকর বলে ঘোষণা করে এবং সেই সঙ্গে কমিউনিজমকে এক ধরনের ক্রীতদাসত্ব বলে নিন্দা

করে। এইসব দেশের কোনও কোনওটিতে এই দল সংসদে সর্ববৃহৎ। দলগুলির মতাদর্শ ও কর্মপন্থা হল যথাক্রমে নরমপন্থী ও নিয়মতান্ত্রিক সমাজ সংস্কারমূলক। ইউরোপে ১৯৪৫ খ্রি থেকে বিশেষ করে ইতালিতে ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্রাটরা শাসন ক্ষমতায় সুদৃঢ় স্থায়িত্বের জন্য সদাই সচেষ্ট থাকে এবং সোসালিস্ট ও কমিউনিস্টদের বিরোধিতা বজায় রাখে। এইসব দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রি জার্মানির ডঃ আদেনুর এবং ইতালির সিনর ফ্যানফ্যারির প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ক্রিসটিয়ান ডেমোক্রাটদের কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে ওঠেনি।

খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্র (Christian Socialism)

১৮৪৮ খ্রি সারা ইউরোপ যখন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে উত্তাল তখন ইংল্যান্ডে কিছু সংখ্যক অ্যাংলিক্যান যাজকগোষ্ঠীর লোক এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে চার্চকে যুক্ত করা। জে. এফ. ডি. মরিস এবং চালর্স কিংসলে নামে দু' জন অ্যাংলিক্যান যাজক ছাড়াও টমাস কার্লাইল, জন ম্যালকম, লাডলো ফর্বস, প্রমুখ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। তাঁরা সেই সময়ে ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণীর দুরবস্থায় অভিভূত হয়ে পড়েন এবং ওই দু' জন যাজক সনদী আন্দোলনকে মদত যোগাতেন। তাঁরা সবাই অনুভব করেন যে সমকালীন সমস্ত সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে মানবজাতির আধ্যাত্মিক চাহিদা ছিল উপেক্ষিত এবং সেজন্য সমাজতন্ত্রকে খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ নিউ টেস্টামেন্টে বিধৃত সমাজোন্নয়নের নীতিকথার ভিত্তিতে রঞ্জিত করা দরকার। এই আন্দোলন অবাধ বাণিজ্যের বিরোধী এবং কলকারখানায় রবার্ট ওয়েনের নিদর্শনে সমবায় ব্যবস্থার সমর্থক ছিল। আধুনিক ধনতান্ত্রিক শিল্পোন্নয়নের পরিবর্তে তাঁরা মধ্যযুগীয় কুটির শিল্পের বেশি অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা শ্রমজীবীদের জন্য কলেজ স্থাপন (১৮৫৪) এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে তাদের দাবি ও অধিকার অর্জন প্রয়াসকে সমর্থন করতেন।

খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের ধারা ফেবিয়ান সোসাইটি ও গিল্ড সোসাইটি ছাড়াও কোনও কোনও মননশীল ব্যক্তি সেটি বজায় রাখেন, বিশেষ করে যাঁরা মার্কসের বৈপ্লবিক প্রণালীতে আস্থাবান না হয়ে শিক্ষা, শ্রমিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক দলের ভূমিকায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা মনে করত যে খ্রিস্টের নীতিকথা এক নতুন সমাজের মাধ্যমে পরিপূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব, কারণ তাঁদের মতে খ্রিস্টধর্মের অর্থই হল সামাজিক দায়িত্ব এবং প্রকৃত ধর্মসম্মত জীবনযাপনে বিষয়আশয় সঙ্গতিশীল।

খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্রী আদর্শ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘকাল স্তিমিত থাকার পর ইংল্যান্ডে ১৯৬০ খ্রি খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্রী ধারা পুনরুজ্জীবিত হয় কয়েকটি খ্রিস্টীয় সংস্থার সমন্বয়ের ফলে। সাধারণভাবে খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্রীরা হলেন রক্ষণশীল। তা হলেও তাঁদের রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যসূচিতে বহু কল্যাণকর ও গঠনমূলক বিষয় থাকে। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর অস্ট্রিয়ার পার্টি পিপলস নাম পরিগ্রহ করে।

গ

গণ-অভীপ্সা (General Will)

রুসোর রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম প্রধান তিনটি অঙ্গ হল **সামাজিক চুক্তি, সার্বভৌমত্ব** এবং গণ-অভীপ্সা। গণ-অভীপ্সা প্রত্যয়টির সূত্রে আরও দুটি প্রত্যয় এসে পড়ে: প্রকৃত (actual) অভীপ্সা ও বাস্তব (real) অভীপ্সা। ব্যক্তিমানুষের প্রকৃত অভীপ্সা তার সহজাত প্রকৃতি সঞ্জাত এবং অযৌক্তিক। এই অভীপ্সা সাময়িক ও বর্তমান কালেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেটা আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক এবং স্বভাবতই সমাজকল্যাণের সঙ্গে জড়িত নয়। এই অভীপ্সা সংকীর্ণ ও স্ববিরোধী। পক্ষান্তরে ব্যক্তি মানুষের বাস্তব অভীপ্সা তার সমাজকল্যাণ-চিন্তার সঙ্গে জড়িত যুক্তিশীল অভীপ্সা। বাস্তব অভীপ্সা মানুষের নিজের স্বার্থ অপেক্ষা জনস্বার্থকেই বড় করে দেখে। বাস্তব অভীপ্সার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয় ঘটে। এই অভীপ্সা স্থায়ী, সাময়িক নয়। স্বার্থবুদ্ধি থেকে মুক্ত থাকার দরুন বাস্তব অভীপ্সা লোকের যথার্থ মুক্তিস্পৃহাকে প্রতিফলিত করে। বড় আকারে দেখা দেয় সর্বজনীন স্বার্থ ও কল্যাণ, ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে নিবদ্ধ থাকে না; সমাজকে প্রাধান্য দেয় এবং তার ভিত্তি হল যুক্তিশীলতা। আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে মানুষ বাস্তব অভীপ্সা উপলব্ধি করে। প্রতি মানুষের মধ্যে একাধারেই থাকে উভয় অভীপ্সা।

গণ-অভীপ্সার কাজ হল সর্বজনের বাস্তব অভীপ্সার সংযোগ ও সমন্বয় ঘটানো। সাধারণত লোকের প্রকৃত অভীপ্সাই দেখা দেয়। কিন্তু মানসিক দোটানায় ক্রমে বাস্তব অভীপ্সার জয় হয়। গণ-অভীপ্সা বিভিন্ন লোকের বাস্তব অভীপ্সার একটি সমন্বিত রূপ। তার মধ্যে কারও আত্মত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না। গণ-অভীপ্সা সমাজের সর্বজনীন উচ্চতর আদর্শকে তুলে ধরে। যথোচিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে **গণমঙ্গল** সম্পর্কে লোকের চেতনা গণ-অভীপ্সার মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে। গণ-অভীপ্সা সার্বভৌম শক্তি অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অভীপ্সা নয়। জনস্বার্থে গণ-অভীপ্সা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্রিয়াশীল হয়। রুসোর এই গণ-অভীপ্সা প্রত্যয় কিছুটা অস্বচ্ছ। তিনি

নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে প্রত্যয়টি যত না কার্যকর তার চেয়ে নীতিকথা হিসাবেই বড়।

গণউদ্যোগ (Initiative)

মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত এই পদ্ধতিতে কিছু সংখ্যক নাগরিক আইনসভায় কোনও প্রস্তাব উত্থাপনের উদ্দেশ্যে নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন অর্জনের জন্য সরাসরি **গণভোট** আহ্বান করতে পারেন। সেই প্রস্তাব কোনও নতুন আইন প্রবর্তন, পুরানো কোনও আইন বাতিল অথবা সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত হতে পারে। গণউদ্যোগ, **গণভোট** এবং **প্রত্যাহ্বান** পদ্ধতি তিনটি কার্যত পাটি অর্থাৎ দলপ্রথাকে এবং বিশেষ করে যেসব দল আইনসভায় আধিপত্য করে তাদের অতিক্রম করে ; তাতে প্রগতিশীল অনেক আইনকানুনের সংস্কার সাধিত হয়। অবশ্য পদ্ধতি তিনটি অঙ্গরাজ্য স্তরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশি কার্যকর হয়ে থাকে। এ ছাড়া ডাকযোগে জনমত গঠনের প্রয়াস দল ও দলহীন, উভয়ভাবেই চলে। সুইজারল্যান্ডে গণভোট প্রথা যথেষ্ট প্রবল।

গণতন্ত্র (Democracy)

গ্রিক ভাষায় demokratia (demos + kratia = power of the people) শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ democracy এবং তার বাংলা প্রতিশব্দ হল গণতন্ত্র। সাধারণভাবে যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকার শ্রেণী, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির পরিবর্তে সর্বজনের নিয়ন্ত্রণাধীনে চালিত হয় তাকে গণতন্ত্র বলে। তাতে জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রণীত আইন ও সর্ববিধ নীতি নির্ধারিত হয় ; নাগরিক অধিকার সকলের সমান, তাঁরা প্রকাশ্য বিচারবিতর্কের মধ্য দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের মাধ্যমে যাবতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রাচীন গ্রিসে সরাসরি অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে জনগণ প্রশাসনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করত। পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আইন সভায় যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

গণতন্ত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অবাধ নির্বাচন ব্যবস্থা একটি স্বাভাবিক নিয়ম। নির্বাচনে কমপক্ষে দুটি প্রার্থী থাকা চাই। স্বাধীন বিচারবিবেচনা সাপেক্ষ অবাধ প্রার্থী বাছাই গণতন্ত্রী ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষের পক্ষে একটি মৌলিক অধিকার, সেজন্য মুদ্রণ, মতামত প্রকাশ এবং সংস্থাধীনে যুক্ত হওয়ার স্বাধীনতাও গণতন্ত্রের মৌলিক লক্ষণ। কোনও নাগরিকের ব্যক্তিগত বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ, খেয়ালখুশি মতো নাগরিকদের ধরপাকড় ও বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। গণতন্ত্রে আইনের শাসন বিরাজ করে। গণতন্ত্রে বিরোধী দল থাকাটা স্বতঃসিদ্ধ। গণতন্ত্রী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা তিন ভাগে বিভক্ত থাকে, যথা নির্বাচিত আইন সভা, প্রশাসনের দায়িত্বে **সরকার** এবং **বিচারালয়**। সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় কিংবা এককেন্দ্রিক হতে পারে। সরকার সংসদের কাছে (ক্যাবিনেট প্রথায়) অথবা প্রেসিডেন্ট জনগণের কাছে (আমেরিকার প্রেসিডেন্ট প্রথায়) দায়ী থাকেন। উভয় ক্ষেত্রেই সংসদ বা আইনসভা কিংবা জনগণ চাইলে সরকারকে ইস্তফা দিতে হয়।

আধুনিক গণতন্ত্র **প্রজাতান্ত্রিক** অথবা সাংবিধানিক **রাজতন্ত্র** হতে পারে। সার্বভৌম ক্ষমতা উভয় ক্ষেত্রেই জনগণের উপর বর্তায়, সংখ্যাগুরু নাগরিকদের ইচ্ছার প্রকাশে সেটা জানা যায়। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে, সভা-সমিতি কিংবা সংবাদপত্রে প্রকাশিত অথবা অন্য কোনও গণমাধ্যমে জনগণের ইচ্ছা, অসন্তোষ, দাবি ও অভিমত নির্ণয় হল প্রচলিত রীতি। **গণভোট** প্রভৃতির মাধ্যমেও জনগণের অভীপ্সা নির্ণয় করা যায়। গণতন্ত্রী ব্যবস্থায় প্রশাসক সরকারের নিরন্তর শাসিতদের মতামত নির্ণয় এবং তদনুযায়ী প্রশাসন ব্যবস্থার রূপায়ণ কর্তব্য। দেশ ও কালভেদে **'জনগণ'** শব্দটিরও পরিবর্তন ঘটেছে। আঠারো কিংবা কুড়ি অথবা একুশ বা তদূর্ধ্ব বছর বয়স্ক লোকে ভোটাধিকার পায়। এক সময়ে দেশবিশেষে স্ত্রীজাতির, কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিদের এবং বিত্তহীন মানুষের ভোটাধিকার ছিল না যেমন ছিল না একদিন গণতন্ত্রের ভূমিষ্ঠভূমি গ্রিসের ক্রীতদাসদের।

উদারনৈতিক রাজনৈতিক ধারায় গণতন্ত্রী সমাজ ও রাষ্ট্রে **বহুত্ববাদী** রীতিনীতি অনুযায়ী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নানা ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ক্রিয়াশীল থাকে।

গণতন্ত্রের দোষগুণ সম্পর্কে নানারকম সমালোচনাও হয়ে থাকে। মার্কসীয় দৃষ্টিতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রী রাষ্ট্র শ্রেণীবিভক্ত হয়ে থাকে, ফলে শক্তিশালী শোষক শ্রেণী গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের দরুন সবাই সমান সুযোগ পায় না। অবাধ বাণিজ্য, ব্যক্তিগত মালিকানা ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের ফলে বিত্তবান মানুষ বিত্তহীন মানুষকে শোষণ করে। মার্কসীয় দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রেই যথার্থ গণতন্ত্র নিহিত থাকে। তাতে অর্থনৈতিক উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নির্বাহ হয়। চাকুরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও অবসরের নিশ্চয়তা থাকে। অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতায় ব্যক্তির সংকীর্ণ স্বার্থ ও জনবিরোধী ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ পায়।

গণতন্ত্রের দ্বিতীয় সমালোচনায় **মানবেন্দ্রনাথ রায়** প্রমুখ **নবমানবতাবাদীরা** বলেন যে গণতন্ত্রের সারবত্তা হল অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতা। কিন্তু প্রচলিত গণতন্ত্রী রীতিনীতি অর্থহীন ও একটি প্রহসন মাত্র। তাতে নাগরিকদের সার্বভৌমত্ব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে নির্দিষ্ট কয়েকটি বছরের জন্য হস্তান্তরিত হয়ে থাকে। সে সময়ে নির্বাচকেরা অসহায়। দ্বিতীয়ত নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্বাচকদের পরিবর্তে তাঁদের নিজেদের দলীয় নির্দেশে চলেন। নবমানবতাবাদীরা সেজন্য **বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের** কথা বলেন। তাতে স্থানীয় সরকারি কার্যনির্বাহের দায়িত্ব স্থানিক জনসমিতির (পিপলস কমিটি) উপর বর্তাবে এবং নির্বাচকমণ্ডলী অনেকাংশে সেগুলির সঙ্গে সরাসরি সংযোগ বজায় রাখতে পারবে। গ্রাম ও জেলা থেকে জাতীয় স্তরে পিরামিড আকারে বিন্যস্ত জনসমিতির প্রতিনিধিরা কর্তব্যকর্মে ব্যর্থ হলে তাদের ফিরিয়ে আনার **প্রত্যাহ্বান** করার অধিকার (right of recall) থাকবে স্থানীয় জনসাধারণের। অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র—উভয় ব্যবস্থাই ব্যর্থ প্রতিপন্ন হওয়ায় তৃতীয় বিকল্প হিসাবে সমবায়ী অর্থনীতি কার্যকর হবে বলে নবমানবতাবাদীরা মনে করেন।

দ্র. প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ; উদারনৈতিক গণতন্ত্র

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা (Democratic Centralism)

লেনিনের সুপারিশক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়নে সরকারি কাজকর্মে নানা ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে যে পদ্ধতির প্রচলন হয়। সোভিয়েত ও অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ওই পদ্ধতি অনুসরণ করে। তাতে পার্টির মধ্যে সর্ববিধ বিষয়ে অবাধ আলোচনা এবং পার্টির কর্মকর্তা নির্বাচনে অবাধ সুযোগ, একদলীয় রাষ্ট্র ও ক্রমোচ্চ পদবিন্যাসের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলা বিধেয়। **কমিন্টার্ন**-এর সময় থেকেই স্থির হয় যে পার্টি তার কর্তব্য পালনে সমর্থ হবে যদি তার সাংগঠনিক কাঠামো যথাসাধ্য কেন্দ্রীভূত হয়, লৌহকঠোর শৃঙ্খলা বজায় থাকে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সর্বস্তরের সদস্যদের আস্থাভাজন এবং শক্তি ও কর্তৃত্বসহ সর্বাঙ্গীণ ক্ষমতাশালী হয়। উল্লেখ্য, কমিন্টার্ন-এর সদস্যপদের জন্য একুশ দফা শর্ত ছিল। কেন্দ্রিকতার অর্থ হল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে যাবতীয় ক্ষমতা ন্যস্ত থাকা, যাতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে সুস্থ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা যায়; কলকারখানা, স্কুল-কলেজ, পরিবার থেকে পুলিশি সংগঠন পর্যন্ত; এই বিধিব্যবস্থায় স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান গড়া ও পরিচালনার অবকাশ নিতান্তই সীমিত।

কেন্দ্রিকতার বিধিব্যবস্থা গণতান্ত্রিক, তার আংশিক কারণ হল যে সেসবের মূলে থাকে জনস্বার্থ, কারণ উৎপাদনে ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করা হয়, আংশিক অপর একটি কারণ হল পার্টির মধ্যে **অন্তর্দলীয় গণতন্ত্র**, যেখানে তলা থেকে সমস্ত পদ নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ হয়। **মাও-জে দং** পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সঙ্গে জনগণের একটা সম্পর্ক স্থাপনে বিশ্বাস করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতা পরস্পরবিরোধী নয়। বরং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অঙ্গ হিসাবে বিরোধী দুটি সত্তার মধ্যে ঐক্যের এটি এক নিদর্শন বিশেষ।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (Democratic Socialism)

গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (সমাজতন্ত্র অভিমুখে সংসদীয় পথ)। প্রত্যয়টির অর্থ হল প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলীকে সমাজতন্ত্রে প্রবৃত্ত করা। সাধারণত সাম্যবাদ বা **সমাজতন্ত্র** বিপ্লব ও আকস্মিক অভ্যুত্থানের পর শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়; সেটা হল সমাজতন্ত্র অভিমুখে বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক পথ। অবশ্য **গণতন্ত্র** (সোস্যাল ডেমোক্রেসি) স্বতন্ত্র বিষয়। গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রে **ব্যক্তিস্বাধীনতা**, **আইনের শাসন** ও **বহুত্ববাদী** সামাজিক পরিবেশ বিরাজ করে। গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রের পথ ইংল্যান্ডের লেবার পার্টি অনুসরণ করে।

দ্র. উদারনৈতিক গণতন্ত্র ; প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

গণভোট (Referendum)

কোনও বিষয়ে জনমত নির্ণয়ের জন্য সারা দেশের নির্বাচকমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ অভিমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে সেটি উপস্থাপন করার পদ্ধতি। কোনও কোনও দেশে সংবিধান সংশোধন অথবা যে-কোনও বিষয়ে জনমত নির্ণয়ের প্রয়োজনে

নির্বাচকমণ্ডলীর গণভোট গ্রহণ করা হয়। কমনওয়েলথ অব অস্ট্রেলিয়া অ্যাক্ট ১৯৯০ আইন অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান সংশোধনের পূর্বশর্ত হল গণভোট। অবশ্য সব ক্ষেত্রে কেবল যে সংবিধান সংশোধনের জন্যই গণভোট হয় তা নয়। সুইজারল্যান্ডে যে-কোনও বিষয়ে অন্যূন ত্রিশ হাজার অধিবাসী দাবি জানালে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ইংল্যান্ডে এই পদ্ধতির প্রচলন নেই। ১৯৯১ খ্রি সোভিয়েত ইউনিয়নে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের একতাবদ্ধ থাকার প্রশ্নে গণভোট গৃহীত হয়।

দ্র. নির্দেশক গণভোট

গণমঙ্গল (Common Good)

প্রত্যয়টি জনস্বার্থ, জনকল্যাণ, জাতির উন্নতি ইত্যাদি শব্দের প্রায় সমার্থক। সমানভাবে ব্যবহৃত এই শব্দগুলি খুব তেমন স্বচ্ছ নয়, তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে এক একটির প্রয়োগ অর্থবহ। গণমঙ্গল প্রত্যয়টি গ্রিসের প্রাচীন রাষ্ট্রদর্শন থেকে এসেছে। গ্রিসের কোনও পুররাষ্ট্রে বসবাস সূত্রেই তাদের অধিবাসীরা ব্যক্তিগত পরিচিতি লাভ করত। পুররাষ্ট্রের জয়-পরাজয়, ভাল-মন্দ ইত্যাদির সঙ্গে তার অধিবাসীদের সম্পর্ক ছিল অঙ্গাঙ্গিভাবে আবেগপূর্ণ ও অবিচ্ছিন্ন ; সেই পটভূমিকায় লোকে নিজের পরিবার, বিষয়আশয় ও জীবনকে পর্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করত। আরিস্তোতল তাই মনে করতেন যে সমস্ত গোষ্ঠীর লক্ষ্যই যদি সাধারণভাবে গণমঙ্গল হয় তা হলে সর্বোচ্চ সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্র সর্বাত্মক মঙ্গল বিধায়ক। সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রই তাতে প্রাধান্য পায়, তার অংশবিশেষের ভাল-মন্দের প্রশ্ন গৌণ। স্বভাবতই তাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অচল প্রতিপন্ন হয়।

বলা হয়ে থাকে যে সাধারণের মঙ্গলার্থে রাষ্ট্র বিরাজ করে। সেই দৃষ্টিতেই নাগরিকদের আনুগত্য ও আইনের যৌক্তিকতা দেখানো হয়। গণমঙ্গলের তাগিদেই লোকে দেশের জন্য যুদ্ধে প্রাণ দেয়, আবার সর্বজনের স্বার্থে ছোঁয়াচে রোগীকে জনগণ থেকে পৃথক রাখা হয়। গণমঙ্গলে ব্যক্তিমানুষের মঙ্গল কতটা সেটাই হল প্রশ্ন। ব্যক্তিমানুষকে পুরসমাজের মঙ্গলার্থে আত্মস্বার্থ বিসর্জন দেবার কথা বলা হয়। ব্যক্তিমানুষের যাবতীয় স্বার্থ ও মঙ্গল বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে দিয়ে চরিতার্থতা লাভ করে। সমাজের পরিবর্তে নিজের স্বার্থচিন্তা সেজন্য সমাজস্বার্থের পরিপন্থী এবং নীতিগতভাবে অসঙ্গত। আদর্শ নাগরিক সমাজস্বার্থকে নিজের স্বার্থের উপরে স্থান দেয়।

কারও কারও মতে গণমঙ্গলের দুটি দিক থাকা সঙ্গত : একটি হল সাধারণভাবে পুরসমাজের মঙ্গল, এবং অপরটি সমাজের প্রতিজনের মঙ্গল। কথাটি সব ধরনের সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রুসো সেজন্য গণঅভীপ্সা ও সকলের অভীপ্সাকে পৃথকভাবে বিচার করেন। তবে রুসো জনস্বার্থের নামে মানুষের নির্লজ্জ স্বার্থপর আচরণের নিন্দা করেন। টমাস হিল গ্রিনের মতে সমাজের জটিল ঐতিহাসিক বিবর্তনে গণমঙ্গল প্রত্যয়ের উদ্ভব এবং তাতে ব্যক্তিমানুষের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারিত হয় ; লোকে নিজ জীবনের পরিপূর্তি খুঁজে পায় তাতে।

গণমঙ্গল প্রসঙ্গে চর্চাসূত্রে ন্যায়বিচার ও রাষ্ট্রিক বাধ্যতার প্রশ্ন এসে পড়ে। হবস,

লক, বেনথাম প্রমুখ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা মনে করতেন যে প্রতিটি বিষয় ব্যক্তিমানুষের মঙ্গল বিধায়ক কি না সেটাই বিবেচ্য, গণমঙ্গলের প্রশ্ন গৌণ। অবশ্য লক ও বেনথাম হিতবাদী দৃষ্টিতে অধিক সংখ্যক মানুষের মঙ্গলবিধান চাইতেন।

গণহত্যা ও গণপ্রজ্বালন (Genocide and Holocaust)

প্রত্যয়টির সূত্রপাত করেন র‍্যাফেল ল্যামাকিন, যার অর্থ হল নির্দিষ্ট কোনও জাতি, বর্ণ, ধর্ম, কুল অথবা রাজনৈতিক গোষ্ঠী অথবা দলের অন্তর্গত সর্বজনকে নিধন করার প্রয়াস। তার লক্ষ্য উচ্চ জাতি কর্তৃক নিম্নজাতিকে নিশ্চিহ্ন করা। ১৯৪৮ খ্রি রাষ্ট্রসংঘে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণহত্যাকে (genocide) আন্তর্জাতিক আইনে একটি অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়।

গণপ্রজ্বালন কথাটি গ্রিক holocaust-এর বাংলা প্রতিশব্দ। শব্দটি ইহুদি ঐতিহাসিকেরা নাৎসিদের ইহুদি-নিধন ও প্রজ্বালন পদ্ধতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন।

গদর পার্টি (Gadar Party)

গদর শব্দটির অর্থ হল বিদ্রোহ। ক্যালিফোর্নিয়ার স্টকটন শহরে বসবাসকারী শিখদের নিয়ে দলটির প্রতিষ্ঠা (১৯১৩) করেছিলেন লালা হরদয়াল। প্রবাসে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার প্রচার করা ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। শিখদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা গড়ে তোলার জন্য 'গদর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত। সম্পাদনা করতেন রামচন্দ্র নামে জনৈক পঞ্জাবি। ১৯১৪ খ্রি মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে বেআইনি অনুপ্রবেশের দায়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জামিন পেয়ে তিনি পালিয়ে ইউরোপে চলে যান। জার্মানিতে পরে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত বার্লিন কমিটিতে যোগ দেন।

মার্কিন দেশে ও কানাডায় গদর পার্টির নেতৃত্বে লালা হরদয়াল ছাড়াও জওলা সিং, সোহন সিং ভাকনা, সন্তোক সিং, গুরমুখ সিং, কেশর সিং, কর্তার সিং, কাসিরাম, রহমত আলি প্রমুখ বিপ্লবীদের কথা জানা যায়। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স ও ব্রিটেনের পক্ষে যোগদানের (১৯১৭) পর গদর পার্টির বহু সদস্য কারারুদ্ধ হন ও তাঁদের বিরুদ্ধে সানফ্রানসিসকো মামলা (১৯১৭-১৮) দায়ের করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপে গদর পার্টি প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের আদর্শ প্রচার করে। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময় সেই আদর্শে প্রভাবিত আনুমানিক আট হাজার ভারতীয় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পঞ্জাবে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁরা সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ ছড়ানোর চেষ্টা করেন। অনেকেই গ্রেপ্তার কিংবা অন্তরিন হন। পঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলায় তিরিশ জনের ফাঁসি হয় ও দ্বীপান্তরিত হন ৫৮ জন।

গদর পার্টির সদস্যরা সিঙ্গাপুর, ইন্দোচীন, ফিলিপাইনস, শ্যাম এবং দূরপ্রাচ্যের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন (১৯১৪-১৫)। গুরুদত্ত সিং ছিলেন সিঙ্গাপুরের এক ব্যবসায়ী। তিনি কোমাগাটামারু নামক একটি ভাড়া-করা জাহাজে ভারত থেকে আড়াইশ শিখ কর্মপ্রার্থীকে নিয়ে কানাডার ভ্যাঙ্কুবারে উপনীত হন। কিন্তু কানাডা

সরকার সেখানে তাঁকে অবতরণের অনুমতি না দেওয়ায় জাহাজটি কলকাতায় ফিরে আসে ও বজবজে সেটির আরোহীরা সশস্ত্র বিক্ষোভে লিপ্ত হন।

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ (১৮৬৯-১৯৪৮) (Gandhi, M.K.)

প্রাক-স্বাধীন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের জনক হিসাবে বন্দিত মহাত্মা গান্ধী সুসংবদ্ধ কোনো রাষ্ট্রদর্শন প্রবর্তন করেননি। প্রচলিত অর্থে গান্ধীবাদ বলে সুস্পষ্ট কিছু নেই, তবুও যদি কিছু থাকে সেটা হল বিশেষ একটি জীবনধারা, যার সারমর্ম হল নৈতিকতা ও প্রীতিপরায়ণতা; এবং তাতে প্রাচীন সনাতন আদর্শের অনুবর্তনে ও রূপায়ণে তথা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণে আধুনিক জীবনের সমস্যাবলীর সমাধানের নিশানা দেখানো হয়েছে।

গান্ধীর জন্ম গুজরাতের পোরবন্দরে। পেশায় তিনি ছিলেন আইনজীবী। জনৈক মক্কেলের পক্ষে ওকালতি সূত্রে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে তিনি এশীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের বৈষম্যমূলক আচরণ প্রত্যক্ষ করেন (১৮৯৩)। সেখানেই তিনি তাঁর অহিংস **সত্যাগ্রহ** কর্মপদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ ও পরীক্ষা করেন। ১৯১৪ খ্রি অবধি দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর নেতৃত্বে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম পরিচালিত হয় তার পিছনে ছিল তাঁর মানুষ নির্বিশেষে সমতা ও স্বাধিকারের দৃঢ় প্রত্যয়। ১৯১৫ খ্রি তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। গান্ধীর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন **গোপালকৃষ্ণ গোখলে**। এ ছাড়া তিনি তলস্তয়, রাস্কিন, হেনরি ডেভিড থোরো প্রমুখের চিন্তায় প্রভাবিত হন। ১৯১৫ খ্রি থেকে মৃত্যুকাল অবধি প্রায় ৩৩ বছরের কালপর্বে গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন। তাঁর কর্মপদ্ধতি ছিল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অহিংস **সত্যাগ্রহ**। অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রচলিত যাবতীয় ধারা থেকে স্বতন্ত্র এক কর্মপন্থা হিসেবে **অছিবাদ** নামে তিনি এক অভিনব ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। তাঁর সমুদয় চিন্তাভাবনা **সর্বোদয়** জীবনদর্শনে সমন্বিত হয়েছে।

গান্ধীর মনন ও সাধনার মূলে ছিল আধ্যাত্মিকতা। তিনি ঈশ্বরে আস্থাবান ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা ঈশ্বর হলেন মঙ্গলময় এবং করুণার আধার; মানুষের ডাকে তিনি সাড়া দেন। ঈশ্বর হলেন নৈতিকতার উৎস। সে কারণে গান্ধী উপাসনায় বিশ্বাস করতেন। শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রভাবে তাঁর মনে শুভ ও অশুভর তথা সত্য ও অসত্যের উপলব্ধি সঞ্চারিত হয় যার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের সত্যাগ্রহ কর্মপদ্ধতি।

গান্ধী ইতিহাসকে অহিংসা নীতির শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখে বিচার করেছেন; তাঁর দৃষ্টিতে সত্য ও অহিংসা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। সেই কারণে ইতিহাসে ধর্মের ভূমিকা অশেষ সৃজনশক্তিসম্পন্ন। বিশ্বের সুশৃঙ্খল ও নৈতিক কার্যনির্বাহের পিছনে ধর্ম ক্রিয়াশীল থাকে। হিংসা ও নিরীশ্বরবাদের তিনি নিন্দা করেছেন। ধর্মসম্মত কর্মসম্পাদনের প্রয়োজনে তিনি ত্যাগ ও আত্মনিগ্রহের আবশ্যকতার কথা বলেন। নিস্পৃহ কর্মযোগীর আদর্শে স্বধর্ম অর্থাৎ নিজ কর্তব্যপালন করলে মোক্ষলাভ করা যায় বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।

তিনি আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার নিন্দা করেছেন। তার মূলে তিনি লোভ, নিপীড়ন,

শোষণ, নির্বিবেক ভোগস্পৃহা ও অপরের উপর আক্রমণের লিপ্সা প্রত্যক্ষ করেন। গান্ধী তাই প্লাতো, রুসো, তলস্তয়ের মতো প্রকৃতির রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন যে পশ্চিমি যন্ত্রসভ্যতার বিনাশ অনিবার্য। তিনি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্রের আধ্যাত্মিক রূপায়ণ চাইতেন। জাতিবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ এবং অস্পৃশ্যতা তাঁর দৃষ্টিতে মানুষের শুভসত্তার পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত।

গান্ধী যে অর্থনৈতিক কাঠামোর সুপারিশ করেন সেটা মূলত ছিল গ্রামভিত্তিক। বৃহৎ আধুনিক শিল্প, জাতীয়করণ, পুঁজিবাদ, নগরায়ণ এবং শ্রমের পরিবর্তে মূলধন নিবিড় যান্ত্রিক উৎপাদন প্রবণতার তিনি বিরোধী ছিলেন। ভারতের জনবহুলতা, বেকার সমস্যা, মন্থর অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পক্ষে উপযোগী ব্যবস্থা হিসেবে তিনি গ্রাম-নির্ভর কুটির ও খাদি-শিল্প এবং বিকেন্দ্রিত বিধিব্যবস্থার সুপারিশ করেন। আর্থিক আত্মনির্ভরতা ও গ্রামীণ স্বয়ম্ভরতার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে চরকার উপযোগিতার কথা বলেন। গান্ধী পুঁজিবাদের রূপান্তর ও সমাজে তার বিষাক্ত প্রভাবের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে অছিবাদ তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন।

তাঁর সমাজতত্ত্বকে অনেকে একপ্রকার নৈরাজ্যবাদ হিসেবে দেখেন। কারণ তিনি চাইতেন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত সমাজ। আলোকপ্রাপ্ত সে-সমাজ অন্তর্মুখী, বহির্মুখী নয় এবং বড় ছোট পদাধিকারীদের কোনও রকম আদেশ কিংবা তাঁদের প্রতি আনুগত্যের অবকাশ সেখানে নেই। সবাই যে যার নিজের উপর কর্তৃত্ব করে এবং সমাজের কল্যাণে নিজেই নিজের ক্রিয়াকর্মের নিয়ন্তা। অহিংসার ভিত্তিতে চালিত সমাজ গ্রামকেন্দ্রিক গোষ্ঠীদের নিয়ে গঠিত, সেখানে শান্তি ও মর্যাদার সঙ্গে লোকে স্বেচ্ছাসমবায়ে জীবন অতিবাহিত করে। তিনি একাধারে বর্ণাশ্রম ও সাম্যে বিশ্বাসী ছিলেন। একদিকে কাজের স্বাধীনতা থাকা অন্যদিকে সম্পদের মালিকানা-প্রবৃত্তিমুক্ত তাঁর আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে। কৃষি ও কুটির শিল্পই হবে প্রধান জীবিকা। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ ও পীড়নের অবসান ঘটবে। রাষ্ট্র, আদালত, জেলখানা, পুলিশ ইত্যাদি অবদমনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। আদর্শ সমাজ একটা পরিবারের মতো হবে, যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কিংবা সমষ্টিবাদ প্রকট আকার ধারণ করবে না। তা যদি কার্যকর না হয়, তেমন ক্ষেত্রে অহিংস এবং সীমিত কর্মপরিধিসম্পন্ন কল্যাণরাষ্ট্রের বিকল্প ব্যবস্থা সাময়িকভাবে অনুসরণই ছিল তাঁর অভিমত।

গিল্ড সমাজতন্ত্র (Guild Socialism)

শ্রমিকসংঘবাদের (Syndicalism) প্রকারভেদ হিসেবে প্রত্যয়টি ১৯০৬ খ্রি ব্রিটেনে উদ্ভূত হয়। পুরোধা ছিলেন এ. জে. পেন্টি নামে জনৈক স্থপতি। মধ্যযুগীয় গিল্ড প্রথার আধুনিক পথে পুনঃপ্রবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে এই আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। এই আন্দোলনের বিভিন্ন সময়ে এ. আর. ওরেজ (Orage), এস. জি. হবসন, জি. ডি. এইচ কোল নেতৃত্ব দেন। গিল্ড সোসালিস্টরা বিশ্বাস করতেন যে যৌথভাবে সম্পদ সৃষ্টি করে সমাজ, ব্যক্তিগত একক প্রচেষ্টায় সে কাজ সাধিত হয় না। তাঁদের মতে ধনতন্ত্রী অর্থনীতি ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণকে সমর্থন করে, কিন্তু সমাজের প্রতি দায়িত্ব কিংবা উত্তরকালের প্রতি কর্তব্য পালন করে না। এঁরা চাইতেন যে কলকারখানা

জাতীয়করণের পরে সেগুলির ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত এক-একটি গিল্ডের (সমবায়) মতো স্বায়ত্তশাসিত পরিচালনভার গ্রহণ করুক। **মার্কসবাদ** ও সিন্ডিক্যালিজমের সমন্বয়ে সৃষ্ট এই মতাদর্শ রাষ্ট্রীয় সমাজবাদের বিরোধী, যেখানে রাষ্ট্র কলকারখানা নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রকাঠামোর সংস্কার অপেক্ষা অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাঁরা চাইতেন মজুরি প্রথার অবসান, শিল্পে স্বায়ত্তশাসন, সমাজের অন্যান্য গণতন্ত্রী সংগঠনের সহযোগে একটি জাতীয় গিল্ড অবকাঠামো গড়ে তোলা।

১৯১৫ খ্রি ব্রিটেনে ন্যাশনাল গিল্ডস লিগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ১৯২৫ খ্রি-এর পর গিল্ড সোসালিস্ট আন্দোলনের অবলুপ্তি ঘটে। ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও লেবার পার্টির তাত্ত্বিকেরা অবশ্য এখনও প্রয়োজনে সেই মতাদর্শের উল্লেখ করেন।

দ্র. সমাজতন্ত্র

গুণতন্ত্র (Meritocracy)

গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরিচালিত সরকার। মাইকেল ইয়াং, ড্যানিয়েল বেল প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকেরা প্রত্যয়টির মুখ্য প্রবক্তা। **অভিজাতবর্গ** প্রত্যয়টির সঙ্গে এটি অনেকাংশে তুলনীয়। গুণ বলতে মোটামুটি বুদ্ধি ও প্রয়াসের সমন্বয় বোঝায়, যার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপযোগী শিক্ষার মাধ্যমে তার গুণের দ্রুত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা হয়, যতে ক্রমে একটি প্রবর গোষ্ঠী গড়ে উঠে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সেই রাষ্ট্রে যাবতীয় পদে কর্মসংস্থান হবে কেবল গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের ; উচ্চ ও নিম্ন সকল পদেই যোগ্যতা অনুযায়ী কাজেকর্মে লোকে নিযুক্ত হবে। গুণতন্ত্রে শ্রেণীগত কোনও অগ্রাধিকার নেই ; গুণগত বিচারে সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীর মানুষই সব কিছু সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। রাষ্ট্রে সামাজিক সচলতা থাকে অনেকটা। গুণতন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে যা কিছু মনোভঙ্গি থাকুক না কেন, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় তার স্থান অবধারিত।

গৃহযুদ্ধ (Civil War)

কোনও দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য সে দেশের বিভিন্ন শ্রেণী, ধর্ম, জাতি অথবা রাজনৈতিক দল কিংবা গোষ্ঠীর মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ। প্রাচীন রোম, ইংল্যান্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে গৃহযুদ্ধের অনেক নজির আছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে উত্তর ও দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ ঘটে (১৮৬১-৬৫) ; প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন নিহত হন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের মাঝে এবং পরবর্তীকালে স্পেন, যুগোস্লাভিয়া, আফগানিস্তান ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে দীর্ঘকাল যাবৎ গৃহযুদ্ধ চলে। মার্কসীয় দৃষ্টিতে শ্রেণী সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় সামাজিক সংকটের ফলে গৃহযুদ্ধ সূচিত হয়। সময়বিশেষে গৃহযুদ্ধ আন্তর্জাতিক স্তরে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বিস্তৃত হয়। ১৯১৭ খ্রি রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের পর ক্ষমতাচ্যুত প্রতিবিপ্লবী শ্রেণী ও শক্তিগুলির যোগসাজসে অন্যান্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলে তীব্র গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। ১৯২১ খ্রি সোভিয়েত শাসন ব্যবস্থার জয় ও প্রতিষ্ঠা হয়।

গেরিলা যুদ্ধ (Guerrilla War)

বিজেতা বিদেশি শক্তি, দখলকারী সেনাবাহিনী কিংবা দেশেরই উৎপীড়ক শাসকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এক ধরনের অঘোষিত, বিক্ষিপ্ত ও সশস্ত্র গণসংগ্রাম। এর কর্মপদ্ধতি হল অন্তরালে গোপনে অবস্থান করে আচমকা ও অন্তর্ঘাতমূলক সশস্ত্র আক্রমণ। স্পেনীয় ভাষা থেকে শব্দটির উদ্ভব ও প্রচলন দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পূর্বে স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও চীনদেশে দখলকারী জাপানি ফৌজের বিরুদ্ধে সংগ্রামসূত্রে দেখা দেয়। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী ও বৈপ্লবিক, উভয় ধরনের সংগ্রামেই এই কৌশল প্রয়োগ করা হয়। কৌশলটি সম্পর্কে মাও জে-দং, আর্জেন্টিনার চে গুয়েভারা, ফরাসি কমিউনিস্ট রেজিস ডেবরে প্রমুখ বিপ্লবী নেতারা নানা ধরনের তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। মাও মনে করতেন জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম ও ক্ষমতা দখলের ক্রিয়াকৌশলে গেরিলাযুদ্ধ পদ্ধতি একান্তই আবশ্যক। ডেবরে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলেন যে বিপ্লবের পরিস্থিতি সৃষ্টির পক্ষে জনগণের সমর্থন অপেক্ষা গেরিলা যুদ্ধের প্রক্রিয়া অনেক বেশি কার্যকর। ওই সমস্ত তত্ত্বেই রাজনৈতিক ও সামরিক, উভয় প্রকার ভূমিকায় দলের কর্মপন্থাকে সঠিকভাবে রূপায়ণ গেরিলা আন্দোলনের পক্ষে সম্ভব। শহরাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ সন্ত্রাসবাদের সমার্থক হয়ে পড়েছে। গৃহযুদ্ধ অনেক সময় গেরিলা যুদ্ধের কর্মকৌশল অনুসরণ করে। তবে প্রতিবিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও ক্ষেত্রবিশেষে গেরিলা যুদ্ধের আকৃতি গ্রহণ করে।

দ্র. মাওবাদ ; গৃহযুদ্ধ

গোখলে, গোপালকৃষ্ণ (১৮৬৬-১৯১৫) (Gokhale, G.K.)

ভারতীয় রাজনীতির মডারেট (নরমপন্থী) ধারার অন্যতম প্রধান নেতা। জন্ম মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলায়। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন ছিল বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময়। ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপনার সঙ্গে 'সুধারক' পত্রিকার সম্পাদনাকালে তাঁর বয়স ছিল ২০... পুনা সার্বজনিক সভা ও প্রাদেশিক সম্মেলনের সচিব হন ২৫ বছরে...জাতীয় কংগ্রেসের সচিব হন ২৯ বছরে...রয়াল কমিশনে সাক্ষ্য দেন ৩১ বছরে...প্রাদেশিক আইনসভায় ৩৪ ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় সদস্য হন ৩৬ বছরে ; এবং ১৯০৫ খ্রি জাতীয় কংগ্রেসের যখন সভাপতি হন তখন তাঁর বয়স ৩৯। ওই বছরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সার্ভান্টস অব ইন্ডিয়া সোসাইটি। তখন থেকেই জীবনের শেষাবধি তিনি ছিলেন কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতা। গোখলেকে গান্ধীজি নিজের রাজনৈতিক গুরু বলে স্বীকার করতেন। গোখলের অপর এক অনুগামী ছিলেন জিন্না। কিন্তু উভয়ের কারও মধ্যে তাঁর জীবনাদর্শ প্রতিফলিত হয়নি।

ইউরোপীয় উদারনীতির গুণগ্রাহী দাদাভাই নৌরজি, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, ফিরোজ শা মেহতা প্রমুখ মডারেটদের উত্তরসূরি গোখলে দেশের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে রাজনৈতিক অগ্রগতির পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। সমকালীন অন্যান্য অনেক নেতার মতো তিনি রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সংমিশ্রণ ঘটাননি। কিন্তু তাঁর মতে রাজনীতির সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তিনি চাইতেন সংযম, শৃঙ্খলা,

যুক্তিশীলতা প্রভৃতি মূল্যবোধসম্পন্ন আদর্শের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির সামঞ্জস্যবিধান। ভারতীয় জনগণের শক্তি ও অপরিমেয় সম্ভাবনার প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল হলেও তিনি ধীরে চলো নীতির পক্ষপাতী ছিলেন, তাই তিনি চাইতেন বিদেশি শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সংঘর্ষের পরিহার। অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের দাবি এবং অর্থনৈতিক শোষণের তীব্র সমালোচনার সঙ্গে তিনি কামনা করতেন ইংরেজ শাসকদের এদেশের প্রতি বিবেকসম্পন্ন দায়িত্ব পালন ও সহযোগিতার মনোভাব।

গোষ্ঠীতন্ত্র (Oligarchy)

গ্রিক কথার বাংলা প্রতিশব্দ। অর্থ হল মুষ্টিমেয় ব্যক্তির দ্বারা শাসন। আরিস্তোতল **অভিজাততন্ত্রের** সঙ্গে এই প্রত্যয়টির পার্থক্য নিরূপণ করেছেন যে সর্বোত্তম দ্বারা শাসিত অভিজাততন্ত্র সবাইকার স্বার্থ রক্ষা করে, সেদিক থেকে গোষ্ঠীতন্ত্রের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কাছে নিজেদের স্বার্থই বড়। গোষ্ঠীতন্ত্রে একটি দলের সরকারের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে ; তাতে অন্য কারও স্বার্থ রক্ষিত হয়, কারও হয় না। সাধারণভাবে ক্ষমতা গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে অল্পবিস্তর আবদ্ধ থাকে, সেটা আইন ও কর্তৃত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা যোগসাজস করে ক্ষমতাকে নিজেদের মধ্যে ইচ্ছামত ব্যবহার করে। কাজেই একথা বলা যায় যে **রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র** নির্বিশেষে সরকারের উপর গোষ্ঠীতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। সেজন্য যাচাই করে দেখা ভাল যে কী রীতিনীতির ভিত্তিতে গোষ্ঠীতন্ত্রভুক্ত ব্যক্তিরা যুক্ত হয়েছে এবং তাদের ক্ষমতার পরিধি কতটা। নির্বাচনে হটিয়ে দেওয়া ছাড়া গোষ্ঠীতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা সাধারণ লোকের পক্ষে কতদূর সম্ভব তা নিয়ে বিতর্ক আছে। সেটা গণতন্ত্রে কষ্টসাধ্য নয়। তবে প্রভাব খাটিয়েও লোকে গোষ্ঠীতন্ত্রের মতিগতি বদলাতে পারে বলে কোনও কোনও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন।

গ্রামশি, আন্তনিয়ো (১৮৯১-১৯৩৭) (Gramsci, Antonio)

ইতালীয় দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিক। তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় ভাববাদী দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচে-র চিন্তায় প্রভাবিত হন। তুরিনের শ্রমিক আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়ে তিনি ইতালির সমাজতান্ত্রিক দলে যোগ দেন এবং সমাজতন্ত্রী পত্রপত্রিকায় লেখা দিতে শুরু করেন। দেশের পশ্চাৎপদ কৃষি-অর্থনীতি ও শিল্পসমৃদ্ধ শহরজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অনুভব করেন যে সমাজতন্ত্রী বিপ্লব ঘটাতে হলে ইতালিতে লোকগ্রাহ্য জাতীয় পটভূমিকায় শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের মধ্যে সাযুজ্য থাকা চাই।

অক্টোবর বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন যে শিল্পে অনুন্নত রাশিয়ায় সংঘটিত বিপ্লব মার্কসীয় ইতিহাসতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। ১৯২১ খ্রি জানুয়ারিতে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠায় গ্রামশির ছিল বিশেষ ভূমিকা। মস্কোয় **কমিন্টার্নের** কাজেও তিনি কিছুকাল যুক্ত ছিলেন। ১৯২৪ খ্রি ইতালির পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন এবং পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২৬ খ্রি গ্রামশিকে মুস্সোলিনি কারারুদ্ধ করেন।

গ

কারাগারে তিনি যেসব দিনলিপি রচনা করেন সেগুলি যুদ্ধোত্তর ইউরোপ বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের বুদ্ধিজীবী মহলে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তায় সেগুলি নতুন দিকদর্শিকা হিসেবে স্বীকৃত। **মার্কসবাদ**-এর কয়েকটি তত্ত্বকে তিনি নতুন আকারে দাঁড় করিয়েছেন, বিশেষ করে **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ** তত্ত্বটিকে। তাতে তিনি ইতালীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, চেতনা ও সংস্কৃতির ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত করেছেন। গ্রামশি ছিলেন মানবতাবাদী, এবং স্বৈরাচারতন্ত্রের কঠোর সমালোচক। বিদগ্ধ ও বুদ্ধিজীবী কমিউনিস্ট হিসেবে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন। **আধিপত্য** (হেগেমনি) সম্পর্কিত প্রত্যয়ে তিনি বলেছেন যে বিষয়টি জটিল এবং তার ছদ্মবেশী চরিত্র হল এমন এক শ্রেণীকর্তৃত্ব যার দ্বারা সারা সমাজের গতিপ্রকৃতি অদৃশ্য ও যান্ত্রিকভাবে প্রভাবিত এবং ক্ষমতাসীন শ্রেণী কর্তৃক অধিকৃত। ধ্রুপদী মার্কসবাদ অনুযায়ী **উৎপাদন-শক্তি**-সমূহ বিকশিত ও বিবর্ধিত হয়ে এমন এক জায়গায় পৌঁছয় যেখানে **উৎপাদন-সম্পর্ক** সেই শক্তিকে ধারণ ও বহনের পক্ষে অক্ষম হয়ে পড়ে। তখন বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ঘনিয়ে আসে, যাবতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। গ্রামশির তত্ত্ব অনুযায়ী সেটা কার্যত ঘটে না, কারণ **ভিত্তি ও উপরিকাঠামো** প্রত্যয়ের দ্বিতীয়টির অর্থাৎ সমাজ ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর শক্তি এতই প্রবল যে সেটা একটি শ্রেণীর অবস্থানকে শক্তপোক্ত করে তোলে। সেজন্য বিপ্লবীদের কাজ হওয়া উচিত স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষায়তন এবং চার্চ প্রভৃতির সাহায্যে নিঃশব্দে আধিপত্য (হেগেমনি) সৃষ্টি করা। তার ফলে একদিকে উপর থেকে প্রভাব বিস্তার এবং তলা থেকে শাসনব্যবস্থার ভিত্তি শিথিল করে বিপ্লবকে সুনিশ্চিত করা সহজ হবে।

বিপ্লবের জন্য সেকারণে চাই নতুন ধরনের আধিপত্য। সেটা ক্রমপ্রসারমান হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবে। গ্রামশি যে বিপ্লব চেয়েছিলেন সেটার লক্ষ্য দমনপীড়নকারী রাষ্ট্র নয়; যাবতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের গণতন্ত্রীকরণের মধ্যে দিয়ে সর্বস্তরের মানুষকে জড়িত করে দমনপীড়নের আবশ্যকতা পরিহার করাই ছিল প্রকৃত লক্ষ্য। তিনি যে আদর্শ তুলে ধরেন সেটা একটা সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ, নিছক একটা রাষ্ট্র নয়। সেই সমাজে দমনপীড়নের পরিবর্তে লোকের ঐকমত্য-ই হবে প্রগতির চালিকা শক্তি।

ঘ

ঘাটতি বাজেট (Deficit financing)

পরিকল্পিতভাবে আয় অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ। সরকারি ভাষায় অনেক সময়ে এই পদ্ধতিকে ক্ষতিপূরণের অর্থসংস্থান অথবা পাম্প করে টাকা ঢালা বলা হয়। বাজেটের ঘাটতি পূরণ করা হয় নানা ভাবে ঋণ সংগ্রহ করে। ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই হল প্রকৃত উদ্দেশ্য। সরকারি ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রবণতা অনেক সময়ে পূর্ণ কর্মসংস্থান সত্ত্বেও অব্যাহত থাকে, যাতে স্বাভাবিক সময়ে ঘাটতি আর্থিক নীতি একটি নীতি হিসেবে অনুসৃত হয়। সরকারের মুদ্রাসংক্রান্ত নীতির অঙ্গ হিসেবে ঘাটতি বাজেট প্রণালী প্রবর্তনের পিছনে জন মেনার্ড কিন্‌সের সুপারিশ প্রভাব বিস্তার করে। ঘাটতি বাজেটের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি তথা ক্রয়ক্ষমতা বর্ধিত হয় বলে মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। সরকারি ঋণের চাহিদা মেটাবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অতিরিক্ত নোট ছাপতে হয়।

চ

চরমপন্থা (Extremism)

অস্বচ্ছ শব্দ, যার নানারকম অর্থ হয়ে থাকে :

১. কোনও রাজনৈতিক চিন্তার ফলাফল, হিতাহিত, সম্ভাব্যতা, যৌক্তিকতা, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি নির্বিচারে শেষ সীমায় নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা ; এবং মুখোমুখি সংঘর্ষে আসাই শুধু নয়, বিরোধী পক্ষকে খতম করাও অভীষ্ট বিষয় ।

২. অপরের সব কিছু চিন্তার প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং অহিংসায় অনীহা ।

৩. রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য যেকোনও মাধ্যম অবলম্বন, যেটা প্রচলিত আচরণবিধি লঙ্ঘন করে, বিশেষ করে যেগুলি অপরের জীবন, স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকারের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে ।

৪. বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের অস্পষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শে বিশ্বাস এবং ক্ষমতা দখল ও সন্ত্রাসবাদী কৌশল প্রয়োগের চেষ্টা ।

চিরস্থায়ী বিপ্লব (Permanent Revolution)

কথাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন **মার্কস** ও **এঙ্গেলস** ; ১৮৫০ খ্রি অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট লিগের সাধারণ সংসদে এই অর্থে যে বুর্জোয়া শ্রেণী যত শীঘ্র সম্ভব বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটাতে চাইবে, ততই আমাদের কাজ হবে সেটাকে চিরস্থায়ী করা, যত দিন না পৃথিবীর প্রধান দেশগুলিতে সর্বহারা শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করছে ! চিন্তাটি অবশ্য মার্কস **প্রুঁদ**-র কাছ থেকে পান । উভয়ের ভাবধারায় **ত্রৎস্কি** প্রভাবিত হন । **লেনিন** চাইতেন বিপ্লবের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও নিরন্তর প্রয়াস ; কিন্তু তার সঙ্গে চিরস্থায়ী বিপ্লব প্রত্যয়ের মিল নেই ।

চিরস্থায়ী বিপ্লবের প্রবক্তা ত্রৎস্কির বক্তব্য ছিল যে অনুন্নত দেশে ইতিহাসের যাবতীয় পর্ব অতিক্রমের প্রয়োজন নেই, যেগুলি উন্নত দেশগুলি করেছে । অনুন্নত ও উন্নত সমুদয় পর্যায়কে একটির উপর অপরটি চাপিয়ে (telescope) বা ডিঙিয়ে বিপ্লবের

কর্মসম্পাদন করা দরকার। প্রাক-পুঁজিবাদী উন্নয়নশীল দেশের সর্বহারা শ্রেণী দেশি বুর্জোয়া শ্রেণী অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী। বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের ভূমিকা পালনে অক্ষম হলে সর্বহারা শ্রেণী দেশকে আধা সামন্ততন্ত্রী পর্যায় থেকে সরাসরি সমাজতন্ত্রে নিয়ে যাবে। বিজয়ী সর্বহারা শ্রেণীকে যুগপৎ অন্যান্য বিশেষ করে উন্নত দেশগুলিতে বিপ্লব প্রচেষ্টায় মদত জোগাতে হবে। ত্রৎস্কির মতে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামী স্তরে বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন অথবা তার পরিবর্তে সর্বহারা ও কৃষকদের অন্তর্বর্তীকালীন যৌথ গণতান্ত্রিক-বিপ্লবী একনায়কতন্ত্রের শাসন পর্যায় নিষ্প্রয়োজন। ত্রৎস্কি মনে করতেন লেনিন ১৯১৭ খ্রি রুশ বিপ্লবে এই রণনীতি প্রয়োগ করেছিলেন।

স্তালিন যখন তাঁর 'সমাজতন্ত্র একটি দেশে' মতবাদ ব্যক্ত করেন তখন ত্রৎস্কি তার পরিণাম বিষময় হবে বলে হুঁশিয়ার করে দেন। কারণ স্তালিনের যৌথ কৃষিব্যবস্থা সময় অনুযায়ী অনুপযোগী এবং **কমিন্টার্ন** সোভিয়েত দেশের পররাষ্ট্র বিভাগের একটি অবিপ্লবী দপ্তরে পরিণত হবে বলে ত্রৎস্কি মনে করেছিলেন। তাঁর মতে সোভিয়েত দেশের শিল্পোন্নয়ন ও জীবনধারণের মান কিছুটা উন্নত করাই সমাজতন্ত্র নয়, চাই শ্রমের উচ্চতর উৎপাদন ক্ষমতা এবং পুঁজিবাদী দেশের চেয়েও উন্নততর জীবনযাত্রার মান। তার জন্য চাই সর্বহারা শক্তির বিশ্ব অর্থনীতিতে আধিপত্য, যার জন্য প্রয়োজন অন্যান্য উন্নত দেশেও বিপ্লব ঘটানো।

চুক্তি (Treaty)

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত সংবিদা (agreement) কথাটির নানা সমার্থক শব্দ আছে : সন্ধি, প্রচল, অঙ্গীকার, বিধি, ঘোষণা, পররাষ্ট্রীয় আচরণবিধি। এই সব শব্দের কোনও বাঁধাধরা অর্থ নেই। কিন্তু চুক্তি শব্দটির মধ্যে দিয়ে একটি আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পাদিত সংবিদা প্রকাশ পায়। অন্য শব্দগুলি সে তুলনায় কম অথবা সীমিত আনুষ্ঠানিকতা জ্ঞাপন করে। **আন্তর্জাতিক আইন** অনুযায়ী চুক্তিপত্র রচনার নির্দিষ্ট কোনও আইন নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের নানাবিধ উৎসের অন্যতম হল চুক্তি। চুক্তির সাধারণত দুটি পর্যায় থাকে। এক, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত দূতের (plenipotentiary) স্বাক্ষর ; এবং দুই, রাষ্ট্রগুলির অনুমোদন। গণতান্ত্রিক দেশ চুক্তি-সম্পাদনের পূর্বে অনুকূল জনমত নির্ণয় করে থাকে। সময়বিশেষে চুক্তি হয় শর্তসাপেক্ষ এবং সে কারণে রূপায়ণেও ব্যত্যয় ঘটে।

রাষ্ট্রসংঘ যে সনদের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তার ১০২ ধারা অনুযায়ী সদস্যদের মধ্যে যাবতীয় আন্তর্জাতিক চুক্তি রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারিয়েটে রেজিস্ট্রিকরণ বিধেয়। যুদ্ধ বেধে গেলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে দ্বিমত আছে। চুক্তির সমাপ্তি সম্পর্কে নানা মতামত ও জটিলতা কম নয়। তাতে দুটি প্রশ্ন ওঠে : এক, কোনও এক পক্ষ অপর পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে কি না ; দুই, অন্য কোনও আইনের বলে চুক্তি সমাপ্ত করা যায় কি না। বর্তমান সমস্যা ও প্রয়োজনের তাগিদে চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেই চুক্তি পরবর্তীকালের শাসকদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে অনেক আইনবিদের মতে সেই চুক্তির পরিমার্জনার প্রশ্ন বিবেচিত হতে পারে।

দ্র. আইন

ছ

ছন্নছাড়া সর্বহারা (Lumpen-proletariat)

লুম্পেন শব্দটি জার্মান। মার্কস তাঁর 'এইটিন্থ্ ব্রুমেয়ার' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে এক ধরনের ব্যক্তির কথা বলেছেন যারা সব শ্রেণীর কাছেই জঞ্জাল-বিশেষ। উচ্ছৃঙ্খল এই জনসম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন, হঠকারী ও ছন্নছাড়া। তাদের মধ্যে থাকে ভবঘুরে, কর্মচ্যুত সৈন্য, ছাড়া-পাওয়া কয়েদি, পকেটমার, নিষিদ্ধ পল্লীর কারবারি, ভিখিরি, কাগজ-কুড়ানি ইত্যাদি যাদের উপর ফ্রান্সে উনিশ শতকের মধ্যবর্তীকালে ক্ষমতা দখলের সময় লুই বোনাপার্ত নির্ভর করতেন। পরবর্তীকালে মার্কসীয় লেখকেরা প্রায়শই সঙ্গতিবিহীন হলেও ফ্যাসিবাদের উত্থানে এই ধরনের লোকের ভূমিকা প্রত্যক্ষ করেন। ত্রৎস্কির দৃষ্টিতে শ্রমিক-শ্রেণীর বড় এক অংশ ছন্নছাড়া সর্বহারা সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

বস্তুত প্রত্যয়টির দ্বারা কোনও সুস্পষ্ট সামাজিক শ্রেণী বোঝায় না যাদের একটা আর্থ-রাজনৈতিক ভূমিকা থাকে। পুঁজিবাদী সমাজে চরম সংকটকালে সামাজিক টানাপড়েনে বিস্তর মানুষ শ্রেণীচ্যুত হয়ে ভেসে বেড়ায়, যাদের প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন ও মতাদর্শে কাজে লাগানো হয়।

জ

জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪) (Nehru, Jawaharlal)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা, জাতীয় কংগ্রেসের বার তিনেক সভাপতি এবং দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। ইংল্যান্ডে ছাত্রজীবন (১৯১০-১২) থেকে তিনি সেখানকার উদারনৈতিক গণতন্ত্রী আদর্শে প্রভাবিত হন। পরবর্তীকালে তাঁর ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রী মনোভঙ্গির সঙ্গে মার্কসীয় মতাদর্শ মিশ্রিত হয়। সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের প্রথমে তিনি টিলক ও অ্যানি বেসান্তের হোম রুল লিগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পরে অসহযোগ আন্দোলনসূত্রে গান্ধীজির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। কুড়ির দশকের শেষ দিকে কংগ্রেসের মাদ্রাজ (১৯২৭) ও লাহোর (১৯২৯) অধিবেশনে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করানোতে সমর্থ হন। জওহরলালের গ্রন্থাদির মধ্যে 'আত্মজীবনী', 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' ও 'গ্লিমপসেস অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি' তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয় অনেকাংশে বহন করে।

পিতা মোতিলালের অজ্ঞাবাদী ভাবনাচিন্তা জওহরলালের মনে সঞ্চারিত হয়। তবে তাঁর মননে বাস্তববাদিতা ও যুক্তিবাদিতার পরিমিশ্রণ দেখা যায়। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন হলেও তাঁর চিন্তায় অতীন্দ্রিয়বাদের কোনও ছাপ পড়েনি। তবে বুদ্ধ ও খ্রিস্টের তিনি ছিলেন বিশেষ অনুরাগী।

জওহরলাল এক দিকে খাদি উন্নয়ন ও গ্রামীণ শিল্পের কর্মসূচিতে বিশ্বাস করতেন, অন্য দিকে দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার চাইতেন। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রী পশ্চিমি ভাবধারা ও বৈচিত্র্যময় ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যের মধ্যবর্তী পথ অনুসরণের পক্ষপাতী। গান্ধীজির নির্ভীকতা, রাজনৈতিক আন্দোলনে জনগণকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করে তার নেতৃত্বদান এবং রাজনীতিতে অহিংসা, শান্তি ও নৈতিকতা সঞ্চারের প্রয়াস জওহরলালকে গান্ধীজির প্রতি আকৃষ্ট

করে। আধুনিকতার গুণগ্রাহী জওহরলালের সঙ্গে গান্ধীজির বহু বিষয়েই মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু তিনি কখনও গান্ধীজির ক্রিয়াকলাপের বিরোধিতা করেননি।

রাষ্ট্রচিন্তায় জওহরলালের মৌলিক অবদান বিশেষ না থাকলেও তাঁর অনুসৃত বহুবিধ কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি থেকে তাঁর নিজস্ব ভাবনাচিন্তা ও একটি সুস্পষ্ট মতবাদ ফুটে ওঠে। ব্রিটেনের **ফেবিয়ান সোসাইটির** গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী আদর্শ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে দেশোন্নয়নের প্রয়াস তাঁকে প্রভাবিত করে। তাই দেখা যায় ভারতীয় সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্রী প্রথায় নাগরিকদের মৌল অধিকারের সঙ্গে রাষ্ট্রের অনুসরণীয় নির্দেশাত্মক নীতির কথা বলা হয়েছে। আইনের শাসনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, সরকারি ক্ষমতার পৃথকীকরণ এবং রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। বিকেন্দ্রিত পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সমান্তরাল ধারায় **মিশ্র অর্থনীতির** প্রবক্তা হিসাবে ভারতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার তিনি প্রবর্তন করেন। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার প্রসার, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এবং আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়নে তিনি ছিলেন সবিশেষ উৎসাহী। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি অনুসরণ এবং জোটনিরপেক্ষতার মানসিকতা সৃষ্টির পিছনেও ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ও নেতৃত্ব।

জনগণ (People)

সাধারণ দৃষ্টিতে শব্দটির অর্থ হল যে নির্দিষ্ট কোনও ভূখণ্ডের অধিবাসী যাদের ভাষা ও সাহিত্য একই এবং বিশেষ এক ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা থাকে ও আচার-ব্যবহার, বেশভূষা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি প্রায় অভিন্ন, তারা সমষ্টিগতভাবে সেখানকার জনগণ হিসাবে পরিচিত। সমষ্টিগতভাবে এই বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজবন্ধনের প্রকৃত সূত্র, জাতি গঠনের প্রধান উপাদান। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসীরা সেখানকার সরকার তথা রাষ্ট্রের যেমন অধীন, আবার তারাই হল তার নিয়ন্ত্রণকারী। তাই বলা হয় 'সরকার জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য' (লিঙ্কন)। আধুনিক প্রত্যয় অনুসারে জনগণই হল **সার্বভৌমত্বের** উৎস। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের উদ্দেশ্য হল জনগণের অভীপ্সা নির্ণয়। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও কর্মপন্থার পিছনে বৈধতা নিরূপণ করে জনগণ। জনগণই হল মার্কসীয় মতানুসারে জনগণতান্ত্রিক সরকারের স্রষ্টা।

দ্র. জাতি, জাতি-রাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ [illegible], রাষ্ট্র।

জনগণতন্ত্র (People's Democracy)

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্টদের প্রভাবে গঠিত নতুন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা। সোভিয়েত রাষ্ট্রতাত্ত্বিকেরা জনগণতান্ত্রিক অর্থাৎ পিপলস ডেমোক্রেসি নামে সেগুলিকে অভিহিত করেন। মতাদর্শের বিচারে সেগুলির অবস্থান সোভিয়েত ইউনিয়নের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের নীচে। সেগুলির প্রধান লক্ষণ ছিল রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে শ্রমিক ও কৃষকদের যোগদান, সরকারি সংস্থায় শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্ব, আইন সভা ও প্রশাসন কর্তৃত্বের সংযুক্ততা, গণতান্ত্রিক

কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসারে সরকার পরিচালনা এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব। কোনও কোনও জনগণতান্ত্রিক দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা দেখা দেয় যার নেতৃত্বে থাকে সুসংবদ্ধ এক কমিউনিস্ট পার্টি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মতাদর্শের ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন দলকে জাতীয় ফ্রন্টে একতাবদ্ধ করে। বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির তারতম্য অনুযায়ী সেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হয় প্রধান লক্ষ্য। এই গণতন্ত্রে পার্টির যান্ত্রিক নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে লোকের যাবতীয় বক্তব্য, প্রতিনিধিত্ব ও জনমত প্রতিফলিত হয়। যেহেতু জনগণের জন্য নির্দিষ্ট এবং জনস্বার্থ সংরক্ষণ এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, সেকারণে এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে জনগণতন্ত্র বলা হয়।

জনতা (Masses)

জনগণ শব্দটির সমার্থক জনতা শব্দটিকে অনেক সময় ভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়। ইংরেজি mob (উন্মত্ত জনসাধারণ) কথাটির প্রতিশব্দ হিসেবে জনতা শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। সেই নিরিখে জনতা হল এমন এক জনসমষ্টি যারা চিন্তাভাবনার পরিবর্তে, সাময়িক উত্তেজনার বশে উচ্ছৃঙ্খল এবং অনেক সময় হিংসাত্মক আচরণে লিপ্ত হয়। স্পেনীয় দার্শনিক জে অরটেগা গ্যাসেট প্রত্যক্ষ করেন যে নবোদ্ভূত এই জনসমষ্টির প্রবণতা হল অসংযত ও নাশকতাপূর্ণ এবং মনোভাবে তারা সনাতন মূল্যবোধ ও সামাজিক সুস্থিতির প্রতি উদাসীন। তাঁর মতে এই হাবভাব ও আচরণের পিছনে রাজনৈতিক সংগঠনের প্রশ্রয় থাকে। বিশ্লেষণসূত্রে একথাও তিনি বলেন যে এটা হল আধুনিক এক গণতন্ত্র যেখানে সবাই চায় মেধা ও যোগ্যতা নির্বিশেষে সমান পদমর্যাদা। ফরাসি বিপ্লবে জনতাই ছিল প্রাধিকারের একমাত্র উৎস। মার্কসীয় দৃষ্টিতেও প্রগতি ও ঐতিহাসিক শক্তি সমুচ্চয়ের চালিকা শক্তি হল জনতা। কার্যক্ষেত্রে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে জনতার এই ভূমিকা স্বীকৃতি না পেলেও মাও জে-দং যাবতীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিবর্তনের সময়ে জনতাকে যুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন।

দ্র. ছন্নছাড়া সর্বহারা

জনতা দল (Janata Dal)

১৯৭৭ খ্রি গঠিত **জনতা পার্টি** বছর দুয়েকের মধ্যেই ভাঙনের মুখে পড়ে। পার্টির অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় লোকদল, জনসংঘ (পরে ভারতীয় জনতা পার্টি নাম গৃহীত হয়) ও সোসালিস্ট গোষ্ঠী নানা কারণে একের পর এক জনতা পার্টি পরিত্যাগ করে।

১৯৮৮ খ্রি রাজীব গান্ধী মন্ত্রিসভা তথা কংগ্রেস দলে এক সংকট দেখা দেয়। ১৯৮৭ খ্রি জুলাই মাসে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বিরোধী বিভিন্ন দল কংগ্রেসের বিকল্প সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৮৮ খ্রি ১৭ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজে এক সভায় জনমোর্চা নামে একটি সংগঠনে সমন্বিত হয়। তাতে জনতা পার্টির একাংশ, লোকদল,

কংগ্রেস (স), ডি এম কে, তেলুগু দেশম, অসম গণ পরিষদ প্রভৃতি সাতটি দল যোগ দেয়।

ওই বছরের ১১ অক্টোবর বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে অবশিষ্ট জনতা পার্টি, কংগ্রেস (ই) থেকে বহিষ্কৃত বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী, লোকদল (ব) এবং কংগ্রেস (স) সমেত জনমোচর্চা সহযোগে জনতা দল গঠিত হয়। পূর্বতন জনতা পার্টির গঠনতন্ত্র নবগঠিত জনতা দলের গঠনতন্ত্র হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৮৯ খ্রি ১১ এপ্রিল লোকসভায় দলটি স্বীকৃতি পায় এবং সেটিকে চক্রমধ্যে হলধর নির্বাচনী প্রতীক দেওয়া হয়। জনতা দলের কর্মপন্থা সংক্রান্ত দলিলে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রামীণ ও কৃষি অর্থনীতির উন্নয়ন, কাজের অধিকার, ভূমিব্যবস্থার সংস্কার, মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তফসিলি ও অন্যান্য অনুন্নত জাতি সমূহকে আইনানুগ সুযোগসুবিধা দান, কর্মসংস্থান, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৯০ খ্রি জনতা দল, বি জে পি ও বামপন্থী দলগুলির সমর্থনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী হন বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং। পরে বি জে পি সমর্থন প্রত্যাহার করায় মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে দলের একাংশ সমাজবাদী জনতা দল নাম গ্রহণ করে এবং কংগ্রেসের সমর্থনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করে। মাস কয়েক পরে সেটিরও পতন ঘটে।

১৯৯১ খ্রি মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচনে জনতা দলের মাত্র ৫৯জন লোকসভার সদস্যপদে জয়ী হন। তাঁদের মধ্যে ২০ জন সাংসদ অজিত সিং-এর নেতৃত্বে বেরিয়ে এসে প্রথমে একটি পৃথক দল গঠন এবং পরে কংগ্রেসে যোগ দেন। এটি ছিল দলের দ্বিতীয় ভাঙন। অবশিষ্ট ৩৯ জন সদস্য ১৯৯৪ খ্রি ২১ জুন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যান। মূলত দলের পূর্বতন সোসালিস্ট গোষ্ঠীর ১৪জন সদস্যকে নিয়ে জর্জ ফারনান্ডেজের নেতৃত্বে নতুন একটি দল প্রথমে জনতা দল (জর্জ) এবং পরে সমতা পার্টি নাম গ্রহণ করে। তাঁদের বিশিষ্ট নেতা রবি রায় দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা ভি পি সিং, সভাপতি এস আর বোম্মাই, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব ও উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়ককে দলের যাবতীয় দুর্গতির জন্য দায়ী করেন।

ইতিপূর্বে চন্দ্রশেখরের সমাজবাদী জনতা পার্টি ছেড়ে মুলায়ম সিং যাদব সমাজবাদী পার্টি গঠন এবং বহুজন সমাজ পার্টির নেতা কাঁসিরামের সহযোগে উত্তর প্রদেশে সরকার গঠন করেন (১৯৯৩)। ১৯৯৫ খ্রি সাধারণ নির্বাচনে দল বিহারে শাসনক্ষমতা বজায় রাখে, কিন্তু উড়িষ্যায় দল ক্ষমতাচ্যুত হয়। অন্য দিকে দল কর্ণাটকে ক্ষমতাসীন হতে সমর্থ হয়।

জনতা পার্টি (Janata Party)

১৯৭৫ খ্রি ভারত সরকার কর্তৃক ঘোষিত জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরবর্তী বছরে সেটি প্রত্যাহারের পর শাসক কংগ্রেসের বিরোধী দলগুলি কংগ্রেসের বিকল্প একটি শক্তিশালী দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের প্রেরণার প্রধান উৎস ছিলেন **জয়প্রকাশ নারায়ণ**, যিনি জরুরি অবস্থার সময় কারারুদ্ধ হন। সর্বভারতীয় পাঁচটি দল—কংগ্রেস (স), জনসংঘ, ভারতীয় লোকদল, সোসালিস্ট পার্টি ও স্বতন্ত্র পার্টি ঐক্যবদ্ধ হয়ে

১৯৭৭ খ্রি জানুয়ারি মাসে জনতা পার্টি নামে নতুন একটি দলে মিশে যায় এবং আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐক্যের আচ্ছাদনে অবশ্য সব দলই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক আসনে জয়ী হয়ে জনতা পার্টি কেন্দ্রে সরকার গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী হন মোরারজি দেশাই।

১৯৭৯ খ্রি পার্টির অভ্যন্তরীণ অনৈক্য প্রকাশ পায়। মন্ত্রিসভা থেকে চরণ সিংকে বাদ দেওয়া হয়। ওই বছরের মাঝামাঝি চরণ সিং-এর নেতৃত্বে কয়েকজন মন্ত্রিসহ পূর্বতন ভারতীয় লোকদলের সদস্যরা জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে আসেন। দলত্যাগীরা প্রথমে জনতা পার্টি (সেকিউলার) এবং পরে লোকদল নামে একটি নতুন দল গঠন করেন। ১৯৮০ খ্রি জনতা পার্টিতে একসঙ্গে দুটি দলের সদস্যপদ বজায়ের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার ফলে জন সংঘের সদস্যরা জনতা পার্টি থেকে পদত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টি গঠন করেন। ১৯৮৮ খ্রি জনতা পার্টির বৃহদংশ জনতা দল নামে নতুন একটি দলে মিশে যায়। পার্টি অবশ্য তার ক্ষীণ অস্তিত্ব নব্বই দশকের মাঝামাঝি বজায় রাখে। তামিলনাড়ুতে সুব্রহ্মণ্যম স্বামী পার্টির সভাপতি হিসাবে কর্মসূচি রূপায়ণ করেন। ওই সময়ে কংগ্রেসের সঙ্গে পার্টি মিশিয়ে দেবার কথাবার্তা চলে।

জনমত (Public Opinion)

জনজীবনে সক্রিয় লোকের সরব মতামতই জনমত হিসাবে পরিগণিত হয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মতামত নয়। জনমত বুঝে চলাই হল রাজনীতিকের একটি প্রধান কাজ। জনমতের দর্পণে রাজনৈতিক কাজ ও ভাবনার গুণাগুণ বিবেচিত হয়। জাগ্রত জনমতের অভিব্যক্তি হল গণতন্ত্রের গতিশীলতার লক্ষণ। ফরাসি বিপ্লবের গোড়ায় জনমতের গুরুত্ব সম্পর্কে ভাবনার প্রথম পরিচয় রুসোর চিন্তায় পাওয়া যায়।

প্রথম পর্যায়ে নেতৃস্থানীয় কিছু ব্যক্তি জনমত গঠনের জন্য কোনও চিন্তা ব্যক্ত করেন ; তারপর সেটা সর্বজনের মধ্যে প্রচার করা হয়। লোকে যখন সেটা বুঝে গ্রহণ করে তখনই তা জনমতে পরিণত হয়। জনমতের প্রতীক সাধারণত মানুষের স্বার্থ ও চাহিদার ভারসাম্য রক্ষার চিহ্ন বহন করে (ওয়ালটার লিপম্যান)। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিদ্যাবত্তা ও শুভবুদ্ধি অনেকাংশে উন্নত জনমতের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। সরকারের অনুকূলে উপযোগী জনমত বলতে লোকের মধ্যে এমন একটা দৃঢ়মূল মনোভঙ্গি বোঝায় যেটা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় দেয়।

তবে জনজীবনে লোকের বিশেষ কোনও বিষয়ে সম্ভাব্য আচরণ ও প্রবণতা নির্ণয় সংক্রান্ত নানাবিধ পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি, নির্বাচন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদির সঙ্গে জনমতের কোনও সঙ্গতির প্রশ্নে মতদ্বৈধ থাকলেও একথা বলা চলে যে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষানিরীক্ষা সাপেক্ষ জনমত বিষয়টি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্গত।

জনমত গঠন ও প্রকাশের প্রধান সহায়ক হল : ১. মুদ্রণযন্ত্র ও সংবাদপত্র, ২. রেডিও, টেলিভিশন ও সিনেমা, ৩. রাজনৈতিক দল, ৪. সভাসমিতি, ৫. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। সমাজতন্ত্রী দেশে সরকার এইসব সহায়ক সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে-কারণে জনমত সরকারি ইচ্ছাক্রমে গঠিত হয়। তাই স্বাধীন জনমত গঠনের প্রথম প্রয়োজন হল ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রী সমাজব্যবস্থা।

জয়প্রকাশ নারায়ণ (১৯০২-১৯৭৯) (Narayan, Jayaprakash)

জে পি নামে জনপ্রিয় জয়প্রকাশ নারায়ণ একটি বৃত্তি লাভ করে উচ্চ শিক্ষার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আট বছর অতিবাহিত করেন। সেখানে ব্যয়নির্বাহের জন্য নানা রকমের পেশা অবলম্বন করতে হয় তাঁকে। যুক্তরাষ্ট্রেই জে পি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রচনাদি পাঠ করে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। দেশে ফেরার পর তিনি বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। লাহোর কংগ্রেসে (১৯২৯) জওহরলাল নেহরুর ভাষণে উদ্দীপিত হয়ে জে পি চাকরি ছেড়ে কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনে যোগ দেন। তিরিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে কারাগারে অচ্যুত পট্টবর্ধন, মিনু মাসানি, আচার্য নরেন্দ্র দেব প্রমুখের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁদের সহযোগে ১৯৩৪ খ্রি নিখিল ভারত কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪২ খ্রি ভারত ছাড় আন্দোলনের সময়ে আত্মগোপন করে তিনি সংগ্রামের পুরোভাগে নেতৃত্ব দেন, তাতে জনচিত্তে তাঁর এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর হিংসাত্মক রাজনীতি ও মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তায় তাঁর অনাস্থা দেখা দেয়। তাঁর নেতৃত্বাধীন সোসালিস্ট গোষ্ঠী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসে। বিনোবা ভাবের সঙ্গে তিনি ভূদান যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেন এবং গান্ধীবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। একই সময়ে মানবেন্দ্রনাথের নবমানবতাবাদ দর্শন ও দলহীন রাজনীতি তাঁকে প্রভাবিত করে। ষাট ও সত্তরের দশকে দেশে প্রশাসনিক অধোগতি ও ব্যাপক দুর্নীতির প্রতিকার হিসাবে জে পি সারা দেশে সম্পূর্ণ ক্রান্তি আন্দোলন গড়ে তোলেন। ইন্দিরা গান্ধী সরকার জরুরি অবস্থা জারি করার ফলে জে পি কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর তিনি জনতা পার্টি গঠনে নেতৃত্ব দেন।

জাতি (Nation)

নির্দিষ্ট কোনও ভৌগোলিক এলাকার জনগণ যখন একই বংশ, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ এবং সুখ-দুঃখ, ত্যাগ, আবেগ, ঐতিহ্য ও গৌরববোধে অভিন্নহৃদয় হয়ে একই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যে উপনীত হতে চায় এবং অন্যান্য জাতিত্ব থেকে নিজেদের পৃথক মনে করে, ও সংগঠিতভাবে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয় তখন তাদের জাতি সত্তা দানা বাঁধে। কিন্তু কোনও জাতির সার্বভৌমত্ব থাকে না। সার্বভৌম ক্ষমতা আয়ত্ত হলে জাতি একটি রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হয়। জাতি সম্পূর্ণ স্বাধীন হলে সেটা একটি রাষ্ট্র গঠন করে। তবে জাতি গড়ে উঠলেই যে রাষ্ট্র গড়ে উঠবে তার নিশ্চয়তা নেই। কোনও জাতি সম্পূর্ণ স্বাধীন না হলেও জাতিত্ব থাকে, কিন্তু রাষ্ট্রকে স্বাধীন ও সার্বভৌম হতেই হবে। তবে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও স্বতন্ত্র জাতিত্বের ভিত্তিতে জাতি গঠিত নাও হতে পারে। আবার রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটলে জাতির অস্তিত্ব চলে যায় না। ইদানীং স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রকে জাতি হিসেবে অভিহিত করা হয় যার ভিত্তিতে গড়ে উঠছে ইউনাইটেড নেশনস্ অর্গানাইজেশন (রাষ্ট্রসংঘ)।

জাতির উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলি সর্বত্র সমানভাবে খাটে না। একই জাতিকে যেমন একাধিক রাষ্ট্রে বিভক্ত দেখা যায়, তেমনি একই রাষ্ট্রে দুই বা বহু জাতির মিলিত

অবস্থান চোখে পড়ে। ফরাসি ভাবুক রেনা 'নেশন' অর্থাৎ জাতির উপাদান হিসাবে ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক ঐকাত্ম্যকে মানতেন না। তাঁর মতে সবার মনে অতীতের স্মৃতিসম্পদের গরিমাবোধ এবং একসঙ্গে বসবাসের দৃঢ় ইচ্ছাই জাতি গঠনের শ্রেষ্ঠ উপাদান।

জাতিকুলবাদ (Racialism)

নৃতাত্ত্বিকেরা স্থায়ী শারীরিক লক্ষণের ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বংশানুক্রমিক স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী এক একটি মানব-পরিবারকে বিভিন্ন জাতিতে (race) বিভক্ত করেন এবং বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রা ও সমাজ-গঠনের প্রণালী প্রত্যক্ষ করে শ্রেণীবিভাগ করেন।

জাতিগত উচ্চনীচ মনোভঙ্গি ত্রিশের দশকে দেখা দেয়। বলা হয় যে জাতিকুল অনুযায়ী সংস্কৃতি গঠিত হবার ফলে উচ্চনীচ জাতিসমূহের মধ্যে মান-মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা সমান হওয়া সঙ্গত নয়। এই বৈষম্যমূলক মানসিকতা আবেগ-প্রসূত, কারণ কিছু মানুষকে বহিরাগত হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তবে সেটা সব সময় শারীরিক লক্ষণের নিরিখে নয়। যেমন ইহুদি-বিদ্বেষের পিছনে নানারকম যুক্তি দেখানো হয়। ক্রীতদাস-পদবাচ্য শ্রমিকদের অর্থনৈতিক শোষণের প্রয়োজনে চিহ্নিত করার জন্যও নিচু জাতির প্রত্যয় কাজে লাগানো হত। আধুনিক কালেও নানা ধরনের জাতিকুলবাদ তথা জাতিবিদ্বেষ ও বৈষম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণাঙ্গরা এই মনোভঙ্গির এক মস্ত ভুক্তভোগী। অনেক দেশে আইনের মাধ্যমে জাতিকুলবাদ রদের নানান প্রয়াস দেখা যায়।

জাতিত্ব (Nationality)

কোনও ভূখণ্ডের জনগণ যখন অধিকতর গভীর ঐক্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য জনগণ থেকে আত্মস্বাতন্ত্র্য অনুভব করে তখন জাতিত্বের উদ্ভব ঘটে। জাতিত্ব বিকশিত হয় যখন ওই ভূখণ্ডের জনগণের মধ্যে ভাষা, ধর্ম, বংশানুক্রম ও সংস্কৃতিগত ঐক্য বিরাজ করে। জাতিত্বের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বংশগত ও রাজনৈতিক চেতনা। প্রত্যয়টির অন্যান্য উপাদান হল ভৌগোলিক, আবেগপ্রবণ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের এবং ব্যবহারিক জীবনের ঐক্য। উল্লিখিত উপাদানগুলির মধ্যে বাহ্যিক উপাদানগুলি গৌণ, সেগুলি ব্যতিরেকেও জাতিত্ব গড়ে উঠতে পারে; প্রকৃতপক্ষে মুখ্য উপাদান হল ভাবগত ঐক্য। যদি একই ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহে সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদের জীবন গড়ে ওঠে এবং তাদের সুখ-দুঃখ,, ত্যাগ, আবেগ ও গৌরববোধ একই আকাঙ্ক্ষিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিজেদের ঐতিহ্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তখন তাদের আবেগ সম্পৃক্ত ভাবগত একতাবোধ জাতিত্ব গঠনের ভাবমূর্তি প্রস্তুত করে; তারা অন্যান্য জাতিত্ব থেকে নিজেদের সত্তা পৃথক বলে মনে করে। উল্লেখ্য, জাতিত্ব ও জাতি প্রত্যয় দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। জাতিত্ব যখন রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন এবং সুসংগঠিতভাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে

নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য পরিপূর্তির প্রয়াসী হয় তখন জাতিত্ব জাতিতে পরিণত হয়। জাতি হল জাতিত্বের পরবর্তী ধাপ এবং সেটা একটি রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে কিংবা স্বাধীন হবার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সচেষ্ট।

জাতীয় সমাজতন্ত্র (National Socialism)

জার্মানিতে নাৎসি দলের (ন্যাশনাল সোসালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি) মতাদর্শ যার ভিত্তিতে ১৯১৩ খ্রি অ্যাডলফ হিটলার অভিনব এই রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তত্ত্বগতভাবে প্রত্যয়টিকে আন্তর্জাতিক **সমাজতন্ত্রর** বিপক্ষে একটি জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ হিসেবে দাঁড় করানো হয় এবং প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধে পরাভূত ও হতোদ্যম দেশ ও জাতিসমূহের কাছে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের পরিমিশ্রণের যৌক্তিকতা দর্শানো হয়। গোড়া থেকে আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শটির অন্তর্নিহিত যে-সুর ফুটে ওঠে সেটি ছিল মূলত জাতীয়তাবাদী দেশাভিমান ও অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষ এবং সামরিক উচ্চাভিলাষ। জাতীয় আত্মাভিমান থেকে প্রকাশ পায় বাসভূমির দাবি যেটা **ভূরাজনীতির** সৃষ্টি করে। যে-জাতি প্রবল তাদের প্রয়োজনীয় বাসভূমির উপর সম্প্রসারণের অধিকার এবং যাদের দখলে সে-ভূমি থাকে তাদের উৎখাত করার সঙ্গে হীন জাতিসমূহকে তাদের কর্মফল অনুসারে নির্মূল করার অধিকার ও শক্তি প্রয়োগ করা হয়। জাতীয় সমাজতন্ত্রী তত্ত্বে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও লোকের সামাজিক সম্পর্ককে এক করে দেখা হয়, যাতে সব রকম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ফল রাষ্ট্রের উপর এসে পড়ে। কার্যত তাতে একদলীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। সামাজিক সমন্বয় বিধানের যাবতীয় দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর অর্পিত। ফলে গড়ে ওঠে এক **সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী** রাষ্ট্র। প্রত্যয়টির আংশিক সমাজতন্ত্রী বৈশিষ্ট্য হিসেবে কল্যাণরাষ্ট্র ও মিশ্র অর্থনীতির প্রবর্তন এবং শাসকশ্রেণীর উচ্ছেদ ঘটিয়ে এক মহানেতার অধিষ্ঠানের কথা বলা হয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার আধিপত্য, ইহুদি নিধন, শ্রমিক ও বামপন্থী তথা সমাজবাদী আন্দোলনের কঠোর দমন **হিটলারের** শাসনক্ষমতায় অবস্থানকালে (১৯৩৩-৪৫) নাৎসি কর্মসূচির প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

দ্র. নাৎসিবাদ ; ফ্যাসিবাদ

জাতীয়তাবাদ (Nationalism)

জাতির ইংরেজি প্রতিশব্দের অন্যতম হল ন্যাশনালিটি ও নেশন। দেশের জাতিকুল, সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে দেশবাসীর পারস্পরিক সংযুক্ত থাকার ইচ্ছা ও আবেগ থেকে গড়ে ওঠে ন্যাশনালিটি। সেটা স্বাধীনতা ও **সার্বভৌমত্বের** মিশ্রণে একটা নেশন হিসেবে রাজনৈতিক অভিধা লাভ করে। তার সঙ্গে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেখা দেয় রাষ্ট্র বা নেশন স্টেট ; ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদ হল তার ভাবগত পশ্চাৎপট।

মধ্যযুগে ইউরোপের কোনও কোনও জনপদে স্থানীয় শক্তিশালী নৃপতির অধীনে

লোকের সংবদ্ধ থাকার আবেগ থেকে **রেনেসাঁসের** বিভিন্ন পর্বে জাতীয়তাবাদী মানসিকতা অভুরিত হয়। আধুনিক কালে জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী আবেগ অষ্টাদশ শতকের শেষ দশক অর্থাৎ ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে ঘনীভূত হচ্ছে। বিপ্লব-উত্তর ইউরোপে নেশন-স্টেটের শক্তি ও সত্তা ক্রমে বৃদ্ধি পায়, বিকশিত হয় নেশনের আবেগে নান্দনিক নতুন মূল্যবোধ এবং নবোদ্ভূত রোমান্টিক আদর্শে মানুষের সৃজনশক্তির স্বাধীন চর্চার অবকাশ। জাতীয়তাবাদের বিবর্তনের ধারায় নেশন-স্টেট ক্রমে সমাজের প্রধান সংগঠনে পরিণত হয়েছে। মূল সমাজের পরিসর হয়েছে সংকুচিত। নেশন স্টেটের ক্রমবিবর্তনে গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক মাত্রার সমান মিশ্রণ ঘটে। **শিল্পবিপ্লব** ও ফরাসি বিপ্লবের যুক্ত ধারায় নতুন পুঁজিবাদী শ্রেণী সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটায়। নতুন জীবনযাত্রার প্রবণতা এবং যুক্তিবাদী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারবোধের উন্মেষ ঘটায় জাতীয়তাবাদ। পরাধীন দেশে জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা আন্দোলনের উপাদান জোগায়।

জাতির প্রতি আসক্তি, অনুরাগ ও অতীত গরিমার ভিত্তিতে জাতীয় আবেগ ও দেশহিতৈষা গড়ে ওঠে। সেটাই হল জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের উপাদান। রাষ্ট্রের গঠনে প্রয়োজন হয় জাতির, এবং এক বা অনেক জাতির সমন্বিত জাতীয়তাবাদী আবেগের উপাদানে রাষ্ট্র সুসংবদ্ধতা লাভ করে। জাতীয় পরিচয় (identity) রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। জাতীয় পরিচয় কেবল জাতিসত্তা অর্থাৎ ভৌগোলিক সংযুক্ততা, ভাষা, রীতিনীতি ও সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে না ; পৃথক অধিকার ও আনুগত্যের চেতনাও পরিচয়কে নিরূপণ করে। সেই চেতনা প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বিশেষ করে নৃকুলগত সম্পর্কে একাত্মতা সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হয়।

জাতীয়তাবাদের আলোর দিকটা পশ্চিমে ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে এবং তার অন্ধকার দিকটা বড় হয়ে দাঁড়ায়। তার একদা গণতন্ত্রী মানবতাবাদী ভূমিকা সংকীর্ণ জাত্যভিমান, অসহিষ্ণু অন্ধ দেশভক্তি, সংখ্যালঘুদের উপর পীড়ন, অন্য জাতির প্রতি বিদ্বেষ ও পররাজ্য গ্রাসের আচরণে ঢাকা পড়ে যায়। ফরাসি ভাবুক আর্নেস্ট রেনাঁ নেশনের উপাদান হিসেবে ভাষা ধর্ম, জাতি ও ভৌগোলিক সংযুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে, সবার মনে অতীতের স্মৃতিসম্পদের গরিমাবোধ এবং একসঙ্গে বসবাসের দৃঢ় ইচ্ছাই নেশনের শ্রেষ্ঠ উপাদান। তাঁর সূত্র ধরে **রবীন্দ্রনাথ** বলেছেন যে "নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ"। দুটি জিনিস এই মানস পদার্থের "অন্তঃপ্রকৃতি" গঠন করেছে। একটা হচ্ছে "সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ, আর একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা।" জাতীয়তাবাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে একদিকে তাতে সমষ্টিগত স্বার্থপরতার তাড়নায় ব্যক্তি মানুষের মনে বিদ্বেষভাব সঞ্চারিত হয়, অন্যদিকে সমষ্টির নামে সেটা রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিমানুষকে বলিদান করে। তাঁর দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ একটি মহামারী বিশেষ, যেটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের নৈতিক প্রাণশক্তিকে গ্রাস করেছে। দেশপ্রেমের নামে যে ভূগোল প্রতিমার পুজো চলেছে তাকে তিনি পরিহার করেন।

জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করে **মানবেন্দ্রনাথ রায়** বলেছেন যে দেশাভিমান, জাতিতে-জাতিতে বিদ্বেষ, বৈরিতা ও সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি ছেড়ে বিশ্বজনীনতার আশ্রয়ে

সর্বদেশের মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন কর্তব্য। জাতীয়তাবাদ তাঁর দৃষ্টিতে আধুনিকতা ও প্রগতির অন্তরায়, জাতির বিমূর্ত স্বার্থে জাতীয়তার নামে জনসাধারণকে ত্যাগের আহ্বান জানানো হয়। দেশের ঐক্যের অজুহাতে লোকের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে হরণ করা হয়। জাতীয়তাবাদের পক্ষপুটে ও সমাজতন্ত্রের ছদ্মবেশে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ঘটে।

মার্কসীয় দৃষ্টিতে জাতীয়তার বিষয়টি **বুর্জোয়া** ও ক্ষুদে বুর্জোয়া মতাদর্শের অন্তর্গত। ইতিহাসতত্ত্বের বাইরে এবং শ্রেণীসম্পর্কের অতীত হিসেবে জাতিকে সমাজজীবনের শীর্ষে স্থাপন করে জাতীয়তাবাদ ; শ্রেণী নির্বিশেষে সর্বস্তরে সকলের স্বার্থকে সমন্বিত করা হয় তাতে। জাতীয়তাবাদ সংশ্লিষ্ট জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে দাবি ও তার স্বাতন্ত্র্য দাবি করে। প্রতিক্রিয়াশীলেরা জাতীয়তাবাদের সাহায্যে প্রায়শই শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনাকে ভোঁতা করে দেয়, তাদের শ্রেণীগত সংগ্রামকে ব্যাহত করে। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের একটি পর্যায়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের নিরসনে কৌশল হিসেবে নিপীড়িত মানুষকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও সচেতন করার কাজে জাতীয়তাবাদের এক সাময়িক প্রয়োজন থাকে।

বলা হয়ে থাকে যে বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে একটি মহান মতাদর্শ হিসেবে তার তত্ত্বগত পারম্পর্যের মধ্যে এক বিরাট অসঙ্গতি দৃশ্যমান। একই জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক বহুত্ব খুবই আদরণীয় ; আবার যে-নিরিখে একটি জাতির অস্তিত্ব বা জীবনযাত্রার মূল্য বেশি গুরুত্ব পায় তার ভিত্তি কাঁচা থাকে। কারণ ওই নিরিখ অনুযায়ী পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি যেন আজ আত্মবিনাশের দিকে চলেছে।

জিন্না, মহম্মদ আলি (১৮৭৫-১৯৪৮) (Jinnah, M. A.)

অবিভক্ত ভারতের বিশিষ্ট জননেতা, দ্বি-জাতি তত্ত্বের মুখ্য প্রবক্তা এবং **পাকিস্তান** রাষ্ট্রের প্রথম গভর্নর জেনারেল। করাচিতে জন্ম ও মৃত্যু। আইনজীবী হিসাবে পসার এবং ১৯০৮ ও ১৯১৬ খ্রি রাজদ্রোহ মামলায় লোকমান্য **টিলক**-এর পক্ষ নিয়ে তাঁকে অভিযোগ থেকে মুক্ত করার ফলে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯০৬ খ্রি তিনি ছিলেন মডারেট নেতা দাদাভাই নৌরজির একান্ত সচিব। **জিন্নাকে** হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের একজন দূত হিসাবে দেখেছিলেন মডারেট জননেতা ও অর্থনীতিবিদ **গোপালকৃষ্ণ গোখলে**। জীবনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কাল জিন্না ছিলেন জাতীয়তাবাদী একজন মডারেট নেতা। ১৯১০ ও ১৯১৬ খ্রি তিনি বোম্বাই মুসলিম-নির্বাচন-কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যপদে নির্বাচিত হন। প্রথমে তিনি মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধী ছিলেন। পরে অবশ্য তাতে তিনি সায় দেন এই দৃষ্টিতে যে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়কে জাগিয়ে তোলার পক্ষে সেটা হয়তো একদিন সহায়ক হবে।

১৯১৩ খ্রি জিন্না নিখিল ভারত **মুসলিম লিগ**-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেন। তিনি লিগে যোগ দেন এই শর্তে যে তাতে যেন সমগ্র [illegible]তির প্রতি তাঁর কর্তব্যকর্ম বিঘ্নিত না হয়। ১৯১৪ খ্রি ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ভারত শাসন আইন সংস্কার সংক্রান্ত বৈঠকে

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে প্রেরিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন জিন্না। ১৯১৬ খ্রি **টিলক** ও অ্যানি বেসান্ত **হোম রুল লিগ** প্রতিষ্ঠা করেন ; বেসান্ত অন্তরীণ হলে জিন্না ওই লিগে যোগ দেন। ১৯১৬ খ্রি লখনৌতে লিগ ও কংগ্রেসের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল জিন্না ছিলেন তার অন্যতম স্বাক্ষরকারী

জিন্নার সঙ্গে কংগ্রেসের মনের মিলন প্রথম ধাক্কা খায় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে (১৯২০), যেখানে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। খিলাফত আন্দোলনে তিনি বিশ্বাস করতেন না এবং একজন আইনজীবী হিসাবে তাঁর কাছে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিতে আইনবিরুদ্ধ বলে মনে হয়েছিল। খাদির পরিবর্তে তিনি চেয়েছিলেন পুরোপুরি একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি। সরকার-নিয়োজিত বিভিন্ন কমিশনের সদস্য হিসাবে জিন্নার মতামতকে মডারেট রাজনীতিকেরা সমর্থন করতেন।

১৯২৮ খ্রি মোতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ভারত-শাসন সংস্কারের বিষয়ে বিকল্প শাসন-কাঠামোর খসড়া প্রস্তুতিকল্পে গঠিত সর্বদলীয় কমিটিতে জিন্না একটি ১৪ দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। তাতে তিনি আইনসভায় হিন্দু ও মুসলমানদের সমসংখ্যক প্রতিনিধি সংস্থানের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। অতঃপর জিন্না সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে লন্ডনে আইনব্যবসায় শুরু করেন (১৯৩০)। অন্যান্য মডারেট নেতাদের মতো তাঁকেও কোণঠাসা করা হয়।

ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি জিন্না দেশে ফিরে আসেন ও মুসলিম লিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নিষ্প্রভ লিগও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এর পর তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিরন্তর আন্দোলন সৃষ্টি করেন। ১৯৩৯ খ্রি ২২ ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেস যখন সাতটি প্রদেশ থেকে মন্ত্রিসভা প্রত্যাহার করে নেয় তখন তাঁর নেতৃত্বে লিগ দিনটিকে মুক্তিদিবস হিসাবে পালন করে। কংগ্রেসকে তিনি বর্ণহিন্দুদের আধিপত্যে চালিত একটি দল হিসাবে অভিহিত করেন এবং পশ্চিমি ধাঁচে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁর আশঙ্কা ছিল যে তাতে অনিচ্ছুক মুসলিম, অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণের হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মীয় মানুষদের উপর উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আধিপত্য করবে। মুসলিম লিগকে তিনি মুসলমানদের একমাত্র দল এবং কংগ্রেসকে হিন্দুদের সংগঠন হিসাবে প্রচার করেন। লিগের লাহোর অধিবেশনে (১৯৪০) তাঁর নেতৃত্বে মুসলমানদের স্বতন্ত্র বাসভূমি হিসাবে স্বাধীন **পাকিস্তান** রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জিন্না মুসলমানদের স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনে সফল হলেও নিজে ধর্মান্ধ ছিলেন না। তিনি ছিলেন আধুনিক মনোভাবাপন্ন একজন রাজনীতিক। তাই পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রথম বক্তৃতায় তিনি ধর্মনিরপেক্ষ একটি রাষ্ট্রের আদর্শ তুলে ধরেন। ভারতীয় রাজনীতির স্ববিরোধ ও জটিলতা থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। ভারতকে বিভক্ত করে ইংরেজদের শাসন চালানোর নীতির তিনি ক্রীড়নক হয়ে পড়েন ; হিন্দু আধিপত্যের আশঙ্কায় তিনি সে-পথে অগ্রসর হন। স্বভাবতই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা ছিল দিব্যতন্ত্র-ঘেঁষা। তিনি চাইতেন পশ্চিমি শোষণমূলক অর্থনীতির পরিবর্তে সাম্যের আদর্শে ইসলামি অর্থনীতি।

জিরো আওয়ার (Zero Hour)

সংসদের উভয় কক্ষের কাজ শুরু হয় সকাল ১১টায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। এই সময়ে মোটামুটি একটা শৃঙ্খলা বজায় থাকে। তারপর ঘড়িতে যখন ১২টা বাজে তখন একসঙ্গে বিস্তর সাংসদ দাঁড়িয়ে ওঠেন এবং চিৎকার করে অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শুরু হয় তখন জিরো আওয়ার। সে সময়ে সাংসদেরা তাঁদের ইচ্ছামতো বক্তব্য তুলে ধরে তা নথিভুক্ত করাতে পারেন। জিরো আওয়ারের পর প্রেস গ্যালারি প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়। অতঃপর বিভিন্ন বিল উত্থাপিত হয়।

জেফারসনীয় গণতন্ত্র (Jeffersonian Democracy)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট (১৮০১-৯), রিপাবলিক্যান দলের নেতা এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টমাস জেফারসন (১৭৪৩-১৮২৬) স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (১৭৭৬) প্রণয়ন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা অর্থাৎ কংগ্রেসের উভয় কক্ষের কার্যপরিচালনবিধি আজও জেফারসনের তৈরি খসড়া অনুসরণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনাসূত্রে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার সুদূরপ্রসারী নানান মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষিনির্ভর সমাজজীবনের প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ আকর্ষণ। তাঁর মতে দেশের সংবিধান জন-অভীপ্সাকে প্রতিফলিত করে। দ্বি-কক্ষ আইনসভা, আদালতের স্বাতন্ত্র্য ও মানবাধিকারের তিনি সমর্থক ছিলেন। ফরাসি বিপ্লবসূত্রে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বিমূর্ত তত্ত্বের পরিবর্তে বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী সরকারের প্রকৃতি নিরূপিত হওয়া সঙ্গত। পরবর্তী প্রজন্মের উপর সংবিধান চাপিয়ে দেওয়াও অনুচিত। দ্বি-কক্ষ আইনসভা ছাড়াও তাঁর গণতন্ত্রী প্রত্যয়ের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে ছিল সর্বজনীন ভোটাধিকার, **অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের** দায়িত্ব, নাগরিকের অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ক্ষমতার বিভাজন, ক্ষমতার প্রয়োগে কার্যকর **নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য** নীতি। জেফারসন চাইতেন **যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার** যাতে অঙ্গরাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের বেআইনি আচরণ থেকে রক্ষা পায় এবং ক্ষমতা **বিকেন্দ্রীকরণে** সাংবিধানিক নিশ্চয়তা থাকে।

জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন (Non-Aligned Movement)

একটি রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি অনুযায়ী বিশ্বের বৃহৎ কোনও শক্তিগোষ্ঠীর সঙ্গে সেটির যুক্ত না হওয়া এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। জোট-নিরপেক্ষতা প্রত্যয়টি সবিশেষ দানা বাঁধে যখন পশ্চিমি রাষ্ট্রগোষ্ঠী বনাম পূর্বতন সোভিয়েত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। বহু ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থাসম্পন্ন বিশ্বের যে সব রাষ্ট্র জোট-নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে সেগুলি **সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা,** যুদ্ধপ্রস্তুতি এবং যাবতীয় সামরিক জোটে যোগদানের বিরোধী। জোট নিরপেক্ষতা প্রত্যয়টি **নিরপেক্ষতা**-নীতির বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে শান্তি ও সহাবস্থানের নীতি স্থাপনকল্পে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় উদ্যম হিসেবে গড়ে উঠেছে। ১৯৫৫ খ্রি ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং সম্মেলনে চীন ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত (১৯৫৪)

পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে জোট-নিরপেক্ষতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো, ভারতের প্রধানমন্ত্রী **জওহরলাল নেহরু** এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের। ১৯৬১ খ্রি বেলগ্রেডে ভূমধ্যসাগরের কূলবর্তী দেশগুলি, আফ্রিকা ও এশিয়ার ৩৫টি দেশের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে জোট-নিরপেক্ষতা আন্দোলন সংগঠিত রূপ পরিগ্রহ এবং ষাট ও সত্তরের দশকে রাষ্ট্রসংঘের নীতিনির্ধারণে সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। Non-Aligned Movement (NAM) নামক গঠিত সংস্থার বর্তমান সদস্য-সংখ্যা শতাধিক। বিভিন্ন সদস্য-দেশে চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত শীর্ষ-সম্মেলনে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচিত হয়।

জ্যাকোবাঁবাদ (Jacobinism)

১৭৮৯ খ্রি গঠিত ফ্রান্সের একটি বিপ্লবী দল। পারি শহরের জ্যাকোবাঁদের পূর্বতন মঠে তারা মিলিত হত। সারা দেশে তারা প্রায় চল্লিশ হাজার ক্লাব গঠন করে। রোবসপিয়ের ছিলেন দলের প্রধান নেতা। বিভিন্ন বিপ্লবী দলের মধ্যে জ্যাকোবাঁ দল ছিল সবচেয়ে উগ্র। এবং জাতীয় পরিষদে এই দল ছিল সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। এরা মনে করত এদের দৃষ্টিভঙ্গি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেটা তাদের কার্যকলাপ ও কর্তৃত্বকে নিশ্চয়তা দেয়। শুভ লক্ষ্যে পৌঁছতে যে কোনও মাধ্যম অবলম্বিত হতে পারে বলে এরা মনে করত। লোকে সাধারণত অজ্ঞ ও নিস্পৃহ, কাজেই তাদের জোর করে বিপ্লবে যোগ দিতে বাধ্য করা প্রয়োজন। **লেনিন** ছিলেন জ্যাকোবাঁদের অনুরাগী। জ্যাকোবাঁ দল সংসদ ও জাতীয় পরিষদে চরমপন্থী বিপ্লবী মোর্চা মঁতাগার্দ-এর উপর আধিপত্য করত। জননিরাপত্তা ও সাধারণ নিরাপত্তা সমিতিতেও জ্যাকোবাঁ দলের ডেপুটিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ৯ থার্মিডর (২৭ জুলাই, ১৭৯৪) তারিখে রোবসপিয়েরের পতনের পর জ্যাকোবাঁ দলের আধিপত্য চলে যায়।

ট

টিলক, বালগঙ্গাধর (১৮৫৬-১৯২০) (Tilak, B. G.)

আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক শীর্ষস্থানীয় জননেতা ও ধর্ম-দর্শনের ভাষ্যকার। মহারাষ্ট্রে রত্নাগিরিতে এক চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। রাজনীতিতে পুরোপুরি প্রবেশের আগে ডেকান এডুকেশন সোসাইটি স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তারের কাজে ব্রতী হন। প্রায় একই সময়ে মরাঠি ভাষায় 'কেশরী' এবং ইংরেজিতে 'মরাঠা' নামে দুটি সাময়িকপত্রে সমাজ-সংস্কার ও রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির কাজে লিপ্ত থাকেন। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাদির মধ্যে 'গীতারহস্য' বইটি বিখ্যাত।

টিলক ছিলেন একাধারে রক্ষণশীল এবং চরমপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। সেকারণে তাঁর সঙ্গে পত্রিকা-সম্পাদনার বিষয়ে গোপাল গণেশ আগারকার (১৮৫৬-৯৫) এবং পুনা সার্বজনিক সভার কর্মসূত্রে মডারেটপন্থী গোপালকৃষ্ণ গোখলে (১৮৬৬-১৯১৫) প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়; ক্রমে তিনি রাজনৈতিক কাজে বেশি জড়িয়ে পড়েন। অভিজাতবর্গ কর্তৃক অধিকৃত জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী কর্মপন্থা তাঁর মনঃপূত ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে নিম্নবর্গের জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটাতে। হিন্দু ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের সঙ্গে স্থানীয় জাতীয় বীরদের স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে তিনি ১৮৯৪ খ্রি সর্বজনীন গণপতি পূজা এবং শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেন। মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (১৮৪২-১৯০১) প্রমুখ নেতারা তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হবে বলে অনুমান করেন। ওই সময়ে বাল্যবিধবা-বিবাহ ও বিবাহের বয়স ১০ থেকে ১২ বছরে বৃদ্ধির জন্য আনীত বিলের (১৮৯১) বিরুদ্ধে টিলক জনমত সৃষ্টি করেন। টিলক মনে করতেন যে আইনের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ সামাজিক বিকাশ ও জাতীয় স্বাধীনতার মাধ্যমে সমাজসংস্কার প্রয়াস কার্যকর হবে। তাঁর সঙ্গে বোম্বাইয়ের মডারেট নেতৃবৃন্দের কংগ্রেসের পুনা অধিবেশনে (১৮৯৫) প্রবল

মতবিরোধ দেখা দেয়। সংস্কারবিরোধীদের সমর্থনে তিনি সার্বজনিক সভার নির্বাচনে রাণাডে ও মডারেটদের পরাজিত করেন।

সরকারের অর্থনৈতিক কর্মপন্থার বিরুদ্ধে দেশের দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের অভিযোগ তুলে আন্দোলন এবং প্লেগ মহামারিতে তিনজন ব্রিটিশ কর্মচারীকে হত্যার দায়ে ১৮ মাসের কারাদণ্ডে তিনি দণ্ডিত হন (১৮৯৭)। জনগণের চিত্তাকর্ষক রাজনীতি ও একাধিকবার কারাবাস টিলককে সবিশেষ জনপ্রিয় করে তোলে। অনতিকাল পরে বাংলা-বিভাগের বিরুদ্ধে বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলনের সমর্থন এবং সারা দেশে চরমপন্থী আন্দোলনের এক নতুন ধারায় যুক্ত হন। চরমপন্থী অন্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তি।

১৯০৮ খ্রি টিলক বর্মায় কারারুদ্ধ হন। মামলায় তাঁর পক্ষে আইনজীবী ছিলেন **জিন্না**। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে (১৯০৭) দলে ভাঙন ধরেছিল। **মুক্তির** পর বোম্বাই প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯১৫) তিনি জাতীয় **শিক্ষা**, **স্বদেশী**, **বয়কট** ও **স্বরাজের** কর্মসূচি নিয়ে নতুন উদ্যমে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। কংগ্রেসের লখনৌ অধিবেশনে (১৯১৬) কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে চুক্তি-সম্পাদনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। অতঃপর বোম্বাইতে আনি বেসান্তের সহযোগে **হোম রুল লিগ** স্থাপন করেন। মৃত্যুর পূর্বে লোকমান্য টিলক গান্ধীর **অসহযোগ** ও **খিলাফত** আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন।

টিলক হিন্দুদের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে একটি শক্তিশালী হিন্দুজাতি গঠনের প্রয়াসী হন। তাঁর মতে সেই ব্যক্তিই হবেন হিন্দু যিনি বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণাদিতে আস্থাবান। অনেকটা সেই নিরিখে টিলক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তবে পশ্চিমি শিক্ষাধারার বর্জন তিনি চাননি, পশ্চিমি যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় রক্ষণশীল ও সনাতনী জীবনবোধের পরিমিশ্রণে সমাজসংস্কার চিন্তা এক জটিলতার সৃষ্টি করে। তিনি মনে করতেন যে রাজনৈতিক চেতনা ও স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজন সর্বাগ্রে, নইলে সমাজসংস্কার-প্রয়াস সফলকাম হবে না। তাঁর মতে হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথার ক্ষতিকর দিক থাকলেও সেটা দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের বিকাশ ও সংরক্ষণের পক্ষে সহায়ক ছিল। বেদ ও গীতার বাণীকে আদর্শ হিসেবে রেখে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছিলেন। মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার অনুযায়ী টিলক সংসদে প্রবেশের নীতিকে সমর্থন করেন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তিনি কংগ্রেস ডেমোক্রেটিক পার্টি নামে একটি মঞ্চ গঠন ও তার নির্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করেন।

ট্রেড ইউনিয়ন (Trade Union)

কলকারখানার শ্রমিক সংগঠন। আঠারো শতকে ইংল্যান্ডে **শিল্প বিপ্লবের** আগেই এর উদ্ভব হতে শুরু করে। সেখানে তখন অসুখবিসুখে ও বার্ধক্যে পারস্পরিক নিরাপত্তা বিধান এবং মালিকপক্ষের সঙ্গে মজুরি ও অন্যান্য শর্তাদি নিয়ে দরাদরি করাই ছিল তাদের কাজ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রাবল্যের দরুন সেগুলিকে বিরুদ্ধ পরিবেশের সম্মুখীন হতে হত। কারণ বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লবের পর সেগুলি জনশৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর বৈপ্লবিক সংস্থা হিসেবে প্রতিপন্ন হত। শ্রমিকদের বেআইনি সংস্থা

গঠন দমনের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে ১৭৯৯ ও ১৮০০ খ্রি গৃহীত আইনের সাহায্যে শাস্তিপ্রদানের ব্যবস্থা হয়েছিল। অবশ্য ১৮২৪ খ্রি ওইসব আইন রদ হয়ে যায়। ১৮৬৯ খ্রি রয়্যাল কমিশন নিযুক্ত হয় এবং ১৮৭১ খ্রি ট্রেড ইউনিয়ন আইন প্রবর্তিত হবার পর ট্রেড ইউনিয়নগুলি শিল্পশ্রমিকদের কাছে জনপ্রিয় হতে শুরু করে। দর কষাকষির মাধ্যম হিসেবে ধর্মঘটের অধিকার আইনসঙ্গত বলে স্বীকৃতি পায় এবং শিল্পশ্রমিকদের আধুনিক আন্দোলন পদ্ধতি শুরু হয়।

ট্রেড ইউনিয়ন তার সদস্যদের বেশি মজুরি, তাদের স্বার্থের অনুকূল উন্নত শর্তাদি, কাজের সময় কমানো, সবেতন ছুটি এবং নানা ধরনের সুবিধা আদায় করে। এইসব ব্যাপারে ইউনিয়ন মালিকদের সঙ্গে নানা কিছু চুক্তি করে যার সুযোগসুবিধা সদস্যরা ছাড়াও অন্যান্যেরাও পায়। মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা ভেস্তে গেলে ইউনিয়ন ধর্মঘটের ডাক দেয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ট্রেড ইউনিয়নকে কর্তৃপক্ষ ও সরকার দাবিয়ে রাখত, শতকের শেষ দিকে ক্রমে ইউনিয়ন তার ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতি পায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৫ খ্রি বিধিবদ্ধ ন্যাশনাল রিলেসান্স অ্যাক্ট শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। ইদানীং পশ্চিমি দেশগুলির রাজনীতিতে ট্রেড ইউনিয়ন বিভিন্ন ধরনের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর অন্যতম হয়ে উঠেছে। সেগুলির স্বার্থান্বিত ঐক্যসূত্রে একটা সংগ্রামী সত্তা ফুটে ওঠে। বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পবাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও জাতীয় বেতন কাঠামো নির্ধারণে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের যুক্ত করা হয়। যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্য সময় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা শ্রমিকদের স্বার্থই বেশি দেখেন, তার বেশি জাতীয় স্বার্থে নিজেদের জড়াতে চান না। সময় বিশেষে অধস্তন সদস্যরা নেতৃবৃন্দের দ্বারা স্বীকৃত শর্তাদি অমান্য করেন।

কমিউনিস্ট দেশের সমাজে ট্রেড ইউনিয়নের বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ভূমিকা থাকে, তাদের রাষ্ট্রের হয়ে অনেকটা এজেন্টের মতো কাজ করতে হয়। কমিউনিস্ট তত্ত্বানুসারে শ্রমিক ও রাষ্ট্রের স্বার্থ অভিন্ন। কমিউনিস্ট দেশে সেজন্য ধর্মঘট অচল; রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলাই নিয়ম।

উনিশ শতকে ও বিশ শতকের গোড়ায় ট্রেড ইউনিয়নকে এক নতুন সমাজব্যবস্থার পুরোধা হিসেবে দেখা হত। সমাজতন্ত্রই ছিল ট্রেড ইউনিয়নের স্বাভাবিক আদর্শ। ফ্রান্সে সিন্ডিক্যালিজম ও ইংল্যান্ডে গিল্ড সোসালিজম বৈপ্লবিক আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হত। ট্রেড ইউনিয়নের ভাবধারা সমাজের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে ধনতন্ত্রকে উচ্ছেদের কথাও বিপ্লবীদের মনে উদয় হয়। রাজনৈতিক কারণে ইউনিয়নসমূহ ধর্মঘট করলেও তাদের মুখ্য লক্ষ্য ছিল নিজেদের সদস্যদের উন্নতি বিধান।

সব দেশেই ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে উঠেছে। ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, হিন্দ মজদুর সভা, সিটু (সেন্টার ফর ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস) ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় সংস্থাগুলির সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠন গঠিত হয়েছে। ওয়ার্লড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস, ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নস ইত্যাদি।

ঠ

ঠাণ্ডা লড়াই (Cold War)

দুটি রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতাপূর্ণ বিরোধিতা। তাতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হওয়া ছাড়াও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ এবং সামরিক প্রস্তুতি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। কিন্তু সরাসরি যুদ্ধ বাধে না। প্রধানত পশ্চিমি রাষ্ট্রজোট এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র দেশগুলির সম্পর্কসূত্রে ঠাণ্ডা লড়াই শব্দটি ১৯৪৭ খ্রি থেকে চলে আসছে। কিন্তু অনুরূপ ঠাণ্ডা লড়াই আরও কোনও কোনও দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে দেখা যায়। একদিকে পূর্ব ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সমর্থনে ও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল, অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমি দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস ঠাণ্ডা লড়াইকে সারা বিশ্বে প্রসারিত করে। বস্তুত ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অস্তিত্ব দুটি সমান শক্তিশালী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর এক পক্ষের ক্ষমতা সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে অপর পক্ষের নিরন্তর বিরোধের মধ্যে নিহিত থাকে। এর অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে থাকে বিপক্ষ দেশের সংলগ্ন কোনও দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, ভীতি প্রদর্শন, বিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ, অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি ইত্যাদি।

দ্র. অবরোধ

ড

ডেমোক্রেটিক পার্টি (Democratic Party)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিক্যান পার্টির প্রতিষ্ঠার (১৭৯২) পর সেটির অন্তর্বিরোধে যে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক্যান গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় সেটির পুরোভাগে ছিলেন টমাস জেফারসন। ১৮২৮ খ্রি মধ্যে পার্টি ডেমোক্রেটিক পার্টি নামে পরিচিতি লাভ করে। তার পূর্বে ১৮০০ খ্রি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পদে জেফারসনের নির্বাচন একটি বৈপ্লবিক ঘটনা হিসেবে পরিগণিত। আলেকজান্ডার হ্যামিলটন ও ফেডারাল দলের বিরুদ্ধে জেফারসনের প্রধান বক্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের একাধিপত্য সংকোচন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বিস্তার। ক্রীতদাস প্রথার পক্ষাপক্ষে মতবিরোধের ফলে দলে ভাঙন ধরে। গৃহযুদ্ধে দল বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৮৭৬ খ্রি দল আবার গড়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলেই দলের একচ্ছত্র শক্তি ও প্রভাব ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে দলের মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মতবিরোধ মাথা চাড়া দেয়। পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদের স্বতন্ত্র চাহিদা এবং বৃহৎ শহরাঞ্চলের ধনী শিল্পপতিদের ভিন্ন চাপ সৃষ্টির ফলে দলের ঐক্য বজায় রাখা দুরূহ হয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়ে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের জনপ্রিয়তা এবং ত্রিশের দশকে অর্থনৈতিক মন্দার প্রতিকারে প্রেসিডেন্ট এফ ডি রুজভেল্টের 'নিউ ডিল' আর্থনীতিক সংস্কার দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধোত্তরকালে কৃষ্ণাঙ্গদের নাগরিক অধিকার আন্দোলনে দক্ষিণাঞ্চলে দলের প্রভাব হ্রাস পেলেও প্রেসিডেন্টের নির্বাচনে ট্রুম্যান জয়ী হন। শাসনক্ষমতায় ডেমোক্রেটিক দল একাদিক্রমে দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারেনি। দলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি উদারনৈতিক প্রবণতা থাকলেও সাধারণ লোকের নির্বাচনী আচরণ ও বিশ্বাসে রক্ষণশীলতা ও উদারনীতির মধ্যবর্তী সীমারেখা নিয়তই পরিবর্তিত হয়।

ত

তরুণ তুর্কি (Young Turks)

তুরস্কে অটোম্যান সাম্রাজ্যের উদারনৈতিক সংস্কারের জন্য তরুণ সামরিক অধিকর্তাদের আন্দোলন (১৯০৩-১৯০৯)। ১৯০৮ খ্রি জুলাই মাসে সালোনিকাতে সামরিক অধিকর্তাদের এক বিদ্রোহসূত্রে কনস্টান্টিনোপলে কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস গঠিত হয় ; নেতৃত্ব দেন এনভার বে, আহমেদ জেমেল ও মহম্মদ তালাত। তাঁরা তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদকে সাংবিধানিক শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ১৯০৮ খ্রি ডিসেম্বরে পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বানের দাবি জানান। কিন্তু প্রবাসে পলাতক উগ্রপন্থীদের সঙ্গে উল্লিখিত তিনজন জাতীয়তাবাদী নেতার বিচ্ছেদ ঘটে। ফলে বলকান যুদ্ধে (১৯১২-১৩) ওই তিনজন তুর্কি নেতার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁদের প্রভাবে জার্মানির সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধে এনভার ও তালাতের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

দ্র. কেমাল আতাতুর্ক.

তৃতীয় বিশ্ব (Third World)

পৃথিবীর অনগ্রসর ও দরিদ্র দেশগুলিকে সাধারণত পশ্চাৎপদ কিংবা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সেগুলিকে তৃতীয় বিশ্ব হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। অবস্থান ও প্রকৃতি অনুসারে মোটামুটি সেগুলি পাঁচ ধরনের : ১. ভৌগোলিক অবস্থান—সঠিক না হলেও আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে এই গোত্রে ফেলা হয়। ২. অর্থনৈতিক অবস্থা—সেই একই শিথিল প্রত্যয়ে বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলিকে এই অভিধায় বিচার করা হয়। ৩. মতাদর্শগত প্রত্যয়—এই পর্যায়ে ওই মহাদেশগুলিতে সদ্য স্বাধীন আত্মসচেতন যেসব ছোট বড় রাষ্ট্র পশ্চিমের প্রধান দুই রাষ্ট্রগোষ্ঠীর আদর্শ, অর্থাৎ

ধনতন্ত্র (ইংল্যান্ড, আমেরিকা ইত্যাদি নিয়ে প্রথম বিশ্ব) অথবা সমাজতন্ত্র (সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপ নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব) থেকে স্বতন্ত্র পথে চলেছে সেগুলিকে তৃতীয় বিশ্বের শ্রেণীতে ফেলা হয়। ৪. জোটবদ্ধতার মানদণ্ড—উক্ত মহাদেশগুলিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমন্বয়ে যেসব জোটবদ্ধতার উদ্ভব হয়, সেই নিরিখে। যেমন বান্দুং সম্মেলনে (১৯৫৫) আফ্রিকা ও এশিয়ার কিছু রাষ্ট্র গোষ্ঠীনিরপেক্ষ আন্দোলন (Non-Aligned Movement) গড়ে তোলে। ওই দুটি মহাদেশের কিছু রাষ্ট্রের সঙ্গে লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশকে নিয়ে প্রথম UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) সম্মেলন হয় ১৯৬৪ খ্রি। ৫. রাজনৈতিক বিচারে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসম্পর্কের ক্ষেত্রে—পূর্ব ও পশ্চিম—তথা সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র থেকে পৃথক একটি তৃতীয় শক্তি হিসেবেও কিছু রাষ্ট্রকে দেখা হয়।

সম্প্রতি তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায় (যেমন OPEC গোষ্ঠী) তৃতীয় বিশ্বের মধ্যেও ফারাক দেখা দিয়েছে। ফলে পূর্বতন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মৈত্রীর সূত্র শিথিল হয়ে পড়েছে।

তেভাগা আন্দোলন (Tebhaga Movement)

স্বল্পকালস্থায়ী একটি কৃষক আন্দোলন, যেটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দীর্ণ যুক্ত বাংলার শেষপর্বে (১৯৪৬-৪৭) ঘটে। সরকার নিয়োজিত ফ্লাউড কমিশনের ভূমিব্যবস্থা সংক্রান্ত সুপারিশ রূপায়ণকল্পে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিসান সভা ১৯৪৬ খ্রি সেপ্টেম্বর মাসে এক গণসংগ্রামের ডাক দেয়। সুপারিশে বলা হয়েছিল যে যারা জোতদারের জমিতে চাষ করে সেইসব বর্গাদার, আধিয়ার প্রভৃতি ভাগচাষীরা ফসলের অর্ধাংশ বা তারও কমের পরিবর্তে অতঃপর দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। কিসান সভা তথা কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী, যাদের অনেকেই ছিলেন শহুরে বুদ্ধিজীবী ও জঙ্গি মনোভাবাপন্ন ছাত্র, তাঁরা বর্গাদারদের সংগঠিত করার জন্য গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। ক্রমবর্ধিষ্ণু গ্রামীণ জনসংখ্যা প্রধানাংশে ছিল দরিদ্র কৃষক যারা সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষে ভূমিহীন হয়ে ভাগচাষীতে পরিণত হয়। তেভাগা আন্দোলন অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ষাট শতাংশ। নভেম্বর মাসে ধান কাটার সময়ে 'নিজ খামারে ধান তোলো' ধ্বনিতে আন্দোলন কোনও কোনও অঞ্চলে প্রবল হয়ে ওঠে। তেভাগা নীতির ভিত্তিতে বর্গাদারেরা ফসল আর জোতদারের ঘরে না তুলে নিজেদের খামারে নিয়ে যায়। উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমা এবং জলপাইগুড়ি, রংপুর ও মালদহ জেলায় আন্দোলন সবিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাছাড়া মৈমনসিং (কিশোরগঞ্জ), মেদিনীপুর (মহিষাদল, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম) এবং চব্বিশ পরগণায় (কাকদ্বীপ) আন্দোলনকারীরা নিজেদের শাসনক্ষমতা কায়েম করে। মৈমনসিং-এর হাজং-রা ফসলের পরিবর্তে টাকায় খাজনা দিতে শুরু করে। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী উপজাতির বেশিটা ছিল আধিয়ার ও দরিদ্র কৃষক। কলকাতা ও নোয়াখালির সমসাময়িক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এই আন্দোলনকে স্পর্শ করেনি। স্বভাবতই জোতদার ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। বহু ক্ষেতমজুর ও কৃষক নিহত হয়।

সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। বহু কর্মী গ্রেপ্তার হন, আন্দোলন ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ক্রমে স্তিমিত হয়ে পড়ে, বিশেষ করে আসন্ন দেশবিভাগের প্রেক্ষাপটে।

ত্রৎস্কি, লিয়ঁ (১৮৭৯-১৯৪০) (Trotsky, Leon)

রাশিয়ান সোসাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির অন্যতম সদস্য ত্রৎস্কি ১৯০৫ ও ১৯১৭ খ্রি রুশ বিপ্লবের নেতৃত্বে, ১৯১৮ খ্রি সোভিয়েত রাষ্ট্রের বৈদেশিক বিষয়ক কমিসার এবং ১৯১৮-২৫ খ্রি প্রতিরক্ষা ও নৌবাহিনীর দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৩ খ্রি থেকে তিনি সোভিয়েত আমলাতন্ত্রের বিপ্লবে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তুলে বিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি করেন। ১৯২৯ খ্রি তিনি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত দেশ থেকে বহিষ্কৃত হন। স্তালিনবাদের বিরুদ্ধে তিনি চতুর্থ আন্তর্জাতিক গঠন করেন (১৯৩৮)। ফ্যাসিবিরোধিতায় দ্বিমুখী প্রবণতা ও দ্বিধাগ্রস্ততার দরুন তিনি কমিন্টার্নের তীব্র সমালোচনা করেন। মেক্সিকোয় স্তালিনপন্থী আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন।

দ্র. ত্রৎস্কিবাদ ; আন্তর্জাতিক ; চিরস্থায়ী বিপ্লব

ত্রৎস্কিবাদ (Trotskyism)

রুশ বিপ্লবের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা লিয়ঁ ব্রনস্তাইন ত্রৎস্কি (১৮৭৯-১৯৪০) কর্তৃক অনুসৃত মার্কসীয় মতবাদ ও কর্মপন্থা। তিনি ১৯০৫ খ্রি প্রথম সোভিয়েত গঠন করেন ; ত্রৎস্কি লেনিনের প্রতিপক্ষতা থেকে সরে এসে ক্রমে তাঁর সমর্থকে পরিণত হন। বলশেভিকদের ক্ষমতায় আসার পিছনে পার্টির ক্রিয়াকৌশল এবং রেড আর্মি সংগঠনে ত্রৎস্কির ভূমিকা তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। কিন্তু লেনিনের মৃত্যুর পর তিনি স্তালিনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যর্থ হন এবং ১৯২৯ খ্রি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কৃত হন। নির্বাসিত অনুরূপ ব্যক্তিদের স্তালিনের বিরুদ্ধে সংগঠিত করে ১৯৩৮ খ্রি চতুর্থ আন্তর্জাতিক গঠন করেন। ১৯৪০ খ্রি তিনি মেক্সিকোয় নিহত হন।

স্তালিনের বিরুদ্ধে ত্রৎস্কির বিরোধিতা নিছক ব্যক্তিগত বৈরিতা ছিল না। তাঁর একটি নিজস্ব তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি চাইতেন সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিকতা এবং সেজন্য স্তালিনের 'সমাজতন্ত্র একদেশে' সীমাবদ্ধতা-নীতির বিরোধিতা করেন। নির্বাসনের পর থেকে তিনি বিশ্ববিপ্লবের ধ্বনি তোলেন। কমিউনিস্ট লিগে প্রদত্ত (১৮৫০) মার্কসেরই একটি বক্তৃতার সূত্র ধরে ত্রৎস্কিবাদের মূল সুরে **'চিরস্থায়ী বিপ্লব'** প্রত্যয় ফুটে ওঠে। মার্কসবাদীদের মধ্যে যাঁরা মনে করতেন বিশ শতকে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব উদ্ভূত হবে অনুন্নত দেশগুলিতে, ত্রৎস্কি তাঁদের অন্যতম। তিনি তাঁর নানা বক্তব্যের উপর অনেক বই লেখেন। সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তিনি গভীর বিশ্লেষণ করেন। তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল যে কমিউনিস্ট পার্টি অনুসৃত বাঁধাধরা পথ থেকে অনেক সময় স্বতন্ত্র পথে তিনি

ত

কমিউনিস্ট কার্যবিধি সমর্থন করতেন। স্তালিনপন্থীদের বিপরীত পথে ত্রৎস্কিপন্থীরা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে চলতেন। ক্ষমতার কেন্দ্রানুগতা ও আমলাতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি তাঁরা মানতেন না। তাঁদের মতে সামাজিক রূপান্তরে রাজনীতির ভূমিকা তথা সব ধরনের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের রূপান্তরে বিপ্লবের একটা ভূমিকা থাকে।

থ

থ্যাচারবাদ (Thatcherism)

মার্গারেট থ্যাচার ১৯৭৯ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। থ্যাচারবাদ কী, এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। তবে মূলতঃ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি ক্ষমতার সঙ্কোচন অথবা বিলোপ, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারিকরণ এবং দৃঢ়ভাবে চালিত সামাজিক কর্মসূচী—এই হল থ্যাচারবাদের গোড়ার কথা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে ব্রিটেনে জাতীয় স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন ও পরিবর্ধন সমাজকল্যাণ এবং পূর্ণ কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে নয়া-কেন্‌সীয় অর্থনীতির ব্যবহার নিয়ে দলমত নির্বিশেষে এক মতৈক্য গড়ে ওঠে। থ্যাচারবাদীরা দাবি করেন যে এই মতৈক্যই যুক্তরাজ্যের অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও আন্তর্জাতিক অবনয়নের কারণ। থ্যাচারের রক্ষণশীল দলের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল মুদ্রাস্ফীতিরোধ। অন্যান্য উদ্দেশ্য ছিল আরও প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেনের অবস্থানের উন্নয়ন, সরকারের সীমিত কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করা এবং ব্রিটিশ সমাজতন্ত্র (অর্থাৎ লেবার পার্টি-কে) পরাজিত করা।

থ্যাচারবাদীরা দাবি করেন যে ১৯৮৭-র মধ্যে এই সবক'টি উদ্দেশ্যই সাধিত হয়।

কিন্তু আপাত সাফল্যের পেছনে লুকিয়েছিল সংখ্যাগুরু শ্রেণীকে অত্যাচার ও শোষণ। মুক্ত-বাজার অর্থনীতিতে গরিব আরও গরিব হয়ে পড়ল আর ব্রিটেনে গড়ে উঠল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের অবিশ্বাস্য ঐশ্বর্য। মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ হল ; কিন্তু তার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ হলেন বেকার এবং বহু শিল্প বন্ধ হয়ে গেল। সরকারি ব্যয় কমল, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সঙ্কোচন হল। কিন্তু মার খেল গরিবের জন্য করা যুক্তরাজ্যের সমাজকল্যাণ-ব্যবস্থা। বেসরকারিকরণের জন্য কিছু লোকের হাতে এল বিপুল টাকা।

আসলে নির্বাচনী সাফল্য ছাড়া আর কিছু দিয়ে ব্রিটিশ সরকারগুলোর মূল্যায়ণ করা যায় না। থ্যাচারবাদের প্রয়োজনীয়তা বা প্রয়োজনহীনতা তাই আজও খোলা প্রশ্ন।

দ

দক্ষিণপন্থা (Rightism)

বামপন্থা কথাটির বিপরীত একটি শব্দ হিসেবে পরিদৃষ্ট হলেও দক্ষিণপন্থা প্রত্যয়টির কিছু সুস্পষ্ট অর্থ আছে। প্রথমত, এটি একটি শিথিল মতবাদ যার প্রধান উপাদান হল **রক্ষণশীলতা** ও কিছুটা **কর্তৃত্ববাদ**। তাতে আনুগত্য, প্রথা ও প্রচলিত ধারার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, মতবাদটিতে বশ্যতা, **বৈধতা** ও কর্তব্যনিষ্ঠার উপাদানে রাষ্ট্রিক বাধ্যতা নিরূপিত হয়। **চুক্তি**, **সম্মতি**, **সমতা**, **ন্যায়বিচার** প্রভৃতি মূল্যবোধের স্থান তাতে সংকীর্ণ। তৃতীয়ত, এতে আইন ও সমাজমানসের অসঙ্গতি এবং আইনের উদারনৈতিক সংস্কারসাধন প্রয়াসকে বিশেষ উৎসাহিত করা হয় না। চতুর্থত, বংশানুক্রমিক ও কালক্রমে যেসব অধিকার বর্তায় সেগুলি অক্ষুণ্ণ রাখা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বিধিসম্মত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পঞ্চমত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস এবং ষষ্ঠত, অবাধ বাণিজ্য ও পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সমর্থন।

দক্ষিণপন্থী মতবাদের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে যেমন পারম্পর্য আছে তেমনি কিছু স্ববিরোধও দৃশ্যমান।

দল (Party)

রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে ইউরোপে উনিশ শতকের মাঝামাঝি। রাজনৈতিক দল সাধারণত দু'ধরনের। প্রথমটা হল বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র অনুসারী, যেখানে দল হল কিছু সংখ্যক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যক্তির সংস্থা, যাঁরা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ কর্মসূচির ভিত্তিতে সংযুক্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ শুধু সদস্য বা সমর্থক। কেউ নির্বাচনে প্রার্থীপদের অভিলাষী ; দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে কেউ হন মন্ত্রিত্বের অভিলাষী। দলের একটি গঠনতন্ত্র থাকে, যার মধ্যে পাওয়া যায় সদস্যপদ ও অন্যান্য বিষয়ের নিয়মাবলি। দল সর্বসম্মত কর্মপন্থার ভিত্তিতে কাজ করে ; দলের প্রতি আনুগত্যের অভাব অথবা **কর্মপন্থা** থেকে দ্বিমত কিংবা বিচ্যুতির পরিণাম হল

শৃঙ্খলাভঙ্গের শাস্তি অথবা বহিষ্কার। দল তার সদস্যসংখ্যা সাধ্যমত বাড়াতে সচেষ্ট থাকে। দেশের সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রিসভা চালাতে হয়, সেখানে দলের রীতিনীতি প্রযোজ্য নয়। আইন প্রণয়ন করতে হলে দলকে আইনসভায় বিল আনতে হয়। সংবিধান অনুযায়ী আইন বিধিবদ্ধ হয়। যদিও একটি রাজনৈতিক দল নিজস্ব-মতবাদের ভিত্তিতে চলে, তাহলেও দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও স্বার্থকে সামনে রেখে তাকে নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে হয়। অবশ্য ক্ষমতা অর্জনই রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত অভীষ্ট বিষয়। সেকারণে নিজস্ব শক্তি কিংবা অন্যান্য দলের সাহায্যে ক্ষমতা অর্জনের প্রয়াসী হতে হয়।

একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় দ্বিতীয় ধরনের যে দল থাকে, সেটা এক ও অদ্বিতীয় ; তার সঙ্গে উল্লিখিত সংসদীয় গণতন্ত্রী ধারার কোনও মিল নাই। এই ব্যবস্থার অন্তর্গত দল সাধারণত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয় ; দল অলিখিত একটা আইনানুগ সংগঠনের মতো বিরাজ করে। একচেটিয়া অধিকারের সাহায্যে দল সমস্ত সরকারি দপ্তর ও সেগুলির ক্রিয়াকলাপে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে, সদস্যপদে কারুর যোগদান কিংবা সদস্যপদ খারিজের ব্যাপারে দল তার জবরদস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে। দলের কার্যপরিধি শুধু রাজনৈতিক বিষয়ে আবদ্ধ থাকে না। দলের মতে সমাজের যাবতীয় বিষয় রাজনৈতিক। সে কারণে সর্ববিধ প্রতিষ্ঠানের উপর দল কর্তৃত্ব করে। দলকে ক্ষমতায় যেতে সাধারণ নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হয় না। সাধারণত নির্বাচনের মহড়া হয় বটে, কিন্তু দ্বিতীয় অন্য কোনও দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। তবে **অন্তর্দলীয় গণতান্ত্রিক** ব্যবস্থায় দল তার উপর থেকে নিচে ক্রমবিন্যস্ত কাঠামোয় প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দেয়। প্রশাসন, পুলিশ ও সমর বিভাগের কাজকর্ম দল নিয়ন্ত্রণ করে। অনুরূপভাবে দলের নিয়ন্ত্রণেই আইনকানুন বিধিবদ্ধ ও প্রযুক্ত হয়। নির্দিষ্ট মতবাদ অনুযায়ী কাজ চলে ; বিচ্যুতি ঘটলে সদস্য না হলেও দলবহির্ভূত ব্যক্তিরও শাস্তি অনিবার্য। দলের সদস্যদের কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে হয়, তার অভাবে সদস্যপদ অনেক সময় নবীকরণ করা হয় না। স্বায়ত্তশাসিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানে দলের মতামতই প্রাধান্য পায়। কারণ দলই হল বিশেষ কোনও শ্রেণীর আলোকপ্রাপ্ত পুরোধা।

দলকর্মী (Cadre)

রাজনৈতিক দলের পূর্ণসময়ের শিক্ষণপ্রাপ্ত, বেতনভুক কর্মী। ফরাসি সামরিক বাহিনীতে এক একটি রেজিমেন্টের সমবেত অধ্যক্ষদের উদ্দেশে ব্যবহৃত শব্দ। ত্রিশের দশকের গোড়া থেকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সেইসব কর্মী ও বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীদের ক্ষেত্রে শব্দটির ব্যবহার শুরু করে যারা পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার মতাদর্শ প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। এবং বর্তমানে সাধারণভাবে সমস্ত ধরনের সংগঠিত গোষ্ঠীর সক্রিয় কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাঁরা সুসমন্বিতভাবে দলের কর্মসূচি রূপায়ণে অংশ নেন।

কোনও উন্নয়নশীল দেশের স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে থেকে কিছু ব্যক্তিকে বিশেষ

শিক্ষণ দিয়ে অর্থনৈতিক, সরকারি ও বেসরকারি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় নিয়োগ করা হয় যেখানে সেইসব কর্মীরা অর্থনৈতিক সংগ্রামের পুরোভাগে থাকেন।

দ্র. দলীয় কর্মিবর্গ

দলত্যাগী (Renegade)

লাতিন renegare কথাটি থেকে ইংরেজি 'রেনিগেড' শব্দটি উৎপন্ন। বাংলা প্রতিশব্দ দলত্যাগী। অর্থ হল যে-ব্যক্তি স্বধর্ম, স্বমত বা স্বদল ত্যাগ এবং বিরুদ্ধপক্ষে যোগদান করেছে। আদিপর্বে রেনিগেড বলতে বোঝাত স্বধর্মত্যাগী বিশেষ করে ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম ত্যাগ করে সেইসব লোকেদের মধ্যে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। কমিউনিস্ট আন্দোলনে শব্দটি ব্যবহারবহুল। নানা সময়েই কমিউনিস্ট আন্দোলনে যাঁরা ভিন্নমত প্রকাশ করেন এবং ক্রমে বিপক্ষগোষ্ঠী বা দলে যোগ দিয়েছেন তাঁদের প্রতি নিন্দা বা বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গালি হিসেবে শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের শীর্ষনেতা মার্কসবাদী কার্ল কাউটস্কির সর্বহারার একনায়কত্ব তত্ত্ব পরিহার, সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস ইত্যাদি মৌল বিষয়ে মতপার্থক্য এবং বলশেভিক দল পরিত্যাগ করে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে যোগদানের দরুন লেনিন তাঁকে 'রেনিগেড' হিসেবে অভিহিত করেন। কমিন্টার্নে বুখারিনের সঙ্গে স্তালিনের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে (১৯২৮-২৯) স্তালিনের পক্ষে যোগদানে সম্মত না হওয়ায় **মানবেন্দ্রনাথকে** কোণঠাসা, বহিষ্কার ও রেনিগেড আখ্যা দেওয়া হয়। অনুরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে।

দলহীন রাজনীতি (Partyless Politics)

১৯৪৮ খ্রি **মানবেন্দ্রনাথ রায়** কর্তৃক প্রবর্তিত মতবাদ যাতে তিনি প্রচলিত রাজনৈতিক পার্টি অর্থাৎ দলের ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরে দলহীন রাজনীতির এক অভিনব পথ প্রদর্শন করেন। তাঁর দৃষ্টিতে : ১. দল-প্রথায় গণতন্ত্রী আদর্শ স্ববিরোধী হয়ে পড়ে। কারণ দল বলতে জনসাধারণের একটি অংশকেই মাত্র বোঝায়, অথচ গণতন্ত্র সমগ্র জনসাধারণকে নিয়ে চলে। অংশ যেমন সমগ্রের সমতুল হতে পারে না, তেমনি দলীয় শাসনও অসম ও স্ববিরোধী হতে বাধ্য। দলীয় সরকার জনসাধারণের জন্য হতে পারে, জনসাধারণের দ্বারা নয়, ২. প্রতিনিধিত্বমূলক অর্থাৎ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত ব্যক্তিরা জনসাধারণের হয়ে সরকার চালায়। সেইসব প্রতিনিধিরা জনগণের প্রতি অনুগত না হয়ে নিজ দলের কাছে অনুগত থাকেন। ফলে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা কতিপয় রাজনৈতিক ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যায়, জনগণের অভিভাবক হিসেবে বৃহত্তর দল সরকারের কাজ চালায়। প্রত্যাহ্বান, গণভোট ইত্যাদি থাকে না ; তাই সংসদীয় ব্যবস্থায় দুটি নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে জনগণ অসহায় থাকে, ৩. দলীয় রাজনীতি ক্ষমতার কাড়াকাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়, দলগুলি চায় ক্ষমতা দখল। তাই তারা নির্বাচনদ্বন্দ্বে নামে, যে-কোনও দ্বন্দ্বেরই একটা নিজস্ব ধারা থাকে—সেখানে নীতির স্থান গৌণ, সেই দ্বন্দ্বমুখর পথে যেতে গিয়ে দলগুলিকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, ধাপ্পাবাজি, ঘুষ, জালভোট, জোচ্চুরি, হিংসা ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হয়, ৪. দল মাত্রেই মূলত

সমষ্টিবাদী ; দলের আদর্শে ও উদ্দেশ্যে শ্রেণী, জাতি, দেশ, ধর্ম ইত্যাদি যূথবাদী আদর্শ প্রাধান্য লাভ করে ; সেখানে ব্যক্তির স্থান নগণ্য, ৫. দলীয় প্রথায় উপর থেকে সবকিছু আরোপিত হয়। জনগণ দলের হাতে পুতুল হয়ে থাকে। দলগুলি তাদের দেশব্যাপী সংগঠন ও আর্থিক শক্তির সাহায্যে দেশকে কেন্দ্রাভিগতার পথে ঠেলে দেয়। দেশকে দল কেন্দ্রাধীনে একই সুর ও ছন্দে চলতে বাধ্য করে।

বিকল্প হিসাবে মানবেন্দ্রনাথ যে-চিত্র তুলে ধরেন তাতে স্থানিক গণসমিতিই হবে যাবতীয় বিধিব্যবস্থার নিয়ন্তা। গণসমিতিগুলির ভিত্তিতে পিরামিডাকারে নিচে থেকে উপরে ও বিস্তৃত এলাকার ক্রমোচ্চ পর্যায়ে নির্বাচিত প্রশাসন কাঠামোর সাহায্যে যাবতীয় নীতিনির্ধারণ ও প্রশাসনিক কার্যনির্বাহের তিনি প্রস্তাব করেন। স্থানিক গণসমিতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজে নির্বাচকদের যাতে প্রত্যক্ষ সজাগ দৃষ্টি থাকে তার অনুকূল ব্যবস্থার কথাও তিনি বলেছেন, প্রয়োজনে প্রতিনিধিদের **প্রত্যাহ্বান** ও **গণভোটের** সুযোগ থাকবে। নির্বাচনে স্থানিক সমিতি প্রতিনিধি মনোনয়ন করবেন। উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া অথবা কোনও দলের প্রার্থী মনোনয়নপ্রথা নির্বাচনের মানদণ্ড হবে না। দলপ্রথার মধ্যস্থতা ব্যতিরেকেই এই প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক প্রথার সুফল হল নির্বাচকমণ্ডলীর চেতনা ও মননশক্তির বিকাশের সুযোগ। স্থানিক সমিতির অন্যতম কাজ হবে মানুষের যুক্তি ও নীতিবোধ জাগিয়ে তোলার সঙ্গে জনকল্যাণকর কাজে নিরন্তর নিযুক্ত থাকা।

উল্লেখ্য, মানবেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাবে **জয়প্রকাশ নারায়ণও** এক দলহীন গণতন্ত্র প্রত্যয়ের উদ্ভাবন করেন।

দ্র. র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম ; সম্পূর্ণক্রান্তি

দলীয় কর্মিবর্গ (Apparatchiki)

কমিউনিস্ট দেশে দলের পূর্ণকালীন কর্মিবর্গ যাঁরা লেনিন কর্তৃক প্রবর্তিত দলীয় নতুন কাঠামোয় দলের ভিতর এবং দলের বাইরে সরকার ও অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত থাকেন। তাঁরা স্থানীয়, রাজ্য ও রাষ্ট্রীয় স্তরে ক্রমোচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন পদে বিন্যস্ত হন। দলীয় আমলাতন্ত্র হিসেবে এই কর্মিবর্গ নির্বাচিত দলীয় কমিটির অধীন, কিন্তু নিজেরাও নির্বাচিত হয়ে পদাধিকার বলে সবিশেষ ক্ষমতাশালী। ১৯৮৬ খ্রি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সংশোধিত নিয়মাবলিতে এই কর্মিবর্গকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বেতনভুক বৃত্তিকুশলী এই কর্মিবর্গের দলের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য থাকে। সরকারি প্রশাসনে দলের নির্দেশ রূপায়ণে এঁদের ভূমিকা প্রবল।

দ্র. আমলাতন্ত্র ; দলকর্মী

দারিদ্র্য-সীমা (Poverty Line)

উনিশ শতকের শেষদিক থেকে আর্থনীতিকদের মধ্যে দারিদ্র্য-সীমারেখা আঁকার প্রয়াস দেখা দেয়। ১৮৯৯ খ্রি চার্লস বুথ তাঁর 'লাইফ পভার্টি অব দ্য পিপ্‌ল্' গ্রন্থে

পরিবার পিছু খাদ্য, বস্ত্র ও বাড়িভাড়া বাবদ গড় খরচের ভিত্তিতে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা নিরূপণ এবং নিম্নবর্তী স্তরের মানুষদের মান দারিদ্র্যের সীমারেখার নীচে অবস্থিত বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু জীবনধারণের অন্যান্য খরচ অন্তর্ভুক্ত না করায় ওই প্রয়াসের সমালোচনা দেখা দেয়। বিভিন্ন দেশে সরকারি পর্যায়ে দারিদ্র্যের ফাঁক (poverty gap) নির্ণয়ের এক-একটি প্রচেষ্টা চলে আসছে যার সাহায্যে দরিদ্র মানুষের আয় ওই রেখার কতটা নীচে এবং মধ্যবর্তী ফাঁকটা দেখানোর চেষ্টা হয়।

জীবনধারণ তথা কাজ করার শারীরিক ক্ষমতার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ব্যয়নির্বাহের সঙ্গতি থাকার উপর দারিদ্র্যের সংজ্ঞা নির্ণয়ের কথাও বলা হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষার উপযোগী জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর উপর দারিদ্র্যের সীমারেখা টানার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু জীবনধারণের উপকরণ সম্পর্কেও মতপার্থক্য আছে। সে কারণে মনে করা হয় যে দারিদ্র্য বিষয়টি একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। সমাজের অন্যান্য সকলের মতো ভোগের সমান সুযোগ না থাকাটা কারও দৃষ্টিতে দারিদ্র্যের লক্ষণ। তাতে মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক প্রভৃতি চাহিদাগুলিকে ধরা হয়। তুলনামূলক অনুরূপ বিচারে একই সমাজে সময়ের হেরফেরে লোকের জীবনযাত্রার ভিন্ন মান কিংবা দুটি সমাজের মধ্যে সম্পদ, ক্রয়ক্ষমতা ইত্যাদির বৈষম্য নির্দেশ করে দারিদ্র্য।

ভারতে ষাটের দশকের গোড়ায় একটি বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর পরামর্শ অনুসারে ভারত সরকার প্রথম দারিদ্র্য-সীমা নির্ধারণ করেছিলেন। ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহের জন্য যেটুকু ব্যয়ের প্রয়োজন হয় তার ভিত্তিতে সীমারেখাটি আঁকার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। যে ব্যক্তির আয় ন্যূনতম ওই অঙ্কের নিচে তাঁকেই দরিদ্র বলে গণ্য করার নিয়ম। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে অঙ্কটিও বাড়ে। কিছুকাল অন্তর যোজনা কমিশন সরকারের হয়ে পুরানো অঙ্কের পরিবর্তে নতুন অঙ্ক ঘোষণা করেন। কিন্তু দারিদ্র্য কেবল পুষ্টি দিয়ে মাপা যায় না। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিধেয়, বাসস্থান ইত্যাদির সংস্থান সমান গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত দারিদ্র্য কেবল একটি সীমারেখা তথা নির্ধারিত অঙ্কের ব্যাপার নয়। লাভজনক পর্যাপ্ত উপার্জনের সুযোগসৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষকে স্বাভাবিক জীবন এবং আত্মমর্যাদার আস্বাদ দেওয়াটাই যথার্থ দারিদ্র্যমোচন।

দার্শনিক আমূল পরিবর্তনবাদী (Philosophical Radicals)

ইংল্যান্ডে **জেরিমি বেনথাম**-এর অনুগামীবৃন্দ। তাঁরা দার্শনিক ভাবভূমিতে **উদারনীতি** মতবাদকে আইন, অর্থনীতি এবং রাজনীতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত করার প্রয়াসী হন। উনিশ শতকের গোড়ায় তাঁরা যে মননশীল বিদগ্ধ গোষ্ঠী গড়ে তোলেন, পরবর্তী শতকে তারই সূত্র ধরে বামপন্থী উদারনৈতিক ধারা বেগবান হয়ে ওঠে, তার আংশিক প্রতিফলন ঘটে ফেবিয়ান সোসাইটি প্রভৃতি সংগঠনে। সেইসব বিদ্বজ্জনদের মধ্যে জেমস মিল, **জন স্টুয়ার্ট মিল**, ডেভিড রিকার্ডো প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিক, আইনবিদ জন অস্টিন, ঐতিহাসিক জর্জ গ্রোট প্রমুখ ব্যক্তিরা ছিলেন।

দার্শনিক রাজা (Philosopher-king)

গ্রিক দার্শনিক **প্লাতো** কর্তৃক কল্পিত একটি প্রত্যয়। গুরু সোক্রাতেস্-এর মেধাগত অভিজাত-তন্ত্র প্রত্যয়ের গুণগ্রাহী হলেও প্লাতো আরও কিছুটা এগিয়ে দার্শনিক রাজার কথা বলেন। তাঁর মতে মানুষে-মানুষে অসাম্যের ফলে প্রয়োজন ঘটে সরকার ও আইনের। কিন্তু দার্শনিকের প্রজ্ঞার তুলনায় আইনের নমনীয়তা কম। রাজা যদি দার্শনিক হন তা হলে আইন হবে যুক্তির নির্দেশনা, এবং রাজার মর্জিমাফিক ক্রিয়াকলাপ অনমনীয় আইনের চেয়ে ভাল। আইন ও স্বার্থপরতার উর্ধ্বে প্লাতোর দার্শনিক রাজা বিরাজ করেন। দার্শনিক রাজা যথার্থই একজন রাজনীতিজ্ঞ এবং তাঁর রাজতন্ত্র হল সবচেয়ে ভাল ধরনের সরকার। প্লাতো তাই চাইতেন দার্শনিক রাজার নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র। তাঁর দৃষ্টিতে সুবিচার-ব্যবস্থা হল রাষ্ট্রের প্রকৃত পরিচয়। সুবিচার জ্ঞানেরই ক্রিয়া। রাষ্ট্রীয় সুকৃতির পরিচয়, অর্থাৎ সুবিচারের আধার হলেন দার্শনিক রাজা।

প্লাতোর 'দ্য রিপাবলিক' গ্রন্থের প্রধান যুক্তি হল যে মানুষের যাবতীয় পুণ্যের উৎস হল তার জ্ঞান। এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের ভিত্তিতে লব্ধ জ্ঞানই হল প্রকৃত জ্ঞান এবং সে-জ্ঞান আপ্তবাক্য, বিশ্বাস ও প্রথাগত জ্ঞানের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। সমাজে দার্শনিক হলেন সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী। তিনি এক পুণ্যাত্মা ব্যক্তি। দার্শনিক রাজার হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকার অর্থ এই নয় যে তিনি হবেন একজন স্বেচ্ছাচারী। তাঁর শাসনের মানদণ্ড হল যুক্তি, লালসা নয়। তাঁর শাসনের লক্ষ্য সকলের মঙ্গলসাধন।

লিখিত যাবতীয় আইনকানুন প্রথা ও জনমতের ভিত্তিতে রচিত হয়, সে সবের মূলে যথার্থ জ্ঞান বিশেষ থাকে না। দার্শনিক রাজার যুক্তিশীল জ্ঞান আইনের চেয়েও বড়। প্রজ্ঞা ও মানবকল্যাণকর সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন দার্শনিক রাজাকে তাই প্রচলিত আইনের অধীন না রাখাই বাঞ্ছনীয়। লিখিত আইন ও আদালত ত্রুটিবহুল নিম্নতর সমাজব্যবস্থায় দরকার হয়। আদর্শ রাষ্ট্রে সে সবের প্রয়োজন নেই। সুবিচারের মধ্যে দিয়ে আদর্শ রাষ্ট্র উজ্জীবিত হয়। সেজন্য দরকার দার্শনিকের পরিপক্ব জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তা। দার্শনিক রাজা যে-কোনও আইন উপেক্ষা করতে পারেন যদি সেটা তাঁর জ্ঞানগম্য না হয়। আদর্শ রাষ্ট্রে তাঁর যুক্তি ও জ্ঞানই হবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণকারী ও সঞ্চারক।

দিব্য অধিকার (Divine Right)

যে প্রত্যয়ে দৈব আদেশক্রমে প্রাপ্ত সার্বভৌম নৃপতির অধিকার বোঝায় অথবা নৃপতি স্বয়ং যেখানে দৈবশক্তির আধারস্বরূপ সর্ববিষয়ের অধিকারী। দিব্য অধিকার প্রত্যয় প্রাচীন ভারত ও রোমে প্রচলিত ছিল। রোমের অধিপতি অগাস্টাস নিজের দিব্য অধিকার এবং পরমত্ব প্রতিষ্ঠার পিছনে জনসমর্থন তথা **বৈধতা** সৃষ্টির প্রয়াসী হন। ইংল্যান্ডে প্রথম জেমস মর্তে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিভূ এবং ঐশ শক্তির অধিকারী বলে দাবি করেন। উত্তরকালে কোনও কোনও রাষ্ট্রদার্শনিক এই মানসিকতার অনুকূলে সমাজ সৃষ্টির এবং **রাষ্ট্রিক বাধ্যতার** পশ্চাতে চুক্তিতত্ত্ব অথবা সম্মতিতত্ত্বের

পরিবর্তে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সমর্থন করায় **জন লক** তার তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে রাষ্ট্রিক বাধ্যতার উৎস হল দৈব বিধান। সেটাকে স্বীকার না করাটা তাঁদের মতে ধর্মীয় ও পৌর অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উভয় পক্ষেই ক্ষতিকর।

দিব্যতন্ত্র (Theocracy)

আভিধানিক অর্থে ঈশ্বর কর্তৃক চালিত রাষ্ট্র; কার্যত এটি হল পুরোহিততন্ত্র। প্রত্যয়টি ইহুদি ঐতিহাসিক জোসেফাস ব্যবহার করেন এই অর্থে যে ইহুদি শাস্ত্রগ্রন্থ 'তোরা' অনুযায়ী দিব্য আইন সমূহ ধর্মীয় ও নাগরিক দায়দায়িত্ব নির্দেশ করে। প্রাচীন দিব্যতন্ত্রী সরকার সরাসরি পুরোহিতদের কুক্ষিগত ছিল না, পুরোহিতেরা আইন প্রণয়ন ও বিচারব্যবস্থায় জড়িত থাকতেন। সেই ধারা বর্তমান **ইসলামি রাষ্ট্রে** সঞ্চারিত হয়েছে। দার্শনিক স্পিনোজার মতানুসারে যাবতীয় নাগরিক দায়দায়িত্ব ঈশ্বরের সঙ্গে একটি চুক্তি থেকে উৎসারিত বলে মনে করা হয়; তদ্ব্যতিরেকে রাজার সঙ্গে কিংবা সমাজের আর কোনও সূত্রে প্রাপ্ত চুক্তিপত্র কার্যকর নয়। অধিনায়ক ও একনায়কও ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত। স্পিনোজা দেখিয়েছেন যে প্রাচীন ইহুদি প্রথায় আইনের ভাষ্যকারেরা সার্বভৌম শাসক কর্তৃক নিযুক্ত হতেন না, নিযুক্তির অধিকারী ছিল ইহুদি চার্চের যাজক, যার সরকারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকত না। যাজক বা পুরোহিতেরা সচরাচর সার্বভৌম শাসকের দায়িত্বে থাকতেন না। রাষ্ট্রের মধ্যে **ক্ষমতার পৃথকীকরণ** বিরাজ করত, যাতে সার্বভৌম শাসকের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে। দিব্যতন্ত্রেই এক ধরনের আইনের শাসন ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের কোনও কোনও ইসলামি দেশে সরকারি প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা ধর্মগুরু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

দৃষ্টবাদ (Positivism)

স্যাঁ-সিমঁ কর্তৃক প্রবর্তিত দর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তা, যেটিকে **অগুস্ত কঁৎ** পরিবর্ধিত করেন। দৃষ্টবাদ বলতে কোনও কিছুর বাস্তব অস্তিত্ব বোঝায়, পক্ষান্তরে অধ্যাত্মবাদ ও অধিবিদ্যায় সে সম্পর্কে কিছু ধোঁয়াটে কল্পনা করা হয় মাত্র। কঁৎ-এর সমাজতত্ত্ব ছিল বিজ্ঞানসম্মত; তিনি মনে করতেন বৈজ্ঞানিক চিন্তার পদ্ধতি সাধারণভাবে মানুষের জীবনেও প্রযোজ্য। বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের সাহায্যে মানুষের নানাবিধ প্রয়োজন ও সমস্যা ইহজীবনেই মেটানো সম্ভব; কাজেই ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষের উপাসনা বিধেয়।

দৃষ্টবাদী মতানুসারে অভিজ্ঞতাজাত বিজ্ঞানই হল মানুষের যথার্থ জ্ঞানের উৎস। কঁৎ মনে করতেন যে জ্ঞান অধ্যাত্মবাদ, অধিবিদ্যা থেকে পরিশেষে দৃষ্টবাদী স্তরে বিবর্তিত হয়। দৃষ্টবাদী বিজ্ঞান অতিপ্রকৃত, বিমূর্ত ও দূরকল্পী শক্তিতে আস্থাশীল নয়। প্রদত্ত কোনও কিছুর প্রত্যক্ষণীয় সম্পর্কের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণের ভিত্তিতে সর্বগ্রাহ্য এবং সুনির্দিষ্ট আইনকানুন বিধিবদ্ধ হয়। এই জ্ঞানের ভিত্তিতেই প্রাকৃতিক ও সামাজিক গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। সেটা তাই বৈজ্ঞানিক ও দৃষ্টবাদী রাষ্ট্রচিন্তার পরিপোষক। কঁৎ-এর মতে দৃষ্টবাদ চার্চের পরিবর্তে একটি নতুন ধর্মের রূপ

নিতে পারে। কং-এর সামাজিক এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলনসমূহকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল।

দ্রাবিড় মুন্নেত্র কজগম (Dravida Munnetra Kazagam)

বিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই দক্ষিণ ভারতে হিন্দু সমাজে সরকারি চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রাহ্মণ আধিপত্যের বিরুদ্ধে অব্রাহ্মণদের মধ্যে তুমুল ক্ষোভ দেখা দিতে শুরু করে। ১৯১৫ খ্রি অব্রাহ্মণদের সংগঠন সাউথ ইন্ডিয়ান পিপ্‌ল্‌স অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়, যেটি পরে জাস্টিস পার্টি নামে পরিচিতি লাভ করে। ব্রাহ্মণদের কুক্ষিগত কংগ্রেসের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত যাতে না হয়, সেই মর্মে এই দল একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে। পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত দলের কর্মসূচিতে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথার অবসান এবং সরকারি চাকরি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রার্থী নির্বাচনের দাবি উত্থাপন করা হয়।

১৯২০ খ্রি কংগ্রেস যখন নতুন সাংবিধানিক আইনাধীনে সাধারণ নির্বাচন বয়কট করে তখন জাস্টিস পার্টি মাদ্রাজের আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক মন্ত্রিসভা গঠন করে। প্রদেশ কংগ্রেসের সচিব ই. ভি. রামস্বামী নাইকার সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার সুবিধার্থে আইনসভা ও সরকারি চাকরিতে আনুপাতিক হারে সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রার্থী নির্বাচনের প্রস্তাব করেন। কংগ্রেসের ব্রাহ্মণ সদস্যদের বিরোধিতায় সে প্রস্তাব গৃহীত না হবার ফলে নাইকার ও তাঁর অনুগামীরা কংগ্রেস ছেড়ে স্বয়ং মর্যাদা নামে এক আন্দোলন শুরু করেন (১৯২৫)। ১৯৩৭ খ্রি নির্বাচনে কংগ্রেসের কাছে জাস্টিস পার্টি পরাজিত হয়। ১৯৪৪ খ্রি সালেমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে স্বয়ং মর্যাদা আন্দোলনের সঙ্গে জাস্টিস পার্টি যুক্ত হয়ে দ্রাবিড় কজগম দল গঠিত হয়।

দলের ত্রিচিনাপল্লী সম্মেলনে (১৯৪৫) স্বাধীন সার্বভৌম দ্রাবিড় রাষ্ট্রের দাবি প্রস্তাবাকারে গৃহীত হলেও পূর্ববর্তী সালেম সম্মেলনে স্থির হয়েছিল যে দল নির্বাচনে অংশ নেবে না ; জনশিক্ষার বিস্তার ও অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলাই দলের লক্ষ্য নিরূপিত হয়। সি এন আন্নাদুরাইয়ের অনুগামীরা সরাসরি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশ নেবার পক্ষপাতী ছিলেন ; তাতে নাইকারের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেয়। ৭২ বছর বয়স্ক নাইকার মনিআম্মাই নামে সপ্তদশী এক মহিলাকে বিবাহ করে তাকে নিজের স্থলে অভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাতে আন্নাদুরাই গোষ্ঠী আপত্তি তোলে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদ্রোহীরা দল ত্যাগ করে। ১৯৪৯ খ্রি সেপ্টেম্বরে তারা দ্রাবিড় মুন্নেত্র কজগম (দ্রাবিড় প্রগতি সংঘম, সংক্ষেপে ডি এম কে) নামে নতুন এক দল গঠন করে। ১৯৫১ খ্রি মাদ্রাজ সম্মেলনে আন্নাদুরাই প্রধান নেতা হিসেবে নির্বাচিত হন।

ডি এম কে দলের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং তামিলনাড়ুতে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। দলের এক গোপন পত্রে ই ভি কে সম্পথ ব্যক্ত করেন যে ভারতীয় সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জনই দলের লক্ষ্য। সম্পথকে আন্নাদুরাই হিন্দি বিরোধী আন্দোলনের প্রধান নেতা হিসাবে মনোনীত করেন। চলচ্চিত্র শিল্পীরা দলের অর্থভাণ্ডার নিয়ন্ত্রণ করতেন।

দুর্নীতি প্রসঙ্গে তাঁদের সঙ্গে সম্পথের বিরোধ বাধে। মতপার্থক্য তীব্র হয়ে পড়ায় সম্পথ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে দল ছেড়ে তামিল ন্যাশনাল পার্টি গঠন করেন (১৯৬১) এবং কংগ্রেস সভাপতি কে কামরাজে-এর আমন্ত্রণে ওই পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয় (১৯৬৪)।

১৯৬১ খ্রি ডি এম কে দল তার নির্বাচনী ইস্তাহারে মাদ্রাজ, মহীশূর, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরলকে নিয়ে দ্রাবিড়নাদ নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি জানায়। মাদ্রাজ বিধানসভায় ডি এম কে বিরোধী দল হিসাবে স্বীকৃতি পায় (১৯৬২)। পরের বছরে দলীয় গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে ডি এম কে দল তার লক্ষ্য স্থির করে এই মর্মে যে দাক্ষিণাত্যের চারটি রাজ্যের সমন্বয়ে ভারতীয় সংবিধানের অধীনে একটি দ্রাবিড় ইউনিয়ন গঠিত হবে। ১৯৬৭ খ্রি সাধারণ নির্বাচনে ডি এম কে অন্যান্য বাম ও দক্ষিণপন্থী দলের সহযোগে বিধানসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আন্নাদুরাই প্রথম ডি এম কে মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

আন্নাদুরাইয়ের মৃত্যুর (১৯৬৯) পর দলের নেতৃত্ব নিয়ে এম করুণানিধি ও ডি আর নেদুচেনজিয়ান-এর মধ্যে বিরোধ বাধে। আপসে করুণানিধি মুখ্যমন্ত্রী ও দলের সভাপতি হন এবং নেদুচেনজিয়ান সচিব হন। যে ডি এম কে দল স্বাধীন দক্ষিণ ভারত রাষ্ট্র গঠনের দাবি উত্থাপন এবং উত্তর ভারতের হিন্দি বলয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল সেই দল ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ খ্রি অবধি কেন্দ্রের ইন্দিরা সরকারকে সমর্থন করে। দলও নির্বাচনে বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং মন্ত্রিসভা গঠন করে। তারপর থেকে করুণানিধির সঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্পী ও দলের কোষাধ্যক্ষ এম. জি. রামচন্দ্রনের বিবাদ বাধে। প্রথমজনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়জনের দুর্নীতি ও একাধিপত্যের অভিযোগ ছিল। ১৯৭২ খ্রি ১০ অক্টোবর রামচন্দ্রনকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়। দলে তাঁর ছিল বিপুল প্রভাব ও প্রতিপত্তি। ১৮ অক্টোবর রামচন্দ্রনের অনুগামীরা ডি এম কে দল ত্যাগ করে **আন্না ডি এম কে** দল গঠন করেন। দাক্ষিণাত্যের বিশেষ করে তামিলনাড়ুর পরবর্তী দু'দশকের রাজনৈতিক ইতিহাস হল এই দুটি দলের বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

১৯৯৪ খ্রি মে মাসে ডি এম কে দলে তৃতীয়বার ভাঙন ধরে। প্রথম ভাঙন ১৯৬১ খ্রি ভি কে সম্পতের নেতৃত্বে তামিল ন্যাশনাল পার্টি নামে পৃথক এক দলের উত্থান, দ্বিতীয় ভাঙন ১৯৭২ খ্রি এম. জি. রামচন্দ্রনের নেতৃত্বে আন্না ডি এম কে গঠন এবং তৃতীয় এই বার সাংসদ গোপালস্বামীর সঙ্গে ডি এম কে-র সভাপতি করুণানিধির বিরোধসূত্রে গোপালস্বামীর নেতৃত্বে মলুমারচি ডি এম কে নামে নতুন এক দল গঠিত হয়। আন্নাদুরাইয়ের সাংগঠনিক নিয়মাবলির সামান্য পরিবর্তন করে দলের কর্মসূচি গৃহীত হয়। নির্বাচন কমিশন নতুন দলকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ডিসেম্বরে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলনে ডি এম কে দলের কর্মসূচি ব্যাহত হয়। কারণ সি পি আই (এম) গোপালস্বামীর নবগঠিত দলের সঙ্গে একত্রে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়।

দ্র. আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্র কজগম

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)

মার্কসবাদের দর্শনগত ভিত্তিভূমি। তার দুটি উপাদানের একটি হল হেগেলের ভাববাদী দ্বান্দ্বিক (dialectical) প্রণালী এবং অপরটি মার্কস ও এঙ্গেলসের বস্তুবাদ (materialism)।

হেগেলের দর্শন থেকে দ্বান্দ্বিক যে প্রণালী মার্কস ও এঙ্গেলস গ্রহণ করেন তা একটি জটিল প্রত্যয়। হেগেল সেটি প্রাচীন গ্রিক তর্কশাস্ত্র থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তার মর্ম হল আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কে প্রামাণ্য বিষয়ের (thesis) নেতিবাচক বিপরীত দিকগুলি (anti-thesis) তুলে ধরা, তারপর নয় (thesis) ও প্রতিনয়ের (anti-thesis) বাদানুবাদ থেকে একটা সমন্বয়ে (synthesis) উপনীত হওয়া। সংক্ষেপে দ্বান্দ্বিক প্রণালীটি হল কোনও বিষয়ের দুটি বিপরীত দিকের মিলন তত্ত্ব।

প্রণালীটি হেগেল তাঁর ইতিহাসতত্ত্বে প্রয়োগ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে ইতিহাস হল একটি প্রক্রিয়া (প্রসেস) যার মধ্যে দিয়ে পরম সত্তা (ব্রহ্মও বলা চলে) নিরন্তর নিজেকে উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে অগ্রগমন করে, কাল-পরম্পরায় নিজের সত্যস্বরূপ প্রকাশ করে, আদিম গোষ্ঠীজীবন থেকে ক্রমে অধিক পরিমাণে জাতীয় জীবনকে প্রকাশ করে। হেগেলের এই দ্বান্দ্বিক প্রণালীর তত্ত্ব মার্কস ও এঙ্গেলসকে আকৃষ্ট করে। স্মর্তব্য যে হেগেল তাঁর তত্ত্বের প্রয়োগ শুধু অতীত বিষয়ে আবদ্ধ রাখেন এবং বলেন যে ইতিহাস বা যে-কোনো বিষয়েই প্রযুক্ত হোক না কেন দর্শনের কাজ হল যা ঘটে গেছে তার বিচার-বিশ্লেষণ করা। এখানে মার্কসের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য দেখা দেয়। মার্কস বলেন যে দর্শনের কাজ শুধু ব্যাখ্যা করাই নয়, পরিবর্তন করাও তার কাজ, হেগেলের অবস্থান থেকে এগিয়ে গিয়ে মার্কস দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে ভবিষ্যতেও প্রয়োগ করেন।

হেগেলের দ্বান্দ্বিক প্রণালীর প্রধান যে তিনটি উপাদান মার্কস ও এঙ্গেলস গ্রহণ করেন নীচে তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হল:

১. পরিমাণগত বিষয়ের গুণগত রূপান্তর ও তদ্বিপরীত বিধি।
   এই বিধি অনুযায়ী নতুন গুণগত পরিস্থিতির উদ্ভব এবং তার পরিণাম ব্যাখ্যা করা যায়। অলক্ষ্যে পরিমাণ রূপান্তরিত হয়ে এমন এক স্থানে পৌঁছয় যেখানে গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। চিরাচরিত দৃষ্টান্ত হল—জল গরম হয়ে ১০০° সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে বাষ্প অথবা ঠাণ্ডা হয়ে ০° সেন্টিগ্রেডে নেমে বরফ হয়ে যায়। বাষ্প বা বরফে জল হঠাৎই যেন লম্ফ দিয়ে রূপান্তরিত হয়। এই লম্ফটাকেই মার্কসীয় দৃষ্টিতে বিপ্লব বলা হয়।

২. বৈপরীত্যের ঐক্য বিধি।
   বস্তুসত্তাগত সবকিছুর মধ্যে একই অঙ্গে দুটি বিপরীতধর্মী প্রকৃতি বিরাজ করে, কোনও পার্থক্য দর্শায় না। যেমন একটা বস্তুর পজিটিভ ও নেগেটিভ—বিপরীত দুই মেরুর সত্তাই থাকে; একই রাস্তার একদিক উত্তরে, অপর দিক দক্ষিণে গেছে। বিপরীতমুখী হলেও উভয় প্রকৃতি পরস্পর নির্ভরশীল। ঠিক তেমনি একটি পুঁজিবাদী দেশে বুর্জোয়া ও সর্বহারা একই সমাজদেহের অংশ হিসেবে পরস্পরযুক্ত। সর্বহারার শ্রমকে সস্তায় কেনে বুর্জোয়া শ্রেণী; আবার বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে শ্রম বিক্রয় ছাড়া সর্বহারার

উপায়ান্তর নেই। মার্কসীয় দৃষ্টিতে এই সমাজবিবর্তনের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ব্যাখ্যা করা হয়।

৩. নেতির নেতিকরণ বিধি।

বিকাশ বা বিবর্তনের ধারায় নয় (thesis), প্রতিনয় (anti-thesis) ও সমন্বয় (synthesis) হল এক একটি পর্যায় বিশেষ। নয় তার নিজস্ব অন্তর্বিরোধের ফলে ভেঙে পড়ে এবং প্রতিনয়ের পথ প্রশস্ত করে। প্রতিনয় সেইসব অন্তর্বিরোধের মীমাংসা করে বটে, কিন্তু সেটাও ভেঙে গিয়ে একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে, যার মধ্যে ভেঙে যাওয়া নয় ও প্রতিনয়ের অভগ্ন উপাদানগুলি স্থান পায়। প্রতিনয়ের প্রতিনয় হল সমন্বয়। সেজন্য এই বিধি হল নেতির নেতিকরণ।

উল্লিখিত ত্রিপর্যায়ের বিবর্তন পদ্ধতি মার্কস ও এঙ্গেলস মানুষের সমাজ-বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। যথা আদিম সমাজ, দাসমালিকান, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র। সামন্ততন্ত্রের অন্তর্বিরোধের ফলে তার নেতি হিসেবে উদ্ভূত হয় পুঁজিবাদ। কিন্তু পুঁজিবাদের অন্তর্বিরোধের দরুন সেই নেতির নেতি হিসেবে সমাজতন্ত্র গড়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সম্প্রসারণ ও পরিপূরক।

দ্বান্দ্বিক প্রণালী এগিয়ে চলে ঘূর্ণায়মান পথে। কারণ সমস্ত বাদানুবাদের মিলন ঘটে একটা উচ্চতর পুনর্বিকাশে। মার্কস এঙ্গেলস হেগেলকে উলটিয়ে পায়ের উপর সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেন এই অর্থে যে তাঁরা হেগেলের দ্বান্দ্বিক প্রণালীকে গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা তাঁর ভাববাদী পরমতত্ত্বের চালনশক্তিকে (মোটিভ ফোর্স) নাকচ করেন। পরিবর্তে তাঁরা বস্তুবাদী দৃষ্টিতে সামাজিক তথা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে ইতিহাসের গতিপথের নির্দেশক বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

মার্কসীয় বস্তুবাদে বলা হয় যে বস্তুজগৎই হল জ্ঞানের মূল উৎস। বস্তুজগতে ভাবের অধিগম্যতা থাকলেও বস্তু সম্পূর্ণরূপে ভাবনিরপেক্ষ। মানুষের বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান ও তৎসংক্রান্ত ভাব আসলে মনের উপর বস্তুর সংবেদনের ফলেই ঘটে। মার্কসীয় মতে সংবেদনের মাধ্যমে মনের উপর বস্তুজগতের প্রতিফলন ঘটলেও সেটা জ্ঞানার্জনকে উদ্দীপিত করে মাত্র এবং সেটা সম্পূর্ণ হয় কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে। সংবেদন ক্রিয়াশীল না হলে, সেটা সচেতন কর্মতৎপরতায় পরিণত হত না। পরিবেশের প্রতিক্রিয়ায় মানুষ যদি পরিবর্তনকামী না হত, তা হলে বিপ্লব মনুষ্যকৃত না হয়ে যান্ত্রিকভাবে ঘটত। তাই মার্কস বলেন যে মানুষ কোনও কিছু দেখে তার উপর নিজের ক্রিয়াশীলতার নিরিখে। জ্ঞানের উপর এই ক্রিয়াশীলতার তত্ত্ব অনুযায়ী জ্ঞান যে সক্রিয়তার (praxis) সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত সেটা মার্কসীয় দর্শনের একটি মস্ত অঙ্গ। মার্কসীয় মতে তাই তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকে।

ধ

ধনিকতন্ত্র (Plutocracy)

ধনবান ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত রাষ্ট্র। প্রাচীন গ্রিসের আথেন্সে সোফিস্টদের মধ্যে এই রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতির প্রচলন ছিল। বর্তমান কালেও অলিখিত ধারায় বিশেষ ধরনের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধনী ব্যক্তি রাষ্ট্রপরিচালক হন। যে ব্যক্তির প্রভূত অর্থ থাকে তিনি সরকারি উচ্চপদের অধিকারী। কারণ সেই পদ অর্জন ও বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন ঘটে বিপুল বিত্তের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিপুল বিত্ত ব্যতিরেকে উচ্চপদে নির্বাচিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। ভারতেও সেই প্রবণতা আছে। অবশ্য ধনিকতন্ত্র না হলেও, সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের শাসনকর্তৃত্ব অর্জনের পর বিপুল বিত্ত সঞ্চয়েরও অনেক নজির আছে।

ধর্ম (Religion)

অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক শক্তি তথা ঈশ্বরের উপাসনায় বিশ্বাস। বিশ্বাসের পিছনে অনুমান করা হয় যে ঐশ শক্তি কর্তৃক মানুষ ও তার পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কৃতকর্মের উপর লোকের জীবনে ভাল অথবা মন্দ ফলাফল নির্ভর করে। সমাজ ও সভ্যতায় ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে নানা তত্ত্ব ও সম্প্রদায়গত মতবাদ আছে। সব ধর্মই মনে করে যে ধর্মই হল নৈতিকতার উৎস ; আবার অনেকে মনে করেন ধর্ম ইতিহাসের সবচেয়ে বড় চালিকা-শক্তি। কারও দৃষ্টিতে ধর্মের আচ্ছাদনে সমাজব্যবস্থায় শোষণ ও পীড়নকে অব্যাহত রাখা হয়। তবে প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য বৃদ্ধির ফলে ঈশ্বরের উপর লোকের আস্থা হ্রাস পাচ্ছে

ইতিহাস ও রাষ্ট্রতত্ত্বে ধর্ম ও রাজনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে ; কি শাসিত, কি শাসক, উভয়ের মনেই সেটা প্রতিফলিত। আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তায় প্রায় অধিকাংশ প্রত্যয় ও সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় দৃষ্টিতে প্রভাবিত। যাজকীয় তথা ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে আইন ও প্রাকৃত আইনের

বিবর্তন, সার্বভৌমতা, সম্পত্তি, ন্যায্য মূল্য, সুদ আদায়, সমাজকল্যাণ, শিক্ষা, রাজনৈতিক বাধ্যতা, আনুগত্য ইত্যাদি প্রত্যয়ে ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রভাব যথেষ্টই আছে। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থে নির্দেশিত বহু রাজনৈতিক বিধিবিধান এখনও রাষ্ট্রজীবনে অনুসৃত হয়। ভাববাদী রাষ্ট্রদার্শনিকেরা অনেকাংশেই এই ধারার সমগোত্রীয়। তবে ধর্মীয় মতবাদের সঙ্গে সমান্তরাল ধারায় **বস্তুবাদী**, নিরীশ্বরবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রদর্শন গড়ে উঠেছে। কোনও কোনও রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুযায়ী সরকার পরিচালিত হয়।

দ্র. দিব্যতন্ত্র ; দিব্য অধিকার ; ধর্মনিরপেক্ষতা।

ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)

ইংরেজি সেকিউলারিজম-এর বাংলা প্রতিশব্দ। শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথমটি হল একটি দর্শন বা মনোভঙ্গি যার পশ্চাতে অতিপ্রাকৃত অর্থাৎ ঐশ কোনও শক্তির স্থান নেই। ইহজীবনসর্বস্ব এই প্রত্যয় অনুযায়ী কোনও কিছুই নিয়তিনির্দিষ্ট নয়, ব্যক্তিমানুষ তার সহজাত যুক্তিশীলতার সাহায্যেই নিজের আচরণ ও জীবনযাত্রার রীতিনীতি নির্ধারণে সক্ষম; এই অর্থে সেকিউলারিজম সর্বাংশে নিরীশ্বরবাদী এবং মানবতাবাদের সমার্থক।

শব্দটির দ্বিতীয় অর্থের একটি ঐতিহাসিক পশ্চাৎপট আছে। ইউরোপে দ্বাদশ থেকে কয়েক শতক-ব্যাপী যে **রেনেসাঁস** আন্দোলন ঘটে তা স্পষ্টতই ছিল প্রাতিষ্ঠানিক খ্রিস্টান ধর্ম ও যাজক সম্প্রদায়ের আধিপত্যের বিরুদ্ধে উত্থান। মূলত এই মানবতন্ত্রী উত্থান ও আন্দোলনের ফলে ইউরোপীয় সমাজে কালক্রমে সেকিউলার অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসার ঘটে। বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশ সহজ হতে শুরু করে। রাজতন্ত্রের দিব্য অধিকারতত্ত্বের মূলে ঘা পড়ে। ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্র পৃথকীকরণই ছিল সেকিউলারিজমের প্রধান তাৎপর্য। **উদারনৈতিক গণতন্ত্রের** পথ ক্রমে সুগম হয়। তেমনি ধর্মসংস্কারের পথও প্রসারিত হয়। এর আগে থেকে চলেছিল রাষ্ট্রশক্তি ও খ্রিস্টান চার্চের মধ্যে পারলৌকিক ক্ষমতার কাড়াকাড়ি। পরিশেষে রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্বের বিরাম ঘটে। সেই বিরামের অভিঘাতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গতিশীল বিকাশের পথে এগোয়।

উল্লিখিত দ্বিতীয় ধারায় সমস্ত মানুষই যে নাস্তিক হয়ে পড়ে তা নয়। মানবজীবনে পারত্রিক ও ঐহিক উভয় দিকই থাকে। তবে প্রথমটি মানুষের একান্তই ব্যক্তিগত ও নিজস্ব। মানুষের পারত্রিক বা পারলৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার নানা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ ও ধর্মীয় জীবনের মূল বিষয়। পক্ষান্তরে মানবজীবনের দ্বিতীয় যে ঐহিক ধারা থাকে তার অঙ্গ হল প্রকাশ্য সমাজজীবনের সঙ্গে সঙ্গতিশীল সাধারণ যাবতীয় বিষয়, যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন, প্রশাসন, বিবাহ, পরিবার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি নানান রাষ্ট্রীয় কাজকারবার। উল্লিখিত দুটি ধারার কোনওটিই অপরটির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ যেন না করে, দুটিই হল একে অপরের থেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। প্রগতির নিরিখে সেটাই বাঞ্ছনীয়। পশ্চিমি দেশগুলিতে রাষ্ট্র সব ক্ষেত্রে সমান ধর্মনিরপেক্ষ

ধ

নয় ; নিরপেক্ষতার তারতম্য দেখা যায় ; অবশ্য পশ্চিমি সব দেশেই প্রায় খানাপিনা, বিবাহ, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা সমাজজীবনে বহু পূর্বেই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের মানসিক উৎস সমান। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অন্তঃসার রূপে স্বীকৃত। স্বাধীন মননসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই কেবল স্বাধীনতার সমাদর সম্ভব। সেই ব্যক্তির চাই আত্মনির্ভরতা শক্তি, চাই আপন যুক্তিশীল আত্মবিশ্বাস এবং ধর্মান্ধতার প্রভাবমুক্ত মানসিক দৃঢ়তা। সাম্য ও মৈত্রীর প্রতি অনুরাগ থাকায় জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের ভেদবুদ্ধির প্রভাব থেকেও সে মানুষ মুক্ত। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র প্রায় সমার্থক। যথার্থ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া স্বাভাবিক।

দ্র. ধর্ম ; দিব্য অধিকার ; দিব্যতন্ত্র

ন

নকশাল আন্দোলন (Naxal Movement)

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় নেপাল সীমানা সংলগ্ন তরাই অঞ্চলে নকশালবাড়ি এলাকায় ১৯৬৭ খ্রি মে মাসে একটি কৃষক আন্দোলন থেকে ক্রমে নকশাল আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। সময়টা ছিল পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমল (১৯৬৭-৬৯)। গোড়ায় সশস্ত্র এই বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার কয়েকজন সদস্য। উগ্রপন্থী সেইসব সদস্যরা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক সমিতি নামে পৃথক একটি গুপ্ত মার্কসবাদী পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত করেন (নভেম্বর ১৯৬৭), তাঁদের অধিকাংশই গ্রেপ্তার হন। জেল থেকে মুক্তির পর তাঁরা দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) গঠন করেন। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে ১৯৬৯ খ্রি মে দিবসে এক জনসভায় প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হয়। সি পি আই (এম)-কে নয়া-শোধনবাদী দল আখ্যা দেওয়া হয়। দলছুট বিক্ষুব্ধ কর্মীদের সি পি আই (এম) অতিবাম, হঠকারী ও বাস্তব চিন্তাশক্তিবিহীন বলে সমালোচনা করে।

প্রতিষ্ঠাকালে এক রাজনৈতিক প্রস্তাবে ভারতীয় বিপ্লবের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলা হয় যে ভারত হল একটি আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততন্ত্রী দেশ, বৃহৎ ভূস্বামী ও তাঁবেদার বুর্জোয়া পুঁজিপতির কুক্ষিগত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক রাষ্ট্র। বর্তমান পর্যায়ে ভারতীয় বিপ্লবের প্রকৃতি হল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের, যার প্রধান লক্ষ্য ও কার্যক্রম হওয়া উচিত কৃষি বিপ্লব এবং সামন্ততন্ত্রের অবসান। সেজন্য নতুন পার্টির কর্তব্য হল সংগঠিত কৃষক আন্দোলন ও সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জনযুদ্ধ ও শাসনক্ষমতা দখল; সংগ্রামের মূল কৌশল হবে **গেরিলা যুদ্ধের** রীতি অনুসরণ ও বৈপ্লবিক মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি। সংসদীয় শাসনব্যবস্থা ও সংসদীয় নির্বাচনকে পার্টি সম্পূর্ণ বর্জন করে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের জন্য চাই জনযুদ্ধের গেরিলা পদ্ধতিতে সংগ্রাম। নেতৃত্ব দেবে যে পার্টি সেটা শ্রমিক ও

কৃষকদের নিয়ে গঠিত হবে। গ্রামাঞ্চলে যে সব বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে উঠবে সেগুলি এক সময়ে শহরগুলিকে ঘেরাও করে ক্ষমতা দখল করবে। চারু মজুমদার ও কানু সান্যাল ছিলেন দলের প্রধান তাত্ত্বিক নেতা ও সংগঠক।

নকশাল আন্দোলনে যুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে সক্রিয় ছিল। উল্লিখিত মে দিবসের সমাবেশে সেইসব গোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানের পরিবর্তে সি পি আই (এম-এল) দলে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়। অনেক গোষ্ঠীই নানা যুক্তি দেখিয়ে তাতে যোগ দেয়নি। অবশ্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় গড়ে ওঠে।

অন্ধ্রপ্রদেশে টি নাগি রেড্ডির নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী পার্টির গোড়াপত্তন হয় (জুন ১৯৬৮)। কিন্তু চিরাচরিত প্রথায় পার্টি সংগঠন পরিচালনে তাঁর সঙ্গে চারু মজুমদারের মতদ্বৈধ ঘটে। তাই অন্ধ্রের নাগি রেড্ডি গোষ্ঠী ও পশ্চিমবঙ্গে অসিত সেন গোষ্ঠী সি পি আই (এম-এল) দলের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। তাঁদের দৃষ্টিতে ওই দল মাও-এর মতাদর্শ বিকৃত করে চে গুয়েভারার পথ অনুসরণ করে। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে এবং গ্রামভিত্তিক গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের কর্মসূচিতে তাঁরা দ্বিতীয় সি পি আই (এম-এল) গঠন করেন।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতিবাম ও উগ্র বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত সি পি আই (এম-এল) তার সদস্যদের কাছে বিস্তারিত (১৫ মে ১৯৬৯) খসড়া এক রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলে যে এখন হল মাওবাদের যুগ এবং মাও-এর নেতৃত্বে সকল দেশের মুক্তিযুদ্ধকে একত্র আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করা কর্তব্য। তাতে মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র এবং সহায়তাকারী পুঁজিবাদ হল কমিউনিজমের চার প্রধান শত্রু। ১৯৭০ খ্রি মে মাসে একটি খসড়া দলিলে চারু মজুমদার বলেন চীনের চেয়ারম্যান হলেন সি পি আই (এম-এল) দলের চেয়ারম্যান এবং চীনের পথই তার পথ। সি পি আই ও সি পি আই (এম)-কে শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু এবং নাগি রেড্ডি ও অসিত সেনের গোষ্ঠী হল নয়াশোধনবাদী রেনিগেড (দলত্যাগী)। সি পি আই (এম-এল) দলের ওই মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম পার্টি কংগ্রেসে চারু মজুদারের থিসিস গৃহীত হয়। তাতে গেরিলা যুদ্ধে কৃষক বিপ্লব ও গ্রামীণ এলাকায় মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। জুলাই-অগস্ট মাসে পার্টিতে বিভেদ দেখা দেয়। অন্ধ্রের বিশিষ্ট নেতা নাগভূষণ পট্টনায়ক এবং এম আপ্পালা সুরি পার্টির কর্মসূচি অনুযায়ী শ্রেণীশত্রু হিসেবে ভূস্বামীদের নিধন গ্রামীণ জনগণকে পার্টির প্রতিকূল করে তুলছে বলে মনে করেন। তাঁরা মাও-এর নামে ব্যক্তিপূজার সমালোচনা করেন। ফলে চারু মজুমদার পার্টির প্রধান সংগঠক কানু সান্যালকে মধ্যপন্থী হিসেবে অভিযুক্ত করেন। ১৯৭০ খ্রি সেপ্টেম্বরে পার্টির মুখপত্র 'দেশব্রতী' পত্রিকায় বিগত এক বছরে দেড় শত ভূস্বামী ও সুদখোরকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

নব্বুইয়ের দশকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত নকশাল আন্দোলন কোনও কোনও রাজ্যে শক্তিসম্পন্ন হয়েছে। নাগভূষণের সভাপতিত্বে পরিচালিত ইন্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্ট সমস্ত বামদলগুলিকে নিয়ে কনফেডারেশন বা দলজোট গড়ার আহ্বান জানায় এবং অচিরেই ওড়িশার রাজনীতিতে একমাত্র বিকল্প বামদল হিসেবে আই পি এফ আত্মপ্রকাশ করবে বলে তিনি আশা করেন। অন্ধ্রে জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর অপহরণ, হত্যা,

ব্যাঙ্ক লুঠ এবং সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস ইত্যাদি কাজ আই পি এফ সমর্থন করে না। এঁদের মতে সশস্ত্র সংগ্রামই একমাত্র পথ নয়, তাই এঁরা সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন।

১৯৯২ খ্রি হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের জন্য অন্ধ্রে জনযুদ্ধ গোষ্ঠী নিষিদ্ধ হয়েছে। বিহারে মাওবাদী কমিউনিস্ট সেন্টার এখনও বন্দুককেই ক্ষমতার একমাত্র উৎস বলে মনে করে। পশ্চিমবঙ্গে চারু মজুমদার ও খতমের রাজনীতির বাইরে যে সব গোষ্ঠী বেরোতে পারেনি যেমন সি পি আই (এম এল) দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির অস্তিত্ব ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। খোদ নকশালবাড়িতে কানু সান্যালের সি ও আই (এম-এল) বহুধাবিভক্ত। কোনও কোনও গোষ্ঠী ঝাড়খণ্ড আন্দোলন ও অনুরূপ জনজাতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

জনযুদ্ধ গোষ্ঠী গেরিলা যুদ্ধের কর্মকৌশলে বিশ্বাসী, পক্ষান্তরে মাওবাদী কমিউনিস্ট সেন্টার গণঅভ্যুত্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। উভয় গোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক সম্পর্কে মতপার্থক্য থাকলেও বহু বিষয়ে তারা পরস্পরের কাছাকাছি। দুটি গোষ্ঠীই সশস্ত্র সংগ্রামে নামতে চায়। অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড় ও দিল্লিতে জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর কর্মতৎপরতা বেশি। এম সি সি গোষ্ঠী বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় সক্রিয়। উভয় গোষ্ঠী এতদুদ্দেশ্যে গঠিত নিখিল ভারত প্রতিরোধ সংস্থার মধ্যে মিশে গেছে। কেরল ও উত্তরপ্রদেশে বিক্ষিপ্ত গোষ্ঠীগুলিকে তাতে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সি পি আই (এম-এল) চীন ও তার নেতা মাও জে দং-কে সমর্থন করে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পিছনে ভারতের সক্রিয় ভূমিকাকে এবং সিকিমের ভারতভুক্তিকে পার্টি সমর্থন করেনি। পার্টির প্রধান দুটি মুখপত্র ছিল 'দেশব্রতী' ও 'লিবারেশন'। পরে অনেকগুলি সংযোজিত হয়েছে।

১৯৯২ খ্রি জুলাই মাসে ভিলাইতে নকশালপন্থী ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার শ্রমিক নেতা শঙ্কর গুহনিয়োগীকে সেখানকার কুখ্যাত পঞ্চপ্রধান শিল্পপতিদের গুণ্ডারা হত্যা করার ফলে মধ্যপ্রদেশে নকশাল আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯৯৪ খ্রি বিহারে সি পি আই (এম-এল) দলের প্রকাশ্য গণসংগঠন ইন্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্টের নেতা বিনোদ মিশ্র বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমন্বয়ে কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান কমিউনিস্টস গঠনের প্রয়াসী হন। সংসদীয় রাজনীতি থেকে সরে এসে আই পি এফ বিহারের গয়া ও ঔরঙ্গাবাদ জেলায় মাওইস্ট পার্টি ইউনিটি গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের রক্তক্ষয়ী লড়াই মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

অন্ধ্রপ্রদেশে জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গে সরকারের সংঘাত বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমবঙ্গে কানোরিয়া জুট মিলকে কেন্দ্র করে গঠিত সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের সমন্বিত চারটি নকশাল গোষ্ঠী নেতৃত্ব দেয়। সীমাহীন দারিদ্র্য ও শোষণের ফলে মধ্যপ্রদেশে অনেক দূরবর্তীস্থানে নকশালদের পালটা সরকার গড়ে উঠেছে। ১৯৯৪ খ্রি নকশাল আন্দোলনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে লিবারেশন গোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন সমস্ত বৈপ্লবিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানায়।

১৯৯৫ খ্রি মে মাসে কানু সান্যালের নেতৃত্বে পরিচালিত কমিউনিস্ট অর্গানাইজেশন অব ইন্ডিয়া (এম-এল) দলকে বিভিন্ন গোষ্ঠী যথা জনশক্তি গোষ্ঠী, নয়া গণতন্ত্রমুখী

গোষ্ঠী, সন্তোষ রাণার গোষ্ঠী ছাড়াও সি পি আই (এম) দলের বিক্ষুব্ধ মার্কসবাদী কেন্দ্র প্রভৃতিকে চতুর্থ সর্বভারতীয় সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য প্রবৃত্ত করে। উল্লেখ্য, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে কোনও কোনও বিশিষ্ট নকশাল নেতা মতাদর্শগত ভিন্ন দলীয় ধারায় যোগ দিয়েছেন।

দ্র. কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী)

নগররাষ্ট্র (City State)

প্রাচীনকালে সামাজিক ও রাজনৈতিক একাত্মতার ভিত্তিতে গঠিত স্বশাসিত এক একটি নগর বা জনপদ। তার সমার্থক শব্দ হল প্রাচীন গ্রিসের পুররাষ্ট্র (polis)। ইতিহাসের আদিপর্বে মেসোপটেমিয়ায় নগররাষ্ট্রই ছিল সংঘবদ্ধ ও স্বাভাবিক সমাজজীবনের আধার। তারই ভিত্তিতে ক্রমে গড়ে ওঠে ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় সাম্রাজ্য। নানা সময়ে বিভিন্ন দেশে নগররাষ্ট্র গড়ে ওঠে। কিন্তু উজ্জ্বলতম ছিল প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রসমূহ। যেগুলি থেকে উত্তরকালে পশ্চিমি সভ্যতা ও রাষ্ট্রচিন্তা উৎসারিত হয়; যেগুলি থেকে (বিশেষ করে আথেন্স) গণতন্ত্রের ধ্যানধারণা উদ্ভূত হয়েছিল। তবে সবক্ষেত্রে সেগুলি গণতন্ত্রী রাষ্ট্র ছিল না। বেশির ভাগ ছিল রাজতন্ত্র অথবা গোষ্ঠীতন্ত্র। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের স্বাধীন রাজতন্ত্রী শাসন এবং রেনেসাঁসের সময়ে ইতালির রাজ্যগুলি ছিল নগররাষ্ট্র।

নগররাষ্ট্রের জনসংখ্যা বেশি হত না। ফলে নাগরিকদের সঙ্গে শাসকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকত। আশপাশের গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলত। প্রতিবেশী অন্যান্য নগররাষ্ট্রের অধিবাসীরা একই ভাষায় কথা বলত। পারস্পরিক বন্ধুত্ব, রেষারেষি, সংঘর্ষ দেখা দিত। বস্তুত নগররাষ্ট্রগুলি ছিল এক একটি উপজাতি অধ্যুষিত।

নবদক্ষিণ (New Right)

নববাম ধারার মতো দক্ষিণপন্থার মধ্যে কিছু নতুন প্রবণতা দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ফ্রান্সে—যার মূলে পূর্বতন রক্ষণশীলতা ও সমাজতন্ত্র-বিরোধিতার সঙ্গে উদারনৈতিক মানসিকতার পরিমিশ্রণ দেখা যায়। তবে বিভিন্ন দেশে এই নবদক্ষিণ প্রবণতার মধ্যে বৈসাদৃশ্য আছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে কমিউনিস্ট শাসনের অবসানের ফলে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ভীতি প্রশমিত হলেও সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে এখনও অনেকে স্তালিনীয় পীড়নমূলক ভূমিকা ও রাজনৈতিক বিরোধিতা সম্পর্কে অনমনীয় মনোভাব প্রত্যক্ষ করেন। তাঁদের দৃষ্টিতে মার্কসীয় তত্ত্বে ইতিহাসের নিয়তিনির্দিষ্ট পরিক্রমণই বড়, ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন কোনও সত্তা নেই তাতে। দ্বিতীয় ধারায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিবাদ ও ব্যক্তিগত মালিকানায় আরও বেশি গুরুত্ব আরোপিত হয় উদারনৈতিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার আলোকে। রাষ্ট্রদার্শনিক এফ এ ফন হায়েকের মতে পুঁজিবাদ ও ব্যক্তিগত মালিকানায় সাবেকি

অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ও প্রথাসমূহের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব বিরাজ করে। অনুরূপ অভিমত হল মার্কিন দার্শনিক রবার্ট নোজিক-এর ; তিনি সেইসঙ্গে নীতিনিষ্ঠ গরিষ্ঠ-সংখ্যক মানুষের প্রতি একটি সুশোভন বিনম্র আচরণ লক্ষ করেন যার ভিত্তি হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন এক ধরনের নৈরাজ্যবাদ। এঁরা রাজনীতির যুগোপযোগী পরিবর্তনে বিশ্বাসী এবং ঐতিহ্যগত অচল বিধিবিধানের বিরোধী।

তৃতীয় ধারায় আইন, নৈতিকতা ও সমাজচেতনায় মাত্রাধিক বামঘেঁষা উদারনৈতিক ও আলোকপ্রাপ্ত মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আরও কঠোর কর্তৃত্ববাদী সরকার গঠনের চাহিদা ফুটে ওঠে—অন্তত যে-সরকার সাবেকি মূল্যবোধ, প্রথা ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নবদক্ষিণ তৃতীয় ধারার প্রবণতা যুক্তরাজ্যেই বেশি। রক্ষণশীল দলের আয়ান গিলমুর প্রমুখ তাত্ত্বিক নেতাদের কাছে এডমান্ড বার্ক (১৭২৯-৯৭) হলেন আদর্শ। বার্ক ফরাসি বিপ্লবকে নিন্দা করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রয়োগবাদী রাজনীতি ও অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী। এখানে লক্ষণীয় যে নবদক্ষিণদের অন্তর্নিহিত মূল স্ববিরোধ হল রক্ষণশীলতা ও উদারনৈতিকতার সংমিশ্রণ।

ফ্রান্সের নবদক্ষিণ আন্দোলনের মধ্যে রক্ষণশীল ঐতিহ্য অপেক্ষা উদারনৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব বেশি। তাঁরা চান যথার্থ মানবিক বিকাশ। আলেঁ দ্য বেনোয়া প্রমুখ তাত্ত্বিকেরা মানুষের আত্মম্ভরিতা ও আত্মোন্নতির পিছনে জৈব আকুতি প্রত্যক্ষ করেন, যেটা সমাজতান্ত্রিক যূথবদ্ধতায় খর্ব হয়।

নববাম (New Left)

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে ইউরোপে কিছু সংখ্যক মার্কসপন্থী ভাবুকের মধ্যে কমিউনিজম ও তার অন্যান্য দিক সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটতে শুরু করে ; তাঁদের রাজনৈতিক ভাবনা ও প্রবণতা 'নিউ লেফট' নামে অভিহিত। যুক্তরাজ্যে ওই সময় থেকে প্রকাশিত এঁদের 'নিউ লেফট' পত্রিকার নামকরণ ও তাতে আলোচিত বিষয়াদি এই গোষ্ঠীর পরিচিতি বহন করে। এঁদের সমগোত্রীয় তাত্ত্বিক ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আছেন। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে ফ্রান্সে জাঁ পল সার্ত্র প্রমুখের প্রতিরোধ আন্দোলনের সদস্যরা নববাম ধারাকে পরিপুষ্ট করেন। বিভিন্ন দেশে প্রবহমান এই ধারার মধ্যে মিল এইটুকু যে সবাই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। তাঁদের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নানা সমালোচনা ও বামপন্থী তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে ; মার্কসীয় তত্ত্ব, যেমন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, সর্বক্ষেত্রে গৃহীত হয়নি। যুক্তরাজ্যের নববামগোষ্ঠী মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে আধুনিক ইতিহাসের এবং সমকালীন ঘটনাবলির বিশ্লেষণ করেছে। প্রবক্তাদের মধ্যে রেমন্ড উইলিয়ামস, পেরি অ্যান্ডারসন ও ই পি টমসনের নাম উল্লেখযোগ্য।

নববাম আন্দোলনের সমালোচনাও হয়ে থাকে নানা দৃষ্টিতে। কারও কারও মতে এই আন্দোলন বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাসমূহের নেতিবাচক বিশ্লেষণ করে মাত্র—তাতে গঠনমূলক সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পরিবর্তে নিন্দাই ফুটে ওঠে বেশি। অনেকে আবার তাদের সঙ্গে জার্মানি ও ইতালির সন্ত্রাসবাদীদের যোগসূত্র দেখতে পান। বিভিন্ন

দেশের নববাম আন্দোলনের মধ্যে সুসংবদ্ধ ও সর্বাত্মক কোনও মতবাদ নেই, যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে কোনও অভিযোগ দায়ের করা যায়।

নবমার্কসবাদ (Neo-Marxism)

প্রত্যয়টি একটি কোনও সুস্পষ্ট ধারায় দানা বাঁধেনি। ধ্রুপদী মার্কসীয় দর্শনের মূলধারা থেকে উৎসারিত নানান শাখা-প্রশাখা এখন থেকে প্রায় শতাব্দীকাল পূর্ব হতেই প্রবহমান। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকাল থেকে বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল বহু দেশের সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে মার্কসীয় দর্শনের প্রধান উপাদানগুলি গৌণ হতে শুরু করে। দর্শন ও বাস্তব রাজনীতির মধ্যে সঙ্গতির বিচ্যুতি দেখা দেয়। মার্কসীয় দর্শনের মূল তত্ত্ব হল বস্তুবাদ, যেটিকে মার্কস ব্যবহারিক রূপ দিয়েছেন **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ** তত্ত্বে। তাঁর দৃষ্টিতে ইতিহাস তথা বস্তুজগৎ এগিয়ে চলে **দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী** গতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী। মার্কস-এঙ্গেলস-এর পথ থেকে কাউটস্কি, প্লেখানভ, বুখারিন, লেনিন ও মাও অবধি বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রদার্শনিকের সময় অবধি মননশীল আলাপ-আলোচনায় মার্কসীয় বস্তুবাদ নানাভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

কিন্তু প্রাত্যহিক ও বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে কার্যকর বৈপ্লবিক আন্দোলনের তাগিদ হল বড়। তত্ত্বের চেয়ে সেখানে স্থান ও কালের উপযোগী প্রয়োগের উপর বেশি দৃষ্টি দেওয়া হয়। কমিউনিস্ট পার্টির সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে বিচিত্র ও এমন কী পরস্পরবিরোধী চিন্তাভাবনা এবং বিপ্লবের রণনীতি ও কৌশল সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী দেশের মধ্যে জীবনযাত্রার তারতম্য বিপুল। মার্কসীয় মতাদর্শের পরিধিতে গণতন্ত্রী ও সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী একত্র অবস্থান করে। কেউ চায় শহুরে শ্রমিকদের নেতৃত্ব, কারও মতে কৃষি-বিপ্লব বেশি জরুরি। কেউ হয়তো সহিংস বিপ্লবের পক্ষপাতী, আবার কেউ অহিংস চরমপন্থী। মূল মার্কসীয় বস্তুবাদী তত্ত্ব বজায় রেখে সবই হয়তো চলতে পারে। কিন্তু বস্তুবাদী প্রত্যয় বর্জন নবমার্কসবাদী প্রবণতার একটি অনভিপ্রেত লক্ষণ। নবমার্কসবাদীদের মধ্যে অনেকে মার্কসীয় দর্শনে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পরিবর্তে উপরিকাঠামো মনুষ্য-চেতনাকে অগ্রবর্তী বলে মনে করেন।

কোনও কোনও দেশে সংসদীয় রাজনীতির বৈপ্লবিক সম্ভাবনা সম্পর্কে কৌশলগত নানাবিধ মনোভাব দেখা যায়। কিন্তু কৌশল সম্পর্কিত বিতর্ক তত্ত্বগত রূপ নিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বে যখন আঘাত করে, দর্শন রাজনীতি, রাষ্ট্র, চেতনা ইত্যাদি প্রশ্ন স্বতন্ত্রভাবে বিবেচিত হয়, তখন নবমার্কসবাদ প্রত্যয় প্রকট হয়ে ওঠে। মার্কসীয় বস্তুবাদী ধারা থেকে আদোর্নো, লুকাস, **গ্রামশি**, সার্ত্রে, মারকিউস থেকে শুরু করে **ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের** বিদ্বৎগোষ্ঠী পর্যন্ত অনেক খ্যাতনামা মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী অল্পবিস্তর সরে গেছেন।

দ্র. মার্কসবাদ ; মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ; শোধনবাদ

নয়া-উপনিবেশবাদ (Neo-colonialism)

সাম্রাজ্যবাদী পূর্বতন দেশগুলি (যেমন ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য) দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর তাদের উপনিবেশগুলিকে রাজনৈতিক স্বাধিকার প্রদানের পরেও সেখানে অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় ও বিস্তারের যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় সেটাকেই প্রথম দিকে নয়া-উপনিবেশবাদ বলা হত। পরে শব্দটিতে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা আরোপিত হয়। অচিরেই আর এক ধরনের নতুন ঔপনিবেশিক শক্তি (যেমন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি) দেখা দেয় যাদের উপনিবেশ ছিল না বা থাকলে অল্পই ছিল।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন রাষ্ট্রগুলি উপলব্ধি করে যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। কার্যত ঔপনিবেশিক শাসনকালে যে অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা আরোপিত হয়েছিল পরবর্তীকালে সেটাতেই পূর্ববর্তী ঔপনিবেশিক শক্তির স্বার্থে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। অনেক সদ্য স্বাধীন উপনিবেশে উৎপাদনের পরিমাণ কম, কৃষিজাত কিছু পণ্যের রপ্তানির উপর নির্ভর করতে হয়। সুদূর বিদেশের বাজারে যে মূল্য পাওয়া যায় তাতে জিনিসপত্র আমদানির খরচ মেটে না। স্বদেশে প্রস্তুত রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন নির্ভর করে পূর্বতন ঔপনিবেশিক দেশগুলির ব্যবসায়ীদের উপর। বিদেশে উচ্চ আমদানি শুল্ক ও সংরক্ষণমূলক বিধিব্যবস্থা থাকায় অনুন্নত দেশের পক্ষে শিল্পোন্নয়নের প্রয়াস উৎসাহব্যঞ্জক নয়। তা ছাড়া শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন, পেটেন্ট করা কারিগরি বিদ্যার জন্যও বিদেশি উন্নত দেশের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে ঔপনিবেশিক শক্তি নতুনভাবে আধিপত্য শুরু করে। বিদেশি ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হলে ও তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকার অধিগ্রহণ করলে বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপ শুরু করে।

উল্লিখিত নয়া-উপনিবেশবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে সদ্য স্বাধীন অনুন্নত দেশগুলি সমবেতভাবে সর্বপ্রথম ১৯৫৫ খ্রি জোটনিরপেক্ষ বান্দুং সম্মেলনে সরব হয়ে ওঠে। সেই সময় থেকে নয়া-উপনিবেশবাদ শব্দটির প্রচলন বিস্তৃতি লাভ করে। শব্দটি যদিও অর্থনৈতিক শোষণসূত্রে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সেটি ঔপনিবেশিক শক্তির রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি, সামরিক সমর্থন অর্জন, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা ও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়। নয়া-উপনিবেশবাদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামরিক মাত্রা দুটি যুক্ত হবার ফলে তার অর্থনৈতিক দিকটি ঢাকা পড়ে যায়, যেমন দেখা গিয়েছিল ভিয়েতনামে।

নরমপন্থী (Moderate)

দুটি অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয় : (১) রাজনৈতিক চিন্তা, (২) রাষ্ট্রের স্বরূপ। প্রচলিত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নরমপন্থী হিসেবে চিহ্নিত হন তাঁরাই যাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন, কিন্তু কারও দেহে বা মনে আঘাত করেন না। বাহ্যিক আকারে ও চরিত্রে নরমপন্থী ক্রিয়াকলাপ জানা যায়। প্রথমত মুখোমুখি বাদপ্রতিবাদের পরিবর্তে বিরোধী মতামতের সালিশি মীমাংসা ; প্রায় তাই থেকেই আসে দ্বিতীয়টি যে বিপ্লবের পরিবর্তে

নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অসন্তোষের নিষ্পত্তি। তৃতীয়ত ক্রমান্বয়িক ও অহিংস পদ্ধতিতে রাজনৈতিক পরিবর্তনে বিশ্বাস ; চতুর্থত নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের মধ্যে ঐকমত্য এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তার প্রতিফলন এবং আইনে রূপায়ণ করায় আস্থা। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে ঐকমত্য স্থানান্তরিত হয় ; সরকার ও জনমতের একই বিন্দুতে উপনীত হওয়াটাই রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া কাম্য, সেটাই বিবাদ-বিরোধে মীমাংসার উৎস। পঞ্চমত ঐকমত্যের সঙ্গে অমিল ঘটলেও তার প্রতি সহিষ্ণুতা রাখা চাই।

রাষ্ট্রকেও মডারেট অর্থাৎ নরমপন্থী আখ্যা দেওয়া হয়, সেটা কেবল তার ভাবাদর্শের জন্য নয় ; দেবার কারণ হল যে নরমপন্থী রাষ্ট্র ভারসাম্য বজায় রেখে মীমাংসার পথ অনুসরণ করে। পুরসমাজে পরস্পরবিরোধী শক্তির মতো কারও সঙ্গে সংঘাত বা তার উচ্ছেদ চায় না। নরমপন্থী সরকারের অন্যতম লক্ষণ হল বিরোধীপক্ষের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া। যুক্তি দেখানো হয় যে সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন সরকার এবং বিরোধী পক্ষের সমন্বয়ে আইনের শাসন রচিত হওয়া সম্ভব।

নাগরিক (Citizen)

আইনের দৃষ্টিতে কোনও ব্যক্তি যখন নির্দিষ্ট একটি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকে এবং সেই রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভ করে তখন সেই ব্যক্তি ওই দেশের নাগরিক। নাগরিকত্বের বিধিবিধান এক একটি দেশের আইন অনুযায়ী প্রণীত হয়। **আন্তর্জাতিক আইন** অনুযায়ী নাগরিকত্ব ও জাতীয়তা (nationality) সমার্থক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুযায়ী একটি দেশের সংবিধান যে সব অধিকার ও কর্তব্য নির্দেশ করে সেগুলির প্রতিপালন শর্তে নাগরিকত্ব নিরূপিত হয়। সেই কারণে প্রাচীনকাল থেকেই নাগরিকত্বের ভিত্তি নির্ধারণ এবং আইনকানুনের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা হয়ে এসেছে। আরিস্তোতল মনে করতেন কার্যনির্বাহী পদ গ্রহণের যোগ্যতা থাকলে নাগরিকত্বের অধিকার পাওয়া যায়। তাই ক্রীতদাসদের নাগরিকত্ব থাকত না। কাজেই নাগরিকত্ব আর প্রজাস্বত্ব এক নয়। নাগরিকত্ব পেতে হলে পর্যাপ্ত কার্যনির্বাহী পদ সকলের কাছে উন্মুক্ত থাকা চাই। বর্তমানে এটি সাংবিধানিক তত্ত্বের গোড়ার কথা। তবে কার্যনির্বাহী পদ কথাটির ব্যবহার সংকীর্ণ অর্থে হলে চলবে না। আইনের সংজ্ঞায় প্রদত্ত পারস্পরিক দায়িত্ববোধের উপলব্ধি চাই।

নাটো (NATO)

নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের সংক্ষিপ্ত নাম। ১৯৪৯ খ্রি ওয়াশিংটনে পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বারোটি প্রধান দেশকে নিয়ে এই সংস্থাটি গঠিত হয়। পরে তাতে গ্রিস, তুরস্ক ও পশ্চিম জার্মানি যোগ দেয়। ১৯৮২ খ্রি ষোড়শ দেশ হিসেবে স্পেনও যুক্ত হয়। মূলত কমিউনিস্ট বিরোধী রাষ্ট্রজোট হিসেবে গঠিত এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদ-বিরোধের নিষ্পত্তি এবং সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে একক ও সম্মিলিত প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলা। **রাষ্ট্রসংঘ** কর্তৃক গৃহীত সনদের ৫১ ধারা অনুযায়ী নাটো-র সদস্য কোনও দেশের উপর আক্রমণ হলে সকলের উপর আক্রমণ হিসেবে সেটির বিবেচনা ও যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নাটোর সংসদে সদস্যদেশের রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের স্থায়ী প্রতিনিধিদের মধ্যে যে-কোনও একজন প্রতিনিধিত্ব করেন। সামরিক কমিটিতে থাকেন সংশ্লিষ্ট সদস্য দেশসমূহের স্থায়ী প্রতিনিধি এবং সমরবিভাগের প্রধান সেনানায়কেরা। নাটো-র সেনাবাহিনী বিভিন্ন আঞ্চলিক কমান্ডে বিভক্ত।

দ্র. ওয়ারস চুক্তি

নাৎসিবাদ (Nazism)

জার্মান ভাষায় ন্যাশনাল সোসালিজমের সংক্ষিপ্ত শব্দ। ১৯২০ খ্রি অক্টোবরে জার্মানির মিউনিক শহরে জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলনে দলের মতাদর্শরূপে শব্দটি গৃহীত হয়। দলের এই আদর্শ ইতালির দক্ষিণপন্থী ও স্বৈরতন্ত্রী ফ্যাসিস্ট দলের মতো। হিটলার নেতা হবার পর তিনি জাতিবিদ্বেষী, ইহুদিবিরোধী এবং উচ্চতর আর্য জাতি প্রত্যয় দলের মতাদর্শে অন্তর্ভুক্ত করেন। ভার্সাই চুক্তির সংশোধনের দাবিও তাঁর প্রস্তাবে দলের দাবি হিসেবে গৃহীত হয়। ইতালির ফ্যাসিস্টদের আনুষ্ঠানিক রীতিনীতিও নাৎসিরা অনুসরণ করে।

১৯৩৩ খ্রি ক্ষমতায় আসার পর জাতীয় সমাজতন্ত্র আদর্শের জাতীয়াবাদী দিকটি প্রাধান্য পায়। প্রচলিত অর্থে সমাজতন্ত্রী পথ সঠিক অনুসরণ না করলেও নাৎসিরা পুঁজিবাদকেও পুরো গ্রহণ করেনি। ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে ; একচেটিয়া কোনও ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়নি ; বরং মুষ্টিমেয় লোকের হাতে মূলধনের নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। তবে সারা দেশের অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ সরকারি কর্তৃত্বাধীনে থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানায় আস্থা এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় অনাগ্রহ প্রকাশ পায়। রাজনৈতিক তাগিদে, বিশেষ করে বেকার সমস্যা ঘোচাতে, দেশের অস্ত্রশক্তি বাড়াতে এবং যুদ্ধের উপযোগী শিল্পোন্নয়নের জরুরি প্রয়োজনে ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারি উদ্যম বিকশিত হয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নাৎসি দল ছাড়া অন্য সব দল নিষিদ্ধ ছিল। দলের নীতিনির্ধারণে সদস্যদের কোনও অধিকার থাকত না। হিটলারই ছিলেন একচ্ছত্র ক্ষমতায় আসীন একমাত্র নেতা ; তাঁর নির্দেশ পালন করাই ছিল সদস্যদের কর্তব্য। কোনও কোনও শ্রেণীর লোকেদের দলীয় সদস্যপদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল। ১৮০০ খ্রি পরে ইহুদি পূর্বপুরুষ ছিল যাদের তারা সদস্য হতে পারত না। জার্মান জাতি ও রক্তের একমাত্র প্রাধান্য ছিল। দলের গঠন ও আদর্শে সামরিক মনোভঙ্গি থাকা ছিল একান্তই আবশ্যক। গণতন্ত্র ও মানবতা ছিল উপহাসের বিষয়, গুরুত্ব ছিল যুদ্ধ, বলপ্রয়োগ এবং রক্তের। জাতীয় স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগের আহ্বান জানানো হত। বলা হত নাৎসিবাদ হল জার্মান মানবাত্মার অভিব্যক্তি, যার ভিত্তিতে অন্যান্য দেশের সংখ্যালঘু জার্মানদের যুক্ত করার চেষ্টা করা হত। ১৯৩০-৩২ কালপর্বে দলের প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করে। জার্মানির অর্থনৈতিক মন্দা এবং ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যাই ছিল ওই দলের জনপ্রিয়তার কারণ। পার্টির সদস্য সংখ্যা তখন বিশ লক্ষ। ১৯৪৫ খ্রি সেটা ৬০ লক্ষে পৌঁছয়। ১৯৩৩ খ্রি ৩০ জানুয়ারি হিটলার জার্মানির চান্সেলর নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পর নাৎসি দল বেআইনি ঘোষিত

হয়। পশ্চিম জার্মানিতে নাৎসি মতাদর্শে বিশ্বাসীরা নয়া-নাৎসি নামে অভিহিত।

নারদনিক (Narodnik)

শব্দটি রুশ ভাষার অন্তর্গত ; অর্থ সাধারণ লোক। রাশিয়ায় উনিশ শতকের সত্তরের দশকে গঠিত একটি সমাজতান্ত্রিক লোকবাদী দল। রাশিয়ার প্রবাসী বিপ্লবী নেতা আলেকজান্ডার হারজেনের পরোক্ষ প্রভাবে এই দল মনে করত Mir নামে অভিহিত রাশিয়ার কমিউনের জনসম্পত্তির ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব ; তাতে পশ্চিমি পুঁজিবাদের অভিশাপ এড়িয়ে চলা যায়। দলটি কৃষিবিপ্লবে আবদ্ধ থাকতে চাইত এবং মনে করত যে রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতাসীন হয়। তবে হারজেনের শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের পন্থায় তারা বিশ্বাসী ছিল না। সেদিক থেকে এটি ছিল একটি নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন। রাজনৈতিক বিপ্লবের পরিবর্তে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, বিকেন্দ্রীকরণ এবং সম্পত্তির পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে যাবতীয় সামাজিক গলদ দূরীভূত করা সম্ভব বলে তারা মনে করত। এঙ্গেলস ও লেনিন নারদনিকদের মতবাদকে অবৈজ্ঞানিক ও বিপ্লবের বিরোধী হিসাবে সমালোচনা করেন।

নারী-অধিকার আন্দোলন (Feminism)

পিতৃশাসনের অবসান এবং নারীদের পুরুষদের সমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলন। ফরাসি বিপ্লবে নারীদের যোগদানের সময় থেকেই নিজেদের অধিকার সম্পর্কে তাদের চেতনা ও আন্দোলন দানা বাঁধে। ইউরোপে তার পূর্ববর্তী শিল্প বিপ্লবের সময় মেয়েদের কি ব্যক্তিগত, কি সম্পত্তিগত কোনও অধিকার ছিল না। যুক্তরাজ্যে ১৭৯২ খ্রি মেরি উলস্টোনক্র্যাফটের রচনাদি থেকে নারী জাগরণের সূত্রপাত ঘটে। তিনি প্রধানত চেয়েছিলেন নারীদের লেখাপড়া শেখার সমান সুযোগ। উনিশ শতকে এই সংগ্রামের ফলে নারীরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পুরুষদের কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়। গোড়ায় নারী অধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শিক্ষিত শ্রেণীর পুরুষ শাসন থেকে কিছুটা মুক্ত নারীরা। তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে নারীরা পুরুষদের তুলনায় নানাবিধ অধিকার থেকে বঞ্চিত ও সামাজিক মর্যাদায় সম-পর্যায়ভুক্ত নন এবং তাঁদের উপর পুরুষেরা সব কিছুতে আধিপত্য করে। আন্দোলনের ফলে ইউরোপে কালক্রমে বিবাহিতা নারীরা আইনগত অনেক অধিকার পায়, বিশেষ করে স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার, আশ্রয়ের অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদ ও সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়ের অধিকার। নারী অধিকার আন্দোলনের বিভিন্ন ধারায় অন্যতম একটি দাবি ছিল ভোটাধিকার, যেটি যুক্তরাজ্যে ১৯১৮ খ্রি আংশিক এবং ১৯২৬ খ্রি পূর্ণ স্বীকৃতি পায়। আন্দোলন ক্রমে লেবার পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রছায়ে সংসদীয় সংস্কার আন্দোলনের রূপ নেয়। উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৫৭ খ্রি থেকে বাঁচার উপযোগী বেতন এবং অনধিক ১০ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণের দাবিতে নারী শ্রমিক ও কর্মচারীরা প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেন। ভোটাধিকারের রাজনৈতিক দাবির সঙ্গে অর্থনৈতিক অধিকারের দাবি মিশ্রিত

হয়। ১৯১০ খ্রি কোপেনহেগেনে ইন্টারন্যাশনাল সোসালিস্ট উইমেন্স কনফারেন্স ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে ৮ মার্চ তারিখটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যুক্তরাজ্যে সমান বেতনের দাবিতে নারী শ্রমিক ও কর্মচারীরা ধর্মঘট করেন।

এরপর বিশ শতকের ষাটের দশক থেকে ইউরোপে নারী অধিকার আন্দোলন নারী মুক্তি (লিবারেশন) আন্দোলনে পরিণত হয়। এটিতে নানা গোষ্ঠী ও আদর্শের নারী সংগঠন মূল সাতটি দাবির ভিত্তিতে সমন্বিত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান দুটি গোষ্ঠীর একটি হল সমাজতন্ত্রী ও মার্কসবাদী এবং অপরটি হল আমূল পরিবর্তনবাদী ও বিপ্লবী।

মার্কসবাদী নারী আন্দোলনে বলা হয় যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে পুঁজিবাদের সম্পর্ক নিবিড়। এই মনোভঙ্গির উৎস হল এঙ্গেলসের তত্ত্ব যে ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে আদিম পিতৃশাসিত সমাজের উদ্ভব ঘটে। নারী আন্দোলনকে মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা প্রভাবিত করে। লেনিন, ত্রৎস্কি প্রমুখের রচনায় নারী অধিকারের বিষয়টি বিশেষ স্থান পেয়েছে। ক্লারা জেটকিন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে একটি স্বতন্ত্র নারী বিভাগ গঠন করেন। রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েত দেশে নারীদের বিবাহ ও পরিবারের প্রশ্নটি সমস্যার আকারে দেখা দেয়। মার্কসীয় দৃষ্টিতে নারী নির্যাতন পুঁজিবাদী সমাজের লক্ষণ। এঙ্গেলস মনে করতেন যে গৃহের বাইরে কর্মজীবন, তথা সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে যোগ দিলে নারী জাতির যথার্থ মুক্তি সম্ভব। লেনিনের মতে গৃহে বদ্ধ জীবন থেকে যে গ্লানি দেখা দেয় সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য নারীদের কাজে নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

নারী অধিকার আন্দোলনে আমূল পরিবর্তনবাদী ও বিপ্লবীরা নারী পুরুষের বৈষম্যকে প্রাকৃতিক ও জৈবিক বলে মনে করেন যার সুযোগে পুঁজিবাদ তথা অর্থনৈতিক বৈষম্যের সূত্রপাত ঘটে। তাঁরা মনে করেন যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থায় নারীর হীনাবস্থার মূল কারণ হল জৈবিক অসমতা।

নারী আন্দোলনের বিরুদ্ধপক্ষের বক্তব্য হল যে নারী-পুরুষের মধ্যে যে সম্পর্ক বিরাজ করে এসেছে সেটা আকস্মিক কিছু নয়, বরং একটা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তা গড়ে ওঠে। নারী ও পুরুষ উভয়ে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, সেই সম্পর্কের ভিত্তিতেই তাদের জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে। পুরুষের আধিপত্য একটি বাহ্যিক রূপ মাত্র; তাই দেখে নারী-পুরুষ সম্পর্কের আসল প্রকৃতি যাচাই করা যায় না।

নারীর ভোটাধিকার (Woman suffrage)

আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচনে নারীর ভোটাধিকার দাবি ১৮৪৮ খ্রি যুক্তরাষ্ট্রে এবং ১৮৫১ খ্রি ইংল্যান্ডে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল। ইংল্যান্ডে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের সমর্থনে জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর 'সাবজেকশন অব উইমেন' (১৮৬৯) গ্রন্থে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেন। বহুকাল যাবৎ স্ত্রীলোকেরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এমেলিন প্যাঙ্কহার্স্ট এক শক্তিশালী আন্দোলন সৃষ্টি করেন। উনিশ শতকের শেষাশেষি নারীর ভোটাধিকার দাবির আন্দোলন বিভিন্ন দেশে প্রবল হতে শুরু করে। ১৮৯৮ খ্রি ইংল্যান্ডে ত্রিশ বছরের অধিক বয়স্ক স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার দাবি স্বীকৃতি

পায়। ১৯২৮ খ্রি সেই অধিকার সংশোধিত আকারে পুরুষদের সমতুল হয়। ১৯৩৪ খ্রি পর থেকে লাতিন আমেরিকার ছয়টি দেশ এবং ফিলিপাইনসে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার বিধিবদ্ধ হয়। ইউরোপে ফিনল্যান্ড ও নরওয়ে দেশ দুটি অনতিকাল পরে ভোটাধিকার দাবি মেনে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৫-৪৬ খ্রি ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম ও জাপান এই নজির অনুসরণ করে। ভারতবর্ষে ইংরেজ আমলে আংশিক এবং স্বাধীনতার পর প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রবর্তিত হয়েছিল। সুইজারল্যান্ডে ১৯৭১ খ্রি থেকে মহিলা নাগরিকেরা এই অধিকার পেয়েছেন।

নিগমবদ্ধ রাষ্ট্র (Corporate State)

যে রাষ্ট্রে সরকার নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব করে না কিংবা তাদের কাছে জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকে না। তার পরিবর্তে নাগরিকদের নিয়ে গঠিত বিভিন্ন নিগমের কাছে সরকারের জবাবদিহির দায়িত্ব থাকে। নিগমগুলি অনেকাংশে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক স্বশাসিত রাজ্যের মতো এবং সেগুলির অবস্থান হল কেন্দ্রীয় শক্তি ও নাগরিকদের মধ্যবর্তী স্থানে এবং স্বাধীন আনুগত্যের ভিত্তিতে সেগুলি একটিমাত্র সরকারে সমন্বিত ও সংযুক্ত থাকে। ফ্যাসিবাদী আন্দোলন নিগমবদ্ধ রাষ্ট্রের গুণগ্রাহী। সংসদীয় বিধিব্যবস্থায় সরাসরি প্রশংসা ও স্বীকৃতি না পেলেও সরকার প্রায়শই বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, চেম্বার অব কমার্স ও অনুরূপ সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ করে চলে, সেখানে নাগরিকদের ব্যক্তিগত ভূমিকা নগণ্য।

নিম্নবর্গের রাজনীতি (Subaltern Politics)

নিম্নবর্গ শব্দটি জনগণের সমার্থক এবং প্রবর (elite) কথাটির বিপরীত প্রত্যয়। নিম্নবর্গের মধ্যে গ্রামীণ ভদ্র-সম্প্রদায়, ক্ষয়িষ্ণু ভূস্বামী, উচ্চ ও মধ্যবর্তী কৃষক, শহুরে মধ্যবিত্ত ছাড়াও বিত্তহীন কৃষিজীবী ও শ্রমিকশ্রেণীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত নিম্নবর্গ প্রত্যয়টির সূচনা করেছিলেন গ্রামশি। ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বে ওই সকল শ্রেণীর ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে পর্যালোচনা ও গবেষণা ইদানীং শুরু হয়েছে। কারণ এযাবৎকাল সমাজ ও ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গে প্রবর বর্গ ভারসাম্যহীন প্রাধান্য লাভ করেছে। নিম্নবর্গের ভূমিকা ও অবদান উপেক্ষণীয় নয়।

নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য (Checks and Balances)

প্রত্যয়টি দ্বারা এমন এক বিধিব্যবস্থা বোঝায় যাতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও তার আধিকারিকদের ক্রিয়াকলাপ নির্দিষ্ট কর্মপরিধির মধ্যে সীমিত থাকে ও লঙ্ঘিত না হয় এবং অপরের কর্মপরিধির মধ্যে অযথা প্রবেশ না করে। এইসব কর্মপরিধি এবং ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণে রেখে সেগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার রীতি ও নীতি রাষ্ট্রদার্শনিকেরা দীর্ঘকাল পূর্বে উপলব্ধি করেন। প্রসারিত দৃষ্টিতে প্রত্যয়টি ক্ষমতার

স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্বের সঙ্গে তুলনীয়।

প্রত্যয়টির উদ্ভাবনার প্রথম নিদর্শন মেলে **মাকিয়াভেল্লি-র** 'দ্য প্রিন্স' গ্রন্থে। তাতে তিনি রাজা, অভিজাতবর্গ এবং জনগণের ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ ও পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষার সুপারিশ করেন। উত্তরকালে ইংল্যান্ডে স্টুয়ার্টদের রাজত্বকালে আইনসভা ও সরকারের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ তথা নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য প্রবর্তনের পিছনে ছিল **জন লকের** চিন্তা। পার্লামেন্ট ও রাজার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে তৃতীয় পক্ষ বিচারকমণ্ডলীর ভূমিকার কথা লক অবশ্য বলেননি। সেটি পরবর্তীকালে বলেছিলেন **মঁতেসকিয়ু**, যিনি তাঁর ক্ষমতার পৃথকীকরণ তত্ত্বে উল্লিখিত তিনটি কর্তৃত্বসম্পন্ন ক্ষেত্রের স্বতন্ত্র ক্ষমতার কথা বলেন।

সরকারি বিধিব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন **যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেফারসন**। উনিশ শতকের ষাটের দশকে ইংল্যান্ডে রাষ্ট্রের এক অংশের স্বেচ্ছাচার অন্য অংশের দ্বারা আইনগত পদ্ধতিতে নিবারণের সূত্রপাত হয়। সরকারি কার্যকলাপের বিচারকমণ্ডলীর দ্বারা পর্যবেক্ষণ, দ্বিকক্ষের আইনসভা ইত্যাদি ব্যবস্থা ওই পদ্ধতির অন্তর্গত

নিরপেক্ষতা (Neutrality)

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচলিত এই শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রথমটি দ্বারা বোঝায় যে ঘোষণার পরিবর্তে আচরণে অন্যান্য দেশের পারস্পরিক বিরোধে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পূর্বে বেলজিয়াম প্রভৃতি ইউরোপের ছোট ছোট রাষ্ট্র এবং অধুনা **তৃতীয় বিশ্বের** বহু দেশ পশ্চিমি অথবা সোভিয়েত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর আধিপত্য এড়াতে এই নীতি অনুসরণ করেছিল। নীতিটি তৃতীয় বিশ্বে প্রকারান্তরে এখন **জোট নিরপেক্ষতায়** পরিণত।

দ্বিতীয়টি দ্বারা বোঝায় যে একটি রাষ্ট্র যখন অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সময় কারও পক্ষ গ্রহণ না করে যথার্থই নিরপেক্ষ থাকে। আন্তর্জাতিক আইনেও তাই আঠারো শতকে এই আচরণকে স্বীকৃতি দেওয়া হত। কিন্তু পরবর্তীকালে কোনও কোনও রাষ্ট্র 'সশস্ত্র নিরপেক্ষ' দেশ হিসাবে যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়াকে দৃঢ়তার সঙ্গে এড়িয়ে চলত। **রাষ্ট্রসংঘের** সনদ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ যদি আগ্রাসী কোনও দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা হলে রাষ্ট্রসংঘের কোনও সদস্য নিরপেক্ষ থাকতে পারবে না। অবশ্য কোনও দেশ যদি যুদ্ধে কারও পক্ষ গ্রহণ করার মনোভাব কথায় বা কাজে প্রকাশ না করে তা হলে সে দেশকে নিরপেক্ষ হিসাবে ধরে নেওয়া হবে। আবার যদি কোনও দেশ নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করে তা হলে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সে দেশ বিবদমান কোনও দেশকে সাহায্য করতে পারে।

নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament)

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে অথবা একতরফাভাবে সামরিক পথ পরিহার। **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের** সময় থেকে সাধারণভাবে সকল রাষ্ট্রের মধ্যে এবং সমস্ত ধরনের অস্ত্র ও শক্তিপ্রয়োগের রীতি সংবরণ অর্থাৎ নিরস্ত্রীকরণের

প্রয়াস চলে আসছে। ১৯২৬ খ্রি জেনিভাতে জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে আলাপ-আলোচনার প্রস্তুতি হিসাবে একটি কমিশন গঠিত হয়। ১৯৩২ খ্রি জাতিপুঞ্জের সদস্যরা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা প্রথম একটি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে মিলিত হন। অস্ত্র বাবদ বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ সংকোচন, সেনাবাহিনী হ্রাস ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে একটি খসড়া পরিকল্পনা এবং সে বিষয়ে উপদেশদানের জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গঠনের প্রস্তাব ওঠে। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের নানাবিধ আপত্তির ফলে বিষয়টি শেষাবধি ধামা চাপা পড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৬ খ্রি রাষ্ট্রসংঘ ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার নিবারণের উদ্দেশ্যে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন এবং ১৯৪৭ খ্রি সাধারণভাবে সমরসম্ভার ও সামরিকবাহিনী বৃদ্ধির প্রয়াসকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কমিশন ফর কনভেনশনাল আর্মামেন্টস নামে দুটি বিভাগ গঠন করেন। সর্বাধিক সমর্থন অর্জনের উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে ওই দুটি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু কোনও ঐকমত্যে উপনীত হতে না পারায় বিভাগ দুটি ১৯৫১ খ্রি রাষ্ট্রসংঘের নিরস্ত্রীকরণ কমিশনে মিশে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন চেয়েছিল প্রথমে চুক্তি স্বাক্ষরিত হোক, পরে পরিদর্শনের ব্যবস্থা হবে। পশ্চিমি দেশগুলি মনে করত যে পরিদর্শনের পূর্বে চুক্তিস্বাক্ষর অর্থহীন। মতবিরোধ দীর্ঘকাল ধরে চলে, তবে ১৯৭৫ খ্রি স্বাক্ষরিত হেলসিঙ্কি চুক্তির আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের মনোভঙ্গি নরম হতে শুরু করে। ১৯৭২ এবং ১৯৭৪ খ্রি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্ট্র্যাটেজিক আর্মস লিমিটেশন ট্রিটি সম্পাদিত হয়। কিন্তু চুক্তি লঙ্ঘন ও যথোচিত পরিদর্শনের অভাবে পশ্চিমি দেশগুলির মধ্যে সন্দেহ রয়ে যায়। ১৯৯১ খ্রি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর সেখানকার পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন এবং সেগুলি গুটিয়ে ফেলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র নানা কৌশল প্রয়োগ করে। ১৯৯৩ খ্রি জানুয়ারিতে মস্কোয় যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বোরিস ইয়েলতসিনের মধ্যে স্ট্র্যাটেজিক আর্মস রিডাকশন ট্রিটি স্বাক্ষরিত হয় এই মর্মে যে ২০০৩ খ্রি মধ্যে উভয় দেশ তাদের পারমাণবিক যাবতীয় অস্ত্র দুই তৃতীয়াংশ কমিয়ে ফেলবে।

নির্বাচক বর্গ (Electoral College)

রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল, দলনেতা কিংবা ওই ধরনের উচ্চ কোনও পদে পরোক্ষ নির্বাচনকল্পে নিযুক্ত, মনোনীত অথবা নির্বাচিত এক জনগোষ্ঠী। প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অথবা উপরাষ্ট্রপতি যাঁরা নির্বাচক বর্গের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। কিংবা বিভিন্ন দেশের নির্বাচিত কার্ডিন্যালদের নিয়ে গঠিত নির্বাচক বর্গের মাধ্যমে পোপ নির্বাচিত হন। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা অর্থাৎ কংগ্রেসের উভয়কক্ষে প্রতি অঙ্গরাজ্যের যতগুলি আসন আছে সেই সংখ্যার সঙ্গে দুই যোগ করে মোট যে সংখ্যা দাঁড়ায় ঠিক ততজন নির্বাচক সেই রাজ্যের বরাদ্দে নির্বাচক বর্গে থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচক বর্গের কোনও সভা হয় না। নির্বাচকেরা যে যার নিজ রাজ্যের রাজধানীতে নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে জড়ো হয়ে ভোটদান করেন।

যদি কোনও প্রার্থী নির্বাচক বর্গে সামগ্রিক গরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারেন তা হলে কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রেসেন্টেটিভ স্থির করেন কে রাষ্ট্রপতি হবেন।

নির্বাচকমণ্ডলী (Electorate)

কোনও একটি নির্বাচনকেন্দ্রের (constituency) ভোটাধিকারসম্পন্ন নাগরিকেরা সমষ্টিগতভাবে নির্বাচকমণ্ডলী নামে অভিহিত। সেই কেন্দ্রের ভোটদাতারা সেই নির্বাচনকেন্দ্রের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। নির্বাচনপ্রথার বিবর্তন ধারার বিভিন্ন পর্বে সম্পত্তি, করপ্রদান এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে ভোটাধিকার দেওয়া হত। বর্তমানে অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক মাত্রেরই ভোট দেবার অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা হল ভোট প্রদান, ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার, যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

নির্বাচন (Election)

নির্বাচন হল মতপ্রদানের (ভোট) একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোনও পদের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে থাকে। প্রাচীন গ্রিসে নির্বাচন প্রথা থাকলেও একসঙ্গে কিছু ব্যক্তিকে মনোনয়ন করা হত ; এবং রোমে জনসমাবেশ থেকে ট্রিবিউন নির্বাচনের রীতি বিরাজ করত। মধ্যযুগে নির্বাচনপ্রথা রহিত যায়। গণতন্ত্রের প্রচলনের সময় থেকে নির্বাচন প্রথা গড়ে ওঠে। ইংল্যান্ডে ত্রয়োদশ শতকে সংসদীয় প্রথার সঙ্গে নির্বাচন প্রথা যুক্ত ছিল, ১৬৮৮ খ্রি সেটা সুনিয়মিত হয় এবং ১৮৭২ খ্রি থেকে গোপন ব্যালট প্রথা প্রবর্তিত হয়।

নির্বাচন প্রথার উপাদান হল : (১) প্রার্থীর যোগ্যতা, (২) নির্বাচকের যোগ্যতা, (৩) নির্বাচন পদ্ধতি, (৪) পদ্ধতির রূপায়ণ ও তার কর্মিবৃন্দ এবং (৫) নির্বাচনের নিয়মাবলি (জালভোট, ভীতিপ্রদর্শন, মিথ্যাপ্রচার, ব্যয়বাহুল্য ইত্যাদি নিবারণ)। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দায়িত্ব, সুশৃঙ্খলভাবে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ক্ষমতাসীনদের থাকা অথবা না থাকার প্রশ্ন এবং দলীয় কর্মসূচির প্রতি নির্বাচকমণ্ডলী তথা জনগণের মনোভাব প্রতিফলিত হয়।

নির্বাচনপ্রথার সার্থকতা হল প্রথমত দেশের রাজনৈতিক জীবনে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকা, যার এক বিশেষ মূল্য আছে এবং দ্বিতীয়ত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জনমনের গতিপ্রকৃতি জানা যায় ; নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচকদের অভীপ্সা মেনে চলেন। জনচিত্তে নেতাদের বৈধতা নির্ভর করে।

নির্বিশেষ গণভোট (Plebiscite)

প্রাচীন রোমে অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত সাধারণ লোকেদের (প্লিবীয়) সংসদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকাররীতি থেকে প্রত্যয়টির উদ্ভব হয়েছে। বর্তমানে জনমত নির্ণয়কল্পে

অবলম্বিত যে কোনও উপায় (যেমন **গণভোট**) যার মাধ্যমে কোনও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ শতকের রাজনীতিতে নানা বিষয়েই এই পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। একটি সাধারণ প্রয়োগ হল যে, কোনও এক ভূখণ্ডের উপর দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের সর্বভৌমত্বের দাবি উঠলে ওই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে এই পদ্ধতিতে জনমত নির্ণয় করা হয়, কিংবা সংবিধানগত প্রশ্ন উঠলে, যেমন ১৯৭৫ খ্রি **ইউরোপিয়ান ইকনমিক কমিউনিটির** সদস্যপদ গ্রহণসূত্রে যুক্তরাজ্যে **নির্বিশেষ গণভোট**, অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা প্রশ্নেই পদ্ধতিটির প্রয়োগ ঘটে। **প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের** ক্ষেত্রে সরাসরি জনমত গ্রহণের অসুবিধা কিংবা **প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের** অকার্যকরতা কাটিয়ে ওঠার পক্ষে নির্বিশেষ গণভোটের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে।

নৈরাজ্যবাদ (Anarchism)

এই মতাদর্শে কোনও ধরনেরই রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থান নেই। সর্বকর্তৃত্বসম্পন্ন কেন্দ্রানুগ রাষ্ট্রীয়সংগঠনের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিমানুষের স্বেচ্ছাপ্রসূত সমবায়ী সমাজব্যবস্থাই হল নৈরাজ্যবাদের সারমর্ম। এটি একটি সমাজদর্শন। এর প্রবক্তারা সমস্ত ধরনের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান অবিচারের বিরুদ্ধে মৌল প্রতিবাদের আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। তাঁরা স্বাধীন ব্যক্তিমানুষের একটা শিথিল সংগঠনে বিশ্বাসী ছিলেন। সেখানে সশস্ত্রবাহিনী, আদালত, জেলখানা বা লিখিত আইনের কোনও অবকাশ নেই। তাঁদের মধ্যে কারও বিশ্বাস ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনে, কেউ চাইতেন রক্তঝরা বিপ্লব।

ইংরেজি অ্যানার্কিজম শব্দটির উৎপত্তি ঘটে গ্রিক শব্দ অ্যানার্কিয়া (অশাসন) থেকে। আদিপর্বে প্রত্যয়টি খ্রিস্টীয় অনুশাসনে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে প্রচলিত ধ্যানধারণায় অবিশ্বাসী (heretic) খ্রিস্টান নস্টিক (gnostic) মতাবলম্বীদের মধ্যে নৈরাজ্যবাদী মনোভঙ্গি দেখা যেত। তাঁরা চাইতেন সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে আর্থসামাজিক পরিবর্তন। পরবর্তীকালে অ্যানাব্যাপটিস্ট গোষ্ঠীর খ্রিস্টানদের প্রধান বক্তব্যই ছিল যে রাষ্ট্রের কোনও প্রয়োজন নেই ; কারণ মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, মাঝে রাষ্ট্র বা চার্চ ধরনের কোনও কিছুর অবস্থান নিষ্প্রয়োজন। ষোড়শ শতকে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব বিরোধী ধর্মপ্রচারকেরা মুনস্টার শহর দখল করে সেখানে সম্পত্তির আইন, যাবতীয় ঋণ ও চুক্তিপত্র বাতিল করে দেয়। পরে মুনস্টারে তার পরিণতি হয়ে দাঁড়ায় স্বৈরতন্ত্রী একনায়কতন্ত্র।

ফরাসি বিপ্লব থেকেই প্রকৃতপক্ষে নৈরাজ্যবাদের দার্শনিক ও ইহলৌকিক বুনিয়াদ গাঁথা শুরু হয়। হিংসাত্মক কাজ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নৈতিক স্বীকৃতি পায়, জনগণকে পরিচালনার জন্য উচ্চশ্রেণীর ষড়যন্ত্রীদের নেতৃত্বে সমাজবিপ্লবের ছক তৈরি হয় ; যাতে উপর থেকে একটা সাম্যবাদী সমাজ গঠিত হয়। উপর থেকে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়াটা নৈরাজ্যবাদের একটা স্ববিরোধ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক মতাদর্শ সমষ্টিবাদী রাজনৈতিক কর্মসূচির পক্ষে সঙ্গতিহীন।

নৈরাজ্যবাদী দর্শনের প্রবর্তক **প্রুদঁ** (১৮০৯-৬৫) নৈরাজ্যবাদের অসঙ্গতি কাটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটা শিথিল ধরনের ফেডারেশনের সুপারিশ করেন—যেখানে

কলকারখানা নিয়ে গঠিত ছোট ছোট কমিউন হবে সেই নতুন সমাজের অঙ্গ। প্রত্যয়টি উত্তরকালে অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিজমের তত্ত্বের রূপ পরিগ্রহ করে। লাতিন আমেরিকার কোনও কোনও দেশে সেটা গণআন্দোলন হিসাবে দেখা যায়। রাশিয়ার নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক মিখাইল বাকুনিন (১৮১৪-৭৬) গুপ্ত বিপ্লব ও প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ধ্বংস চাইতেন এবং মনে করতেন যে ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে মানুষের শুভসত্তা ফুটে উঠবে ও নবযুগের সূচনা হবে।

ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা ও বিভিন্ন বৈপ্লবিক আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে নৈরাজ্যবাদের পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে। নৈরাজ্যবাদের নানা মত ও মেজাজের নেতৃত্ব দেখা দেয়। লিও তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০) একজন আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে রাষ্ট্রের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের সঙ্গতি নেই; প্রেমের দ্বারাই শাসন পরিচালিত হওয়া কাম্য। জনসাধারণের সমরায়োজনে যোগ না দেওয়া, কর না দেওয়া এবং আদালত বর্জন করলে প্রশাসন স্বতঃই ভেঙে পড়বে। ভারতে গান্ধী ছিলেন তলস্তয়ের অনুগামী। পিটার ক্রপতকিন (১৮৪২-১৯২১) ছিলেন একজন সাধু প্রকৃতির নিখাদ নৈরাজ্যবাদী যিনি কল্পনা করেন এমন এক সমাজের যেখানকার মানুষের আচরণ আইন বা কর্তৃত্বের মধ্যে দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হবে না; হবে পারস্পরিক ঐকমত্য এবং সামাজিক রীতিনীতির সমন্বয়ে। অ্যানার্কো-কমিউনিস্ট ও সিন্ডিক্যালিস্টদের বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং ফ্রান্স, স্পেন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের নৈরাজ্যবাদীরা তাঁর স্বপ্নবিলাসী চিন্তায় প্রভাবিত হন। সেইসব নৈরাজ্যবাদীদের অনেকেই ট্রেড ইউনিয়নকে একটা সংগ্রামী হাতিয়ার ছাড়াও নৈরাজ্যবাদী সমাজের ভিত্তি হিসাবে কল্পনা করতেন।

উগ্রপন্থী নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যেও নানা গোষ্ঠীর তৎপরতা দেখা যেত। তার মধ্যে গোঁড়া মতান্ধ আদর্শবাদীরা ছিলেন যাঁরা হত্যা, সন্ত্রাস ইত্যাদি হিংসাত্মক কাজের মধ্যে দিয়ে প্রচারকর্মে লিপ্ত থাকতেন। ১৮৮০ খ্রি থেকে প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পূর্বাবধি রাশিয়া, পশ্চিম ইউরোপ, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ইতস্তত বোমা নিক্ষেপ ও বন্দুকবাজির ঘটনা ঘটে। নৈরাজ্যবাদীরা রাশিয়াতে জার অ্যালেকজান্ডার, ইতালিতে রাজা হুমবার্ত, ফ্রান্সে প্রেসিডেন্ট কার্নো, অস্ট্রিয়াতে সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ম্যাকিনলেকে হত্যা করে। সরকারও যথারীতি কঠোরহস্তে ওইসব হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ দমন করে। ব্যক্তিগত সন্ত্রাস নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হলেও ঝর্জ সর্ল-এর চিন্তায় তা স্বীকৃতি পায়। ফ্যাসিবাদীরা ও বামপন্থীদের অনেকেই গুপ্তহত্যার আশ্রয় নেয়। ১৮৭৭ খ্রি আন্তর্জাতিক নৈরাজ্যবাদী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে নৈরাজ্যবাদীরা স্থায়ী কোনও সংগঠন গড়তে পারেনি। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তাদের সামান্য অস্তিত্ব দেখা যায়।

ন্যায়বিচার (Justice)

প্লাতোর 'রিপাবলিক' গ্রন্থের শুরুতেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে 'ন্যায়বিচার কী?' প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক ন্যায়বিচারকে (জাস্টিস) একটি বিশেষ ধরনের সাম্য হিসাবে দেখতেন। তবে তার অর্থ এই নয় যে সব কিছু সবাইকার কাছে সমান, তা হলে সমান ও অসমান

ন

সমগোত্রে বিবেচিত হবে। কার্যত ন্যায়বিচার বলতে চতুর্বিধ সাম্য গণ্য হতে পারে : (১) উপযুক্ততা, (২) প্রয়োজন, (৩) নৈতিক অধিকার এবং (৪) আইন অনুযায়ী।

বস্তুত বিচারক ও আইনজীবীদের কাছে আইন অনুযায়ী ন্যায়বিচারের প্রাধান্য স্বভাবতই বেশি, কারণ আইনের সঠিক ও নিরপেক্ষ প্রয়োগই তাঁদের পেশা। কিন্তু সাধারণ নাগরিকের দৃষ্টিতে আইনের প্রয়োগ ছাড়াও ন্যায়বিচারের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একটি প্রসারিত বিবেচনা থাকে। কোনও আর্থিক পুরস্কার বেশি গুণসম্পন্ন ব্যক্তির প্রাপ্য হওয়া স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু তার চেয়ে কম গুণসম্পন্ন ব্যক্তির আর্থিক অসচ্ছলতা বেশি হলে অনেক সময়ে দ্বিতীয়জনের অনুকূলেই লোকের সমর্থন বেশি প্রকাশ পায়। প্রথম জনের সমর্থকদের দাবি সম্পূর্ণ গুণগত ; অন্য দিকে দ্বিতীয়জনের সমর্থকেরা মনে করেন আর্থিক অসচ্ছলতা গুণগত যোগ্যতা অর্জনের অন্তরায়।

রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লিখিত উভয় মনোভাব ন্যায়বিচারের ভিত্তি সম্পর্কে মতদ্বৈধতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আরিস্তোতলের মতে সমাজের কল্যাণে যাদের অবদান বেশি সুযোগসুবিধা তাদেরই প্রাপ্য বেশি। অন্যেরা বিশেষ করে সমাজতন্ত্রী তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে সঠিক ন্যায়বিচারে দরিদ্রের চাহিদা মেটানো সর্বাগ্রে প্রয়োজন, তাতে ধনীদের সম্পদ কেড়ে নেওয়া অনুচিত নয়। উদারতন্ত্রীদের মতে সম্পত্তির নৈতিক অধিকার হল বড়, সে অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না।

প

পঞ্চম বাহিনী (Fifth Column)

স্পেনের গৃহযুদ্ধের (১৯৩৬-৯) সময় উদ্ভূত প্রত্যয়। জাতীয়তাবাদী ও ফ্যাসিবাদী বিদ্রোহীদের নেতা ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে চারটি বাহিনী মাদ্রিদ শহর আক্রমণ করে। মাদ্রিদে ফ্রাঙ্কোর সমর্থকেরা গোপনে সরকারি মহলে গুপ্তচরবৃত্তি, গণবিক্ষোভ এবং অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকে। জাতীয়তাবাদী সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন জেনারাল এমিলো মোলো। সাংবাদিকেরা যখন তাঁকে প্রশ্ন করে যে তাঁর চারটি বাহিনীর মধ্যে কোনটি মাদ্রিদ দখল করবে, তখন উত্তরে তিনি বলেন যে 'পঞ্চম বাহিনী'; অর্থাৎ শহরের অভ্যন্তরে ফ্যাসিবাদী বিদ্রোহীদের সমর্থক যারা বামপন্থী পপুলার ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকর্মে সক্রিয় ছিল।

পঞ্চশীল (Panchsil)

জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির পাঁচটি সূত্র। ১৯৫৪ খ্রি ২৯ এপ্রিল তারিখে চীন ও ভারতের মধ্যে তিব্বত সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদনকালে গৃহীত সহাবস্থান নীতির পাঁচটি সূত্র (১) পরস্পরের এলাকাগত অখণ্ডতা ও সর্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন; (২) পারস্পরিক অনাক্রমণ; (৩) পরস্পরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অহস্তক্ষেপ; (৪) সমতা ও পারস্পরিক কল্যাণ এবং (৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

চুক্তিটি ওই বছরে স্বাক্ষরিত হয়েছিল দিল্লিতে। স্বাক্ষর করেন চীনের প্রধান মন্ত্রী চু এন লাই এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। চুক্তিটি গৃহীত হবার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রহ্মদেশ, ভিয়েতনাম, মিশর প্রভৃতি আরও কয়েকটি দেশ সেটিকে গ্রহণ করে ভারত ও চীনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়।

দ্র. জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন; নিরপেক্ষতা

পঞ্চায়েত (Panchayat)

১. প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত পাঁচজন প্রধান ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত গ্রামীণ সংস্থা। সেগুলির প্রধান কাজ ছিল **বর্ণব্যবস্থার** (caste) বা কুলের (clan) কিংবা বণিকগোষ্ঠীর অন্তর্গত ব্যক্তিদের বিবাদ-বিসংবাদের বিচার ও সমাধান। এরূপ বিচারব্যবস্থা ভারতে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে চলে আসছে। বড় ধরনের দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা সরাসরি সরকারি বিচারালয়ে যেত। বিচারকালে কোনও পক্ষ আইনজ্ঞ নিয়োগ করতে পারত না। রাজশক্তির প্রতীক হিসাবে কাষ্ঠদণ্ড ও জাতির নিজস্ব দেববিগ্রহ পঞ্চায়েতের বিচারে ব্যবহৃত হত। আপসে সমাধানের প্রয়াস পঞ্চায়েতী বিচারের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল পঞ্চায়েতের ঐকমত্য হওয়ার রীতি। বিচারের কঠোরতাকে করুণা বা মানবিক বিবেচনায় মোলায়েম করার চেষ্টাও হত। দোষ প্রমাণিত হলে দোষীকে জরিমানা অথবা জাতিচ্যুত কিংবা একঘরে করার প্রচলন ছিল। পূর্বকালে নিম্ন হতে উচ্চ বিচারালয়ে এবং প্রয়োজন হলে রাজার দরবারেও আপিল করা চলত।

২. গান্ধী, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গুণগ্রাহী ছিলেন। পঞ্চায়েতের সমর্থনে তাঁরা নানাপন্থা উত্থাপন করেন।

৩. দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতের গ্রামাঞ্চলে যে পঞ্চায়েতী রাজ প্রবর্তিত হয়েছে তার সঙ্গে প্রাচীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কিছু সাদৃশ্য থাকলেও তার উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধি এখন ভিন্ন। ইংরেজ আমলে ইউনিয়ন বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ইত্যাদি **স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের** যে ব্যবস্থা ছিল তার সঙ্গে কিছু কার্যক্রমের সংযোজন ও প্রাচীন নামকরণের সংমিশ্রণে বর্তমান পঞ্চায়েতী রাজ প্রবর্তিত হয়েছে। পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, যাতে গ্রামাঞ্চলের বিষয়সমূহ সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সংশ্লিষ্ট স্থানিক জনসাধারণের উপর ন্যস্ত থাকে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় ও বিচারব্যবস্থা ব্যয়বহুল না হয়। সেটা সম্পন্ন করতে হলে চাই কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার, গ্রামীণ অধিবাসীদের মধ্যে সমবায়ী সম্পর্ক, পশ্চাৎপদ গ্রামীণ অধিবাসীদের দুর্গতির অবসান এবং বিকেন্দ্রিত ক্ষমতার প্রসার ও **স্বেচ্ছাসেবী** সংস্থাসমূহকে উৎসাহদান। ভারতীয় সংবিধানের ৪০ ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্য-আইনের সাহায্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা হিসাবে গ্রাম, অঞ্চল ও জেলা স্তর অবধি ক্রমোচ্চ পর্যায়ে বিন্যস্ত একটি কাঠামোয় পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা গঠিত হয়েছে। অধিকাংশ রাজ্যে ত্রিস্তর, কোনও কোনওটিতে দ্বিস্তর, কোনও রাজ্যে আবার একস্তর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। অন্যান্য ব্যতিক্রমও আছে। সব রাজ্যে পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নির্দিষ্ট হারে মহিলা সদস্য নির্বাচন অনেক রাজ্যে বাধ্যতামূলক।

১৯৫৬ খ্রি পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত আইন বিধিবদ্ধ হয়। সর্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে নিয়ে গ্রামসভা গঠিত হয়। গ্রামসভার কার্যনির্বাহের দায়িত্ব গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপর বর্তায়। গ্রাম-পঞ্চায়েতের সদস্যগণ প্রতি চার বছর অন্তর গ্রামসভা থেকে নির্বাচিত হন।

গ্রাম-পঞ্চায়েতের কিছু সদস্যকে রাজ্য সরকার মনোনয়ন করেন। গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রথম সভায় তার মধ্য থেকে একজন অধ্যক্ষ ও একজন উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। কয়েকটি পাশাপাশি গ্রামসভা (ব্লক-এলাকা) নিয়ে একটি পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত হয়; তার সদস্যরা হলেন সংশ্লিষ্ট গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলির অধ্যক্ষগণ এবং প্রতি গ্রামসভার আড়াইশো সদস্য পিছু একজন ব্যক্তি নির্বাচিত হন। পঞ্চায়েত সমিতি তার প্রথম সভায় চার বছরের জন্য একজন প্রধান ও একজন উপপ্রধান নির্বাচন করে। পঞ্চায়েত সমিতি তার এলাকার গ্রামসভার সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে পাঁচজনকে নিয়ে একটি ন্যায়-পঞ্চায়েত গঠন করে। ন্যায়-পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে তার সদস্যরা প্রধান বিচারক হিসাবে নির্বাচন করেন। জেলার সর্বশীর্ষে থাকে জেলা পরিষদ যার সদস্যদের মধ্যে থাকেন সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি (প্রধান), বিধানসভা এবং লোকসভার সদস্য। তাঁদের মধ্য থেকে একজন জেলা পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন।

সংক্ষেপে, গ্রাম-পঞ্চায়েতের কাজ হল জনস্বাস্থ্য, পানীয় জল, রাস্তাঘাট, পুকুর, চারণভূমি, শ্মশানঘাট ও কবরস্থান, সমাজসেবা ও স্বেচ্ছাসেবা সংস্থা সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা। রাজ্য সরকার দায়িত্ব দিলে প্রাথমিক, সামাজিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, জলসেচ, অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন পরিচালন; অক্ষম ও নিঃস্বদের রক্ষণাবেক্ষণ, বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন, পতিত ও অনাবাদি জমিকে কর্ষণযোগ্য করা, সমবায় পদ্ধতিতে ভূমির সদ্ব্যবহার, ভূমিসংস্কারে সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে কার্যনির্বাহ।

পঞ্চায়েত সমিতির কর্মপরিধিতে (ব্লক এলাকায়) থাকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা, চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ, আইন মোতাবেক করধার্যকরণ; কর্মসূচি প্রণয়ন, প্রকল্প নির্ধারণ, গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন; কৃষি, পশুপালন, মাছের চাষ, কুটির শিল্প, গ্রামীণ ক্ষুদ্রশিল্প, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য নৈমিত্তিক কাজ।

জেলা পরিষদের প্রধান কাজ হল সমগ্র জেলা কর্মসূচির রূপায়ণ, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

ব্লক পর্যায়ে যে সব ন্যায়-পঞ্চায়েত থাকে সেগুলির ফৌজদারি অধিকারক্ষেত্র সীমিত হলেও সেখানে চুরির অপরাধ ইত্যাদি এবং দেওয়ানি অধিকারক্ষেত্রে অনধিক একশো টাকা দাবিমূল্যের মামলার শুনানি হয়। ন্যায়-পঞ্চায়েত কারাদণ্ড দিতে পারে না, অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করতে পারে। দণ্ডিত ব্যক্তি আপিল করতে পারে না। তবে জেলাশাসক কিংবা মহকুমা শাসক ন্যায়-পঞ্চায়েতের রায় নাকচ অথবা পরিবর্তন করতে কিংবা আদালতে পুনর্বিচারের নির্দেশ দিতে পারেন।

পরমবাদ (Absolutism)

অভ্যন্তরীণ রীতিনীতি বা **অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান** দ্বারা যে সরকার নিয়ন্ত্রিত হয় না তারই তত্ত্ব ও প্রয়োগ। সরকারের সংবিধানগত **নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য** (checks & balance) বজায় রাখার ব্যবস্থা কিংবা সমালোচনা ও বিরোধিতার কোনও অবকাশ তাতে থাকে না। পরমবাদের সমর্থক **জাঁ বদ্যাঁ, টমাস হবস** প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকেরা মনে করতেন যে

সরকারের সর্বভৌমত্ব থাকা বিশেষ প্রয়োজন। অর্থাৎ সরকারের ক্রিয়াকর্ম হবে প্রশ্নাতীত। আইনের মাধ্যমে সর্বভৌমত্ব প্রয়োগ করা হবে কিন্তু সর্বভৌমকে কোনও আইনের দ্বারা সমালোচনা করা চলবে না। সেই দৃষ্টিতে আইন হল প্রাধিকারিক, এই নিরিখে যিনি এটা প্রয়োগ করেন তিনি পদাধিকারবলে তাঁর ক্ষমতার অধিকারী এবং সে জন্য কোনও নৈতিক বা মননশীল পরিচয়পত্র লাগে না।

তবে পরমবাদ এবং **সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ** সমার্থক নয়। পরমবাদ কোনও কেন্দ্রীয় শক্তির দ্বারা সমগ্র সমাজের সকল কাজকর্মের উপর খবরদারি করে না; তাতে কোনও সরকারের অবাধ ক্ষমতা চাওয়া হয়, যেটা সব সময় ব্যবহৃত নাও হতে পারে এবং সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজন ঘটে না। ইউরোপে সতের ও আঠারো শতকে পরমবাদী শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দিত কিছু কিছু কেন্দ্রিত শক্তির বিরুদ্ধে, যারা সর্বভৌম নয়, যেমন রাজন্যবর্গ, চার্চ ইত্যাদি। কখনও হয়তো বিরুদ্ধশক্তি দমন করে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদে প্রযুক্ত হত। পরমবাদী শাসন একজন ব্যক্তি, পদ (রাজা), শ্রেণী (বুর্জোয়া), দল (**গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা**) কিংবা প্রথার (ভূস্বামী অভিজাততন্ত্র) মাধ্যমে বিরাজ করতে পারে। মোটের উপর পরমবাদ হল সেই ধরনের রাজত্ব যেখানে শাসকেরা **আইনের শাসন** দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না এবং সরকার সেখানে প্রায় যথেচ্ছাচার চালায়।

পাকিস্তান আন্দোলন (Pakistan Movement)

ভারতীয় রাজনীতির এক দীর্ঘকালীন, বিভেদমূলক ও সুগভীর তাৎপর্যবহ আন্দোলনপ্রসূত বিষয়, যার ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায় ও স্থায়ী বিবাদবিরোধের কারণ হিসাবে বিদ্যমান।

'পাকিস্তান' প্রত্যয়টির শব্দগত অর্থ হল 'পাক'-এর দেশ। 'পাক'-এর অর্থ পবিত্র; 'স্তান' মানে স্থান। কাজেই পাকিস্তান কথাটির অর্থ পবিত্র ভূমি। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান প্রস্তাব **মুসলিম লিগ**-এর লাহোর (১৯৪০) অধিবেশনে গৃহীত হবার বহু পূর্বে শব্দটির প্রচলন ঘটে। উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ **আমির আলি**, আলিগড়ের **সৈয়দ আহমদ** প্রমুখের দ্বিজাতি-তত্ত্বের সূত্রে ভারতবর্ষে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক বাসভূমি গঠনের প্রস্তাব বিশ শতকের প্রথম চতুর্থাংশে বিভিন্ন মুসলিম নেতার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, যাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি **মহম্মদ ইকবাল**। আদিপর্বে পাকিস্তান শব্দটির নামকরণ করেছিলেন ১৯৩৫ খ্রি কেমব্রিজ-নিবাসী চৌধুরী রহমত আলি। গোল টেবল বৈঠকের সময় তিনি প্রস্তাবিত মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঁচটি অঞ্চলের ইংরেজি আদ্যক্ষর নিয়ে পাকিস্তান কথাটির সূত্রপাত করেন। তাঁর প্রস্তাব P অর্থে পঞ্জাব, A অর্থে আফগানিয়া (ফ্রন্টিয়ার), K কাশ্মীরি, S সিন্ধু প্রভৃতি বোঝাতে চাওয়া হয়েছিল। ১৯৩০ খ্রি এলাহাবাদে মুসলিম লিগ অধিবেশনে ইকবাল-এর অভিভাষণের পূর্বে পাকিস্তানের কথা কেউ শোনেনি। লিগ কিন্তু তখন ইকবালের পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি।

ভারতে ইসলাম-ধর্মীদের স্বতন্ত্র বাসভূমির ভাবনাচিন্তা ও দাবির পক্ষে ও বিপক্ষে নানা ধরনের যুক্তি দীর্ঘকাল ধরে দেখানো হয়েছে। উনিশ শতকে সাধারণভাবে মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের সংস্কার আন্দোলন এবং ভারতবর্ষে স্বতন্ত্রখাতে

প্রবহমান ও বিলম্বিত মুসলিম নবজাগরণকালে দ্বিজাতি-তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র একাত্মবোধকে (identity) রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে দিয়ে সমন্বিত করার কাজে প্রথম নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমির আলি। অন্যদিকে বঙ্গে নবাব আবদুল লতিফ এবং আলিগড় আন্দোলনের পুরোধা সৈয়দ আহ্মদ্ খাঁ ইংরেজের সঙ্গে সর্বতোভাবে আনুগত্য ও সহযোগিতার পথে সরকারি সুনজরের প্রত্যাশী ছিলেন। তাঁদের প্রভাবে শিক্ষিত মুসলমান সমাজের বৃহদাংশ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পত্তনকালে (১৮৮৫) তার সঙ্গে যুক্ত হয়নি। তার পরিবর্তে ১৮৮৮ খ্রি আমির আলি মুসলমানদের এক সর্বভারতীয় সম্মেলনের আয়োজন করেন। স্বতন্ত্র পথে তিনি মুসলমানদের স্বার্থে ইংরেজদের উপর চাপ সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তিনি হালে পানি পাননি। সৈয়দ আহ্মদের মৃত্যুর পর আলিগড়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ১৯০৬ খ্রি সিমলায় বড়লাটের কাছে একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, যার ফল হয়েছিল মর্লে-মিন্টো শাসনসংস্কারের (১৯০৯) মাধ্যমে স্বতন্ত্র মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলীর প্রবর্তন। ওই বছরেই ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহর প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিম লিগ। বঙ্গ-বিভাগের মধ্যে দিয়ে পাকিস্তানের রূপকল্পনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল সেই একই বছরে।

মুসলমান-ধর্মীদের স্বতন্ত্র বাসভূমি তথা ভাবীকালের পাকিস্তান দাবির পক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল যে ভারতবর্ষ প্রকৃতপক্ষে একটি অখণ্ড দেশ বা নেশন নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি ও নৃতত্ত্বগত পার্থক্য বিরাট। ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের ঐক্যবদ্ধ রূপ সম্পূর্ণ কৃত্রিম। সর্বোপরি পার্থক্য হল হিন্দু ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় জীবন ও সংস্কৃতি, সভ্যতা ও সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ। তাই তাঁদের মতে অখণ্ড ভারত রচনা একটা গোঁজামিল-মাত্র।

ইসলাম-ধর্মীদের স্বতন্ত্র বাসভূমি-সূত্রে প্রথমাবধি যাঁরা বিভিন্নভাবে প্রয়াসী হন তাঁদের মধ্যে সলিমুল্লাহ্, আগা খাঁ ও ইকবালের প্রস্তাব সুস্পষ্ট কোনও পরিকল্পনার রূপ লাভ করেনি। অর্থাৎ তাঁরা তত্ত্বগতভাবে তাঁদের প্রস্তাব তুলে ধরেন মাত্র। ত্রিশের দশকে অনেকগুলি প্রস্তাব পরিকল্পনা আকারে প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে চারটি উল্লেখযোগ্য : (১) মামদোতের নবাবের স্কিম ; (২) আলিগড় স্কিম ; (৩) ডঃ সৈয়দ আবদুল লতিফের পরিকল্পনা যাতে দেশবিভাগের কথা ছিল না ; এবং (৪) পঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী সেকেন্দার হায়াৎ খাঁর পরিকল্পনা। লাহোরে লিগের অধিবেশনে (১৯৪০) আরও কয়েকটি পরিকল্পনা প্রচারিত হয়। উল্লেখ্য যে উল্লিখিত প্রধান চারটি পরিকল্পনায় পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশ ও অন্যান্য কয়েকটি ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্তি এবং কেন্দ্রে কোনও-না-কোনও প্রকার সরকার, ফেডারেশন বা কো-অর্ডিনেটিং কমিটির কথা বলা হয়েছিল।

ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধে জিন্না কিছুকাল মুসলিম লিগ ছেড়ে বিলেতে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৯৩৪ খ্রি তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং লিগের লখনৌ অধিবেশনে (১৯৩৭) সভাপতিত্ব করেন। তাঁর নেতৃত্বে লিগ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। লিগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে আদর্শকে সামনে রেখে এযাবৎকাল কাজ করেছে, পাকিস্তান তার পূর্ণ পরিণতি ও রূপায়ণমাত্র। লখনৌতে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং

লাহোর (১৯৪০) ও মাদ্রাজ (১৯৪১) অধিবেশনে লিগ পাকিস্তানের দাবি ঘোষণা করে।

পুঁজিবাদ (Capitalism)

এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তার মূল উপাদান হল ব্যক্তিগত মালিকানায় তথা বেসরকারি সংস্থাধীন (কোম্পানি ; কর্পোরেশন) ব্যবসাবাণিজ্যে বিনিয়োজিত পুঞ্জীকৃত মূলধন বা পুঁজি এবং বেতনের বিনিময়ে নিযুক্ত শ্রমিক বা শ্রমশক্তি। পুঁজিবাদীর কাজ হল উৎপন্ন সামগ্রী বা পণ্য বাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করা। পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল উৎপাদন, বন্টন ও বিনিময়ে ব্যক্তিগত মালিকানা, বাজার অর্থনীতি ও শ্রম বিভাজন।

মার্কসীয় তত্ত্বানুসারে সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের একটি পর্যায় হল পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদী ও শ্রমিকদের মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে সেই সমাজ থাকে বিভক্ত। শ্রমিকদের শ্রম থেকে অর্জিত উদ্বৃত্ত মূল্যের ভিত্তিতে পুঁজিবাদী তথা বুর্জোয়া শ্রেণী মূলধন সঞ্চয় করে ; শ্রমিক তথা সর্বহারা শ্রেণীর কিছু সঞ্চিত হয় না, তারা বিত্তহীন থাকে। তত্ত্বটি মূলত মার্কসের।

এ ছাড়াও পুঁজিবাদের প্রকারভেদ আছে, যথা বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ, কলকারখানা শিল্পের পুঁজিবাদ, আর্থিক পুঁজিবাদ (ইনসিওরেন্স ; ব্যাঙ্ক) ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ (যে অর্থনীতিতে জনকল্যাণকল্পে সরকার সরাসরি শিল্পবাণিজ্যে নামে)।

পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটে সামন্ততন্ত্রের মধ্যে ; সেদিক থেকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা অপেক্ষাকৃতভাবে অধিক প্রগতিশীল। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীতে নৈপুণ্য ও সহযোগ থাকে, বিপুল সংখ্যক মানুষ একত্র কাজ করে ; সেটা উৎপাদনের সমাজীকরণের পক্ষে অনুকূল। কিন্তু শ্রমিকদের পরিশ্রমের ক্রমবর্ধিষ্ণু যে ফসল মুনাফায় পরিণত হয়, সেই মুনাফা পুঁজিবাদী মালিকেরা ভোগ করে। উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র এবং মুনাফার বেসরকারি পুঁজিবাদী বন্টনের মধ্যে পুঁজিবাদের অন্তর্বিরোধ নিহিত ; সেখানেই পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম উৎসারিত হয়, যেটা সর্বনাশা অর্থনৈতিক সংকটের দিকে সমাজকে নিয়ে যায়। মার্কসীয় তত্ত্বানুসারে সমাজ-বিবর্তনের বাস্তবানুগ ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানুসারে সামাজিক পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যেখানে পুঁজিবাদের স্থান নিয়ে নেয় অধিকতর প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা। ঐতিহাসিক নির্দেশ্যবাদের অনিবার্য নিয়মে উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদন শক্তির সাযুজ্য ঘটে।

দ্র. অবাধ বাণিজ্য

পুরসমাজ (Civil Society)

আদিম সমাজের স্বরূপ সম্পর্কে সামাজিক চুক্তিতত্ত্বের প্রবক্তাদের মধ্যে টমাস হব্‌স্‌ যে প্রকৃতির রাজ্যের (State of Nature) বর্ণনা করেন, সেটা থেকে ভিন্ন অভিমত হিসাবে জন লক ও জাঁ জ্যাক রুসো পুর সমাজের এক চিত্র তুলে ধরেন, যেখানে অণুর মতো বিচ্ছিন্ন আত্মসর্বস্ব মানুষ চুক্তি, সম্মতি অথবা আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সমাজবদ্ধ

হয়। একদিকে পরিবার, অন্যদিকে রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী এই পুরসমাজ হল এমন এক স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রথানুসারী মানবগোষ্ঠী যা আইনভিত্তিক নয়। পক্ষান্তরে রাষ্ট্র হল আইনভিত্তিক ও রাজনৈতিক একটি সংগঠন যার প্রধান কাজ হল সমাজের নিরাপত্তা বিধান এবং সমাজবদ্ধ মানুষের অব্যক্ত কিন্তু শক্তিসম্পন্ন ইচ্ছা সমুদয়কে পূর্ণ করা। পুরসমাজ বলতে সাধারণত লোকের রাষ্ট্র ব্যতিরেকে আর্থ-সামাজিক জীবনকে বোঝায়।

হেগেলের মতে চুক্তির মাধ্যমে পুরসমাজ গড়ে ওঠে না। সেটা চুক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে মাত্র যার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিমানুষ এক স্বাধীন মানবগোষ্ঠীতে যুক্ত হয়। তাতে রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হয় না ; অর্ধ একটি অংশের কেবল সন্নিবেশ ঘটে। সেটা পরিবার, বাকি অর্ধাংশ হল রাষ্ট্র, উভয়ের যোগফলে একটি পুরোপুরি রাজনৈতিক সত্তা প্রকাশ পায়। কাজেই পুরসমাজ রাষ্ট্র হতে ভিন্ন। তবে পুরসমাজ ও সমাজ কথাদুটির পার্থক্য এই যে প্রথমটি সেইসব সংস্থার সমষ্টি যেগুলির একটি রাজনৈতিক চরিত্র থাকে, আর দ্বিতীয়টির গোত্রে সব ধরনের সংস্থাই পড়ে।

পুরসমাজ সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা হেগেলের চিন্তা থেকেই উদ্ভূত। হেগেলের দৃষ্টিতে পুরসমাজ হল ব্যক্তিমানুষের অবাধ এক স্থান যেখানে মানুষ পারিবারিক ঐক্য অতিক্রম করে একটি প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থায় প্রবেশ করে, যার সঙ্গে রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রের বৈসাদৃশ্য থাকে। ব্যক্তিমানুষের বিশেষ কোনও স্বার্থকে পুরসমাজ চরিতার্থ করে। হেগেলের মতে সর্বজনীন স্বার্থ সমন্বিত হয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে। জীবনের প্রথম দিককার রচনাদিতে মার্কস পুরসমাজকে সামন্ততান্ত্রিক থেকে বুর্জোয়া সমাজে প্রবেশের রূপায়ণপর্বের মানদণ্ড হিসাবে বিচার করেন। তাঁর দৃষ্টিতে পুরসমাজ মানুষের স্থূল জড়বাদ, সম্পত্তিগত আধুনিক সম্পর্ক, অপর সবাইকার বিরুদ্ধে প্রতিজনের সংগ্রাম, আত্মসর্বস্বতার মানসিকতা এবং মধ্যযুগীয় সমাজের অবসান থেকে গড়ে ওঠে। মার্কসের মতে পুরসমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এক শ্রেণীর অপর শ্রেণীর উপর আধিপত্যের যন্ত্র ; আধুনিক রাষ্ট্রের শোষণমূলক অর্থনৈতিক সম্পর্কের লক্ষণ পুরসমাজেই রয়েছে। তাই পুরসমাজ ও তার অনুষঙ্গী রাজনৈতিক সমাজের অবসান চাই ; সে কারণে এবং মানুষের মুক্তিকল্পে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

পেটি বুর্জোয়া (Petit Bourgeois)

ফরাসি শব্দ। অর্থ হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। স্ব-নিয়োজিত কারিগর, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক শ্রেণী। কোনও কোনও দেশে ছোট চাষী ও জোতদারদেরও এই শ্রেণীতে গণ্য করা হয়। মার্কসের আশা ছিল যে পুঁজিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী ভেঙে পড়ে সামাজিক মেরুকরণে শ্রমজীবী শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হবে। সেটা অবশ্য অনেক দেশেই কারিগরদের ক্ষেত্রে ঘটে ; দক্ষ শ্রমিক হিসাবে তারা কলকারখানায় নিযুক্ত হয়। ক্ষুদ্র শিল্পের মালিকেরা উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সরে গিয়ে ঠিকাদারি ও সরবরাহকারী কাজকারবারে প্রবেশ করে। পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীতে অনেক সময় নিম্ন মধ্যবিত্ত স্তরের লোকদেরও ধরা হয়, যাদের মধ্যে শিক্ষক, করনিক, দোকানদার ও অনুরূপ ছোটখাট নানা পেশার লোক থাকে। স্বল্পবিত্ত ওইসব পেশার

লোকদের নিয়ে পেটি বুর্জোয়া একটি সুস্পষ্ট শ্রেণী হিসাবে দাঁড়ায় না। তবে উৎপাদন ব্যতিরেকে কেবল বন্টন ও বিনিময় পেশায় যুক্ত লোক বুর্জোয়া শ্রেণীর সমপর্যায়ভুক্ত। মার্কসের মতে পুঁজিবাদের সঙ্কট যতই ঘনিয়ে আসে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী ততই সর্বহারা শ্রেণীতে মিশে যায়।

দ্র. বুর্জোয়াজি ; বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

পেট্রোডলার (Petrodollars)

পেট্রোল রপ্তানিকারী বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের অর্জিত ডলারের সঞ্চয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে আরব রাষ্ট্রগুলিতে জাতীয়তাবাদের প্রবল উত্থান দেখা দেয়। কিন্তু পশ্চিমি রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অন্যতম ফ্রান্স, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৈল সম্পদের বাণিজ্য নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার তাগিদে ইরান, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশের সঙ্গে তীব্র বিরোধে লিপ্ত হয়। তৈলের উৎপাদন ও মূল্যবৃদ্ধির সমস্যাটি ক্রমে আন্তর্জাতিক আকার ধারণ করে। তারই ফলে তৈল-উৎপাদনকারী কয়েকটি রাষ্ট্র ১৯৬০ খ্রি ১৪ নভেম্বর তৈল উৎপাদন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে অর্গানাইজেশন অব পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ (OPEC) নামে একটি সংস্থাধীনে জোটবদ্ধ হয় এবং বিশ্বের বাজারে তৈলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নত দেশ সমূহে সদস্য দেশগুলির বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্পর্কিত স্বার্থ সংরক্ষণে সমর্থ হয়। তৈল উৎপাদন ও রপ্তানিকারী যে-কোনও উন্নয়নশীল দেশ তার সদস্য হতে পারে। সদস্য-তালিকায় আলজিরিয়া, ইকুয়েডর, গাবোন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, কুয়েত, লিবিয়া, নাইজিরিয়া, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আমীরশাহীর দেশগুলি ও ভেনজুয়েলার নাম পাওয়া যায়। ওপেক-এর সদর দপ্তর ভিয়েনায় অবস্থিত।

ওপেক-এর সদস্য দেশগুলি তাদের প্রাকৃতিক তৈলসম্পদে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে পশ্চিমি উন্নত দেশগুলির অতীতের অর্থনৈতিক শোষণে নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছে। তৈলবিক্রয়ে লব্ধ ডলার তারা এখন উন্নত দেশগুলিতে নানাভাবে বিনিয়োগ করছে। তৈল উৎপাদন ও রপ্তানিকারী দেশগুলির দ্রুত বর্ধিত আয় তারা নিজ দেশের উন্নয়নে আশানুরূপভাবে কাজে লাগাতে পারছে না। সে কারণে তারা অর্জিত ডলার উন্নত দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উন্নয়নে সুদের বিনিময়ে লগ্নি করছে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিও সেই সুযোগে পেট্রোডলার লগ্নির বিষয়েও প্রভাব খাটাচ্ছে এবং তৈল রপ্তানিকারী নবীন রাষ্ট্রগুলিকে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব-পরিধিতে রাখার প্রয়াস চালায়। স্বভাবতই নিজ দেশে রুগ্ন শিল্পবাণিজ্যে যাতে পেট্রোডলার লগ্নিকৃত হয় সেই দৃষ্টিতে উন্নত দেশগুলি উন্নয়নশীলদের প্রবৃত্ত করে।

পেরেস্ত্রোইকা (Perestroika)

রুশ শব্দ, বাংলা অর্থ হল: পুনর্গঠন। তার সঙ্গে যুগপৎ ব্যবহৃত অপর রুশ শব্দ হল গ্লাসনস্ত। বাংলায় যার অর্থ খোলামেলা। সোভিয়েত ইউনিয়নে রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে "পূর্ববর্তীকালের বদ্ধাবস্থা ও রক্ষণশীলতা দূর করা ও যেসব ভুলভ্রান্তি করা হয়েছে সেগুলি সংশোধন" করার জন্য "সমাজ সংগঠন ও কর্মপদ্ধতির ইতিহাসগতভাবে সীমাবদ্ধ ও সেকেলে হয়ে পড়া বৈশিষ্ট্যগুলি কাটিয়ে...বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তার এবং সোভিয়েত সমাজের মানসিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজতন্ত্রকে কালোপযোগী রূপ দেওয়া ও সমাজের বৈপ্লবিক নব রূপায়ণে"র (গোরবাচেভ) উদ্দেশ্যে এই কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

১৯৮৭ খ্রি প্রকাশিত 'পেরেস্ত্রোইকা : দেশের ও বিশ্বের জন্য নূতন চিন্তাভাবনা' নামে তাঁর একটি বইতে গোরবাচেভ লেখেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে ৭০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যে প্রতিবেদন (১৯৮৩) লেখেন তাতে তাঁর অনুভূতি ও চিন্তাভাবনার সঙ্গে পার্টি কমরেডদের অনেকের অনুরূপ ভাবনা ও অনুভূতির মিল ছিল। পরে সেগুলি নিয়ে পার্টির কর্মকর্তারা সর্বস্তরে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন, যার ভিত্তিতে ক্রমে পেরেস্ত্রোইকার চিন্তা দানা বাঁধে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারি অধিবেশনে (এপ্রিল ১৯৮৫) সবিস্তারে বিষয়টি বিবেচিত হবার পর, পার্টির ২৭তম কংগ্রেসে (১৯৮৬) অনুমোদন লাভ করে এবং পার্টির সারা দেশের ১৯তম কনফারেন্সে (জুন-জুলাই, ১৯৮৮) চূড়ান্ত অনুমোদন-সহ বিস্তারিত কার্যক্রম গৃহীত হয়। কনফারেন্সের আগে হয়েছিল সযত্ন প্রস্তুতির কাজ—পুরো গ্লাসনস্ত-এর (খোলামেলা আলোচনার) আবহাওয়ায় প্রার্থী নিয়ে আলোচনা এবং প্রতিনিধি নির্বাচন করা। কনফারেন্সের খসড়া প্রস্তাবগুলি নিয়ে মাসাধিককাল যাবৎ প্রতিনিধিদের মধ্যে ভাবনাচিন্তা ও বিচার বিশ্লেষণ চলে। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে জড়িয়ে নেবার জন্য ১৯৮৫ খ্রি যে পেরেস্ত্রোইকার প্রবর্তন করা হয় উল্লিখিত কনফারেন্স সেটাকে বিধিসম্মত বলে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দেয়। যে সাতটি প্রধান বিষয়ের উপর যাবতীয় প্রস্তাব গৃহীত হয় সেগুলি হল : (১) রাজনৈতিক বিষয়াদির সংস্কারকল্পে কতকগুলি জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ ; (২) ২৭তম পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ও পেরেস্ত্রোইকার রূপায়ণ ; (৩) সোভিয়েত সমাজের গণতন্ত্রীকরণ ; (৪) আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই ; (৫) সোভিয়েত জাতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ; (৬) গ্লাসনস্ত ও (৭) আইনের সংশোধন।

পেরেস্ত্রোইকার সমগ্র কর্মপরিধি বিশাল। সংক্ষেপে আলোচনা করলে দেখা যায় যে সেগুলি অভ্যন্তরীণ ছাড়াও আন্তর্জাতিক বিষয়েও বিস্তারিত। রাজনৈতিক ভাবনার প্রথম তিনটি বছরে ধাপে ধাপে পারমাণবিক অস্ত্র বিলোপ, শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের সর্বাত্মক কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস, অনাক্রমণভিত্তিক মতবাদ, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তার উদ্যোগ ইত্যাদি হল নতুন সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির মূলধারা।

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংস্কারের বিভিন্ন বিষয়ের অন্যতম প্রধান দিক হল রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রশাসনিক সংস্থাগুলির সর্বাঙ্গীণ গণতন্ত্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ ; নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন ; আইনের শাসন, নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রসার ; মতামত প্রকাশ, সমিতি গঠন ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ; সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা

সংকোচন ; ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার প্রতিষ্ঠা ; মতামত প্রকাশে বহুত্ববাদের স্বীকৃতি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গ রিপাবলিকগুলিকে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্ব-বিনিয়োগ ও স্ব-মূল্য পরিশোধের অধিকার প্রদান। সাধারণভাবে বাজারভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রসার ; কৃষি উৎপাদনে পরিচালন ব্যবস্থার পরিবর্তন ; যৌথ খামারগুলিকে লীজ দেওয়া এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রচেষ্টা ও সমবায় ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা ; সর্ববিধ অর্থনৈতিক বিষয়ে কস্ট-অ্যাকাউন্টিং পদ্ধতিকে গুরুত্ব দান ; ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ; শিল্পের ব্যক্তিগত উদ্যমকে উৎসাহিত করা, বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে।

পেরেস্ত্রোইকার নীতি গৃহীত হবার পর শিল্পে ও কৃষির ক্ষেত্রে দুই তৃতীয়াংশ অকর্মণ্য পরিচালক স্থানীয় ব্যক্তিদের বদলি ও পদচ্যুতি অথবা অবসর দেওয়া হয়। পেরেস্ত্রোইকার কর্মপরিধি দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাদির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে।

পৌর অধিকার (Civil Rights)

কেবল নাগরিক হওয়ার দরুন যে সব অধিকার লোকে ভোগ করে, এবং আইনের দ্বারা সেইসব অধিকার রক্ষিত হয়। প্রত্যয়টি মানবাধিকারের সমতুল যার পিছনে আইনানুগ সমর্থন সব ক্ষেত্রে থাকে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য দুটি প্রত্যয়ই সমার্থে প্রচলিত, একটির অস্বীকার মানে অপরটির অস্বীকার। তবে ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে পৌর অধিকার ব্যক্তি-স্বাধীনতা অর্থে অধিক ব্যবহৃত হয়। মূল তাৎপর্য হল রাষ্ট্র সমেত অন্যদের প্রতি নির্দেশ যে, ব্যক্তিকে তার কাজেকর্মে ও চিন্তাভাবনায় অধিকার বা স্বাধীনতা দেওয়া। এর আওতায় কাজের অধিকার আসে কিনা সেটা তর্কসাপেক্ষ। কারণ সে ক্ষেত্রে ব্যক্তি নয়, রাষ্ট্রের উপরই পূর্ণ কর্মসংস্থানের নির্দেশ বোঝায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে পৌর অধিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণবর্ণ নাগরিকদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সূত্রে ১৯৬৪ খ্রি পৌর অধিকার আইন বিধিবদ্ধ হয়, তাতে বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে কিছু ধারা সংযোজিত হয়। কিন্তু কার্যত কোনও সুফল না হওয়ায়, অর্থাৎ আইন যথোচিতভাবে অনুসৃত না হওয়ায় পৌর অধিকারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে।

প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (Palestine Liberation Organization)

১৯৪৮ খ্রি প্যালেস্তাইনে ইহুদিদের উদ্যোগে ইজরেল রাষ্ট্র সৃষ্টি হবার ফলে সেখানকার ৭ লক্ষ অধিবাসী প্রতিবেশী বিভিন্ন আরব দেশ বিশেষ করে জর্ডন ও লেবাননে রাষ্ট্রসংঘের উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়। দীর্ঘকাল ধরে তারা আশা করেছিল যে আরব লিগ তাদের স্বদেশে পুনর্বাসনে সমর্থ হবে। কিন্তু ১৯৫৬ ও ১৯৬৭ খ্রি ইজরেলের সঙ্গে সিরিয়া ও মিশরের নেতৃত্বে আরব দেশগুলির যুদ্ধ ও তাদের পরাজয়ে সে আশা অপূর্ণ থাকে। সমাধানকল্পে সশস্ত্র উগ্রপন্থী আক্রমণসহ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা ও আপসের যাবতীয় প্রয়াস নিষ্ফল হয়। ১৯৬৪ খ্রি

আরবদের এক শীর্ষ সম্মেলনে প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পি এল ও) নামে একটি উগ্রপন্থী সংগঠন স্থাপিত হয়। প্রায় একই সময়ে আল-ফাতা নামে প্যালেস্তাইন মুক্তি বাহিনী সংগঠিত হয়। উভয় সংগঠন তাদের সদস্যদের ইজরেল আক্রমণের জন্য গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে। ফাতা চেষ্টা করে লেবাননে ইসলামি বামপন্থীদের সহযোগে সেখানকার ধনী খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সৃষ্টি করতে। তার কর্মকৌশলের ধাঁচ ছিল অনেকাংশে আলজিরিয়ায় ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মতো। পি এল ও জঙ্গিরা তাদের কর্মপরিধি ইউরোপ এবং বিশেষ করে বিভিন্ন পশ্চিমি দেশের বিমানবন্দরে সম্প্রসারিত করে। কারণ পশ্চিমি দেশগুলির অধিকাংশই ইজরেলকে সমর্থন ও সাহায্য করে। পি এল ও গোষ্ঠীর একাংশ শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টাও চালায়। তারা প্যালেস্তিনীয়দের জন্য একটি স্বতন্ত্র সার্বভৌম ভূখণ্ড দাবি করে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমন্বয়ে ইয়াসির আরাফত সেই প্রয়াসের নেতৃত্ব দেন। কিন্তু তা সফল না হওয়ায় প্যালেস্তিনীয়রা জর্ডন দেশটিকে দখলের চেষ্টা করে। পরে লেবাননেও আধিপত্য স্থাপনে উদ্যত হয়।

পি এল ও-র সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্যালেস্তাইন ন্যাশনাল কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত থাকে এবং একটি কার্যনির্বাহী কমিটির অধীনে কাজ করে। জর্ডনের পশ্চিম উপকূল, উপসাগরীয় বিভিন্ন দেশ এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র ও গেরিলা সংগঠনের প্রতিনিধিরা ওই কাউন্সিলের সদস্য। ষাটের দশকে ওইসব উগ্রপন্থী গেরিলা সংগঠন গড়ে ওঠে। পি এল ও এবং আল-ফাতার মধ্যে গেরিলা সংগঠন সমূহের নেতৃত্ব দখলের দ্বন্দ্ব লেগে যায়। আল-ফাতার নেতা ইয়াসির আরাফত কার্যনির্বাহী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন (১৯৬৯)। গেরিলা দলগুলির লক্ষ্য হল আপসহীন সশস্ত্র সংগ্রামে ইজরেলের ধ্বংস সাধন এবং ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের সমতার ভিত্তিতে একত্র অবস্থান।

১৯৬৭ খ্রি জুন মাসে আরব-ইজরেলি যুদ্ধে ইজরেল ছয়দিনের যুদ্ধে আরব দেশগুলিকে হটিয়ে দিয়ে মিশর, সিরিয়া ও জর্ডনের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে নেয়। ফলে দশ লক্ষ আরব অধিবাসী ইজরেলের বাসিন্দা হয়ে পড়ে। ইজরেলের নিজস্ব আরব নাগরিকদের সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন লক্ষ। এর ফলে প্যালেস্তিনীয় গেরিলা সংগঠনগুলি যুদ্ধে অনুপ্রাণিত হয়।

জর্ডনের ভিতর জঙ্গি প্যালেস্তিনীয়রা একটি সমান্তরাল রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল। রাজা হুসেন তাদের অনেক সুযোগসুবিধা দান করেন। অচিরে রাজার অনুগত জর্ডনি সেনাদের সঙ্গে প্যালেস্তিনীয় গেরিলাদের যুদ্ধ বেধে যায় (১৯৭০)। গেরিলারা প্রকারান্তরে শাসনক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। তা ছাড়া জর্ডনে গেরিলাদের ঘাঁটি গড়ে ওঠায় সেগুলি ইজরেলের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাতে রাজা হুসেন প্যালেস্তিনীয়দের প্রতি বিরূপ হয়ে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেন (১৯৭২)। দশ দিনের গৃহযুদ্ধে হাজার দশেক মানুষ নিহত হয়। হুসেন ও আরাফতের মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। জর্ডনে অ-সামরিক শাসন ফিরে আসে।

জর্ডন থেকে বিতাড়িত হয়ে প্যালেস্তিনীয় গেরিলারা লেবাননে ঘাঁটি গাড়ে। বেরুটে তাদের সদর দপ্তর ছিল (১৯৮২)। ফলে লেবাননও ইজরেলের সামরিক আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। লেবাননেও সরকারি বাহিনীর সঙ্গে গেরিলাদের সংঘর্ষ

বাধে। ১৯৮৩ খ্রি আলফাতা দলের নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে আরাফত পি এল ও বাহিনীকে উত্তর লেবাননের ট্রিপলিতে কেন্দ্রীভূত করেন। পরে রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে পি এল ও সমর্থকেরা আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া, ইয়েমেন প্রভৃতি দেশে আশ্রয় নেয়। তাদের সদর দপ্তর টিউনিসে অবস্থিত। ১৯৮৫ খ্রি ইজরেল লেবানন থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করার পর প্যালেস্তিনীয় গেরিলারা লেবাননে ফিরতে শুরু করে। ১৯৮৮ খ্রি নভেম্বরে পি এল ও সভাপতি আরাফত স্বাধীন প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের কথা ঘোষণা করেন এবং ১৯৮৯ খ্রি এপ্রিলে তার রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হন। ১৯৯১ খ্রি উপসাগরীয় যুদ্ধে পি এল ও নেতা আরাফত ইরাকের পক্ষ সমর্থন করায় আটটি আরব রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হন। আরাফত আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সহানুভূতি অর্জনে অনেকাংশে সমর্থ হয়েছেন।

উপসাগরীয় যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর অক্টোবরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে স্পেনের মাদ্রিদ শহরে ইজরেল ও পি এল ও নেতৃবর্গ একটি শান্তি বৈঠকে বসেন। ১৯৯৩ খ্রি অগস্ট মাসে উভয় দেশের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেজন্য ১৯৯২ খ্রি ইজরেলের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ইতঝাক রবিনের ছিল দৃঢ় সংকল্প। ইজরেল কর্তৃক অধিকৃত ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এবং গাজা এলাকার শাসনব্যবস্থা স্থানীয় প্যালেস্তিনীয়দের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। যুগ যুগ ধরে ছিন্নমূল প্যালেস্তিনীয়দের আরব দেশগুলি নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে এসেছে। ইজরেলের সঙ্গে প্যালেস্তিনীয়দের অন্তহীন সংঘর্ষে লিপ্ত থাকবার তিক্ত অভিজ্ঞতা প্যালেস্তিনীয়দের নেতা ইয়াসির আরাফতকে ইজরেলকে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তির পথ বেছে নিতে সাহায্য করে। চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ইজরেল কর্তৃক পরিত্যক্ত ভূখণ্ডে স্বশাসিত এক অন্তর্বর্তী প্যালেস্তিনি পরিষদ গঠিত হয়। স্থির হয় যে ভবিষ্যতে যদি কোনও বিরোধ-বিতর্ক দেখা দেয় তা হলে আলোচনার মাধ্যমে অথবা অন্য কোনও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করা হবে।

চুক্তি কার্যকর হলেও উভয় দেশের উগ্রপন্থী দল বিশেষ করে প্যালেস্তিনী হামাস গোষ্ঠী চুক্তিটিকে ক্ষতিকর মনে করে এবং রক্তঝরা ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকে। ফলে ১৯৯৫ খ্রি ইজরেলের কারাগারে বহু প্যালেস্তিনীকে আবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। জেরুজালেমের একাংশের অধিকার ইজরেলি নিয়ন্ত্রণে থাকায় বিরোধের নিষ্পত্তি হয়নি। ১৯৯৫ খ্রি নভেম্বরে জনৈক ইহুদি আততায়ীর হাতে ইজরেলের প্রধানমন্ত্রী রবিন নিহত হন। তা হলেও উভয় দেশের শান্তির আলোচনা অব্যাহত থাকে।

দ্র. আরব লিগ ; বাথ পার্টি

প্রগতি (Progress)

প্রগতি শব্দটির অর্থ অগ্রগতি। ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মারি জাঁ কঁদরসে (১৭৪৩-৯৪) আধুনিক অর্থে শব্দটির তত্ত্ব প্রথম আলোচনা করেন বলে বলা হয়। অবশ্য সপ্তদশ শতকে জে. বি. বিউরি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে রেফর্মেশনের পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও নিরীশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের ফলে মানুষের মূল্যবোধের ক্ষেত্রে প্রগতি প্রত্যয়ের সঞ্চার ঘটে।

দর্শন, সমাজবিদ্যা ও রাষ্ট্রচিন্তার ছাত্ররা প্রগতি বলতে মনে করেন মানবিক সম্পর্কের উন্নতিকল্পে নিরন্তর পরিবর্তন। প্রগতির লক্ষণ হিসাবে নিরন্তর উন্নতি প্রমাণ করতে হলে দুটি জিনিস চাই : সত্যই যা ঘটেছে তার তথ্য এবং নির্দিষ্ট একটি মান যার সাহায্যে ঘটনাসমূহের মূল্যবিচার। অষ্টাদশ শতকে এই বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত যে মানুষের যুক্তিবোধের ব্যবহার ও সুযোগ উন্নত হয়েছে। মনস্তত্ত্বের সাহায্যে জানা যায় যে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে যুক্তি ও আবেগের সম্পর্কে উন্নতি ঘটেছে। প্রমিথিউস একদিন যেমন মানুষকে অগ্নি উপহার দিয়েছিলেন, আজকের দিনে তেমনি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা মানুষকে তার ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কৌশল শেখাতে পারেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রসারের ফলে নৈতিকতার উন্নতি ঘটেছে। তবে উনিশ শতকের শেষ দিকে প্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং প্রগতির প্রয়োজনীয় লক্ষণগুলি নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। কৃষি ও শিল্পের সার্থক উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক প্রণালী যে উদ্দীপনার সঞ্চার করে তাতে এই ভ্রান্ত ধারণাই মনে উদিত হয় যে সেই একই প্রণালীতে বুঝি সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে।

প্রগতিবাদী (Progressive)

প্রগতিবাদী শব্দটি ধোঁয়াটে, যে সব মানুষ ও তত্ত্ব প্রগতি-র অনুকূল তাদের প্রতি শব্দটি প্রযুক্ত হয়। সাধারণ বামঘেঁষা ভাবনাচিন্তা ও ক্রিয়াকলাপকে শব্দটির সাহায্যে সুবিধামতো চিহ্নিত করা হয়। উন্নতিমূলক কোনও স্বাভাবিক চিহ্ন বা লক্ষণ কারও মধ্যে দৃষ্ট হলে তাকে প্রগতিবাদী আখ্যা দেওয়া হয়। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সাম্যবাদী, সমাজবাদী, উদারনীতিক ও অনুরূপ সমগোত্রীয় দল ও গোষ্ঠী তাদের সবাইকার একই শত্রু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে পপুলার ফ্রন্টে যখন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তখন থেকে প্রগতি শব্দটির ব্যাপক চলন দেখা যায়। ১৯৩৯ খ্রি রুশ-জার্মান চুক্তির পর উল্লিখিত ঐক্যে চিড় ধরলেও সাম্যবাদী প্রচারকেরা সর্বত্র চিরকাল সাম্যবাদের অনুকূল কাজ ও কথাবার্তাকে প্রগতিবাদী বলে অভিহিত করেন। তাই যে সব মার্কিন লেখক নিজ দেশের সমালোচনা করতেন তাঁরা প্রগতিবাদী বলে প্রশংসিত হন। ফলে শব্দটি অনেকের কাছে আগেকার আকর্ষণ হারায় এবং শ্লেষের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

প্রচলিত আইন (Common Law)

প্রচলিত নানান ধারা ও প্রথা থেকে উদ্ভূত আইন-সংক্রান্ত বিভিন্ন যে সব সাধারণ রীতিনীতি আদালতে স্বীকৃতি পায় এবং অন্যান্য আইনের মতোই বলবৎ হয়। পূর্বের বিভিন্ন মামলায় প্রদত্ত সিদ্ধান্ত (case law) প্রচলিত আইন হিসাবে পরিগণিত। আবার যে সব আইন ন্যায় (equity) হিসাবে বিবেচিত এবং প্রচলিত আইনের সমগোত্রীয় তার ভিত্তি হল সমতা ও স্বাভাবিক ন্যায়বিচার (natural justice)।

দ্র. আইন ; প্রাকৃত আইন ; সংবিধি ; সাংবিধানিক আইন।

প্রচারণা (Propaganda)

লাতিন দা প্রোপাগান্ডুম ফিদে (অর্থাৎ ধর্মের প্রচার) থেকে উৎপন্ন ইংরেজি প্রোপাগান্ডা শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ প্রচারণা। সপ্তদশ শতাব্দীতে রোমে পঞ্চদশ পোপ গ্রেগরি কর্তৃক আহূত পবিত্র সমাবেশ (congregation) সূত্রে শব্দটির প্রচলন ঘটে। মর্মার্থ হল কোনও ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা আদর্শের অনুকূলে কিংবা বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির পদ্ধতি। জনমত সৃষ্টির বিষয় ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা সাংস্কৃতিক হতে পারে। প্রচারের যাবতীয় মাধ্যম ব্যবহৃত হতে বাধা নেই। বিশ শতকে প্রতি রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংগঠন প্রচারের জন্য নানা ধরনের উপায় অবলম্বন করে। ইদানীং তার নতুন অভিধা হল ইনফরমেশন সার্ভিস। সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী কমিউনিস্ট ও নাৎসি রাষ্ট্রের প্রচার বা অপপ্রচার বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে। প্রচার থেকেই মগজ ধোলাই কথাটির সৃষ্টি। মার্কসীয় দৃষ্টিতে প্রচারতত্ত্বের উদ্ভাবক ছিলেন প্লেখানভ। লেনিনের লেখনীতে প্রত্যয়টি প্রসারতা লাভ করে।

প্রজাতন্ত্র (Republic)

যে সার্বভৌম রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা রাজতন্ত্র অনুসারী নয়। বিভিন্ন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা বা রানির যে ক্ষমতা থাকে সেটা প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি যিনি রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকেন তাঁর উপর বর্তায়। প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতার উৎস হল জনগণ ; তাদের স্বেচ্ছা-আনুগত্যের অর্থাৎ সম্মতির ভিত্তিতে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমতাসম্পন্ন হন। প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের শক্তির ভিত্তি হল যথাক্রমে সম্মতি ও আনুগত্য।

প্রজাতন্ত্রের প্রকারভেদ আছে। তাতে স্বৈরতন্ত্র থেকে শুরু করে নৈরাজ্যবাদী পর্যন্ত নানাবিধ প্রবণতা দেখা যায়। নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধিরা প্রজাতন্ত্রের শাসনরীতি নির্ধারণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরিচালিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ফরাসি প্রজাতন্ত্রে কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা অনেকাংশে কেন্দ্রীভূত ; অঙ্গরাজ্যগুলির কর্মপরিসর সুবিস্তৃত নয়।

প্রতিক্রিয়াশীল (Reactionary)

ফরাসি বিপ্লবের সময়ে (১৭৮৯-৯৩) মননশীল যে সব ব্যক্তি বিপ্লবচিন্তার সমালোচনা করতেন তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল বলা হত। তারপর থেকে উনিশ শতকের ইউরোপে বিপ্লব অথবা সংস্কার আন্দোলনের বিরোধী ও বাধাদানকারীদের তখনকার দার্শনিক বিপ্লবীরা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসাবে অভিহিত করতেন। স্বভাবতই সেইসব বাধাদানকারীদের মধ্যে খ্রিস্টান যাজক, অভিজাত শ্রেণী, রাজন্যবর্গ ও পুরানো অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠানকে ধরা হত। শব্দটি বামপন্থীদের মধ্যে ব্যবহারবহুল হলেও ফ্যাসিস্টরাও সেটি প্রয়োগ করে। বামপন্থীরা যে পরিবর্তন চান তার বিরোধিতা যিনি করবেন তিনিই প্রতিক্রিয়াশীল ; অথবা বামপন্থীরা যে বিধিব্যবস্থার পরিবর্তন করেছেন সেগুলিকে কেউ পুনঃপ্রবর্তন করলে তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা হবে। রক্ষণশীলমাত্রেই এবং দক্ষিণপন্থী লেখক, নিয়মতান্ত্রিক, অহিংস ও ধীরে চল নীতিতে

বিশ্বাসী রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে শব্দটি নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত দেখা যায় যে কেউ-কেউ পরিবর্তনের নামেই আপত্তি তোলেন, কিন্তু নিজে কোনও পরিবর্তনের প্রস্তাব তোলেন না ; কোনও ব্যাপারে বিবেচনার কোনও দাবি তাঁর থাকে না।

দ্র. দক্ষিণপন্থা ; বামপন্থা

প্রতিবিপ্লব (Counter-revolution)

বিপ্লবের প্রত্যাগমন অর্থে ফরাসি দার্শনিক কঁদরসে শব্দটি ১৭৯৩ খ্রি প্রথম ব্যবহার করেন। পরে ১৭৯৬ খ্রি দে মেস্তার, যিনি প্রতিবিপ্লব চেয়েছিলেন, তিনি শব্দটি পালটা বিপ্লব নয় অর্থাৎ বিপ্লবের বিপরীতমুখিতা অর্থে ব্যবহার করেন।

কঁদরসে যে অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন সেটি হল যে কোনও ব্যক্তি, কোনও কাজ কিংবা ভাবভঙ্গি যখন একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা উৎখাত করে বিপ্লব ঘটায় তখন তার পূর্ববর্তী ব্যবস্থাকে পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে পুনঃস্থাপন করে। সেক্ষেত্রে দে মেস্তার বিশেষ কোনও বিপ্লব অথবা বিপ্লব ব্যাপারটারই বিরোধিতার কথা বলেন।

মার্কসীয় দৃষ্টিতে প্রত্যয়টি হল প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর সক্রিয় সংগ্রাম, যে শ্রেণী কোনও এক সমাজ বিপ্লবে ছিন্নমূল হয়ে, নতুন সমাজব্যবস্থার বিরোধিতা এবং পুরানো অচল ব্যবস্থার সংরক্ষণ এবং পুনঃ প্রতিষ্ঠা চায়।

দ্র. বিপ্লব ; চিরস্থায়ী বিপ্লব ; সাংস্কৃতিক বিপ্লব

প্রতিষেধ (Veto)

লাতিন ভাষা থেকে আগত। অর্থ : আমি নিষেধ করছি। কর্তৃত্ব বলে বা পদাধিকার বলে নিষেধাজ্ঞা। অর্থাৎ কোনও বিষয় বা প্রস্তাব কার্যকর করার ব্যাপারে একটি নেতিবাচক ভোটের দ্বারা প্রত্যাখ্যান বা নিষেধ করার ক্ষমতা, বা প্রতিষেধাধিকার। ভেটো বা নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী বিশেষ। কোনও সংস্থায় প্রতিটি সদস্যকে এই অধিকার দেবার তাৎপর্য হল যে সকল সদস্য ঐকমত্যে না পৌঁছলে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি রূপায়ণ করা যাবে না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তির বিকল্প হিসাবে এই কার্যপ্রণালী অপরিহার্য। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ও শক্তিশালী সদস্যদের এই অধিকার থাকায় তাদের কারও স্বার্থবিরোধী কোনও বিষয় আলোচিত হতে পারে না। প্রতিষেধ অবশ্য সময়বিশেষে প্রয়োজন হয়, যদি ক্ষমতাশালী সদস্যেরা আন্তর্জাতিক জনমতকে মান্য করে।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy)

যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিকেরা নির্বাচিত প্রতিনিধির পরিবর্তে নিজেরাই যৌথভাবে সর্ববিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বলা হয়ে থাকে যে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্ভব যেখানে নির্বাচকমণ্ডলী বৃহৎ নয়, যার ফলে কোনও বিষয়ে বারে বারে ভোট গ্রহণ করা যায়। প্রাচীন আথেনীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই পদ্ধতি অনুসৃত হত। একথাও বলা হয় যে প্রত্যক্ষ

গণতন্ত্রে ব্যক্তিমানুষই হল সার্বভৌম। প্রতিনিধিত্বমূলক পরোক্ষ ব্যবস্থায় নির্বাচিত কিংবা নিয়োজিত ব্যক্তিরা দায়িত্ববদ্ধ হিসাবে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন বটে, তবে তাঁরা জনগণের হাতের পুতুল হিসাবে কাজ করেন না।

দ্র. গণতন্ত্র

প্রত্যাহ্বান (Recall)

নির্বাচিত প্রতিনিধি অথবা পদস্থ কর্মচারীর দায়দায়িত্ব ও কর্তব্যে অযোগ্যতা ও অবহেলা দেখা গেলে প্রত্যাহ্বান প্রক্রিয়ায় ভোটের মাধ্যমে সেই ব্যক্তির নিয়োগ ও নির্বাচনের সময়সীমার মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট নির্বাচকমণ্ডলী তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন। এই প্রথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উনিশ শতকের শেষ দশক এবং বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে খুবই জনপ্রিয় ছিল, এবং এখনও সেখানকার কোনও কোনও অঙ্গরাজ্যে **গণউদ্যোগ** ও **গণভোট** প্রথাদ্বয়ের সঙ্গে এটি বিদ্যমান। তাতে **প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র** প্রকারান্তরে ফুটে ওঠে। তবে কোনও দল বা গোষ্ঠী যাতে এই প্রথার অপব্যবহার না করে সেজন্য সেখানকার অঙ্গরাজ্যগুলির সংবিধানে বলা থাকে যে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে নতুনভাবে ভোট গ্রহণের পূর্বে শতকরা একটি বৃহৎ সংখ্যক ভোটদাতার প্রত্যাহ্বান প্রস্তাবের সমর্থনে লিখিত অভিমত যাচাই করা হয়। কিন্তু সতর্কতামূলক এই কঠোরতা অনেকাংশে শিথিল হয়ে যায় যখন ডাকযোগে স্বাক্ষরদানের জন্য প্রস্তাবকদের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়।

প্রবর (Elite)

ফরাসি 'এলিত' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ। অর্থ হল সেরা, শ্রেষ্ঠ বা অত্যুৎকৃষ্ট। কথাটি দ্বারা ক্ষুদ্রগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে অভিন্নভাবে কাজ করে এবং সামাজিক অথবা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগসুবিধার অধিকারী। ক্ষুদ্র ওই জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত লোকেরা বিশেষ এক অবস্থানে থাকার দরুন নিজেদের প্রকৃতিগতভাবে সেরা অথবা সমাজ কর্তৃক বাছাইকৃত হিসাবে বৃহত্তর জনসমাজকে শাসন করার অধিকারী বলে মনে করে। প্রবরতন্ত্রে অল্পসংখ্যক লোক সবাইকে শাসন করে। যে সমাজব্যবস্থায় গোষ্ঠীতন্ত্র অথবা শাসকশ্রেণী গড়ে ওঠার সুযোগ আছে সেখানে এই প্রবরতন্ত্রের ক্ষেত্র অনুকূল। তবে প্রবরতন্ত্র ও সাম্যের অবস্থান ভিন্ন। অনেকের দৃষ্টিতে জনস্বার্থেই প্রবরতন্ত্রের প্রয়োজন। প্রবরগোষ্ঠী একটি শ্রেণী নাও হতে পারে। প্রবরতন্ত্র নানা ধরনের হতে পারে, তবে প্রধান তিনটি হল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক। তিনটি মিলে একটি ক্ষমতাবান প্রবরতন্ত্র ক্ষেত্রবিশেষে গড়ে ওঠে।

প্রবরতন্ত্রের বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে প্রথমটি আদর্শগত, বাকি দুটি অভিজ্ঞতামূলক: (১) সমাজের নিয়ন্ত্রণ গুণের ভিত্তিতে নির্বাচিত বিশেষ এক গোষ্ঠীর হাতে ন্যস্ত থাকা উচিত। গুণানুসারে তারা নানাবিধ সুযোগসুবিধার অধিকারী। প্রবরবর্গের সদ্বংশ, বুদ্ধি, বিশেষ জ্ঞান, উদ্যমশীলতা ইত্যাদি তাদের গুণের মধ্যে ধরা হয়। সামাজিক উপকারিতার মধ্যে শৃঙ্খলা, প্রগতি,

অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্যকে গণ্য করা হয়। এই তত্ত্বে বিশ্বাসী যাঁরা তাঁরা মনে করেন যে প্রবরবর্গের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা না থাকলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অকল্যাণ অবধারিত। (২) দ্বিতীয় ধারার তাত্ত্বিকদের উদ্ভব ঘটে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ইতালীয় অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক ভিলফ্রেদো পারেতো ও গেতানো মস্কা এবং জার্মান রাষ্ট্রতাত্ত্বিক রবার্ট মিচেলশ **গণতন্ত্রের** প্রতিক্রিয়া হিসাবে বলেন যে প্রবরবর্গের যত না সুবিধা তার চেয়ে অনেক বেশি আছে তাদের অপরিহার্যতা, তেমনি গণতন্ত্র যত না অবাঞ্ছিত, তার চেয়ে অনেক বেশি হল সেটার অসম্ভবতা।

মনস্তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে তাঁরা বিষয়টিকে বিচার করেছিলেন। প্রবরবর্গের মনস্তাত্ত্বিক গুণাবলি তাঁদের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করে। পারেতোর দৃষ্টিতে প্রবরবর্গের মধ্যে দু' ধরনের প্রাণীর মনস্তত্ত্ব কাজ করে—দৃষ্টান্ত হল শৃগাল (দক্ষ, চতুর, উদ্ভাবনশীল) এবং সিংহ (বলবান, নীতিপরায়ণ, রক্ষণশীল)। চক্রাকারে শৃগালেরা সিংহকে প্রবরের স্থানে নির্বাচিত করে। সিংহ কঠোর হয়ে পড়লে তাকে স্থানচ্যুত ক'রে শৃগাল প্রবরের স্থান দখল করে। প্রবরবর্গ নিয়তই নবীকৃত হয়। মস্কা মনে করতেন যে সংগঠিত উপায়ে কতিপয় মানুষ অসংগঠিত জনগণকে শাসন করে। মিচেলশ সেই ধারণার সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক সাংগঠনিক কুশলতাকে যুক্ত করেন। মার্কসীয় সমাজব্যবস্থাতেও অনেকে সর্বহারার কাঁধে ভর করে এক নব্য প্রবরবর্গের উত্থান প্রত্যক্ষ করেন। (৩) অভিজ্ঞতাবাদী তৃতীয় ধারার তাত্ত্বিকেরা প্রবরবর্গের সঙ্গে **বহুত্ববাদী** দৃষ্টিতে গণতন্ত্রের সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াসী হন। তাঁরা মনে করেন সংগঠিত প্রবরবর্গ গড়ে ওঠে বটে, কিন্তু সেগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পর্কে বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে, গণতান্ত্রিক বৈধতা ও আত্মরক্ষার তাগিদে। জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক কাঠামোয় পরস্পরবিরোধী প্রবরবর্গ প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে।

প্রযুক্তিতন্ত্র (Technology)

যে শাসনব্যবস্থায় প্রযুক্তিবিদদের প্রভাব প্রাধান্য লাভ করে। মার্কসীয় চিন্তায় প্রভাবিত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক টি বি ভেবলেন (১৮৫৭-১৯২৯) ক্যালিফোর্নিয়ার জনৈক ইঞ্জিনিয়ার ডবলিউ এইচ স্মাইদ কর্তৃক উদ্ভাবিত (১৯১৯) এই তত্ত্বটিকে বিস্তার করেন এই মর্মে যে উৎপাদন-ব্যবস্থায় মালিকানার বিশ্বব্যাপী পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রকৃত ক্ষমতা তাদেরই হাতে ক্রমশ বর্তাচ্ছে যারা উৎপাদনের মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে—বিশেষত প্রযুক্তিবিদদের উপর—যারা আধুনিক উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত জটিল যন্ত্রপাতি চালিয়ে থাকে। প্রযুক্তিবিদদের প্রকৃত অর্থনৈতিক ক্ষমতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কাজেই তারা রাজনীতির ক্ষেত্রেও সেই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। সম্ভাবনাটি অনেকে ভয়ের চোখে দেখেন এই কারণে যে সেটা হিতবাদী মতবাদে পুষ্ট হয়ে লঘু ভোগবাদের কারণ হবে। বস্তুত প্রযুক্তিতন্ত্রের অনেকাংশে গুণগ্রাহী ছিলেন স্যাঁ সিমঁ ও কঁৎ। মার্কসীয় দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিয়ম তথা অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ অনুযায়ী উৎপাদনের চালিকাশক্তি যারা নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী, সেই কারণে, রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী এবং সেই দৃষ্টিতে প্রযুক্তিতন্ত্রের প্রভাব অনিবার্য।

প্রয়োগ (Praxis)

গ্রিক ভাষা থেকে আগত 'প্র্যাকসিস'-এর বাংলা প্রতিশব্দ। যুক্তিতর্কে নিছক তাত্ত্বিক যুক্তির বিপরীত ব্যবহারিক দিক থেকে অর্থাৎ প্রায়োগিক যুক্তির প্রয়োজনে আরিস্তোতল কথাটির প্রচলন করেন। কথাটির সাধারণ অর্থ হল কাজ বা কর্মতৎপরতা ; এবং মার্কসের ভাবানুসারে স্বাধীন সর্বজনীন, সৃজনশীল, স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াশীলতা যার মধ্যে দিয়ে মানুষ তার ঐতিহাসিক ও মানবিক জগৎকে রূপায়ণ ও পরিবর্তন করে ; সেই ক্রিয়াশীলতা অন্যান্য প্রাণী হতে স্বতন্ত্র মানুষের একান্তই একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কথাটির ব্যবহার ইদানীং নব্যমার্কসবাদীদের মধ্যে খুবই দেখা যায়। বিশেষ করে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল সদস্যদের মধ্যে, যাঁদের কাছে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ।

প্রত্যয়টি দীর্ঘকাল ধরে বহু দার্শনিক বিভিন্নভাবে দেখেছেন। তবে যাঁরা স্বাধীন সৃজনমূলক কর্মতৎপরতা হিসাবে কথাটির সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তাঁরা তা করেছেন শব্দটিকে বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে। তাতে এক ধরনের রাজনৈতিক কাজ হিসাবে শব্দটি পরিগণিত। সেদিক থেকে বিচার করলে বিপ্লব সংকীর্ণ দৃষ্টিতে কেবলই একটি রাজনৈতিক ক্রিয়া নয়, এমন কী কেবলই সমাজের আমূল পরিবর্তনও নয়। মার্কসীয় বিচারে বিপ্লব মানুষ ও সমাজ উভয়েরই মৌল পরিবর্তন সাধন করে। বিপ্লবের লক্ষ্য হল সত্যিকারের মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষ ও মানুষের সমাজ সৃজনকল্পে আত্মবিচ্ছিন্নতাকে (self-alienation) রোধ করা।

প্রয়োগবাদ (Pragmatism)

যে দর্শনে মনে করা হয় যে সত্য সম্পর্কে কোনও প্রস্তাবনা পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে পরিমাপ এবং কার্যক্ষেত্রে বাস্তব ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই প্রয়োগবাদে অধিবিদ্যাগত বিমূর্ত চিন্তাভাবনা পরিহার করা হয়। পূর্বকল্পিত সিদ্ধান্ত বা অবরোহী পদ্ধতিতে সত্যে উপনীত হবার প্রচলিত ধারা প্রয়োগবাদে বর্জিত। প্রয়োগবাদীরা মনে করেন যে নব নব আবিষ্কারের ধারায় সত্য পরিবর্তিত হয় এবং স্থান, কাল ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী সত্যের বিবর্তন ঘটে। অধিকাংশ প্রয়োগবাদী মনে করেন যে নীতিশাস্ত্রে জ্ঞান মানবিক মূল্যবোধের সহায়ক ও বাস্তবানুগ এবং মূল্যবোধ লক্ষ্য ও মাধ্যম উভয়ের মধ্যেই সহজাত। উইলিয়াম জেমস্ (১৮৪২-১৯১০), সি. এস. পের্স (১৮৩৯-১৯১৪), জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২) প্রমুখ প্রয়োগবাদীরা নানা ধরনের প্রয়োগবাদী তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। প্রয়োগবাদ যুক্তরাষ্ট্রের দর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তা এবং বিজ্ঞানচর্চা, আইন ও সমাজতত্ত্বের উপর সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে।

সাধারণভাবে লোকচক্ষে প্রত্যয়টি কঠিন, বাস্তব জগতে সবকিছু আচরণের আশু কার্যকারিতাই হল বড়, আদর্শগতভাবে কাজকর্মের ঔচিত্যের প্রশ্ন গৌণ।

প্রশাসন বিভাগ (Executive)

সরকারের অন্যতম একটি বিভাগ, যার কাজ হল আইনসভায় বিধিবদ্ধ আইনের এবং দেশের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতির রূপায়ণ। দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও রাষ্ট্রীয় আইন সমূহকে কার্যকর করা প্রশাসন বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। বিভাগের একটি বিশেষ কাজ হল রাজস্ব সংগ্রহ এবং আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী ব্যয়নির্বাহ। প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহণ, পূর্ত, খাদ্য, সমবায়, শিল্প, বণিজ্য ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় প্রশাসনিক কার্যপরিধির অন্তর্গত। প্রশাসন বিভাগের উপর সীমিত আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগীয় কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হন এবং মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রশাসন বিভাগের এক একটি বিষয়ের দায়িত্ব মন্ত্রিদের উপর ন্যস্ত থাকে।

দ্র. সরকার ; আইনসভা ; বিচারবিভাগ ; ক্ষমতার পৃথকীকরণ।

প্রশাসনিক আইন (Administrative Law)

আইনের যে শাখায় রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিভাগ, মন্ত্রণালয়, প্রশাসনিক দপ্তর ও সরকারি কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। পক্ষান্তরে, সাংবিধানিক আইনের সাহায্যে কেবল সরকার ও আইনসভার কার্যবিধি নির্বাহ হয়। এ ছাড়া আইনসভায় গৃহীত আইনের বাইরে সরকারি প্রশাসন ও কার্যনির্বাহ সূত্রে সরকার অনেক সময়ে কিছু রীতিনীতি ও নিয়মাবলি নির্ধারণ করে যেগুলি আদালতে প্রশাসনিক আইন হিসাবে স্বীকৃতি পায়। আধুনিক রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ফ্রান্সে সরকারের হাতে এইভাবে প্রশাসনিক আইন প্রবর্তনের ক্রমবর্ধন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসনিক আদালত গঠিত হয়েছে। নাগরিকদের **প্রাকৃত অধিকার** লঙ্ঘনের প্রশ্নে প্রশাসনিক আইনের যৌক্তিকতা নির্ভর করে।

দ্র. আইন ; সাংবিধানিক আইন

প্রাকৃত অধিকার (Natural Rights)

রাজা, রাষ্ট্র বা জনসমাজ কর্তৃক প্রবর্তিত আইনকানুনের বাইরে মানুষের যে সব জন্মগত ও নৈতিক অধিকার থাকে। সেগুলি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও মৌলিক অধিকার। অধুনা বহুল কথিত **মানবাধিকার** প্রত্যয়টি প্রাকৃত অধিকারেরই একটি নবীন রূপ এবং আধুনিক উদারতন্ত্রী ভাবুকদের কাছে সবিশেষ সমাদৃত। প্রাকৃত অধিকার এবং প্রাকৃত সুবিচার আইনজ্ঞদের কাছে সমগোত্রে স্বীকৃত পায়। আইনানুগ অধিকারের বাইরে প্রাকৃত অধিকারের স্থান আছে। তবে যেদেশে **আইনের শাসন** নেই সেদেশে প্রাকৃত অধিকারের প্রশ্ন ওঠে না।

প্রাকৃত অধিকার নামে কিছু থাকতে পারে বলে **বেনথাম** মনে করতেন না। অন্য দিকে **হবস, লক, কান্ট** প্রমুখ দার্শনিকদের কাছে প্রত্যয়টি নানাভাবে স্বীকৃতি

পেয়েছে। লকের বিচারে প্রাকৃত অধিকারের অবকাশ চতুর্বিধ ক্ষেত্রে : জীবন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি ; তার মধ্যে প্রথমটি ছাড়া বাকিগুলি হস্তান্তরযোগ্য। শর্তসাপেক্ষ সব অধিকার আইনের দৃষ্টিতে ছাড়া সম্ভব, কিন্তু জীবনের অধিকার হস্তান্তর কোনও আইনে সিদ্ধ নয়।

প্রাকৃত অধিকারের মানদণ্ডে আইনানুগ অধিকারের মূল্যবিচার হয় এবং ব্যক্তিমানুষের জীবননির্বাহ, শ্রম এবং সম্পত্তির ব্যবহারে সেটা অপরের বিশেষ করে রাষ্ট্রের দমন কিংবা হস্তক্ষেপ নিবারণ করে। প্রাকৃত অধিকার যে স্বতঃসিদ্ধভাবে গ্রহণযোগ্য এবং মূলত সেটা **মানবপ্রকৃতি** থেকে উৎসারিত সে বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে।

প্রাকৃত আইন (Natural Law)

প্রত্যয়টি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। আরিস্তোতলের দৃষ্টিতে প্রাকৃত আইন ছিল বিশ্বজনীন। উত্তরকালে গ্রিক দার্শনিক জেনো এবং রোমান স্টোইক দার্শনিকেরা প্রাকৃত আইনের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও সেটিকে **আইনশাস্ত্রে** অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁদের মতে প্রাকৃত আইন বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে প্রাকৃতিক গতিপ্রকৃতির সামঞ্জস্য বোঝাত। প্রকৃতি বলতে কেবল নৈসর্গিক পরিবেশ বোঝাত না। তার গূঢ় অর্থ ছিল ঈশ্বরের বিধান সম্পৃক্ত একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্পনা। **বাস্তব আইনের** (positive law) সঙ্গে প্রাকৃত আইনের প্রভেদ হল যে দ্বিতীয় আইন একটি আদর্শের অনুসারী। মধ্যযুগে প্রাকৃত আইন যথার্থ আইনের স্বীকৃতি অর্জনের জন্য বাস্তব আইনের প্রতিযোগী হয়। খ্রিস্টান যাজকেরা প্রাকৃত আইনকে ঈশ্বরের অভীপ্সা হিসাবে প্রচার ও তার প্রতি আনুগত্য সৃষ্টির প্রয়াসী হতেন। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদীরা যুক্তির ভিত্তিতে প্রাকৃত আইনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লক-এর মতে **প্রাকৃত অধিকারের** মতো কিছু প্রাকৃত আইন আছে ; যেগুলি ক্ষেত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রের কর্মপরিধি চিহ্নিত করে। কার্যত প্রাকৃত আইনের প্রভাব হ্রাস পেলেও তার নৈতিক দিকগুলির স্থায়ী মূল্য আছে। অবশ্য নৈতিকতা সম্পর্কে ধারণারও হেরফের ঘটে সভ্যতার বিভিন্ন পর্বে। বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের সময় বাস্তব আইন অপেক্ষা প্রাকৃত আইনের প্রতি আনুগত্য বেশি প্রদর্শিত হয়।

বস্তুত প্রাকৃত আইন ও প্রাকৃত অধিকারের ভিত্তিতে প্রাকৃত সুবিচার গড়ে ওঠে। আইনশাস্ত্র ও বিচারব্যবস্থার মূলেও থাকে সেই মনোভঙ্গি। মানুষের অন্তর্নিহিত শুভ প্রকৃতির উপাদানে প্রাকৃত আইন সৃষ্ট হয়। বাস্তব আইন থেকে পৃথক ধারায় তার উদ্ভব ঘটে।

দ্র. আইন

প্রাধিকার (Authority)

প্রত্যয়টিকে রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকেরা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন। রাষ্ট্রতাত্ত্বিকদের মতে প্রত্যয়টি নিয়মনিয়ন্ত্রিত জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ; কোনও কিছু করা

বা বলার পিছনে অভ্রান্ততা নির্দেশ করে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় শব্দটি দ্বারা এক ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বোঝায়। সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে শব্দটি হল একটি বৈধ ক্ষমতা বিশেষ। আবার ক্ষমতা কথাটির অর্থ হল একজন অপরজনকে জবরদস্ত অর্থাৎ গায়ের জোরে স্বমতে আনার চেষ্টা অথবা খাদ্য বস্ত্র আশ্রয় ইত্যাদি আটকে রেখে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে।

প্রাধিকার পদমর্যাদা ছাড়াও ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্ব ও গণমোহিনী শক্তির দ্বারাও গড়ে ওঠে। ম্যাক্স ওয়েবার তিন ধরনের প্রাধিকারের কথা বলেছেন: আইনগত, ঐতিহ্যপ্রসূত এবং গণমোহিনী সঞ্জাত। তবে প্রাধিকারকে ক্ষমতা থেকে পৃথকভাবে দেখাই সঙ্গত। প্রাধিকারের পিছনে অধিকার ক্রিয়াশীল থাকে বেশি। অবশ্য ক্ষমতাও থাকতে পারে পরোক্ষে; এবং সেটা সম্ভব জনসাধারণের বিশ্বাসের জোরে। এই সূত্রে তিনটি দার্শনিক প্রশ্ন ওঠে: (১) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রাধিকার সম্পর্কে জনসাধারণের বিশ্বাসের পিছনে কী কারণ থাকে? (২) সেই বিশ্বাসই বা কতটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত? এবং (৩) লোকে সে বিশ্বাস মেনে চলে কেন? প্রশ্নগুলি প্রায় সমার্থক। প্রাধিকারের ব্যাপারে আস্থা না থাকলেও লোকে বিশ্বাস বজায় রাখে ব্যবহারিকতা ও জনজীবনে শৃঙ্খলার তাগিদে।

প্রাসাদ বিপ্লব (Palace Revolution)

রাজা অথবা রাজার সমতুল কোনও রাজশক্তি, অথবা রাজতন্ত্র কিংবা অনুরূপ কোনও শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজার ঘনিষ্ঠমহলের ব্যক্তি কিংবা রাজন্যবর্গ অথবা রাজসভার কুচক্রী অমাত্যবর্গের দ্বারা সৃষ্ট বিপ্লব, যেটা রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ঘটে থাকে সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে, অর্থাৎ প্রাসাদের বাইরে নয়, অর্থাৎ নগরে অথবা রাজ্যের অন্যত্র কোথাও নয়। এ ছাড়া আপাতদৃষ্টিতে শান্ত পরিবেশে সংবিধান-বহির্ভূত উপায়ে একই দলের বিরোধী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সেই দলেরই ক্ষমতাসীনদের অপসারণ করে সরকারি ক্ষমতা দখল করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রুশ্চেভের উত্থান ও অপসারণ রাজতন্ত্রী প্রাসাদ বিপ্লবেরই সমগোত্রীয়।

প্রুঁদ, পিয়ের ঝসেফ (১৮০৯-১৮৬৫) (Proundhon, P. J.)

ফরাসি রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ও সাংবাদিক। নৈরাজ্যবাদ দর্শনের আধুনিক পর্যায়ের আদি উদ্‌গাতা। তাঁর লেখা 'হোয়াট ইজ প্রপার্টি' (১৮৪০) বইতে তিনি উনিশ শতকে ইউরোপে প্রচলিত সম্পত্তির নানাবিধ অধিকারের তীব্র সমালোচনা করেন, বিশেষ করে যেগুলি অন্য মানুষের উপর খবরদারির সুযোগ দেয়। তার প্রতিকার হিসাবে তিনি কিন্তু কমিউনিজমকে সমর্থন করেননি, কারণ তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন, যার অন্যতম চাহিদা হল সম্পত্তিতে মানুষের অধিকার। তিনি মনে করতেন যে কমিউনিজম কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বলবৎ হয়। সেজন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তিসূত্রে নিপীড়নের অবসানকল্পে কমিউনিজম কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নয়।

প্রুঁদ শ্রমজীবী মানুষের বিশ্বব্যাপী একটি সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন যার ভিত্তি অর্থনৈতিক রীতিনীতি কিংবা রাজনৈতিক কোনও কিছু নয়, অর্থাৎ পারস্পরিক

বিনিময়ের উদ্দেশ্যে সঠিক উৎপাদন-ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে মানবকল্যাণ, মুনাফা নয়। প্রুদঁ-এর চিন্তাভাবনা মার্কসকে একসময়ে উদ্দীপিত করেছিল এবং কিছুকাল দু'জনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রুদঁ মার্কসীয় চিন্তায় কর্তৃত্ববাদী একনায়কতন্ত্রের লক্ষণগুলির সমালোচনা করেন। তার উত্তরে 'পভার্টি অব ফিলজফি' (১৮৪৭) গ্রন্থে মার্কস প্রুদঁর চিন্তা খণ্ডন করেন।

প্রুদঁ একটি সংবাদপত্র চালাতেন। তিনি গণপরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সরকারের সমালোচনা করায় লুই নাপোলেয়ঁ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। প্রুদঁর জীবনাবসানের পর প্রকাশিত আত্মকথায় তাঁর আজীবনকাল শ্রমিকশ্রেণীর জন্য সংগ্রামের বিবরণ পাওয়া যায়। সম্পত্তি যে একটি চৌর্যবৃত্তির ফসল সেটাই ছিল তাঁর বাণী।

প্লাতো (৪২৮-৩৪৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) (Plato)

গ্রিক দার্শনিক যিনি আধুনিক রাজনীতিকে প্রথম একটি পদ্ধতিতে রূপ দান করেন। গুরু সোক্রাতেস-এর চিন্তাই ছিল তাঁর প্রেরণার প্রধান উৎস। স্যারাকস-এর রাজা দিয়ন্যুসিয়স-এর বন্ধু ও উপদেষ্টা হিসাবে তিনি বাস্তব রাজনীতির আস্বাদ পান। রাজনীতির সঙ্গে নৈতিকতার পরিমিশ্রণে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। প্লাতোর বহুবিধ দার্শনিক রচনাদির মধ্যে 'দ্য রিপাবলিক', 'পলিটিকাস' বা 'স্টেটসম্যান' এবং 'লজ' (Laws) নামে গ্রন্থ তিনটি প্রধানাংশে রাষ্ট্রদর্শন বিষয়ক।

প্লাতো ছিলেন ভাববাদী ; ভাব স্থান ও কালের অংশ নয় ; ভাব চিরন্তন, এবং চূড়ান্ত সত্য ; যদিও বস্তুর মধ্যে প্রকাশমান কিন্তু বস্তু নিরপেক্ষ। রাষ্ট্র সম্পর্কিত কোনও ভাব নির্দিষ্ট কোনও রাষ্ট্রের দর্পণ নয়। ভাব হল একটি গুণগত সত্তা যা সর্বব্যাপী ; অর্থাৎ সবকিছুর মধ্যে নিহিত একই অন্তঃসারই হল ভাবজগত।

'দ্য রিপাবলিক' নামে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থে প্লাতো **ন্যায়বিচারের** (justice) প্রত্যয়টিকে দার্শনিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে আনুষঙ্গিক আদর্শ রাষ্ট্রের প্রয়োজন দর্শিয়েছেন। লক্ষ্য হল কল্যাণকর সত্তার প্রতিষ্ঠা। প্লাতো চাইতেন ন্যায়বিচারের উপর আদর্শ রাষ্ট্রের অবস্থিতি এবং ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার ব্যবস্থা ; শিক্ষাক্রমে সমাজকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : শাসক, সৈন্যদল এবং উৎপাদক বা শ্রমিক। এই শ্রেণীগুলি দুটি নীতি অনুসরণ করে : এক, কর্মগত বিশেষজ্ঞতা (functional specialisation) ; দুই, অহস্তক্ষেপতা। ন্যায়বিচারসম্পন্ন আদর্শ সমাজের উচ্চশ্রেণী, যথা **দার্শনিক-রাজা** ও অভিজাত অভিভাবকবর্গ (শাসক ও সৈন্য) থাকবে এক সাম্যবাদী বিধিব্যবস্থার অধীন। তাতে শাসকশ্রেণীকে অধঃপতন ও দুর্নীতিমুক্ত রাখা যাবে। সাম্যবাদী ব্যবস্থাও হবে দুটি ধারায় বিন্যস্ত : ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে এবং একবিবাহ প্রথায়, তাতে ক্রমে পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারা লুপ্ত হবে।

প্লাতোর ন্যায়বিচারের প্রত্যয় নিছক আইন-আদালতের বিষয় ছিল না। নৈতিকতা ও কল্যাণকরতার প্রসারিত দৃষ্টিতে তিনি শব্দটি ব্যবহার করেন। বস্তুত পারস্পরিক আচরণে সর্বাত্মক কল্যাণকর মনোভাবের চিন্তা 'রিপাবলিক' গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

পুরসমাজের (civil society) মাধ্যমে কল্যাণকর জীবন গড়ে উঠবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

মানুষের জৈব প্রকৃতির সঙ্গে সমাজের জীবসদৃশ প্রকৃতির তুলনাসূত্রে প্লাতো মানুষের ত্রিবিধ প্রকৃতির (human nature) কথা উল্লেখ করেছেন : যুক্তি, সাহসিকতা ও ক্ষুধা। ওই তিনটির সঙ্গে সমাজের প্রকৃতিগত পূর্বোক্ত তিনটি শ্রেণী, যথাক্রমে শাসক, সৈন্যদল ও উৎপাদকদের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। দার্শনিক শাসকশ্রেণী যুক্তির প্রতিভূ, সামরিক শ্রেণী হল সাহসী, তারা দেশরক্ষা করে এবং ক্ষুধার উপকরণ তথা ভোগ্যসামগ্রীর জোগানদার কৃষক ও শ্রমিকেরা সোপানের সর্বনিম্ন ধাপে অবস্থান করে। কর্মগত বিশেষজ্ঞতার নীতি অনুযায়ী উল্লিখিত শ্রেণী তিনটি নিজ নিজ বৃত্তিতে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করে এবং অহস্তক্ষেপতার নীতি অনুযায়ী একশ্রেণী অপর শ্রেণীর কর্মে হস্তক্ষেপ করে না।

প্লাতোর শিক্ষাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ছিল চতুর্বিধ : (১) রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ও চালিত, (২) বাধ্যতামূলক, (৩) পুরুষ ও নারীর সমানাধিকার এবং (৪) একাধারে মানসিক ও শারীরিক শিক্ষা। শিক্ষাক্রমও ছিল প্রাথমিক ও উচ্চপর্যায়ে বিভক্ত।

শিক্ষার মতো প্লাতোর সাম্যবাদী (communist) প্রত্যয় ছিল তাঁর ন্যায়বিচার তথা আদর্শ রাষ্ট্রের পরিপূরক। তাঁর সাম্যবাদ ছিল কেবল অভিভাবক তথা শাসক ও সামরিক শ্রেণীদ্বয়ের জন্য নির্দিষ্ট। তিনি মনে করতেন যে পরিবার ও সম্পত্তি হল দুর্নীতির উৎস। তাই তিনি ওই দুটির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকারের অবলুপ্তি চেয়েছিলেন। তৃতীয় বর্গের উৎপাদকদের ক্ষেত্রে তিনি সাম্যবাদ প্রয়োগ করতে চাননি। বলা বাহুল্য অধুনা প্রবর্তিত সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের সঙ্গে তার কোনও সাদৃশ্য নেই।

'রিপাবলিক' গ্রন্থের আলোচিত বিষয়বস্তুর বেশিরভাগ হল নৈতিকতা ও শিক্ষা সংক্রান্ত। সেদিক থেকে তাঁর দ্বিতীয় প্রধান গ্রন্থ 'স্টেটসম্যান'-এ রাজনীতির আলোচনা বেশি স্থান পায়। পূর্বের মতো আদর্শের প্রতি অনুরাগী থাকলেও পরে তাঁর মনে আদর্শগত বাস্তবতা প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথমোক্ত গ্রন্থে প্লাতো-কল্পিত দার্শনিক রাজা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি আইন এবং আইনের শাসনের উপর গুরুত্ব দিয়ে দার্শনিক রাজা সমেত সবাইকে তদধীনে আনতে চেয়েছেন।

'স্টেটসম্যান' গ্রন্থে প্লাতো পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেন; বিশেষ করে গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর তিক্ত কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি শিথিল হয়। তিনি অতঃপর বলেন যে দেশের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ও উপযোগী সংবিধান রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংমিশ্রণেই রচিত হওয়া সঙ্গত। তাঁর মতে রাষ্ট্র হল দু' ধরনের : একটি আইনের দ্বারা চালিত, অপরটি যথেচ্ছ হুকুমে চলে। শাসক একজন, কয়েকজন কিংবা সর্বজন হতে পারে; আইনের শাসন ও যথেচ্ছ হুকুমের শাসনে সেগুলির চরিত্র হয় ভিন্ন।

আইনের শাসন সম্পর্কে প্লাতোর দৃঢ়প্রত্যয় তাঁর রাজনীতি বিষয়ক তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ 'লজ' (Laws) গ্রন্থে সুপরিস্ফুট হয়। তাঁর দার্শনিক রাজার বাস্তব রূপায়ণ সম্পর্কে মনে সংশয় জাগে; তাই তিনি আইনের পথ বেছে নেন, কারণ আইন হল যুক্তি, জ্ঞান তথা দর্শনের আধার। আইন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়কে নিয়ন্ত্রণ

প

করে ; জনজীবনে পারস্পরিক সম্পর্ক ও আর্থিক স্বার্থকে নিয়ন্ত্রণ করে। নাগরিকদের জীবনেও যেমন, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তেমনি, আইনের গুরুত্ব যে সর্বোচ্চ সে কথা প্লাতো উপলব্ধি করেন। 'লজ' গ্রন্থে যেমন বিভিন্ন বিষয় যথা আইন, রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থিতি, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবার, বিবাহ, শিক্ষা, উপাসনা ইত্যাদি বিষয়ে প্লাতোর সুস্পষ্ট মনোভাব ফুটে ওঠে, তেমনি সম্পত্তি ও পারিবারিক ব্যবস্থায় সাম্যবাদ ইত্যাদি অবাস্তব চিন্তা পরিত্যক্ত হয়।

ফ

ফরওয়ার্ড ব্লক (Forward Bloc)

সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে (১৯৩৮) সভাপতি হয়েছিলেন। পরবর্তী ত্রিপুরী অধিবেশনের (১৯৩৯) প্রাক্কালে তিনি যখন পুনর্নির্বাচিত হতে চান তখন গান্ধীজি তাতে বাদ সাধেন। বামপন্থীদের সমর্থনে তিনি নির্বাচনে গান্ধী ও দক্ষিণপন্থীদের প্রার্থী পট্টভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করেন। ত্রিপুরী অধিবেশনে গোবিন্দবল্লভ পন্থের উত্থাপিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এই মর্মে যে কংগ্রেস সভাপতিকে গান্ধীজির অনুমোদন সাপেক্ষ ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে। সে বিষয়ে প্রচণ্ড মতদ্বৈধ ও বিরোধের সূত্রপাত হয়, যার ফলে সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদে ইস্তফা দেন। দীর্ঘকাল ধরে সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন বামপন্থী গোষ্ঠীকে নিয়ে একটি মোর্চা গঠনের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ঐকমত্যের অভাবে সে-চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি এককভাবে ১৯৩৯ খ্রি ৩ মে তারিখে কংগ্রেসের ভিতরেই তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। তাতে অন্য কোনও বামপন্থী দলের সদস্য যোগ দেননি। অবশ্য বিভিন্ন বামগোষ্ঠীর মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে Left Consolidation Committee নামে একটি মোর্চা গঠিত হয়। সর্বসম্মত কর্মসূচির ভিত্তিতে সেটি গঠিত ও অল্প কিছুকাল চলার পর তাতে ভাঙন ধরে। ৯ জুলাই ১৯৩৯ তারিখটিকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস হিসাবে পালন এবং সে কারণে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের সদস্যপদ থেকে তিন বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনের (মার্চ ১৯৪০) সময় সুভাষচন্দ্র সেখানে একটি পালটা আপসবিরোধী সম্মেলন করেন। জুন মাসে নাগপুরে আয়োজিত এক সম্মেলনের পর ফরওয়ার্ড ব্লক একটি স্বাধীন দল হিসাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। দলটি তাঁর নেতৃত্বে ভালভাবে দানা বেঁধে ওঠার আগেই ১৯৪১ খ্রি ১৭ জানুয়ারি তিনি ভারত ত্যাগ করেন।

অগস্ট আন্দোলনের সময় ফরওয়ার্ড ব্লক বেআইনি ঘোষিত হয়। স্বাধীনতার

প্রাক্কালে দলে মার্কসবাদী ও সুভাষবাদী নামে দুটি মতাদর্শ দেখা দেয় যার ভিত্তিতে ১৯৪৮ খ্রি শেষদিকে দল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৫৩ খ্রি রুইকর ও লীলা রায়ের নেতৃত্বে সুভাষবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক প্রজা সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে মিশে যায়। অন্য দিকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে একত্র চলার প্রশ্নে মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকও দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে (১৯৫৪)। কমিউনিস্টদের সঙ্গে চলার বিরোধী দলের বৃহদংশেও শীঘ্র ভাঙন ধরে ; তাঁদের নেতৃবর্গের অন্যতম মোহন সিং ও শীলভদ্র যাজি ছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষপাতী। অন্য দিকে হেমন্ত বসু ও আর কে হালদুলকরের নেতৃত্বে দলের অন্য অংশ মনে করত কংগ্রেস পুঁজিপতিদের দল। ১৯৫৪ খ্রি ২৭-২৮ ডিসেম্বর তাঁরা এক সম্মেলনে যাজি গোষ্ঠীকে বহিষ্কৃত করেন এবং নিজেদের প্রকৃত ফরওয়ার্ড ব্লক হিসাবে দাবি জানান। যাজি গোষ্ঠী পরে কংগ্রেসে যোগ দেয়। ১৯৯৪ খ্রি উত্তরবঙ্গে কমল গুহর নেতৃত্বে সমাজবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক নামে দলের একাংশ পৃথক হয়ে যায়।

ফেবিয়ান সোসাইটি (Fabian Society)

ব্রিটেনের একটি সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল বিপ্লব ও বিদ্রোহের উচ্ছ্বাসে উত্তাল। বিভিন্ন দেশে সামন্ততন্ত্রী শাসকশ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে রক্তঝরা বিপ্লব দেখা দেয়। ১৮৪৮ খ্রি মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন। ইউরোপ মহাদেশের মূল ভূখণ্ডে সমাজতন্ত্রী চিন্তাভাবনা মার্কসীয় আদর্শের ব্যঞ্জনায় তখন দ্রুত প্রসারমান। কিন্তু সে সময়ে ইংল্যান্ডের চিত্র ছিল ভিন্ন। সেখানে মার্কসীয় মতাদর্শ ভূমিষ্ঠ হলেও শিকড় গাড়তে পারেনি। সেখানে ধীর গতিতে ও অহিংসপথে **সনদী আন্দোলন,** রাজনীতি ও শিল্পোন্নয়নের বিবর্তন ঘটে। মিল, রাস্কিন, কালাইল প্রমুখ সমকালীন মননশীল ব্যক্তির উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, রবার্ট ওয়েনের অহিংস সমাজতন্ত্রী আন্দোলন, ক্রিশ্চান সোসালিস্টদের কর্মপদ্ধতি, সমবায় ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, জন ওয়েসলির এভাঞ্জেলিক মিশনারি উদ্যম ইত্যাদির সংমিশ্রণে ইংরেজদের মনে রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার রূপান্তরের চিন্তা অহিংস ও ধীরে চল নীতি অনুসরণ করে। তার আগে সেখানে পার্লামেন্টে গৃহীত আইনের সাহায্যে শ্রমিকদের ভোটাধিকার প্রদান, কলকারখানায় কঠোর নিয়মকানুনের শিথিলতা ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার মেনে নেবার ফলে জনবিক্ষোভ প্রশমিত হয়।

উল্লিখিত পটভূমিকায় ১৮৮৪ খ্রি জানুয়ারি মাসে লন্ডনে ফেবিয়ান সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়, এই বিশ্বাসে যে সামাজিক পরিবর্তন ক্রমান্বয়িক (gradual) সংসদীয় পথে সাধিত হতে পারে। সোসাইটির নামকরণ হয়েছিল রোমান সেনাধ্যক্ষ কুইনটাস ফেবিয়াস ম্যাক্সিমাস এর নাম থেকে, যিনি দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে হ্যানিবালের আক্রমণ থেকে রোমকে রক্ষা করতে সমর্থ হন, তাঁর বিলম্বিত পদক্ষেপের নীতি এবং সম্মুখ সমর এড়িয়ে যাবার কৌশলের দরুন ; অর্থাৎ বিপ্লবের পথ পরিহার। ফেবিয়ান সোসাইটির আন্দোলনে অনেক খ্যাতনামা মননশীল ব্যক্তি, যেমন সিডনি ও তাঁর স্ত্রী বিয়েট্রিস ওয়েব, এইচ. জি. ওয়েলস, জর্জ বার্নার্ড শ, গ্রাহাম ওয়ালাস প্রমুখ যুক্ত হন। কার্যত সোসাইটি একটি **বিদ্বৎ** সংস্থা ছিল। তার প্রধান কাজ ছিল সমাজ সংস্কার

সংক্রান্ত পরামর্শ ও তথ্য জোগানো এবং ক্রমান্বয়িক ধীর গতিতে ও সংসদীয় পথে সমাজতন্ত্রের দিকে এগোনোকে সমর্থন করা।

ফেবিয়ানরা মার্কসীয় পথ থেকে স্বতন্ত্র বিবর্তনমূলক এবং গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের দর্শন ছিল ভাববাদী, বস্তুবাদী নয়। তাঁরা পুঁজিবাদ যেমন চাইতেন না, অন্য দিকে আবার মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামের পথ পরিহার করেন। শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রাধিকার বিষয়ক মার্কসীয় প্রত্যয়ও তাঁরা মানতেন না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাঁরা রিকার্ডো ও বেনথামের উদারনৈতিক আদর্শ অনুসরণ করতেন। তাঁদের দৃষ্টিতে পুঁজিবাদের অবসান অনিবার্য, আধুনিক শিল্পোন্নয়নের স্বাভাবিক পরিণাম হল **সমাজতন্ত্র**। জনপ্রিয় সরকার গঠিত হলে জনসাধারণ অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবে। ফেবিয়ানরা বিশ্বাস করতেন যে সমাজ পরিবর্তনশীল বটে, তবে সামাজিক পরিবর্তন সহিংস পথে ত্বরান্বিত করা যায় না, পরিবর্তনের সঠিক পথ হওয়া চাই অহিংস, ধীর গতিসম্পন্ন, শান্তিপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক। ফেবিয়ানরা একথাও মনে করতেন যে মানুষ যুক্তিশীল। সর্বজনের স্বার্থে অন্যান্য কল্যাণকর আইন যেমন সবাই মেনে নিয়েছে, তেমনি ভূমি ও শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণও মেনে নেবে। সর্বশ্রেণীর শিক্ষিত ও সচেতন মানুষের যৌথ উদ্যম ও সমবায়ী প্রচেষ্টার পরিবর্তন ঘটাই কাম্য। ফেবিয়ান ইতিহাসের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় তাঁরা অনেক গবেষণামূলক কাজ করেছেন। ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি, লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৯০০) ও ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় আন্দোলনে তাঁদের বিশেষ প্রভাব ছিল। ১৯১৮ খ্রি লেবার পার্টি ফেবিয়ান কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। পরে সোসাইটি ওই পার্টির প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যে পরিণত হয়। ব্রিটেনের আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসে সোসাইটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ফ্যাসিবাদ (Fascism)

ইতালিতে ১৯১৯ খ্রি থেকে ১৯৪৫ খ্রি অবধি বেনিতো মুসসোলিনি fascismo নামে যে মতাদর্শ ও আন্দোলনের সূত্রপাত ও প্রচলন করেন তার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল ফ্যাসিজম (fascism)। এই মতাদর্শ হল জাতীয়তাবাদী, স্বৈরতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী। প্রাচীন রোমে ম্যাজিস্ট্রেটের আধিকারিক একটি কুঠার মাঝখানে রেখে একগুচ্ছ লোহার রড (fascies) সমেত যে রাষ্ট্রীয় প্রতীক বহন করতেন সেটাই ছিল ফ্যাসিবাদের প্রতীকচিহ্ন। এই আন্দোলন নিজেদের না ধনতান্ত্রিক, না সমাজতান্ত্রিক বলে দাবি করত এবং একটি রাষ্ট্র হিসাবে নিজেদের ব্যবস্থা সুপারিশ করত। মুসসোলিনি নিজেই লিখেছেন যে 'ফ্যাসিবাদ হল একাধারে কর্ম ও চিন্তা'। বস্তুত সেটা ছিল পরস্পরবিরোধী দুটি মনোভাব—তত্ত্ববিমুখ কর্মবাদিতা ও হেগেলীয় অধিবিদ্যার সমন্বয়। কর্মবাদের উৎস ছিল উনিশ শতকের **সিন্ডিক্যালিস্ট** বিশেষ করে মুসসোলিনির গুরু ঝর্ঝ সর্ল-এর মতাদর্শ। সর্ল-এর ছিল হিংসাশ্রয়ী মনোভঙ্গি, যাতে ভাঙনের মাধ্যমে গঠনের পথে এগোনোর কথা বলা হয়।

ইতালির যুব সম্প্রদায়ের অজ্ঞানতা ও আক্রমণাত্মক প্রবণতাকে ফ্যাসিবাদ ইন্ধন জোগাত। হেগেলীয় চিন্তায় প্রভাবিত দার্শনিকেরা, যেমন জোভান্নি জেনতিলে **ফ্যাসিবাদী** দর্শনকে পরিপুষ্ট করেন। জেনতিল-এর লেখা খসড়া অনুসরণ করে

মুসোলিনি ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রত্যয় ব্যাখ্যা করে রাষ্ট্রের নিঃস্বার্থ ভূমিকার কথা লিখেছেন, সেটা উদার ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরোধী। ফ্যাসিবাদ সমাজতন্ত্রেরও বিরোধী, কারণ তাতে শ্রেণীসংঘর্ষের আদর্শ নিহিত। পরিবর্তে ফ্যাসিবাদ সমগ্র সমাজকে একজাতি, একস্বার্থ ও এক প্রাণের সত্তায় বাঁধতে চায়। ফ্যাসিবাদ জঙ্গি ক্রিয়াকলাপ ও যুদ্ধকেও আবাহন করে, কারণ তাতে জাতীয় আবেগ তীব্র হয়, এবং সমগ্রের স্বার্থে আত্মাহুতির প্রবণতা উৎসাহিত হয়। এক কথায় রাষ্ট্রকে উচ্চ করার অর্থ সরকারকে উঁচুতে তুলে ধরা, যে সরকার একনায়ক স্বয়ং মুসোলিনির ব্যক্তিগত প্রশাসনে অঙ্গীভূত। কার্যত হেগেলীয় 'নিঃস্বার্থ আদর্শবাদ' একজন ডিক্টেটরের স্থূলতায় পর্যবসিত।

১৯২২ খ্রি মুসোলিনির ক্ষমতায় আসার পর, তাঁর ফ্যাসিস্ট পার্টি ইতালিতে একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি পায় ; তার সদস্যরা কালো সার্ট পরিধান করত এবং হাত প্রসারিত করে তারা পরস্পরকে অভিবাদন জানাত এবং মুসোলিনির জয়ধ্বনি দিত।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল (Frankfurt School)

সমাজবিদ্যার অনুশীলন ও চর্চার উদ্দেশ্যে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন খ্যাতনামা দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিককে নিয়ে ইনস্টিটিউট অব সোসাল রিসার্চ নামে একটি সংস্থা গঠিত হয় (১৯২৩)। নাৎসিদের দাপটে সংস্থাটি নিউ ইয়র্কে চলে যায় (১৯৩৩) এবং পঞ্চাশের দশকে সেটি ফ্রাঙ্কফুর্টে ফিরে আসে। সংস্থাটির পশ্চাৎপট হল প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপে বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের পরাজয়, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির মস্কোর সপক্ষে ও বিপক্ষে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়া, রুশ বিপ্লবের স্তালিনবাদে পরিণতি এবং ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের উত্থান। উল্লিখিত ঘটনাসমূহ মার্কসবাদে উদ্দীপিত মানুষের মনে সেই মতাদর্শের মৌল নানা তত্ত্ব সম্পর্কে সংশয়ের সূচনা করে। কার্যত ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল হল বলশেভিক মতবাদ-বিরোধী মুক্ত সমালোচনামূলক মার্কসবাদী চিন্তা ও গবেষণাকেন্দ্র। এই সংস্থা একাধারে পুঁজিবাদ ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিরোধী। এর সদস্যরা সামাজিক বিকাশের একটি বিকল্প পথের সন্ধানী ; এঁদের সঙ্গে ষাট ও সত্তর দশকের ইউরোপীয় নববাম গোষ্ঠীর, মার্কসীয় তত্ত্ব ও প্রয়োগে আমলাতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের প্রশ্নে সাযুজ্য আছে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল কোনও সুসংবদ্ধ মতাদর্শের সংস্থা নয়। এর পিছনে মোটামুটি দুটি বিদ্বৎ-গোষ্ঠী বর্তমান। প্রথমটি উল্লিখিত সংস্থাকে কেন্দ্র করে চলে ; তার প্রধান সদস্যদের মধ্যে দেখা যায় দার্শনিক ম্যাক্স হরখিমার, অর্থনীতিবিদ ফ্রিডেরিখ পোলক, সমাজতাত্ত্বিক থিওডোর অ্যাডোর্নো, মনস্তত্ত্ববিদ এরিখ ফ্রোম, দার্শনিক হার্বার্ট মারকিউস, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফ্রাঁজ নিউম্যান প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা, যাঁদের চিন্তায় কিছুটা ঐকমত্য পাওয়া যায়। ইনস্টিটিউটের সদস্যপদ বিশেষ কোনও চিন্তাধারার পরিচায়ক নয়। দ্বিতীয় বিদ্বৎ-গোষ্ঠীর প্রধান প্রবক্তা হলেন জুরগেন হ্যাবারমাস ; এই গোষ্ঠীর 'ক্রিটিক্যাল থিওরি' মার্কসের ইতিহাসতত্ত্ব এবং অর্থনীতিতত্ত্ব অপেক্ষা তাঁর মানুষের চেতনার বিষয়ে তত্ত্বের উপর একমাত্র আস্থাশীল। এঁরা মার্কসের মতবাদে হেগেল প্রভাবিত প্রাথমিক জীবনের চিন্তাভাবনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন।

ফ

ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে হরখিমারের অধ্যক্ষতায় চালিত উল্লিখিত ইনস্টিটিউট সমাজবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন ব্যক্তি, পরিবার, আমলাতন্ত্র, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কিত গবেষণা ও বিশ্লেষণের কাজ চালায়। ফ্রাঙ্কফুর্ট কেন্দ্রের ভাবনা হিসাবে যে সব প্রত্যয় পরিচিতি লাভ করে সেগুলি নিত্য ব্যবহৃত মার্কসীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে সূচিত হয়, কিন্তু উপসংহারে চিরাচরিত মার্কসীয় সিদ্ধান্ত থেকে সরে যায়।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের আলোচনা-পরিধিতে সমসাময়িক সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি, স্বৈরতন্ত্রের ধরন ইত্যাদির অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য হল যথার্থ স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করা; অবশ্য সকল বিষয়ে ইনস্টিটিউটের সদস্যদের মধ্যে ঐকমত্য পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁদের নানা ধরনের অনুশীলন প্রয়াসের অন্যতম বিষয় ছিল যে কেন মার্কসের চিন্তা অনুযায়ী বিপ্লব পশ্চিমে ঘটল না। সমাজ বীক্ষণে এঁরা মার্কসীয় বস্তুবাদী ইতিহাসতত্ত্ব অপেক্ষা চেতনা তথা সাংস্কৃতিক কার্যকারণ সম্পর্কের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সংস্থার সদস্যরা এক একটি বিষয়ে দিকপাল এবং বিভিন্ন মৌলিক তত্ত্বের উদ্ভাবক। মার্কসীয় ভাবনায় অণুপ্রাণিত, কিন্তু স্বতন্ত্র বিচারে শিল্পকলার একটি তত্ত্ব স্থাপন এঁদের একটি উল্লেখ্যযোগ্য অবদান।

ব

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) (Chatterjee, Bankimchandra)

বাংলা সাহিত্যের অগ্রগণ্য ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক। সিভিল সার্ভিসের কর্মজীবনে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানকালে সাহিত্যকর্ম, দর্শনচর্চা এবং পত্রপত্রিকার সম্পাদনা করতেন। রাজনীতিকে তিনি ধর্মের একটি অঙ্গরূপে দেখেছিলেন। তাঁর মতে পশ্চিমি জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন চিন্তাধারার সংমিশ্রণ হওয়া প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে তিনি কঁৎ-এর দৃষ্টবাদ ও মিলের হিতবাদের আলোকে পরিমার্জনার প্রয়াসী হন। স্বদেশপ্রেমকে গুরুত্বদানের সঙ্গে নিজের রাষ্ট্রদর্শনকে তিনি নীতিশাস্ত্রের উপর স্থাপন করেন। তাঁর চিন্তায় কল্যাণকর রাষ্ট্রের বনিয়াদ হল মানুষের শুভ প্রবণতা। তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বে রাজা কোনও ব্যক্তিবিশেষ নন, রাজশক্তির প্রতিভূ, রাজা স্বদেশীয় না হলেও চলে। তাঁর দৃষ্টিতে রাজা বা রাষ্ট্রশাসন শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য চাই। সেটা অনেকটা বাইরের ব্যাপার। ভিতরের বিধিব্যবস্থা স্বতন্ত্র, অর্থাৎ সেটা সামাজিক, রাষ্ট্রিক নয়। প্রকৃত সামাজিক শাসনেই পূর্ণাঙ্গ মানবসত্তার বিকাশ সম্ভব। তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতায় আস্থাবান ছিলেন। সহজাত গুণাগুণে তারতম্য থাকলেও তাঁর মতে সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে সাম্য থাকা চাই। তিনি চাইতেন যাবতীয় বাধাবিপত্তি থেকে সকলের মুক্তির পথ হোক যথার্থ মুক্ত। সাংস্কৃতিক বনিয়াদ শক্ত না হলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় উন্নয়নপ্রয়াস নিষ্ফল হবে বলে তিনি মনে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তি ও সাম্যের বাণী জনচিত্তে প্রতিফলিত হয়নি। কিন্তু তাঁর দেশাত্মবোধের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দেশমাতৃকার মন্ত্রমুগ্ধ কল্পনা জনমনে স্থায়ী আসন লাভ করে। উত্তরকালে সেটা আবেগসর্বস্ব, উচ্ছ্বাসপ্রবণ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের রূপ নেয়।

দ্র. বন্দে মাতরম

বদ্যাঁ, জাঁ (১৫৩০-১৫৯৬) (Bodin, Jean)

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মীয় সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধে ফ্রান্সের জনজীবন যখন বিদীর্ণ এবং নবোদ্ভূত বুর্জোয়া সমাজের সামনে নানাবিধ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত সেই সময়ে লে-পলিতিক নামে একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে যার রাষ্ট্র-দার্শনিক সদস্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিন্তক ছিলেন জাঁ বদ্যাঁ। পেশায় আইনজীবী বদ্যাঁ রাজদরবারে গুরুত্বপূর্ণ নানা কর্মসূত্রে বাস্তব রাজনীতির অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। অর্থনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তার উপর তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাবলির মধ্যে 'দে রিপাবলিকা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাষ্ট্রদর্শনে বদ্যাঁর প্রধান অবদান হল আধুনিক দৃষ্টিতে **সার্বভৌমত্ব** তত্ত্বের বিশ্লেষণ। তাঁর মতে সার্বভৌমত্ব হল রাষ্ট্রের পরম ও শাশ্বত একটি ক্ষমতা যেটা আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। সরকার পরিবর্তিত হলেও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। রাষ্ট্র ও সরকার অভিন্ন নয়। তিনি চেয়েছিলেন বিকাশমান জাতি-রাষ্ট্রকে চার্চের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখতে। ধর্মীয় বিরোধে ফ্রান্সের জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দেশের পুনরুজ্জীবনের উপযোগী ধর্মনিরপেক্ষতা এবং শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন বদ্যাঁ।

তাঁর দৃষ্টিতে রাজশক্তিই হল সার্বভৌমত্বের আধার। আইন প্রণয়নের পরম ক্ষমতা হল সার্বভৌমত্ব। সে-ক্ষমতা অসীম ও অনিয়ন্ত্রিত। দিব্য আইন, **প্রাকৃত আইন** ও **আন্তর্জাতিক আইনের** সঙ্গে সার্বভৌমের সামঞ্জস্য থাকে। তাঁর সার্বভৌম রাজতন্ত্রের প্রত্যয় স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের সমার্থক নয়। সার্বভৌমের উপর তিনি কয়েকটি বাধানিষেধ আরোপ করেন। তিনি অস্বীকার করেননি যে সার্বভৌমত্ব কিছুসংখ্যক ব্যক্তির অভিজাততন্ত্র বা অনেকের হাতে গণতন্ত্রের আকারে থাকতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করা যায় না, সরকারের ক্ষেত্রেই সেটা সম্ভব। সব রাষ্ট্রই শ্রেণীবিভাগের ঊর্ধ্বে। অবশ্য রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে রাষ্ট্রের প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে পারে।

বদ্যাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় **আইনশাস্ত্র** ও **সার্বভৌমত্ব** তত্ত্বের প্রাধান্য থাকলেও প্রশাসন, অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা, রাষ্ট্রবিপ্লবের বিভিন্ন প্রকৃতি, দার্শনিক ও আইনগত বহুবিধ মৌলিক ভাবনা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে।

বনাপার্তীয় মতাদর্শ (Bonapartism)

ওয়াটারলু যুদ্ধে পরাজয়ের পর সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত সম্রাট নাপোলেয়ঁ বনাপার্ত-কে কেন্দ্র করে তাঁর অনুগামীরা একটি মতবাদ গড়ে তোলেন। অতীত জীবন নিয়ে তাঁর চিন্তা ও ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনার সঙ্গে তাঁর কারাজীবন ও মৃত্যুর সংমিশ্রণে একটা কিংবদন্তি গড়ে ওঠে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নাপোলেঁয় সেগুলিকে নাপোলেঁয়নীয় চিন্তা নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন (১৮৩৯), যেটি একটি রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তার অভিঘাতে লুই নাপোলেঁয় বিপুল ভোটে ক্ষমতাসীন হন (১৮৪৮)।

বনাপার্তীয় রাজনীতির মুখ্য বিষয় ছিল (১) বিপ্লবোত্তর কালে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা ; (২) কেন্দ্রীভূত প্রশাসন, যার পিছনে থাকবে **কর্মকুশল** প্রশাসকেরা ;

(৩) সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সম্রাট কর্তৃক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মানিত করার প্রথা ; (৪) সেজন্য রাজকীয় রাষ্ট্রের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান ; (৫) আত্মরক্ষার পরিবর্তে সারা বিশ্বে প্রভাব বিস্তারের উপযোগী আগ্রাসী পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ ; (৬) সম্রাটের প্রতিভূস্বরূপ একজন অধিনায়কের উপর রাষ্ট্রের সর্ববিধ ক্ষমতার অধিষ্ঠান।

ফ্রান্সের বর্তমান রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার উৎস হিসেবে অনেকাংশেই বনাপার্তীয় রাজনীতি দেখা যায়। প্রত্যয়টি প্রায়শই নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয়। হিটলার ও স্তালিনের কর্তৃত্ববাদী স্বৈরাচারকে ত্রৎস্কি এই অভিধায় সমালোচনা করেন।

বন্দি প্রদর্শন (Habeas Corpus)

লাতিন ভাষা থেকে আগত। অর্থ হল কারারুদ্ধ বা ধৃত ব্যক্তিকে সশরীরে হাজির করা। বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা আইনসঙ্গত হয়েছে কি না সেটা আদালতে পূর্ণ তদন্তের এবং মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সশরীরে হাজির করার আদেশপত্র। ম্যাগনা কার্টা (১২১৫) স্বাক্ষরিত হবার পর থেকে বন্দি প্রদর্শন রীতি নামেমাত্র ছিল, এবং সেটা লঙ্ঘিত হত বেশি। ইংল্যান্ডে বন্দি প্রদর্শন আইন ১৮৭৯ খ্রি বিধিবদ্ধ হয়। আগে ছিল আদালতে হাজির করা, এখনকার আইনে হয়েছে কারাবাস থেকে মুক্তির আদেশজারি। ইংল্যান্ডের রাজা, আমলাবর্গ এবং মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আদেশপত্রের সাহায্যে আদালতের বিচারপতিকে বিনা বিচারে আটক সম্পর্কে তদন্ত করার ক্ষমতাসম্পন্ন করা হয়েছে।

এই আইন ক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবর্তিত হয়, যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের সময় এই আইন স্থগিত (suspend) রাখা হয়েছিল বলে। আব্রাহাম লিঙ্কন চিন্তাগ্রস্ত হন, এবং তখন সেখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে আইনটি না থাকলে নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা সংবিধানে কীভাবে রক্ষিত হবে। তা ছাড়া রাজ্যের পরিবর্তে ফেডার‍্যাল আদালতে বিষয়টি উত্থাপনের প্রবণতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিন্ন এক জটিলতা সৃষ্টি করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এরূপ কোনও আইন ছিল না।

বন্দে মাতরম (Bande Mataram)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত একটি সংগীত। উপন্যাসটি রচিত হওয়ার পূর্বেই সংগীতটি লিখিত ও উপন্যাস প্রকাশের মাস দশেক পূর্বে সাবিত্রী লাইব্রেরির এক সভায় পঠিত হয়েছিল। সংগীতটি থেকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা দেশকে মাতৃরূপে দেখার প্রেরণা লাভ করেন। সংগীতের প্রথম চরণ 'বন্দে মাতরম' জাতীয় আন্দোলনে একটি প্রেরণাদায়ক ধ্বনি হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং সংগীতটি জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পায়। ১৮৯৬ খ্রি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে **রবীন্দ্রনাথ** স্বয়ং-যোজিত সুরে সেটি গেয়ে শোনান। স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম যুগে মদনলাল ধিংড়া এবং পরবর্তীকালে অনেক শহিদের কণ্ঠে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণকালে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। উল্লেখ্য, ধর্মীয় কারণে সংগীতটি সম্পর্কে বিরোধিতা দেখা দেয় এবং বামপন্থী আন্দোলনে বিকল্প হিসাবে কুড়ির দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে **'ইনকিলাব**

জিন্দাবাদ' ধ্বনি প্রচলন লাভ করে। বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে 'বন্দেমাতরম্' নামে পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

বয়কট (Boycott)

১৮৮০ খ্রি আয়ার্ল্যান্ডের এক ভূস্বামীর খাজনা আদায়কারী ক্যাপটেন বয়কট নামক জনৈক ব্যক্তিকে আইরিশ লিগ কর্তৃক সর্বতোভাবে বর্জন ও একঘরে করার ঘটনা থেকে প্রত্যয়টির সূত্রপাত ঘটে, যার অর্থ হল সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি যে কোনও ব্যাপারে অনমনীয় কোনও ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারকে তার অনুসৃত আচরণ ও কর্মপন্থা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য চাপ সৃষ্টির এক পদ্ধতিবিশেষ। ভারতীয় সমাজে ধোপা-নাপিত বন্ধের রীতি এক ধরনের বয়কট। কোনও ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানকে বয়কট করার পিছনে ন্যায্য কারণ থাকতে পারে, কিন্তু অনেক সময়ে অযথা ষড়যন্ত্র করে কারও বিরুদ্ধে বয়কটের পদ্ধতি প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও অবরোধ (embargo) এবং শাস্তি (sanction) ব্যবস্থা হিসাবে কোনও দেশের বিরুদ্ধে অবরোধ ব্যবস্থা বয়কটের রকমফের মাত্র। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোনও দেশের বৈদেশিক নীতি গ্রহণীয় না হলে সেদেশের রাজনীতিকদের বয়কট করার প্রচলন আছে। যুক্তরাষ্ট্রে কোনও কোনও অঙ্গরাজ্যে বিশেষ কিছু ধরনের বয়কট রীতি আইনবিরুদ্ধ। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিদেশি পণ্য বয়কট করার কর্মসূচি গৃহীত হয়।

বর্ণবৈষম্য (Apartheid)

দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকার-অনুসৃত 'স্বতন্ত্র-উন্নয়ন' পন্থা। শ্বেতপ্রাধান্য নীতি (baaskap) এবং জাতিগত শুচিতার ভিত্তিতে রচিত এই পন্থা অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীরা শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে বিভক্ত। ১৯৪৮ খ্রি থেকে ন্যাশনাল পার্টির আধিপত্যে এই নীতি বিধিবদ্ধ হয়। তাতে আইনের সাহায্যে বাসস্থান, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিনোদনকেন্দ্রের পৃথকীকরণ ব্যতীত মিশ্র বিবাহ নিষিদ্ধ ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মূল উদ্দেশ্য হল শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখা এবং বাকি অন্যান্য অধিবাসীদের সাধারণ নির্বাচনে যোগদান সমেত রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। কৃষ্ণাঙ্গদের বসবাস কিছু নির্দিষ্ট ও আদি অঞ্চলে আবদ্ধ রেখে সেখানে তাদের স্বায়ত্তশাসিত বাসভূমি দেওয়া হয়েছে। বাকি অন্যান্য স্থানে শ্বেতাঙ্গরা একচ্ছত্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী। সরকারি নীতি হল কৃষ্ণাঙ্গদের কয়েকটি অঞ্চলে পৃথক করে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা। কিন্তু পৃথকীকরণ সর্বতোভাবে কার্যকর নয়। কারণ পারমিট নিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণের ফলে তাদের পারিবারিক অসুবিধা ঘটে, শ্বেতাঙ্গদের কলকারখানা ও খনিতে শস্তা মজুরিতে কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক নিয়োগ ব্যাহত হয়। নানা জটিলতার দরুন প্রায়শই দাঙ্গাহাঙ্গামা ও প্রাণহানি হয়। কমনওয়েলথ দেশগুলির প্রধানমন্ত্রীরা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের নিন্দা করেছেন।

বর্ণব্যবস্থা (Caste)

ইংরেজি Caste শব্দটি পোর্তুগিজ Casta শব্দ থেকে উৎপন্ন ; দ্বিতীয়টি এসেছে লাতিন Castus শব্দ থেকে, যার অর্থ হল নির্মল, শুদ্ধ বা পবিত্র। কথাটি হিন্দু সমাজ-গঠনের প্রচলিত ধারা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই ধারা থেকে দুই সহস্র খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খ্রি অবধি কালপর্বে গড়ে ওঠে। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি বিশেষ গুণসম্পন্ন এবং বিভিন্ন কর্মবিশিষ্ট বর্ণের সমাবেশের দ্বারা সমগ্র সমাজদেহ গঠিত হয়। যে জাতি বা কুলের (lineage) সমষ্টি একটি বৃত্তি অবলম্বন করত, ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের নিয়ন্তাগণ সেই বৃত্তিতে সেই কুলের বংশানুক্রমিক অধিকার ধার্য করে দিতেন। "ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে কতকগুলি গুণকে উত্তম কতকগুলিকে অধম বলিয়া বিবেচনা করা হত...শুদ্ধি এবং অশুদ্ধির মানদণ্ড অনুসারে সমাজের বিভিন্ন জাতির পদ নির্ণয় করা হত। হেয় জাতির মধ্যে কাহাকেও স্পর্শের অযোগ্য, কাহাকেও বা দর্শনের পর্যন্ত অযোগ্য মনে করা হত" (নির্মলকুমার বসু)।

বর্ণব্যবস্থা প্রকারান্তরে প্রাচীন গ্রিস, চীন ও ভারতীয় মুসলমান সমাজেও দেখা যায়। হিন্দু অসবর্ণ লোকের মধ্যে খানাপিনা ও বিবাহাদি এখনও অধিকাংশ অঞ্চলে অচল। আইন দ্বারা ওই ব্যবস্থার পরিবর্তন সর্বাংশে সফল হয়নি। বর্ণ-অনুযায়ী সামাজিক বর্গ ও শ্রেণীকাঠামোর অনড়তা এবং বংশানুক্রমিক কর্ম-বিভাজন গ্রামীণ হিন্দুসমাজে এখনও প্রবল। সামাজিক বর্ণবিন্যাসের সঙ্গে নির্দিষ্ট কর্ম-বিভাজন ও অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিভাগ সুদীর্ঘকাল যাবৎ প্রবহমান। সমাজের অতি গভীরে বিস্তৃত মূলসহ বর্ণব্যবস্থার বিশাল মহীরুহের তিন-সহস্রাধিক শাখাপ্রশাখার জটিল সমস্যার সমাধান দেশের আর্থ-রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে দুরূহ।

বর্ণব্যবস্থা সম্বন্ধে সরাসরি কোনও মন্তব্য না করলেও ভারত সম্পর্কিত নিবন্ধাদিতে মার্কস সাধারণভাবে আশা প্রকাশ করেছিলেন যে ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে রেলপথ গড়ে উঠলে দেখা দেবে শিল্পোন্নয়ন, এবং তার ফলে বংশানুক্রমিক শ্রমবিভাজন—যার উপর প্রগতির অন্তরায় বর্ণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত—ক্রমশ লুপ্ত হবে। কিন্তু তাঁর সে আশা পূরণ হয়নি। কারণ সামন্ততন্ত্রী সমাজব্যবস্থা বজায় রেখেই ভারতে বুর্জোয়াশ্রেণী গড়ে উঠেছে এবং জাতপাতের বিভেদ অর্থনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করেনি।

বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে একদিকে যেমন নানা মুনির নানা মত, অন্যদিকে তেমনি সেটা প্রবল বর্ণবিভেদে পরিণত হয়ে ইংরেজ আমল থেকেই বিষময় রাজনীতির এক মস্ত উপাদান হয়ে উঠেছে। স্বাধীন ভারতে বাহ্যিক গণতন্ত্রী নির্বাচনে এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্যের প্রশ্ন এখন দেশব্যাপী তিক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রে জ্যোতিবা ফুলে, দক্ষিণ ভারতে পেরিয়ার ই ভি রামস্বামী ছাড়াও সারা দেশে গান্ধীজি ও বি আর অম্বেডকর নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে গেছেন।

বলশেভিকবাদ (Bolshevism)

শব্দটি অনেকসময় লেনিনবাদের সঙ্গে সমার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ; বস্তুত এটি মার্কসীয় সমাজতন্ত্রী বিপ্লবকে বোঝায় ; পক্ষান্তরে লেনিনবাদ হল সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের তত্ত্বগত (তত্ত্ব ও প্রয়োগ) বিশ্লেষণ। বলশেভিকবাদের প্রবর্তক ছিলেন লেনিন। কার্যত বৈপ্লবিক পরিবর্তনে এটিকে একটি পদ্ধতি হিসাবে নিয়েছেন কোনও কোনও মার্কসীয় নেতা (স্তালিন, ত্রৎস্কি, মাও জে দং)। লন্ডনে অনুষ্ঠিত রাশিয়ান সোসাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯০৩) বলশেভিকবাদের জন্ম হয়। সেই থেকে লেনিন এই মতবাদকে একটি "রাজনৈতিক চিন্তার ধারা এবং একটি রাজনৈতিক দল" হিসাবেও দেখতেন। ওই কংগ্রেসের আলোচনায় পার্টির নিয়মাবলির প্রথম ধারায় পার্টির সদস্যপদ গ্রহণের বিষয়ে লেনিন ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে মার্টভের বিতর্কে ভোটাভুটি হয়। লেনিন চেয়েছিলেন যাঁরা সক্রিয় এবং রাজনৈতিক মতাদর্শে পার্টির প্রতি অনুগত তাঁদেরই কেবল সদস্যপদ দেওয়া হোক ; সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টির অন্যান্য নিষ্ক্রিয় সদস্যদের মতো কেবল ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতে সদস্যপদ প্রদান অর্থহীন। এই মতপার্থক্য থেকে সদ্যোজাত আর এস ডি এল পি দল বলশেভিক অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মেনশেভিক অর্থাৎ সংখ্যালঘিষ্ঠ এই দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায়। পার্টির সপ্তম সম্মেলনের (এপ্রিল, ১৯১৭) পর থেকে বলশেভিক শব্দটি সরকারিভাবে পার্টির নামের শেষে বন্ধনীতে যুক্ত হয়। ১৯১৮ খ্রি মার্চ থেকে পার্টির পরিবর্তিত নাম হয় রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) এবং ১৯২৫ খ্রি ডিসেম্বর থেকে অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)। ১৯৫২ খ্রি থেকে বলশেভিক শব্দটি বাদ গিয়ে পার্টির নাম হয় কমিউনিস্ট পার্টি অব সোভিয়েত ইউনিয়ন।

অনেকের মতে বলশেভিকবাদ হল লেনিনবাদের নামান্তর, যেটা পার্টির কর্মসূচি ও লেনিনের তত্ত্বে বিধৃত। তাতে মেনশেভিকদের নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তনের বদলে সহিংস বিপ্লবের সুপারিশ করা হয়। তাতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রানুগতা ও সর্বহারা শ্রেণীর নামে যাবতীয় ক্ষমতা বর্তাবে রাষ্ট্রের উপর এবং ওই শ্রেণীরই নামে চলবে একনায়কতন্ত্র। ১৯১৭ খ্রি বলশেভিকরা রাশিয়ায় বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে।

দ্র. কমিউনিস্ট পার্টি

বস্তুবাদ (Materialism)

দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্গত অধিবিদ্যা বিষয়ক প্রত্যয়, যা বলতে বোঝায় জাগতিক যাবতীয় অস্তিত্বের আধার হল বস্তু (matter)। বস্তুময় জগৎ হল চিরন্তন এবং স্থান ও কালের নিরিখে অসীম। বিবর্তনের ধারায় উদ্ভূত মানুষের ভাব ও চেতনা বস্তুভিত্তিক ও বস্তুরই প্রতিফলন। বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত মস্তিষ্কের ক্রিয়া হল চিন্তন ও চেতনা। বস্তুবাদী দর্শনের বিপরীত ধারা হল ভাববাদ। বস্তুবাদী দর্শনে বস্তুকেই সব কিছুর অগ্রবর্তী বলে মনে করা হয়। বিশ্বতত্ত্ব (cosmology) বিচারপ্রসঙ্গে বস্তুবাদীরা দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর বিশ্লেষণ পদ্ধতি যান্ত্রিক (mechanistic) এবং অপর শ্রেণীর পদ্ধতি দ্বান্দ্বিক (dialectical)। মার্কসীয় দর্শনে বস্তুবাদ দ্বিবিধ ধারায় বিবেচিত

হয়েছে : এক, ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতির ভিত্তিতে **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ** ও দুই, হেগেলের প্রভাবে গঠিত প্রত্যয় নয়, প্রতিনয় ও সমন্বয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত **দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ**।

মানুষের তথা সমাজের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সারমর্ম হল যে সর্ববিধ সামাজিক বিধিব্যবস্থার মূলে অর্থনৈতিক উৎপাদনের চালিকা শক্তি ও উৎপাদনের অন্তর্গত শ্রেণী সম্পর্কের অন্তর্বিরোধ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে যুগপৎ গতিশীল করে তোলে। রাজনৈতিক আধিপত্য, অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কিত তত্ত্ব কিংবা লোকের মূল্যবোধ, চিন্তাভাবনা ও নৈতিক মনোভঙ্গি অনুযায়ী নানান সামাজিক তত্ত্ব বস্তুবাদী কিংবা ভাববাদী আখ্যায় অভিহিত হয়। অন্যদিকে মার্কসীয় দৃষ্টিতে বস্তুবাদের দ্বান্দ্বিক ধারায় বস্তুর গতিপ্রকৃতি বিরোধ, সমন্বয় ও পুনর্বিরোধের মধ্যে দিয়ে উর্ধ্বমুখী ঘূর্ণায়মান (spiral) অগ্রগমনের ধারায় নিয়ন্ত্রিত।

বস্তুবাদ গ্রিস, ভারত প্রভৃতি দেশে প্রাচীনকালেই দেখা দেয়। আঠারো শতকে ইউরোপের বুদ্ধিবিভাসিত আন্দোলনকালে (Enlightenment) মনে করা হত যে বস্তুর বাইরে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। যে সব বিষয় মানসিক বা ভাবগত বলে মনে করা হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে বস্তুগত প্রক্রিয়া, দেখার ভঙ্গিতে ভাবগত বলে অনুভূত হয়।

বস্তু সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায় আঠারো শতকে নিউটনের ধ্রুপদী mechanistic প্রত্যয় ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করা হয়। বৈজ্ঞানিকদের অভিমতের ভিত্তিতে মানবেন্দ্রনাথ রায় মনে করেন যে বস্তু বা জড় এখন নিছক একটা স্পর্শনীয় সত্তা (hard lump of reality) নয়। আইনস্টাইন, প্ল্যাঙ্ক প্রমুখ পদার্থবিদদের বক্তব্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে পদার্থবিদ্যার সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনা বস্তু সম্পর্কে পূর্বতন সংকীর্ণ ধারণা ভেঙে দিয়েছে। সেজন্য তাঁর মতে বস্তুবাদকে physical realism নামে অভিহিত করাই সঙ্গত।

মনোজগৎ বস্তুর অন্তর্গত। মানুষও প্রাকৃতিক জগতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষের আচরণ মনোবিদ্যা নিয়ন্ত্রণ করে, যার ভিত্তি হল শারীরবিদ্যা ও রসায়ন। পদার্থবিদ্যা ও মনোবিদ্যার মধ্যে এক সেতুবন্ধ রচিত হয়েছে। সর্বতোভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব না হলেও physico-chemical substance-এ গঠিত দেহের বিকারেই তিনি প্রাণের উৎস দর্শিয়েছেন। জৈব বিবর্তনের ধারায় প্রাণ ও মস্তিষ্কের পরিণত অবস্থায় চিন্তন এক বস্তুনিরপেক্ষ সত্তা অর্জন করেছে। চিন্তন মস্তিষ্কের ক্রিয়া ; কিন্তু তা স্বাধীন গতিতে অগ্রসর হয়। বস্তুবাদে চিন্তন একটি "objective reality" হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পরিবেশ তাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে না। উভয়ের যুগপৎ ও সমান্তরাল গতি ইতিহাসের জৈবপ্রক্রিয়ার (organic process) বিচার-পদ্ধতি সৃজন করেছে ; বস্তু ও চেতনাকে মানবেন্দ্রনাথ অদ্বয় (monistic) সত্তায় সমন্বিত করেছেন। পক্ষান্তরে পূর্বোক্ত যান্ত্রিক ও দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিতে বস্তু ও চেতনা দ্বৈতরূপে বিশ্লেষিত হয়েছে।

উল্লিখিত যান্ত্রিক প্রত্যয়কে তিনি প্রত্যক্ষপূর্ব জ্ঞানপদ্ধতি (a-priori) হিসাবে দেখেছেন, যাতে জগৎপ্রকৃতি যেন একটা ঘড়ির মতো পূর্বনির্ধারিত এক পরিণামবাদী (teleological) নিয়মে ক্রিয়াশীল, তাঁর মতে প্রকৃতিবিজ্ঞান এখনকার দৃষ্টিতে অবরোহী (deductive) প্রণালীতে চলে না। আরোহী (inductive) পদ্ধতিই বিজ্ঞানসম্মত। প্রকৃতি বিজ্ঞান কোনও দেওয়াল লিখন নয়। কতকগুলি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বারে বারে

ঘটে, যার অপরিবর্তনীয় (invariant) সম্পর্ক গবেষণার মাধ্যমে গাণিতিক সূত্রে পরিমাপ করা সম্ভব এবং প্রকৃতির বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যেও একটি যোগসূত্র থাকে। সেইসব ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে মানবেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে বস্তুবাদের পশ্চাতে এক নিয়ম নিয়ন্ত্রিত জগৎ (law-governed universe) প্রত্যয় কাজ করে। জগতের বিভিন্ন নিয়মনিয়ন্ত্রিত অংশের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা (order) লক্ষিত হয়। সেটি পরিণামবাদী নয়। তদনুযায়ী প্রকৃতির অংশ হিসাবে বস্তু ও প্রাণের মধ্যে কোনও ফাঁক নেই। জৈব বিবর্তন ধারায় সঞ্জাত মানুষের যুক্তিবোধ সেই নিয়মনিয়ন্ত্রিত জগতের অংশ। তাতে মানুষের সব আচরণই ব্যাখ্যা করা যায়।

বহিঃসমর্পণ (Extradition)

অপরাধমূলক কাজের দরুন দণ্ডিত অথবা অভিযুক্ত কোনও ব্যক্তি অপর কোনও রাষ্ট্রে পলায়ন অথবা আশ্রয় গ্রহণ করলে অভিযোগকারী রাষ্ট্রের কাছে তাকে সমর্পণ করা হয়। সমর্পণ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও আন্তর্জাতিক আইন না থাকায় এক বা একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে বহিঃসমর্পণ বিষয়ে সবিস্তারে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে থাকে। ওইসব চুক্তিতে বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক অপরাধ ব্যতিরেকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অপরাধে অভিযুক্ত দোষী ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেবার শর্ত থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে একটি আন্তঃরাজ্য আইন অনুসারে অপরাধীকে সমর্পণ করা হয়। তবে সেখানে একটি রাজ্যের গভর্নর অপর কোনও রাজ্যের অভিযুক্ত আসামীকে হস্তান্তর নাও করতে পারেন। সাধারণত কোনও আইনেই রাজনৈতিক অপরাধীকে নানা কারণে সমর্পণ করার রীতি থাকে না। অবশ্য রাজনৈতিক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অনেক সময় ফৌজদারি মামলা থাকে। বৈদেশিক নীতি ও কূটনৈতিক কারণে ক্ষেত্রবিশেষে প্রচলিত রীতি শিথিল করা হয়।

বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান (Multinational Corporation)

যেদেশে প্রতিষ্ঠিত সে-দেশ বহির্ভূত অন্যান্য দেশে উৎপাদন অথবা ব্যবসায়ী কাজেকর্মে বহুলাংশে লিপ্ত থাকে যেসব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান সারা বিশ্বের প্রেক্ষাপটে তার মূল সিদ্ধান্ত ও নীতি নির্ধারণ করে এবং সেইসব সিদ্ধান্ত অনেক সময় সংশ্লিষ্ট দেশের বাইরে গৃহীত হয় যেখানে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ বিদ্যমান। সে সব দেশের সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান শক্তিসম্পন্ন প্রভাব খাটাতে সক্ষম। অনেকে সেজন্য তার মধ্যে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন। মার্কসীয় দৃষ্টিতে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদের অন্তিমকালীন রূপবিশেষ যার প্রবণতা হল দুর্বল দেশসমূহের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ। বহু অনুন্নত দেশের আকস্মিক বিদ্রোহে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকে বলে মার্কসীয় মহলে মনে করা হয়, যার ফলে সংশ্লিষ্ট দেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সেগুলির নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকে। এইসব অভিযোগের প্রত্যুত্তরে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয়ে গঠিত অর্গানিজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড

ডেভলাপমেন্ট নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে যার লক্ষ্য হল—বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের প্রবণতা থেকে মুক্ত রাখা।

বহুত্ববাদ (Pluralism)

বহুত্ববাদ সম্বন্ধে তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আছে :

প্রথম, যে মতবাদে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিকিরণ করা হয়, এবং সেইসব প্রতিষ্ঠান একে অপরের ক্রিয়াকলাপকে সীমিত রাখতে পারে, কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে পারে, যেগুলির কোনওটাই সার্বভৌম নয়। বহুত্ববাদ হল এক ধরনের "সীমিত সরকার" ; দ্বিতীয় মতানুসারে দেশের সংবিধানে এমন বিধান থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে নানাবিধ সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় ও নৈতিক বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠানগত আচরণ সমভাবে স্বীকৃত এবং যাবতীয় রাজনৈতিক অধিকার সংবিধানে নিহিত থাকে, এবং রাষ্ট্র বিনা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান সেই অধিকারের উৎস হবে না ; তৃতীয় মতানুসারে বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়া ও প্রত্যয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের এক বা দুটি ভিত্তির পরিবর্তে নানা ধরনের ভিত্তি থাকতে পারে।

বহুশাসনপ্রথা (Polyarchy)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদার্শনিক রবার্ট এ ডাল মুখ্যত এই তত্ত্বের উদ্ভাবক, যাতে রাজনৈতিক বিরোধ ও পীড়নের অবসানকল্পে সংসদীয় প্রতিনিধি নির্বাচনে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। প্রত্যয়টি আরিস্তোতলের গ্রিক ভাবধারা থেকে গৃহীত, যাতে জনগণের গণতন্ত্রী শাসন না হলেও বহুত্ববাদী শাসনের কথা বলা হয়েছিল।

বহুশাসন প্রথায় জনসংখ্যাকে অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। সব জনগোষ্ঠীকেই রাজনৈতিক কর্মপন্থা সম্পর্কে খোঁজখবর জানার সমান অধিকার, সমান রাজনৈতিক সুযোগসুবিধা এবং কার্যকালে রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার ব্যাপারে অংশগ্রহণের সমান সুযোগদানের কথা বলা হয়। বাস্তবে অসমতাই বিরাজ করে। তবে ভোটাধিকারে সবার সমান সুযোগ থাকে।

ডালের এই তত্ত্বে বলা হয় যে সমাজের সমস্ত জনগোষ্ঠীই নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কারণ প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোনও দল কারও বিরাগভাজন হতে চায় না। ডাল-এর মতে বিরোধ ও রাজনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। নানাপ্রকারে বিরোধের অবসান ঘটানো যায় : আলোচনা, আপসমূলক মতবিনিময়, দরাদরি, মুখোমুখি বিবাদ, দমননীতি, হিংসা, যুদ্ধ, গণহত্যা ইত্যাদি ; বিরোধী পক্ষাপক্ষের সামনে তিনটি বিকল্প থাকে : অচলাবস্থা, উৎপীড়ন কিংবা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা। প্রতি রাষ্ট্রই তার কর্মপন্থা রূপায়ণের তাগিদে কিছু পীড়নমূলক ব্যবস্থা নিয়ে থাকে, যেটা বৈদেশিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। অবশ্য আপসমূলক নানা সংস্থা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে মীমাংসা সাধনের জন্য সচেষ্ট থাকে। ডাল মনে করেন যে, যে সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান বিবাদ-বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য উপযোগী এবং কার্যকর তার মধ্যে বহুশাসন

প্রথা অন্যতম। প্রথাটিতে দমন ও পীড়ন সম্পূর্ণ নিবারিত না হলেও, যথেষ্ট হ্রাস পায়। তাতে জনসাধারণকে তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ কিছু অধিকার দেওয়া হয়। সেই অধিকার যথার্থ প্রয়োগের সময় কোনও বিরোধ অথবা বাধাত্মমূলক আচরণের পরিস্থিতি থাকে না। প্রথার অধীন রাজনীতিকেরা এমন কোনও আইনকানুন অন্তত জেনেশুনে প্রবর্তন করবেন না যা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী। যদি ভোটাধিকার থাকত তা হলে একদা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীরা সাংবিধানিক কনভেনশনে ক্রীতদাস প্রথার অনুকূলে প্রস্তাব গ্রহণে বাধা দিত। সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও বহুশাসন প্রথায় বিরাট সংখ্যক মানুষের উপর পীড়ন করা চলে না। অবশ্য দমন-পীড়ন পরিণামে সব ধরনের রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বহুশাসন প্রথায় যদি বিরোধ অথবা অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তা হলে শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থায় তার মীমাংসা সাধিত হয়।

বাকুনিন, মিখাইল (১৮১৪-১৮৭৬) (Mikhail Bakunin)

মস্কোর এক অভিজাত পরিবারের সদস্য মিখাইল বাকুনিন আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনে **নৈরাজ্যবাদী** রাষ্ট্রদর্শনের প্রবর্তন করেন। প্রথম **আন্তর্জাতিকে** তিনি ছিলেন মার্কসের প্রধান প্রতিপক্ষ। তরুণ হেগেলীয় গোষ্ঠীর অন্যতম বাকুনিন দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়ায় (dialectical process) নয়ের বিপরীত প্রতিনয় অর্থাৎ নেতিবাচক পর্যায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উত্তরকালে তিনি **প্রুঁদ**-এর চিন্তায় প্রভাবিত হন। প্রথম জীবনে তিনি রাশিয়া, জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার স্বেচ্ছাতন্ত্রী শাসনের বিরুদ্ধে স্লাভ জনজাতিসমূহের সংগ্রামকে গড়ে তোলার প্রয়াসী হন। ১৮৪৮-৪৯ খ্রি বৈপ্লবিক উত্থানের ব্যর্থতার ফলে তাঁকে সাত বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। সেখান থেকে তিনি পলায়ন করেন। ১৮৬১ খ্রি পোল্যান্ডের অভ্যুত্থান নিষ্ফল হয়ে যাবার দরুন জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে বিপ্লবের সম্ভাবনায় তাঁর আস্থা চলে যায়। অতঃপর আন্তর্জাতিক স্তরে বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে উন্নীত করার প্রয়াসী হন তিনি। গোপন বিপ্লবী কর্মসূত্রে তাঁর নৈরাজ্যবাদী প্রত্যয় ক্রমে দৃঢ় হয়ে ওঠে। প্রথম আন্তর্জাতিকে বাকুনিনের চিন্তাভাবনা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মার্কসের সঙ্গে তাঁর বিরোধের ফলে বাকুনিন বহিষ্কৃত হন (১৮৭২)। আন্তর্জাতিকের সাংগঠনিক কর্মপন্থায় মতবিরোধ ছাড়াও মার্কস ও বাকুনিনের মধ্যে অন্যান্য তত্ত্বগত বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল ; রাষ্ট্রের অবলুপ্তির (withering away) সময় সম্পর্কে মতবিরোধ তার অন্যতম। সর্বহারার একনায়কত্ব পরিণামে একটি নতুন শ্রেণী সৃষ্টি করবে বলে বাকুনিন মনে করতেন। সমাজবিপ্লবে অর্থনৈতিক কার্যকারণ-তত্ত্বের পরিবর্তে বাকুনিন জনগণের মানসিক প্রস্তুতিকে প্রাধান্য দেন। লেনিন বাকুনিনের তীব্র সমালোচনা করেন।

বাজার অর্থনীতি (Market Economy)

বাজার বলতে বোঝায় যেখানে চাহিদা ও সরবরাহের মৌল দুই শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে যাবতীয় বস্তুর দরদাম নির্ধারিত হয়। অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বাজারের লক্ষণ। বাজার অর্থনীতিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ খাটে না। তার ভিত্তি হল ব্যক্তিগত

মালিকানা ও লক্ষ্য মুনাফা। আয়ের সমবণ্টন তথা সামাজিক সমতাবিধানে এই অর্থনীতি ব্যর্থ। বেকার সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি নানাবিধ ত্রুটি আছে। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পবাণিজ্যের সীমাহীন লোকসান ও ভরতুকি-নির্ভরতার ফলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে, রাষ্ট্রীয় সুস্থিতি সবিশেষ বিঘ্নিত হয়েছে। মতাদর্শ নির্বিশেষে অধিকাংশ দেশই এখন বাজার অর্থনীতির দিকে ঝুঁকেছে।

বাজার অর্থনীতির কর্মদক্ষতা দ্বিবিধ : ১. উৎপাদনী কর্মদক্ষতা এবং ২. বণ্টনে (allocative) কর্মদক্ষতা। উৎপাদনী কর্মদক্ষতা ন্যূনতম ব্যয়ের (cost) দিকে লক্ষ রাখে। পক্ষান্তরে বণ্টনের কর্মদক্ষতা দৃষ্টি দেয় ক্রেতা অর্থাৎ ভোক্তাদের সন্তোষবিধানে, যাতে ঠিক জিনিস, ঠিক পরিমাণে এবং ঠিক দামে সরবরাহ করা যায়। বাজার অর্থনীতিতে উৎপাদকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ওই দুটি কর্মদক্ষতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। উৎপাদকের উদ্ভাবনা, দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার, ভোক্তাদের সুবিধার জন্য মূল্যহ্রাস ও উৎপাদনের গুণগত মানবৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি দিতে বাধ্য থাকে।

সব দেশই চায় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সেইসঙ্গে জনকল্যাণ। তাই রাষ্ট্র ও বাজারের মধ্যে সমন্বয় বাঞ্ছনীয়। বাজার অর্থনীতির পথকে যেমন নানারকম বাধাবিপত্তি থেকে রক্ষা করতে হবে, তেমনি বাজার অর্থনীতি জনস্বার্থের পরিপন্থী হলে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অবশ্যই অপরিহার্য।

দ্র. সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি ; অবাধ বাণিজ্য

বাথ পার্টি (Bath Party)

'বাথ' আরবি শব্দ, অর্থ নবজাগরণ। দলের পুরো নাম হল আরব সোসালিস্ট বাথ পার্টি বা আরব সোসালিস্ট রেনেসাঁস পার্টি। সর্ব-আরব আন্দোলনসূত্রে গঠিত পার্টির নাম। উদ্দেশ্য হল আরব দেশগুলির অধিবাসীদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক এবং মার্কসীয় সমাজবিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে আরবের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যসাধন। একদিকে সমাজতন্ত্রী মতাদর্শের সঙ্গে জাতীয় ঐক্যের সমন্বয় সাধন তার মূল লক্ষ্য, অন্যদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে ইসলামকে ব্যবহারের পরিবর্তে আরবের ঐতিহ্য ও সেখানকার অবদানকে বন্দিত করা হয়। অটোম্যান সাম্রাজ্যের অবসানে ধর্মীয় অনুশাসন ও রাজনৈতিক একতা অন্তর্হিত হয়, সেই শূন্যতা প্রকারান্তরে পূরণ করে এই দলের জাতীয় সমাজতন্ত্রী আদর্শ।

১৯৪৩ খ্রি মাইকেল আফ্‌লাক নামে জনৈক সিরীয় খ্রিস্টান দামাস্কাসে এই দলের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সংকল্প ছিল স্বাধীনতা ঐক্য ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে সর্বসমন্বিত একটি আরব রাষ্ট্র গড়ে তোলা, যার বৈদেশিক দপ্তর থাকবে একটিমাত্র। ১৯৫২ খ্রি সিরীয় সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরব সোসালিস্ট বাথ পার্টির জন্ম হয়। বাথ পার্টির প্রভাব সিরিয়াতে সীমাবদ্ধ নয়। তার সর্ব-আরব রাষ্ট্রচিন্তা ইরাক, জর্ডন, লেবানন এবং পারস্য সাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহে প্রসারিত হয়। ১৯৫২ খ্রি মিশরের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে বাথ পার্টির প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল। পঞ্চাশের দশকে মিশর

ও সিরিয়া রাষ্ট্রদ্বয়ের ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকে মিশে যাবার পিছনে এই পার্টির মতাদর্শ প্রভাব বিস্তার করে। মিশরের প্রধানমন্ত্রী নাসেরের স্বৈরতন্ত্রী শাসনের ফলে পার্টিতে ভাঙন ধরে। ১৯৬১ খ্রি সিরিয়া সেই সংযুক্তি থেকে সরে যায়। সর্ব-আরব আদর্শে ক্রমে আঘাত পড়তে থাকে ; বিশেষ করে ১৯৬৩ খ্রি থেকে যখন ইরাক ও সিরিয়া গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে বাথ পার্টির আদর্শ, অর্থাৎ বাক স্বাধীনতা, অবাধ নির্বাচন এবং সংগঠনের স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দেয়। ১৯৬৩ খ্রি ফেব্রুয়ারি মাসে ইরাকে কুর্দিদের বিদ্রোহের সময়ে বাথ পার্টি তার গণতন্ত্রী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়।

অতঃপর বাথ পার্টির ভিতরে প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে উপদলীয় দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, সেটা ১৯৭০ খ্রি অবধি চলে। সিরিয়াতে তখন জাতীয়তাবাদী নেতা হাফেজ আল-আসাদ সরকারি ক্ষমতা দখল করেন। ইরাকেও ১৯৬৩ খ্রি বাথ পার্টি অল্পকালের জন্য ক্ষমতাসীন হয় এবং ১৯৬৮ খ্রি স্থায়িত্ব লাভ করে। ইরাক ও সিরিয়ার বাথ পার্টির নেতাদের মধ্যে মতপার্থক্যের ফলে ওই দুটি দেশে দলের এক হয়ে যাবার প্রস্তাব ভেঙে যায়। উভয় দেশেই পার্টি অন্যান্য দল ও কমিউনিস্টদের সঙ্গেও মোর্চা গঠন করে। সিরিয়াতে মুসলিম ব্রাদারহুড এবং ইরাকে শিয়া ও কুর্দিদের মধ্যে বিরোধ বেড়ে চলে।

সিরিয়াতে বাথ পার্টির নেতা ক্ষমতাসীন আল-আসাদ-এর পররাষ্ট্রনীতির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেবাননে হস্তক্ষেপ এবং ইজরেলের আধিপত্য খর্ব হয়। ইরাকে বাথ পার্টির সরকার ইরানিদের সঙ্গে যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়।

দ্র. আরব লিগ

বামপন্থা (Leftism)

রাজনৈতিক চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপে ব্যবহারবহুল বাম শব্দটির সুস্পষ্ট কোনও সংজ্ঞা নেই। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে যখন গণপরিষদের অধিবেশন চলত (১৭৮৯-৯১) তখন বিপ্লবী অর্থাৎ তৃতীয় বর্গের সাধারণ প্রতিনিধিরা অধ্যক্ষের বাম দিকে বসতেন। বিরোধী রক্ষণশীল প্রথম বর্গের পরিবর্তনবিমুখ উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধিরা দূরে সরে গিয়ে অধ্যক্ষের দক্ষিণ দিকে বসতেন। দ্বিতীয় বর্গের উদারতন্ত্রী যে সব প্রতিনিধি সীমিত পরিবর্তন চাইতেন তাঁরা মধ্যস্থলে বসতেন। বাম ও দক্ষিণ দিকে আসন গ্রহণ সূত্রে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী প্রত্যয়দুটির প্রচলন ঘটে।

উৎপত্তিগত বিশেষ তাৎপর্য না থাকলেও দু'শো বছরের বিবর্তনের ধারায় শব্দটি এক আবেগপূর্ণ আদর্শের রূপ পরিগ্রহ করেছে যার সারবত্তা হল প্রগতি, আশাবাদ, বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি, শোষণের বিরোধিতা, অর্থনৈতিক সাম্যের দাবি ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ; জাতি, ধর্ম ও বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ; রাষ্ট্রীয় স্বৈরতন্ত্র ও যুদ্ধের জিগিরকে প্রতিরোধ করা। তবে তার অর্থ এই নয় যে দক্ষিণপন্থীরা ওই ধরনের আন্দোলনে যুক্ত থাকেন না। মানুষের যথার্থ কল্যাণসাধনে রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার নানা পরিবর্তনে বহু বিচিত্র মতাদর্শের ব্যক্তি ও সংস্থার নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় যাঁরা বামপন্থী রূপে পরিচিত হননি।

বাম সম্পর্কে একটি লক্ষণ সাধারণভাবে দেখা গেছে যে বাম মতাদর্শীরা বরাবরই

বিরোধী ভূমিকায় থেকেছেন, অর্থাৎ যাঁদের শাসন ক্ষমতায় যাবার সম্ভাবনা কম, ক্ষমতা পেলে তারই নেশায় তাঁদের আদর্শচ্যুতি ঘটে। সেজন্য ত্রৎস্কি বিপ্লবকে চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বামপন্থীদের ক্ষমতায় আসতে দেখা গেছে। তার অর্থ এই নয় যে তাতে তাঁদের বামসত্তা চলে যায়। ই এইচ কার প্রমুখ কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন যে ক্ষমতায় গেলে বামশক্তি ক্রমে দক্ষিণদিকে হেলতে বাধ্য হয়।

প্রচলিত দৃষ্টিতে দক্ষিণপন্থীরা হলেন ধনী ও উৎপীড়ক শ্রেণীর অন্তর্গত। আর দরিদ্র ও নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতিনিধি হলেন বামপন্থীরা। অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণের পার্থক্য দাঁড়াচ্ছে ধনী ও দরিদ্রের শ্রেণী বিভাজনে। কথাটা অনেকাংশে সত্যি হলেও ইতিহাসে এমনও দেখা গেছে যে দক্ষিণপন্থীদের পিছনে দরিদ্র মানুষের বিপুল সমর্থন আর বামপন্থীদের সঙ্গে ধনী, পুঁজিপতি ও জমিদার শ্রেণীর পূর্ণ সহযোগ।

কারও কারও মতে বামপন্থীরা সদাই আন্দোলন চায় স্থিতাবস্থা ভাঙার জন্য। দক্ষিণপন্থীরা সাধারণত রক্ষণশীল, তারা প্রচলিত বিধিব্যবস্থা বজায় রাখার পক্ষপাতী ; তারই মাপকাঠিতে প্রগতিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল অভিধা চিহ্নিত হয়। প্রশ্ন ওঠে তা হলে ফ্যাসিবাদীদের কোন গোত্রে ফেলা হবে ? তারাও তো চাইত আন্দোলন ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন।

বামপন্থী সংজ্ঞা নিরূপণে অন্যতম মানদণ্ড হল লক্ষ্য (end) ও মাধ্যমের (means) মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রশ্ন। বামপন্থী লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে চাই চরম মাধ্যম অনুসরণ। কার্যত ১৮৫০ খ্রি পর স্বয়ং কার্ল মার্কসই চরমপন্থীদের সংস্রব ত্যাগ করেন। লেনিন সংসদীয় নির্বাচনে কৌশলগত কারণে অংশগ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। উল্লেখ্য, হিংসাত্মক কার্যকলাপ কিংবা আপসহীন সংগ্রামী প্রবণতা ক্ষেত্রবিশেষে দক্ষিণপন্থীদের মধ্যেও দেখা যায়।

আদিপর্বে বামপন্থী আন্দোলন ছিল মূলত রাজনৈতিক। ধর্মের নাগপাশ থেকে মুক্তি এবং সামন্ততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ছিল প্রথম পর্যায়ের মূল আদর্শ। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সর্বজনীন ভোটাধিকার আদায় করাই ছিল তখন দীর্ঘকালের দাবি। ক্রমে তার সঙ্গে যুক্ত হয় ট্রেড ইউনিয়নের অর্থনৈতিক দাবি। ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে অর্থনৈতিক সাম্যের ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিল, সেই ভাবনাই কালক্রমে সমাজতন্ত্রী মতাদর্শের রূপ নিয়ে বামপন্থী আদর্শের অন্যতম প্রধান উপাদান হয়ে ওঠে।

গণতন্ত্র প্রথমাবধি বামপন্থী আদর্শের প্রধান উপাদান ছিল। পরবর্তীকালে সেটির পরিসর সংকুচিত হয়ে পড়ে। মার্কস গণতন্ত্রী অধিকারকে সাময়িকভাবে শুধু সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে সীমিত রাখার সুপারিশ করেন। তৎকালীন বিভিন্ন বামপন্থী গোষ্ঠী যেমন নৈরাজ্যবাদী ও সিন্ডিক্যালিস্ট মতাদর্শে গণতন্ত্রকে অবাধ ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি।

বিশ শতকের শেষ দশকে বামপন্থী মতাদর্শে স্থিতাবস্থা অবসানের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও মাধ্যম ও লক্ষ্য নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সোসালিস্ট ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন মানসিকতা দেখা দিয়েছে। সাধারণভাবে শিল্পবাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও সমানাধিকারের দাবি থাকলেও অধিকাংশ দেশেই

বামপন্থী মহলে মিশ্র অর্থনীতির প্রতি আসক্তি গড়ে উঠেছে। তাঁদের মতে সমাজতন্ত্রী অর্থনীতির অর্থ এই নয় যে উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকা চাই।

দ্র. নববাম ; দক্ষিণপন্থা

বাস্তব রাজনীতি (Realpolitik)

জার্মান ভাষায় রিয়েলপলিটিক কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ। ইউরোপে ১৮৪৮-৪৯ খ্রি বৈপ্লবিক উত্থানকালে জার্মান উদারতন্ত্রী রাষ্ট্রনায়কদের অনুসৃত কর্মে বাস্তব রাজনৈতিক বোধের অভাবের সমালোচনাসূত্রে লুডভিগ ফন রোকা তাঁর এক বইতে (১৮৫৩) শব্দটি প্রয়োগ করেন। উত্তরকালে শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, বিশেষ করে বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানির সংযুক্তির আগে ও পরে ; বাস্তব রাজনীতির চরিত্র হল সম্ভাব্য বিষয়াদির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা, প্রতিপক্ষের কথার চেয়ে তার কাজের মধ্যে দিয়ে তাকে সঠিক জানা এবং সময়মতো শক্তিপ্রয়োগের জন্য প্রস্তুত থাকা। ক্ষমতার অনুরূপ অপর একটি শব্দ হল মাখপলিটিক। তাতে দেশের ও বিদেশের বিবেচনার একমাত্র বিষয়বস্তু হল ক্ষমতা। ক্ষমতাহীন গোষ্ঠী বিবেচনার পদবাচ্য নয় এবং যার যতটা ক্ষমতা আছে সে ততখানিই বিবেচ্য। এই মূল্যবোধশূন্য বিবেচনারীতি বাস্তব রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। লোকের ভাবনার মধ্যে দিয়ে না দেখে বিশ্বপরিবেশকে তার বাস্তব চেহারা অনুযায়ী দেখা হয়। ক্ষমতার রাজনীতি কার্যত রাজনীতির প্রকৃতিকেই বদল করে ; রাজনীতির নৈতিক ধ্যানধারণাকে নস্যাৎ করে দেয়। তবে বাস্তব রাজনীতি ও ক্ষমতার রাজনীতির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে। প্রথমটি বাস্তব বিষয় হিসেবে অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় ; দ্বিতীয়টি অধিকার অর্জনের ক্ষমতার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে।

বি-উপনিবেশন তত্ত্ব (Decolonization Theory)

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে পুরানো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের বিভিন্ন কারণে যে অবক্ষয় ও পরিশেষে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটে সেই প্রক্রিয়াটি বি-উপনিবেশন তত্ত্ব নামে অভিহিত।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে **লেনিন** তাঁর বিখ্যাত তত্ত্বে বলেন যে স্বদেশের উদ্বৃত্ত মূলধন বিদেশে রপ্তানি ও লগ্নি করাই হল সাম্রাজ্যবাদের প্রধান লক্ষণ। সেই স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদ **উপনিবেশ** সমূহে রাজনৈতিক আধিপত্য করে। ওই তত্ত্বের সূত্র ধরে এবং **মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী** পদ্ধতিতে **মানবেন্দ্রনাথ রায়** সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয় ও অবসানের এক তথ্যভিত্তিক চিত্র তাঁর 'ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিসান', 'ফিউচার অব ইন্ডিয়ান পলিটিকস', 'আওয়ার ডিফারেন্সেস' ইত্যাদি গ্রন্থে তুলে ধরেন। তাঁর মতে সাম্রাজ্যবাদ অক্ষয় ও অপরিবর্তনীয় নয়। সেটা সাবেক ধারায় চিরকাল না চলে ক্রমোদ্ভূত নতুন পরিস্থিতি অনুযায়ী বেশ-পরিবর্তন করে নতুন পদ্ধতি ও পন্থা অবলম্বন করে।

রায়ের উল্লিখিত তত্ত্বটির আলোচনার সময় বি-উপনিবেশন অর্থাৎ 'ডিকলোনাইজেশন' শব্দটি বুখারিন প্রয়োগ করেন। সময়টা ছিল রায়ের চীন থেকে

ফিরে আসার পর (১৯২৭)। আদিপর্বে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের রূপ ছিল উপনিবেশকে কৃষিনির্ভর ও কাঁচামাল রপ্তানিকারী দেশ হিসেবে আবদ্ধ রেখে তাকে বিলেতে তৈরি পণ্যের বাজাররূপে ব্যবহার করা। বিশ শতকে সেই রূপের পরিবর্তন ঘটে। শুধুমাত্র বাণিজ্যের পরিবর্তে সেখানে অর্থ লগ্নি করে শোষণ চালানোর নতুন পদ্ধতি সমধিক ফলপ্রসূ হয়।

নানা তথ্যের সাহায্যে তিনি দেখিয়েছেন যে প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধে সামরিক ক্ষয়ক্ষতি ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন উপনিবেশগুলিতে পূর্বের ন্যায় মূলধন রপ্তানিতে অক্ষম হয়ে পড়ে। বিলেতে শিল্পসামগ্রীর উৎপাদন হ্রাস পায়। সঞ্চয় ও মূলধনের ঘাটতি ছাড়াও বহির্বাণিজ্যের বাজারে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এইসব কারণে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ের মতো আর বাধা না দিয়ে ভারতের দেশীয় পুঁজিপতিদের শিল্পোদ্যমে উৎসাহ দেওয়া শুরু হয়। শুল্কনীতি ও সংরক্ষণ-নীতিকে ব্রিটেন অবস্থার বিপাকে শিথিল করে দেয়। মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে ভারতে দেশীয় পুঁজি নিয়োগের কথা বলে দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় পুঁজিপতিদের অতঃপর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে না দেখে যৌথ শোষণের অংশীদার করে নেবার প্রবণতা দেখা দেয়। কাঁচামাল রপ্তানিকারী কৃষিপ্রধান ভারত যাতে অতঃপর শিল্পোন্নত হয়ে ওঠে ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথের একটি ডোমিনিয়নে পরিণত হয়, সেটাই ছিল সেদিন সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সা। মানবেন্দ্রনাথ মনে করতেন যে ইংরেজ শাসকদের এই প্রয়াস স্বেচ্ছায় নয়, অবস্থার চাপে পড়ে দেখা দেয়। বি-উপনিবেশন ছিল ব্রিটেনের ভারতীয় পুঁজিপতিদের সংগ্রামবিমুখ করার একটি কৌশল। তিনি বলেননি যে শোষিত অন্যান্য শ্রেণীকেও এই প্রবণতা প্রভাবিত করবে। সংকটজনক নতুন পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন অব্যাহত রাখাই ছিল মূল অভিসন্ধি। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে মানবেন্দ্রনাথ ব্রিটেনের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং তার উপনিবেশ পরিত্যাগের অবশ্যম্ভাবিতার কথা বলেন এবং জাতীয় স্বাধীনতা অনিবার্য বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। যুদ্ধের পর ভারতসহ বিভিন্ন উপনিবেশ সাম্রাজ্যবাদী নাগপাশ থেকে মুক্তি পায়।

বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralization)

কেন্দ্রাভিমুখে গমনশীলতার বিপরীত প্রক্রিয়া। তাতে রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রিত একক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্থা হতে বহুধা বিভক্ত স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে বিকেন্দ্রিত বা স্থানান্তরিত হয়। কার্যনির্বাহী একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার পরিবর্তে ক্রমনিম্ন স্তরে বিন্যস্ত বিভিন্ন কার্যনির্বাহী সংস্থার কাছে কাজকর্মের জবাবদিহির প্রয়োজন ঘটে। ফলে স্থানীয় ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মপন্থা গ্রহণ ও সম্পাদন সম্ভবপর হয়।

কেন্দ্রীভূত শক্তি ও সংস্থার হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে পড়ার প্রতিকার হিসেবে বিকেন্দ্রীকরণের চাহিদা প্রকাশ পায়, যাতে সর্বনিম্ন স্তরের সাধারণ মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হতে পারে। যদিও সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শক্তির আধারে অধিষ্ঠিত থাকে, কিন্তু সেটা কোনও বিমূর্ত সত্তা নয়; ক্রমনিম্ন স্তরে বিন্যস্ত স্থানিক

পর্যায় অবধি ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত হলে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিকশিত হবার সুযোগ পায়।

দ্র. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ; যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ; ক্ষমতা অর্পণ

বিচারবিভাগ (Judiciary)

সরকারের অন্যতম একটি বিভাগ, যার কাজ হল আইনসভায় বিধিবদ্ধ, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য আইনকানুনের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদবিরোধ, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের বিবাদ, ফৌজদারি মামলার কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের অধীন অঙ্গরাষ্ট্র বা রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবাদবিরোধ ইত্যাদির বিচার করা। এসব প্রধান কাজ ছাড়াও কিছু কাজ বিচারবিভাগ নির্বাহ করে থাকে যেগুলি যথার্থ বিচারবিভাগীয় কাজ নয় ; যেমন, কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মচারী নিয়োগ, লাইসেন্স অনুমোদন, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা, নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ, কোনও প্রতিষ্ঠানের অছি নিয়োগ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন। নানান মামলায় ইনজাংশন অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা জারি বিচারবিভাগের নিয়মিত একটি কাজ। বিচারবিভাগের মৌলিক (original) অথবা নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে পুনর্বিচারের আপিলের শুনানি ও বিচার করার অধিকার থাকে।

মামলার বিচারকালে বিচারবিভাগ রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োগও ব্যাখ্যা করে। অনেক ক্ষেত্রে বিচারবিভাগ নতুন আইনের সৃষ্টি করে, অর্থাৎ বিভিন্ন মামলায় প্রদত্ত রায় আইনের সমতুল মর্যাদা লাভ করে। **ক্ষমতার পৃথকীকরণ** নীতি অনুযায়ী বিচারবিভাগ ছাড়া সরকারের অপর দুটি বিভাগ, অর্থাৎ আইনসভা ও প্রশাসন বিভাগ থেকে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বজায় রাখে। বিচারবিভাগের পবিত্র দায়িত্ব হল যে, কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তির যথোচিত বিচার করে ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং দেশে আইনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। বিচারবিভাগের কার্যসম্পাদনে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করা অনৈতিক ও অনুচিত। বিচারকদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও কর্মচ্যুতির বিষয়ে ক্ষমতাসীন দলের হস্তক্ষেপ বিচারকদের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে।

দ্র. সরকার ; আইনসভা ; প্রশাসন বিভাগ।

বিচ্ছিন্নকরণ (Secession)

স্বেচ্ছায় ও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও দল, ধর্মীয় সংগঠন অথবা যুক্তরাষ্ট্র থেকে অপসৃত হওয়া। বিচ্ছিন্নকরণের পূর্বে দ্বিমত, বিরোধ কিংবা বিদ্রোহ ঘটে। প্রকৃষ্ট নিদর্শন ১৭৭৬ খ্রি আমেরিকায় গ্রেট ব্রিটেনের ১৪টি উপনিবেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যুক্তরাষ্ট্র নামে নতুন এক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যুক্তরাষ্ট্র থেকেও ১৮৬০-৬২ খ্রি দক্ষিণাঞ্চলের ১১টি অঙ্গরাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে রাষ্ট্রসমবায় গঠন করে এবং আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপ বিচ্ছিন্নতার ঘটনা পোর্তুগাল থেকে ব্রাজিল (১৮২২), স্পেন থেকে দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় রাষ্ট্রগুলি (১৮১০), তুরস্ক থেকে গ্রিস (১৮৩০), স্পেন থেকে কিউবা (১৮৯৮), কলোম্বিয়া থেকে পানামা (১৯০৩) এবং সোভিয়েত

ইউনিয়ন থেকে তার অঙ্গরাজ্যগুলির (১৯৯১) ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নকরণ ঘটে। কানাডা, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশে বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলন প্রবল।

বিচ্ছিন্নতাবোধ (Alienation)

বিশেষ এক মানসিক অবস্থা যা নিয়ে **রুসো, হেগেল, মার্কস, ফ্রয়েড** প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিক ও বিদ্বজ্জন বিভিন্ন দৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন।

মার্কসের দৃষ্টিতে উল্লিখিত মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয় যখন কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান বা সমাজ ১. তার কাজের ফসল কিংবা মূল কাজ, ২. তার বসবাসের পরিবেশ, ৩. অন্যান্য মানুষ অথবা ৪. নিজের মানবিক সম্ভাবনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। বিচ্ছিন্নতা ব্যাপারটা কার্যত আত্ম-বিচ্ছিন্নতা, অর্থাৎ মানুষ নিজেই তার নিজস্ব ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে নিজের সম্ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। বিচ্ছিন্নতাবোধের তাই মূলকথা হল আত্ম-বিচ্ছিন্নতা।

বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রত্যয়টি ফ্রান্সে রুসো এবং জার্মানিতে গ্যয়টে, শিলার প্রমুখ ইউরোপীয় আলোকিত শতাব্দীর মনীষীদের চিন্তায় উদ্ভূত হয়। বস্তুগতভাবে প্রত্যয়টি ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কের অমানবিক চরিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বিষয়টি জার্মান দর্শনে প্রতিফলিত হয়। নানা দিক থেকে প্রত্যয়টির তাৎপর্য নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ফিক্‌টে, হেগেল, ফয়েরবাক ও মার্কস নিজ নিজ দৃষ্টিতে প্রত্যয়টিকে বিচার করেন।

প্রত্যয়টি মার্কসীয় মতবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মার্কসীয় এবং অমার্কসীয় উভয় মহলেই এটি সাম্প্রতিককালে ব্যাপক আলোচনার একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কস তাঁর প্রথম দিককার রচনাদিতে, বিশেষ করে 'ইকনমিক অ্যান্ড ফিলজফিক্যাল ম্যানাস্ক্রিপ্টস' (১৮৪৪) বইতে প্রত্যয়টির নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশদ বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে সামাজিক বিকাশের বিশেষ এক পর্যায়ে বিচ্ছিন্নতাবোধ স্ববিরোধের পরিচয় দেয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবোধের উদয়কে তিনি একত্র পরস্পরবিরোধী শ্রমবিভাগ হিসেবে প্রত্যক্ষ করেন। তাতে বিচ্ছিন্নতাবোধ মানুষের সমস্ত কাজকর্মেই প্রতিফলিত হয়; প্রতিটি কাজ সমাজের পরস্পরবিচ্ছিন্ন এক-একটি জনগোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকারে আবদ্ধ। শ্রমের বিচ্ছিন্নতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মার্কস প্রসঙ্গত পুঁজিবাদী সম্পর্ক ও সর্বহারার অবস্থা, শ্রমিক ও তার উৎপন্ন সামগ্রী, সমাজ সম্পর্কের বস্তুগত চরিত্র, সমাজে অমানবিক শক্তির আধিপত্য, শ্রমিকের কায়িক ও নৈতিক অবনতি ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পুঁজিবাদী সম্পত্তির অবসানের মাধ্যমে তিনি বিচ্ছিন্নতাবোধের সমাধানের পথপ্রদর্শন করেন। শ্রমের বিচ্ছিন্নতার উপরই যে যাবতীয় বিচ্ছিন্নতাবোধ নির্ভর করে এই উপলব্ধি থেকেই প্রকৃত সমাজজীবনের স্ববিরোধ ও ভ্রান্ত ধারণা সমূহ বোঝা যায়। এর ভিত্তিতেই প্রয়োগের উপর তত্ত্বের নির্ভরশীলতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, দর্শন পুনর্গঠিত হয়। ১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে মার্কস তাঁর পূর্বতন বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রত্যয়টির জায়গায় একটি সমন্বিত চিন্তাধারা উপস্থাপিত করেন; তার মধ্যে অবশ্য পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নতাবোধ একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ব

বিদ্রোহ (Insurgency)

আন্তর্জাতিক আইনে ব্যবহৃত শব্দ, যার অর্থ হল আইনসম্মতভাবে গঠিত সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান। সঠিক অর্থে এটিকে **বিপ্লব** কিংবা **গৃহযুদ্ধ** অথবা **যুধ্যমান অবস্থা** বলা যায় না। এই ধরনের বিদ্রোহের কোনও আইনসঙ্গত সত্তা নেই, যেটা যুদ্ধের ক্ষেত্রে থাকে। বিদ্রোহে ক্ষমতাসীন সরকার যেমন জবর-দখলকারী বা বিদেশাগত নয়, তেমনি বিদ্রোহীরা দেশেরই অধিবাসী। নিষ্পত্তির জন্য আলাপ-আলোচনা চালাবার সময় বিদ্রোহী সরকার আন্তর্জাতিক সত্তা লাভ করে।

বিপ্লব (Revolution)

বিপ্লব শব্দটির অর্থ ও দৃষ্টান্ত নিয়ে মতভেদ আছে। দৃষ্টান্ত দিয়ে যদি অর্থ বোঝানো যায় তা হলে প্রশ্ন ওঠে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপ্লব সঠিক অর্থে একটি বিপ্লব ছিল কি না, সেটা অভিধানগত অর্থ দিয়ে নির্ণয় করা কঠিন। শব্দটির সরল অর্থ হল সম্পূর্ণ ঘুরে যাওয়া, যেমন একটা চাকা ঘোরে। সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডে যে মহিমান্বিত (গ্লোরিয়াস) বিপ্লব (১৬৮৮) ঘটে সেই সময়ে উদ্ভূত বিপ্লব শব্দটির অর্থ ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। তখনকার কালে মানুষের দুর্গতি ও শোচনীয় জীবনযাত্রার পরিবর্তন অনেকটা ভাগ্যচক্র ঘুরে যাওয়ার মতো ছিল। এখন অর্থ দাঁড়িয়েছে যে যুগপৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে, পূর্বতন সমাজব্যবস্থার দৃঢ়মূল আশা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নানাবিধ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আমূল রূপান্তর। সময়বিশেষে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের আশ্রয় নেওয়া হয়। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের বিপ্লবে ব্যতিক্রম ছিল। কারণ অনেকাংশেই সেটা ছিল শান্তিপূর্ণ এবং সেটা যুক্তিবহ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে একটি সংবিধানে পরিণতি লাভ করে। মানব-ইতিহাসে ওই সংবিধানটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অভূতপূর্ব ফলিত অবদান হিসেবে পরিচিত। কোনও কোনও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মানুষের কাছে বিপ্লব অর্থাৎ রাজনৈতিক রূপান্তরের মূল অবদান হল মুক্তির এবং এমন একটি সংবিধানের সন্ধান যার সাহায্যে মুক্তি সুনিশ্চিত হবে। ইংল্যান্ডের মহিমান্বিত (গ্লোরিয়াস) বিপ্লব এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিপ্লব সঠিক অর্থে বিপ্লবের আদর্শপূর্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সার্থক ও উত্তীর্ণ বলে তাঁরা মনে করেন। এর আংশিক কারণ হল উভয় ক্ষেত্রেই হিংসাত্মক পথকে এবং পরবর্তীকালের বিপ্লবসমূহের মতো সামাজিক উলটপালটকে পরিহার করা হয়, এবং আংশিক অন্য কারণ হল যে যখন রূপান্তর ঘটে রাজনৈতিক স্তরে, তখন সামাজিক সচলতা ও দৃঢ়মূল স্থায়িত্ব বজায় থাকে।

কিন্তু বেশির ভাগ সমাজবিজ্ঞানী উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন না। তাঁরা সাম্প্রতিক ইরানের হিংসাত্মক বিপ্লবকে প্রতিবিপ্লব বলে মনে করেন। অহিংস বিপ্লব ও সহিংস বিপ্লবের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান আছে। এই মনোভঙ্গির আদি প্রবক্তা ছিলেন **মার্কস** ; সেই মনোভঙ্গিতে ফরাসি বিপ্লবকে একটি নতুন পথের নজির হিসেবে দেখা হয়, যার মধ্যে দিয়ে অন্তর্নিহিত অনেক অনাবিষ্কৃত শক্তি মুক্তি পায়। তার ফলে মার্কসীয় বিপ্লবের তত্ত্ব উদ্ভূত হয়।

মার্কসীয় বিপ্লবতত্ত্বের দুটি ভাষ্য আছে। প্রথমটিকে বলা হয় যে **উৎপাদিকা শক্তি**

বিকশিত হয়ে এমন এক স্থানে পৌঁছয় যেখানে তাকে উৎপাদিকা সম্পর্ক শৃঙ্খলিত করতে শুরু করে। সেই বিপুল শক্তিকে কিছুকাল শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখা যায়, পরে শৃঙ্খল ভেঙে চূর্ণ হয়ে যায় সমগ্র সমাজ-সংগঠনে। দ্বিতীয়টিকে বলা হয় যে বিপ্লব হল উৎপাদনী সম্পর্কে শ্রেণীসংগ্রামের পরিণতি। সেটি সমাজের প্রতিটি স্তরে সঞ্চারিত হয়, সংগ্রাম প্রকাশ্যে দেখা দেয়, শাসকের স্থান কেড়ে নেয় শাসিতেরা। দ্বিতীয় ভাষ্যটি ফরাসি বিপ্লবের চিন্তা থেকে গৃহীত এবং হেগেল-এর প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণে অনুপ্রাণিত। দুটি ভাষ্যই অবশ্য অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। কারণ দুটির পিছনেই বিদ্যমান একই তত্ত্ব আছে যেটা হল সমাজব্যবস্থার ভিত্তিমূলে সদাই এক স্ববিরোধী দ্বন্দ্বের ক্রিয়াশীলতা।

মার্কসীয় দর্শনের একটা গোড়ার কথা যে বিপ্লবে একটি শ্রেণী অপর একটি শ্রেণী দ্বারা পরাভূত হয়। সেজন্য সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র অবধি পৌঁছতে প্রয়োজন দুটি বিপ্লবের। প্রথমটি বুর্জোয়াজি অভিজাতবর্গ ও সামন্ততন্ত্রীদের উচ্ছেদ করে, যেটাকে বলা হয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং পরবর্তী যে বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণী বুর্জোয়া শ্রেণীকে উচ্ছেদ করে সেটা হল সর্বহারা বিপ্লব। সেই দৃষ্টিতে রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে সহসা যে অভ্যুত্থান ঘটেছিল সেটা ছিল সর্বহারা বিপ্লব। তার আগে ওই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বুর্জোয়া বিপ্লব সাঙ্গ হয়। লেনিনবাদী বিপ্লবের তত্ত্বে বিপ্লবের এজেন্ট অর্থাৎ বাহকের ভূমিকায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে; তাতে কেবল বস্তুগত (objective) অবস্থাই নয়, মনোগত (subjective) প্রস্তুতিও থাকা চাই। আরও সোজা করে বললে বলতে হয় যে বিপ্লবের পিছনে দেশের কিছু সুসংগঠিত গোষ্ঠী বা দলের সক্রিয় বিদ্রোহমূলক ভূমিকা থাকা চাই। লেনিনের দৃষ্টিতে সংহত ও পুঞ্জীভূত ক্ষমতার সাহায্যে বিপ্লব সিদ্ধ হতে পারে; মার্কসের চিন্তায় সামাজিক প্রক্রিয়ায় বিপ্লবের পরিস্থিতি অগ্রসর হয়, অদম্য যে শক্তি ফরাসি বিপ্লবকে পরিণত রূপ দিয়েছিল, তার উৎপত্তি ঘটে সামাজিক স্তরে।

মানবেন্দ্রনাথ রায় বিপ্লবের এক ভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। তাঁর মতে অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করাই বিপ্লবের একমাত্র লক্ষ্য নয়। মানুষের সহজাত সম্ভাবনার বিকাশে বাধাস্বরূপ যে-কোনও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নির্মূল করাই বিপ্লবের আদর্শ। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা সময়বিশেষে মানুষের দৈহিক অস্তিত্ব ও মানসিক বিকাশ ও সৃষ্টিশীল সত্তার প্রতিকূলতা করে। প্রগতি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মানুষকে বিপ্লবের সাহায্যে ওই সব অন্তরায়গুলিকে অপসারণের প্রেরণা জোগায়। নতুন দর্শনের আলোয় মানুষ নতুনতর সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে। মুক্তি ও সৃজনীশক্তির আকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন মানুষের মনোভাবকে মানবেন্দ্রনাথ 'রোমান্টিক' আখ্যা দিয়েছেন। বিপ্লব সেই অর্থে রোমান্টিক এবং যুক্তিসম্মত। যুক্তিনির্ভর মন থেকেই মুক্তির আবেগ উদ্ভূত হয়। তাঁর রোমান্টিক বিপ্লবের প্রত্যয় সম্পূর্ণ যুক্তিবহ ও নীতিসম্মত।

বিবাদাবসান (Detente)

ফরাসি দাতাঁত কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ। কূটনীতি-সম্পর্কিত এই শব্দটির অর্থ হল দুটি বিবদমান রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের পরিসমাপ্তির প্রারম্ভিক সূচনা। তখন

উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক উত্তেজনাকর মনোভাব প্রশমিত হয়। শব্দটির ব্যবহার উনিশ শো ষাটের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতিসূত্রে প্রচলন লাভ করে। সেই সময় থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি উভয় পক্ষ গ্রহণ করে যখন যুদ্ধাস্ত্র সীমিতকরণ, হেলসিঙ্কি চুক্তি (১৯৭৫) সম্পাদন ইত্যাদির মাধ্যমে ইউরোপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করে। অনেকের দৃষ্টিতে ওই সম্পর্কের পিছনে কোনও এক পক্ষের অভিসন্ধি ছিল প্রতিপক্ষের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে গোপনে অস্ত্রসম্ভার গড়ে তোলা ও এমন কী প্রতিবেশী অন্য রাষ্ট্রে হানা দেওয়া। কারণ হিসেবে বলা হয় যে সোভিয়েত গোষ্ঠীর অন্তর্গত দেশগুলির কোনও নাগরিক হেলসিঙ্কি চুক্তির ভিত্তিতে পৌর অধিকার দাবি করলে তাকে দণ্ডিত হতে হত। অন্যদিকে ভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে বলা হত যে ওই চুক্তির নানারকম ব্যাখ্যা থাকা সম্ভব এবং চুক্তির অর্থ উভয়ের মধ্যে কোনও বোঝাপড়া (contract) নয়।

দ্র. নিরস্ত্রীকরণ ; পঞ্চশীল

বিবেকানন্দ, স্বামী (১৮৬৩-১৯০২) Vivekananda, Swami

দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারকরূপে পরিচিত স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত পরিচয় হল যে তিনি মূলত ছিলেন একজন মানবতাবাদী ও দেশপ্রেমিক। তিনি ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানমার্গকেই শ্রেয় বলে মনে করতেন। মাতৃভূমির দুর্দশায় সদাই তাঁর মন এক অন্তর্জ্বালায় আচ্ছন্ন থাকত। তাই সবকিছুর উপরে তিনি জনসেবাকে প্রাধান্য দেন। মানুষের সেবা করতে হলে, এমন কী রাজনীতি করতে হলেও একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিজেকে যে যুক্ত রাখতেই হবে সেকথা তিনি মনে করতেন না। তিনি চাইতেন মানুষের কল্যাণ, ক্ষমতা দখল নয়। তিনি ছিলেন নরমপন্থী ; অচল সমাজব্যবস্থার নিরসন সংঘর্ষের পথে হওয়াটা তাঁর মনঃপূত ছিল না। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে প্রবেশে নিজের সুপ্ত আবেগকে তিনি সযত্নে দমন করেছিলেন। তবুও রাষ্ট্রদর্শনের বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রকাশিত অজস্র চিন্তা তাঁর *Lectures from Colombo to Almora, East and West* এবং *Modern India* বই তিনটিতেই বেশি পাওয়া যায় ; ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সেগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল অপরিমেয়।

হেগেলের প্রভাবে বিবেকানন্দ ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণকল্পে সমষ্টির জন্য ব্যষ্টির আত্মত্যাগের কথা বলেছেন। তবে তিনি ব্যক্তিকে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের যন্ত্রাংশ করতে চাননি, রাষ্ট্রের চেয়ে ব্যক্তি ও সমাজের উপর তিনি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিবেকানন্দের হৃদয়পটেও মাতৃরূপে দেশের চিত্র কল্পিত। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে তিনি মোক্ষ বা মায়ার বন্ধনমোচনই শুধু চাননি, পার্থিব জীবনে বৈষয়িক ও সামাজিক মুক্তিও তাঁর কাম্য ছিল। মুক্তিকে তিনি মানুষের জন্মগত অধিকার বলে মনে করতেন। জনগণের স্থান ও মান উন্নীত করতে না পারলে রাজনৈতিক উন্নয়নপ্রয়াস তাঁর দৃষ্টিতে ছিল অর্থহীন। নিজেকে তিনি 'সোসালিস্ট' বলে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি যে নবজাগ্রত মাতৃভূমির কল্পনা করেন তার রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মানুষ নির্বিশেষে সকলের অধিকার সমান, মানুষ জ্ঞানে, কর্মে, স্বাস্থ্যে ও

হৃদয়বৃত্তিতে মহান। মুক্ত মানুষের সমবায়ে গঠিত তাঁর কল্পিত সমাজব্যবস্থা দেশপ্রেম, বিজ্ঞানচেতনা এবং সত্ত্ব ও রজের সংমিশ্রণে এক নতুন নিশানা দেখায়।

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় (Intelligentsia)

জটিল মানসিক শ্রমে অভ্যস্ত এবং প্রয়োজনীয় বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন একটি বৃত্তিকুশল সামাজিক গোষ্ঠী। বুদ্ধিজীবীরা স্বতন্ত্র কোনও সামাজিক শ্রেণী নয়। তারা বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের বুদ্ধিগত প্রয়োজন মেটায়। সেই নিরিখে তাদের সামাজিক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ধনতন্ত্রী সমাজে তারা অনেকাংশেই বিত্তবান শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রশাসনের উচ্চস্তরে, রাষ্ট্রায়ত্ত কিংবা বেসরকারি ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং বুর্জোয়া প্রচারযন্ত্রের মোটা বেতনভুক বিজ্ঞানী প্রভৃতি যারা নিজেরাই উৎপাদনের এক অংশের অধিকারী তারা সকলেই মার্কসীয় দৃষ্টিতে শ্রমজীবী মানুষদের শোষণে সহায়তা করে। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বৃহদাংশ পুঁজিপতিদের এক ধরনের চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী বিশেষ; তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমজীবীদের সংগ্রামী রীতিনীতি ও কৌশলসমূহ ব্যবহার করে।

উন্নয়নশীল দেশে বুদ্ধিজীবীরা বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। বিশেষ করে যে দেশে সর্বহারা শ্রেণী নেতৃত্ব গ্রহণের পক্ষে উপযোগী হয়ে ওঠেনি। বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠেই ওইসব দেশে কৃষক, শ্রমিক, কারিগর প্রভৃতি মেহনতি মানুষের কথা ধ্বনিত হয়। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে পরিবর্তনশীল পর্বে বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি শ্রেণীর স্বার্থ অভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়।

দ্র. মধ্যবিত্ত শ্রেণী

বুর্জোয়া গণতন্ত্র (Bourgeois Democracy)

পশ্চিম ইউরোপ এবং বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কসীয় লেখকদের নিন্দাসূচক ব্যবহৃত শব্দ। 'বুর্জোয়া' মার্কা দিয়ে বোঝানো হয় যে ওইসব রাষ্ট্রব্যবস্থায় বহুদল ও ভোটদানের প্রথা যাই থাকুক, শাসনক্ষমতা বুর্জোয়া শ্রেণী বা তার অনুগতদের উপর সদাই বর্তায়; বুর্জোয়া সংবিধান ও প্রশাসনের কায়দাকানুন এমনভাবে কাজ করে যে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে; সংসদীয় প্রতিনিধিরা বুর্জোয়া রীতিনীতি দ্বারা চালিত হয়। এর ঠিক বিপরীত রাষ্ট্রব্যবস্থা হল জনগণতন্ত্র যেখানে নির্বাচন নাও হতে পারে, কিন্তু সেখানে সমগ্র জনস্বার্থে কর্তৃত্ব নির্বাহ হয়, নির্দিষ্ট কোনও শ্রেণীর স্বার্থে নয়; কোনও শ্রেণীরই আধিপত্যের ক্ষমতা থাকে না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পর্কেও মার্কসীয় লেখকেরা অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন।

দ্র. বুর্জোয়াজি

বুর্জোয়াজি (Bourgeosie)

বুর্জোয়া কথাটি একটি ফরাসি শব্দ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নগরবাসী। পূর্বে নগরকে বলা হত 'বুর' (bourg)। বুর-এর অধিবাসীরা বুর্জোয়া বলে অভিহিত। পুঁজিবাদী অর্থনীতির উদ্ভব হয় ওইসব নগরগুলিতে। শিল্পোন্নয়নে সেগুলি সমৃদ্ধি লাভ করে। যান্ত্রিক অগ্রগতির ফলে ইউরোপে উৎপাদন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। মানুষের পরিবর্তে উৎপাদন যন্ত্রই ক্রমশ বেশি ব্যবহৃত হতে থাকে। মানুষের চাহিদার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থারও দ্রুত সম্প্রসারণ হয়। নানাবিধ পেশারও উদ্ভব ঘটে। নতুন উৎপাদন পদ্ধতি ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিকশিত হতে থাকে। এই নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত নগরবাসীরাই বুর্জোয়া নামে পরিচিত। নগরে জীবিকান্বেষণে আগত সাধারণ লোক যারা কারিগরি, দোকানদারি, কেরানিগিরি ও অন্যান্য নানান বৃদ্ধিজীবীর কাজে জড়িত হয় তারা পেটি বুর্জোয়া বলে অভিহিত। তারা প্রলেটারিয়েট ও বুর্জোয়া শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে।

এদিকে সামন্তদের অধীনে ক্রীতদাসবৎ, দায়বদ্ধ কৃষকেরা (serf) অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নগরের দিকে পলায়নপর হয়। কর্মসংস্থান ও উন্নত জীবন তাদের সেদিকে আকর্ষণ করত। ফলে বুর্জোয়াদের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রীদের তুমুল বিরোধ দেখা দেয়। সামন্তদের দাপটে সারা সমাজই জর্জরিত—সকলেই চায় তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি। বুর্জোয়ারাই সামন্ততন্ত্রীদের উৎপীড়ন সবচেয়ে বেশি ভোগ করে। তারাই সেজন্য সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদকল্পে বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। সংক্ষেপে এই বিপ্লবকেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলা হয়।

মার্কসীয় দৃষ্টিতে শ্রেণীগতভাবে বুর্জোয়াজির অন্তর্গত হল পুঁজিবাদী, মিলমালিক, বণিক প্রভৃতি যারা ব্যবসাবাণিজ্যের মালিক (কৃষি ব্যতিরেকে)। এই বিভাজন অনুযায়ী বুর্জোয়াজি শ্রেণীর একদিকে থাকে শিল্পপতি ও অর্থলগ্নিকারী, অন্যদিকে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী যাদের জীবনযাত্রার মান সর্বহারা শ্রেণী থেকে খুব বেশি উন্নত নয়। এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী শিল্পোন্নয়ন তথা আধুনিক কলকারখানার উন্নতির সঙ্গে বুর্জোয়াজি শাসকশ্রেণীতে পরিণত হয়, সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী ও তার সাবেকি উৎপাদন ব্যবস্থা নিক্ষিপ্ত হয়। সমাজে সামন্ততন্ত্রের যোগসূত্র ছিন্ন করতে বুর্জোয়াজির উত্থানের সঙ্গে উদারতন্ত্র প্রাধান্য পায়। মার্কসীয় চিন্তানুসারে বুর্জোয়াজি শ্রেণীসংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণী দ্বারা পর্যুদস্ত হয়। মধ্যবর্তী পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী (কৃষিজীবী সহ) সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হয়। শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়াজি আরও ছোট আকারে পরিণত হয়ে দেশকে নিয়ন্ত্রণ করে।

বেনথাম, জেরিমি (১৭৪৮-১৮৩২) (Bentham, Jeremy)

ইংরেজ দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও আইনবিদ। তিনি ছিলেন হিতবাদ দর্শনের প্রবর্তক। হিতবাদ দর্শনের মূলকথা হল জনগণকে সামগ্রিক সুখ প্রদানই আইন ও নৈতিকতার লক্ষ্য।

হিতবাদ শব্দটি সুখ অর্থে বেনথাম ব্যবহার করেন। যেটা দুঃখের কারণ সেটা হিতবাদী নয়। তিনি মনে করতেন যে প্রকৃতি মানুষকে দুটি অবস্থার অধীন করেছে, যথা সুখ ও দুঃখ। মানুষের যাবতীয় কামনা ও বাসনার মূলে থাকে সুখের সন্ধান এবং সে সর্বদা দুঃখকে এড়িয়ে চলতে চায়। তিনি তাই সবকিছুকেই সুখ ও দুঃখের মানদণ্ডে পরিমাপ করেন। তাঁর মতে হিতবাদীকে পুণ্যকাম হতে হবে, কারণ পুণ্যকর্মই সুখের উৎস, অন্যদিকে দুঃখের কারণ হিসেবে পাপকর্ম বর্জনীয়। তবে সুখের সন্ধানীকে কেবল নিজ সুখের কথা ভাবলেই চলবে না, সর্বজনের সুখ তার কাম্য হওয়া উচিত।

হিতবাদ একটি ভোগবাদী তত্ত্ব। সুখ বেনথামের কাছে ছিল একটি অনুভূতি বিশেষ। আনন্দ মনের একটা অবস্থা। পরিমাণগতভাবে দুটি সুখের মধ্যে তারতম্য থাকে। অর্থাৎ একটি সুখের পরিমাণ অন্য একটি সুখের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি কিংবা কম। অবশ্য দুটি সুখের মধ্যে তুলনাগত বিচারে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় প্রকারেরই তারতম্য থাকতে পারে। বেনথাম কেবল পরিমাণগত দিকটিকেই দেখেছেন। মাপার উপযোগী গাণিতিক পদ্ধতিও তিনি উদ্ভাবন করেন। হিতবাদী তত্ত্ব লোকের আচরণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি শেখায়। কোন কাজটা ঠিক এবং কোন্‌টা ভাল তা জানা যায়। ভাল কাজে সবচেয়ে বেশি সুখ পাওয়া যায়, কাজের মধ্যে কষ্ট থাকলেও। আর যেকাজটা ঠিক তাতে পাল্লায় সুখের দিকটাই থাকে ভারী। বেনথাম মনে করতেন হিতবাদী তত্ত্ব সর্বজনীন। এর মধ্যে দিয়েই লোকচরিত্র সহজে বোঝা যায়।

রাষ্ট্র সম্পর্কে বেনথামের অভিমত ছিল যে হিতবাদী ধারাকে উন্নত ও বজায় রাখার জন্য কিছু লোকের সমষ্টি হল রাষ্ট্র। সরকারের কাজ হল লোকের সুখ ও সমৃদ্ধিসাধন। তাঁর মতে সামাজিক চুক্তি নয়, সুখের তাগিদেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছিল। লোকে আইনের প্রতি অনুগত থাকে ; কারণ অনুগত থাকার উপকার ও না থাকার বিপদ উপলব্ধি করে বলে। এই আনুগত্যই তাঁর মতে রাজনৈতিক সমাজের ভিত্তি। হিতবাদী উৎসেই জন্মায় রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্র। তাঁর মতে রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠানেরই হিতবাদী ভূমিকা থাকা উচিত।

বেনথামের দৃষ্টিতে মানুষ মূলত স্বার্থপর এবং সমাজের অন্যদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে নিজস্বার্থ চরিতার্থ করে। উভয় স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধানই সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রাষ্ট্রকে সেকাজ করতে হয় আইনের সাহায্যে। তাঁর মতে রাষ্ট্রের প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন। আইন একাধারে নির্দেশ ও বাধা দেয়। আইন প্রকৃতিগত স্বাধীনতারও প্রতিবন্ধকতা করে। পরস্পরবিরোধী সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান আইনের এক মস্ত ভূমিকা। লোকের সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তাকে আইন এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে লোকে সর্বজনের সুখবিধানে তৎপর হয়। সেটা শাস্তিদানের মধ্যে দিয়েই সম্ভব। শাস্তি কিন্তু দুঃখের পর্যায়ে পড়ে।

বেনথাম মনে করতেন যে রাষ্ট্রই হল যাবতীয় অধিকারের উৎস। তবে প্রাকৃত আইন ও প্রাকৃত অধিকার কিংবা দিব্য অধিকার অথবা চুক্তিগত অধিকার ইত্যাদি সবই অর্থহীন। সম্পত্তির কিংবা স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত হতে পারে যখন সেগুলি লোকের সুখবিধান করে। রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য সুখ, অধিকার নয়। তবে তিনি

সবাইকে নিরাপত্তার নিরঙ্কুশ অধিকার প্রদান করেন, কারণ ব্যক্তির সুখ নিরাপত্তা, প্রাচুর্য ও সমতার উপর নির্ভরশীল।

অপরের স্বার্থহানি করে না বলে তিনি নাগরিক স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু প্রকৃতিগত স্বাধীনতা সমর্থন করতেন না। তিনি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ তাতে সবাইকার সুখ সুনিশ্চিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা মানুষের সুখ বিধানের জন্যই প্রযুক্ত হওয়া উচিত। তাঁর মতে রাজতন্ত্র অপেক্ষা সাধারণতন্ত্র ভাল। তিনি চাইতেন ব্যবসাবাণিজ্যে অবাধ সুযোগ। রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার সুযোগ থাকা তিনি চাইতেন, তবে নাগরিকদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আইনসম্মত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অধিকারের তিনি বিরোধী ছিলেন।

দ্র. মিল, জন স্টুয়ার্ট

বৈধতা (Legitimacy)

রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষমতাবান ও সুবিধাভোগীরা নিজেদের প্রতাপ ও অধিকারের বৈধতা প্রমাণের জন্য সর্বসাধারণের কাছে নিজেরা যে নীতিগতভাবে গ্রহণযোগ্য সেটা নিত্যই প্রমাণের চেষ্টা করেন (ম্যাক্স ওয়েবার)। লোকের সেই বিশ্বাসের জোরে শাসকেরা ক্ষমতা বজায় রাখার সঙ্গে ন্যূনতম বলপ্রয়োগে নিজেদের স্থায়িত্ব সুদৃঢ় করেন। আদর্শের কতকগুলি বাঁধা বুলি থাকে যেগুলির সাহায্যে তাঁদের নিজেদের ন্যায্যতা প্রতিপন্নের চেষ্টা করা হয়। ক্ষমতাবানেরা নিজেদের ভাবনাচিন্তা জনগণের কাছে সহজেই প্রচার করতে পারেন, কারণ জনগণকে প্রভাবিত করার উপযোগী প্রচার মাধ্যম তাঁদের হাতেই থাকে। সেই নিরিখে মার্কসীয় বক্তব্য হল যে শাসকশ্রেণীর চিন্তাভাবনাই সমাজে প্রাধান্য পায়। তা হলেও অনেক দেশে কিছু বিরোধী অভিমত থাকে, যেটা শাসকদের রীতিনীতি মানে না ; কিন্তু (প্রকৃত কিংবা সম্ভাব্য) উৎপীড়নের চাপে সাধারণভাবে আনুগত্য বিরাজ করে।

বৈধতার বিষয়ে রাষ্ট্রতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। কারও কাছে সেটা প্রয়োজনীয়, কারও মতে সর্বক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়। যাঁরা মনে করেন সেটা প্রয়োজনীয় তাঁরা চান মতাদর্শের ভিত্তিতে রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা। রক্ষণশীল মতানুসারে বৈধতা অবশ্যই প্রয়োজন, তবে রাজনৈতিক মতবাদের পরিবর্তে সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেটি কার্যকর হওয়া বিধেয়। অবিচারের মতো অবৈধতা সহজেই চোখে পড়ে। সঠিক বিবেচিত সরকারের প্রতি জনগণের সন্তোষ অপেক্ষা অবৈধ হিসেবে বিবেচিত সরকারের বিরুদ্ধে লোকের নিন্দার মনোভঙ্গি অনেক বড় আকারে দেখা দেয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism)

প্রত্যয়টির মর্মার্থ হল হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত অবাধ ব্যক্তিসত্তা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে রাষ্ট্র ব্যক্তিমানুষকে স্বাধীনভাবে চলতে দেয়। এই মতবাদে সমাজজীবনের কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষ। মানুষের স্থান যাবতীয় বিষয়ের ঊর্ধ্বে। রাষ্ট্রের কাজ হল ব্যক্তিমানুষকে হিংসা ও বঞ্চনা থেকে রক্ষা করা ; তার জীবনকে কোনও ভাবে নিয়ন্ত্রণ না করা। মানুষের

জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনুচিত। মূল উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দান এবং তাতে রাষ্ট্রের ন্যূনতম হস্তক্ষেপ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা হল যাবতীয় বিপদআপদ, পারস্পরিক বিরোধ, সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি এবং চুক্তির লঙ্ঘন থেকে নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান। তার বাইরে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কোনও ব্যাপারেই রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ বাঞ্ছিত নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের দৃষ্টিতে মানুষের সৃজনশীল শুভসত্তার স্বাধীন বিকাশের পক্ষে রাষ্ট্র এক অশুভ অন্তরায়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উৎপত্তি ঘটে **সামাজিক চুক্তি** তত্ত্বগুলি থেকে। তবে সেটা ছিল অনেকাংশে বিমূর্ত। অষ্টাদশ শতকে স্বৈরাচারতন্ত্রী ও পরমবাদী রাজতন্ত্রী সরকারের নিরন্তর নিপীড়নদৃষ্টে রাষ্ট্রদার্শনিকেরা ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন সত্তার উপর গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। ফ্রান্সে **অবাধ বাণিজ্য** নীতির প্রবক্তা ফিজিওক্র্যাট নামে অভিহিত অর্থনীতিবিদরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে তার আদিপর্বে অর্থনৈতিক ব্যঞ্জনা প্রদান করেন। তাঁরা সমকালীন মার্কান্টাইলিস্ট নামক অর্থনীতিবিদদের সরকারি নিয়ন্ত্রণমূলক আর্থিক বিধিব্যবস্থার মতবাদকে নাকচ করে দেন। ফিজিওক্র্যাটদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অবাধ বাণিজ্যের মতবাদ ক্রমে সারা ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করে। অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-৯০) প্রমুখ ইংরেজ অর্থনীতিবিদ মতবাদটিকে পরিপুষ্ট করেন। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রস্তুত করেন **জন স্টুয়ার্ট মিল**, হার্বার্ট স্পেনসার প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকেরা। **আলোকিত শতাব্দীর** (ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্ট) অনুষঙ্গী বাণী ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। ব্যক্তিস্বাধীনতার উপাদানে গড়ে ওঠে উদারনৈতিক মতবাদ।

গোড়ায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যতই জনপ্রিয়তা লাভ করে থাকুক না কেন, কালক্রমে সেটা ক্ষুণ্ণ হতে শুরু করে। অর্থনৈতিক সংকট, বেকার সমস্যা, জনগণের ক্রমবর্ধিষ্ণু দুর্গতির ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁকে। সমষ্টিবাদী নানা মতবাদও বেড়ে ওঠে। একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রের দাপটে ব্যক্তিস্বাধীনতা অস্তমিত হয়। ফলে ভারসাম্য সুরাহার পথ খোঁজার প্রয়াস দেখা দেয়।

ব্যক্তিমানুষের জীবন ও মননের স্বাধীন বিকাশের প্রসঙ্গ রাষ্ট্রদর্শনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এক মস্ত অবদান। সেইসঙ্গে একথাও উল্লেখ্য যে চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ফলে মানুষ স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, অসামাজিক ও সংকীর্ণচিত্ত হয়ে পড়ে। কাজেই মানুষের স্বাধীন বিকাশের প্রয়োজন যেমন থাকে, তেমনি সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সঙ্গে সমাজের পারস্পরিক দায়দায়িত্ব অপরিহার্য। সমাজই অধিকার সৃষ্টি করে এবং উপযোগী পরিবেশে তার বিকাশ ঘটায়। সামাজিক সম্পর্কেই মানুষকে জানা যায়। রাষ্ট্র সমাজের একটি কার্যনির্বাহী অঙ্গ। ব্যক্তিমানুষের স্বার্থ, উদ্যম ও নিরঙ্কুশ বিকাশের স্বাধীনতা অব্যাহত রেখে সমষ্টিগত স্বার্থ, চাহিদা, প্রয়োজন ও সমস্যাদির ভারসাম্য বিধিবিধানের ও প্রশাসনিক কার্যনির্বাহের সঙ্গে রাষ্ট্রের সুসমঞ্জস ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয়।

ভ

ভাববাদ (Idealism)

দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত অধিবিদ্যা বিষয়ক প্রত্যয় যার বিপরীত শব্দ হল **বস্তুবাদ**। শব্দটির পিছনে এই বিশ্বাস কাজ করে যে বাস্তব বিশ্বচরাচরের অন্তর্নিহিত প্রকৃত স্বরূপ হল ভাব, চিন্তন, চেতনা বা পরম এক বস্তু-নিরপেক্ষ প্রাথমিক সত্তা। বস্তুনির্ভর জগৎ-প্রকৃতির স্থান দ্বিতীয়। গ্রিক ভাবমূর্তি (image) প্রত্যয় থেকে এই বিশ্বাসের উদ্ভব ঘটে। ভাববাদী দর্শনচিন্তার অন্যতম আদি প্রবক্তা ছিলেন **প্লাতো**। ভাববাদের দুটি ধারা আছে : আত্মগত ও বস্তুগত। আত্মগত ধারায় বলা হয় যে মানুষের চেতনা-নিরপেক্ষ কোনও স্বাধীন অস্তিত্ব বস্তুজগতের নেই ; ব্যক্তি মানুষের চেতনা, অনুভূতি ও বীক্ষণের উপর যাবতীয় বাস্তবতা নির্ভরশীল। বিশপ বার্কলে ছিলেন এই ধারার সমর্থক। পক্ষান্তরে বস্তুগত ভাববাদী ধারা অনুযায়ী সর্ববিধ বাস্তব-বিশ্বের মানুষের ভাব-নিরপেক্ষ স্বাধীন অস্তিত্ব আছে, তবে তার প্রাথমিক ভিত্তি হল এক পরম পরিচিন্তন, অর্থাৎ এক জাগতিক ভাব বা ঈশ্বর। স্বতঃই অধ্যাত্মবাদ বা ধর্ম এসে পড়ে। সেই নিরিখে সসীম কালাকাশের স্রষ্টা হলেন ঈশ্বর।

আধুনিক কালে **কান্ট** ও **হেগেল** হলেন ভাববাদী চিন্তার অন্যতম প্রধান দিকপাল। বস্তুবাদী মার্কসীয় দৃষ্টিতে বস্তুর সত্তা হল প্রাথমিক। বস্তুরই প্রতিফলন হল মন। ভারতীয় রাষ্ট্রদার্শনিকদের মধ্যে **গান্ধী** ও **শ্রীঅরবিন্দ** ছিলেন আধ্যাত্মিক ভাববাদী। অন্যদিকে **মানবেন্দ্রনাথ রায়** বস্তু ও ভাবকে পৃথক না করে উভয়ের অদ্বয় ধারায় বিশ্বাসী ছিলেন।

রাষ্ট্রচিন্তায় ভাববাদের তাৎপর্য হল জনজীবনে ভাবগত ও নীতিসম্মত আচরণে অবিচল আস্থা। এমনকী বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে বিরোধ দেখা দিলেও অথবা অসম্ভব বলে মনে হলেও সেইসব ভাবগত নৈতিক আচরণ পরিহারে দৃঢ় অনীহা ফুটে ওঠে। বৃহত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে বাস্তববাদীদের সঙ্গে তুলনায় ভাববাদীরা বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সম্পর্কে নৈতিক মূল্যবত্তা, সুবিচার, সহনশীলতা ও

মানবিকতার আদর্শ তুলে ধরেন ; বাস্তববাদীরা কার্যকারিতা, রণকৌশল, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার দিক থেকে বিচার করেন। অবশ্য সেজন্য সব ধরনের বস্তুবাদ ন্যায়নীতি থেকে বিচ্যুত বলে মনে করা যায় না।

ভারত ছাড় আন্দোলন (Quit India Movement)

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে ১৯৪২ খ্রি আগস্ট মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক ইংরেজ সরকারের আশু ভারত পরিত্যাগ ও দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে সৃষ্ট আন্দোলন। বিষয়টি বোঝার সুবিধার্থে পূর্ববর্তী প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলির সামান্য উল্লেখ প্রয়োজন। মাদ্রাজ অধিবেশনের (১৯২৭) সময় থেকেই কংগ্রেস দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের আশঙ্কায় সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে যুদ্ধে ভারতের জড়িয়ে পড়ার বিরোধী ছিল। কিন্তু যুদ্ধ শুরু (১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) হয়ে যাবার পর জনমত এবং বিশেষ করে কেন্দ্রীয় আইনসভার অভিমত না নিয়েই বড়লাট যুদ্ধে ভারতের যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সরকারের যুদ্ধনীতির ব্যাখ্যা এবং ভারতকে স্বাধীনতাদানের আশু সম্ভাবনার বিষয়ে ইংরেজ সরকারের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না পাওয়ায় এগারোটি প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভাসমূহ পদত্যাগ করে। সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ বাদানুবাদ ও আপসমূলক আলোচনা নিষ্ফল হয়ে যাওয়ায় গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস ব্যাপক আইন অমান্যের পথে না গিয়ে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু করে (১৭ অক্টোবর ১৯৪০)। নেতৃবৃন্দসহ কয়েক সহস্র কংগ্রেস কর্মী পর্যায়ক্রমে কারাবরণ করেন। সত্যাগ্রহ ফলপ্রসূ না হওয়ায় বছরখানেক পরে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

ইত্যবসরে বিভিন্ন দল ও নেতার মধ্যে দেশের পরিবর্তন সম্পর্কে মতভেদ প্রবল হয়ে ওঠে। যুদ্ধের পরিস্থিতিও সংকটজনক হয়ে পড়ছিল। বেসামরিক প্রশাসনে অচলাবস্থার দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ১৯৪২ খ্রি মার্চ মাসে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভারতে পাঠানো হয়। ক্রিপসের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের আলোচনা-বৈঠক পক্ষকাল পরে নিষ্ফল হয়ে ভেঙে যায়। যুদ্ধোত্তর শাসন সংস্কার সম্পর্কে ক্রিপস প্রস্তাব কোনও দলই মেনে নিতে পারেনি, অবশ্য নিজ নিজ কারণে। অবিলম্বে কংগ্রেসের হাতে বেসামরিক ক্ষমতার হস্তান্তরই ছিল কংগ্রেসের প্রধান দাবি ; নইলে ব্যাপক আকারে আইন অমান্য আন্দোলন তথা প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু করা হবে বলে জানানো হয়।

১৪ জুলাই ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গান্ধীজির প্রস্তাবক্রমে ভারত ছাড় আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু আন্দোলনের রূপ ও কৌশল সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট কোনও ভাবনাচিন্তা ছিল না। কমিটির অন্যান্য সদস্যেরা ছিলেন গান্ধীজির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। বড়লাট এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সঙ্গে আপস আলোচনার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর ৭ ও ৮ অগস্ট বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত এ আই সি সি অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটির খসড়া প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। স্বাধীন ভারতের শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনার সঙ্গে অহিংস পথে ভারত ছাড় আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এদিকে ৮ অগস্ট বড়লাটের কার্যনির্বাহী সংসদে গৃহীত এক প্রস্তাবে কংগ্রেসের

বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় বিপজ্জনক ব্যাঘাত সৃষ্টি ও দেশবাসীর মনোবল বিনষ্ট করে দেবার অভিযোগ করা হয়। ৯ অগস্ট কংগ্রেস দল বে-আইনি ঘোষিত হয়। নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রবল বিক্ষোভ ও হিংসাত্মক আন্দোলন দেখা দেয়। দেশের পূর্ব সীমান্তে তখন জাপানি ফৌজ হানা দিয়েছে।

আন্দোলনের নামে যা শুরু হয় সেটা ছিল মূলত জনরোষ। অসংগঠিত, পরিকল্পনাবিহীন ও নেতৃত্ব ছাড়াই আন্দোলন নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে। উগ্রপন্থী ও বিপ্লবী বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন বামপন্থী দল অহিংস নীতি পরিহার করে। একদিকে সরকারি দমননীতি ও ব্যাপক ধরপাকড়, অন্যদিকে প্রবল জনবিক্ষোভ। দেশের প্রায় সর্বত্র প্রকাশ্য বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। মহারাষ্ট্রের কয়েকটি অঞ্চল, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ, উত্তর বিহার, বঙ্গদেশের তমলুক মহকুমায় জাতীয় সরকার গঠিত হয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও কলকারখানায় দীর্ঘদিন ধরে ধর্মঘট চলে। স্বাধীন সরকার ও তার বেতারকেন্দ্র কোনও কোনও স্থানে গড়ে ওঠে। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে সহস্রাধিক ব্যক্তি নিহত ও তিন সহস্রাধিক ব্যক্তি আহত হন।

সংগঠনের অভাবে ভারত ছাড় আন্দোলন মাস কয়েকের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে পড়ে। আন্দোলনের পিছনে কার্যত বামপন্থীরাই ছিলেন প্রথমাবধি সক্রিয়। কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির নেতা আচার্য নরেন্দ্র দেব পরে মন্তব্য করেন যে আন্দোলনের অভীষ্ট লক্ষ্যের সিদ্ধিলাভ হয়নি। তার কারণ হিসাবে আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ জেল থেকে মুক্তির পর বলেন যে কুশল সংগঠন ও জনসমক্ষে কর্মসূচি তুলে ধরার অভাবে আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়। সবাই ভেবেছিলেন যে গান্ধীজি আন্দোলনের একটি কর্মসূচি তুলে ধরবেন। কিন্তু অনতিকাল পরে মুক্তি পেয়ে গান্ধীজি বড়লাটের সঙ্গে যখন আলোচনায় বসেন তখন তিনি সহিংস অগস্ট আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করেন।

ভারতীয় জনতা পার্টি (Bharatiya Janata Party)

জনসংঘ তথা ভারতীয় জনসংঘের পরিবর্তিত বর্তমান নাম। জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ১৯৪৯ খ্রি মাঝামাঝি হিন্দু মহাসভা পরিত্যাগ করেন। সে সময়ে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। দিল্লিতে ১৯৫০ খ্রি নেহরু-লিয়াকত আলি চুক্তির প্রতিবাদে তিনি মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৫১ খ্রি গোড়ায় প্রাদেশিক ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ ও পঞ্জাবে জনসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পিছনে ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের জোরালো সমর্থন। ক্রমে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রাদেশিক সংঘ গড়ে ওঠে। ওই বছরের ২১ অক্টোবর বিভিন্ন প্রাদেশিক সংঘের সমন্বয়ে ভারতীয় জনসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদ ঘোষণা করেন যে 'ধর্মরাজ্য অর্থাৎ আইনের শাসন গড়ে তোলাই' সংঘের অভীষ্ট বস্তু।

ভারতে ১৯৫১-৫২ খ্রি সাধারণ নির্বাচনে ভারতীয় জনসংঘ চারটি সর্বভারতীয় দলের অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৫৩ খ্রি ২৩ জুন শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে সংঘ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সংঘের উপর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের আধিপত্যের প্রশ্ন দলের ভিতর দীর্ঘকালের একটি বিতর্কের বিষয়। সেইসূত্রে ১৯৫৪ খ্রি মৌলিচন্দ্র শর্মা

তাঁর সমর্থকদের নিয়ে দল ত্যাগ করেন। ১৯৫৫ খ্রি জম্মুতে পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরার নেতৃত্বে প্রজা পরিষদ জনসংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়। দক্ষিণ ভারতে সংঘের অস্তিত্ব ছিল নগণ্য। ১৯৬৭ খ্রি ডিসেম্বরে সংঘের চতুর্দশ বার্ষিক সম্মেলন কালিকটে অনুষ্ঠিত হবার পর দক্ষিণ ভারতে সংঘের জনপ্রিয়তা দৃঢ়মূল হতে শুরু করে। পরের বছর সংঘের উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়ে যখন দলের দীর্ঘকালের সংগঠক ও সাধারণ সচিব দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবনাবসান ঘটে। উপাধ্যায় দলের সাংগঠনিক রদবদলের সঙ্গে চেয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের আধিপত্য থেকে মুক্তি।

পঞ্জাবের হোসিয়ারপুর জেলায় প্রকাশ দেব এবং মনিলাল শর্মা ১৯৬৯ খ্রি দল ছেড়ে স্বতন্ত্র জনসংঘ নামে একটি দল গঠন করেন। পরের বছর অকালি দলের সঙ্গে রাজ্য জনসংঘের মিতালির প্রতিবাদে এবং হিন্দি ভাষার স্বার্থে ফকিরচাঁদ আগরওয়াল দল থেকে ইস্তফা দিয়ে দ্বিতীয় স্বতন্ত্র জনসংঘ সৃষ্টি করেন। ১৯৭২ খ্রি উত্তরপ্রদেশে সংঘের বিশিষ্ট নেতা আর ভি কাপুর স্বয়ংসেবকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। একই কারণে বিহারের বিশিষ্ট নেতা কালিকানন্দন দল থেকে ইস্তফা দিয়ে রাষ্ট্রীয় জনসংঘ গঠন করেন।

দলের রাজনৈতিক কৌশলের প্রশ্নে বিশেষ করে ১৯৬৭ খ্রি সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্টদের সঙ্গে জোট বাঁধার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন জনসংঘের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা বলরাজ মাধোক ; বস্তুত সেটা ছিল সেবছরে স্বতন্ত্র দল ও ১৯৭১ খ্রি নির্বাচনে কংগ্রেস (স) দলের সঙ্গে মোর্চার অন্যতম অঙ্গ। দলের তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু হয়নি। বলরাজকে ১৯৭৩ খ্রি ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয় ; পরে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি ক্ষমতাশালী অটলবিহারী বাজপেয়ী গোষ্ঠীর উপর দোষারোপ করেন ; মাধোকও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকদের একটা দায় হিসেবে দেখতেন। ১৯৭৪ খ্রি জনসংঘ জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে বিহারে বিধানসভার পুনর্নির্বাচনের দাবির সমর্থনে দলীয় সদস্যদের পদত্যাগের নির্দেশ দেয়। সদস্যদের একাংশ সেই নির্দেশ অমান্য করে।

১৯৭৭ খ্রি ইন্দিরা গান্ধী সরকার বিগত বছর দুয়েকের এমার্জেন্সি অর্ডার প্রত্যাহার করে সাধারণ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে জয়প্রকাশের নেতৃত্বে বিভিন্ন অকমিউনিস্ট দল, যথা কংগ্রেস (স), লোকদল ও সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে ভারতীয় জনসংঘ **জনতা পার্টি** নামে নতুন একটি দলে মিশে যায়। নির্বাচনে জনতা পার্টির অন্তর্ভুক্ত জনসংঘীরা লোকসভায় অন্যান্যদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি আসন পায়। অবশ্য সব দলই তাদের স্বতন্ত্র সত্তা জনতা পার্টিতে মিশিয়ে দিয়েছিল। ১৯৮০ খ্রি এপ্রিলে জনতা পার্টির কার্যনির্বাহী সমিতি পার্টির সদস্যদের দ্বৈত দলীয় সদস্যপদ অর্থাৎ সদস্যদের অন্য কোনও দলের সদস্যপদে থাকার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু পূর্বতন জনসংঘীরা অধিকাংশই তাঁদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্যপদ বজায় রাখেন। এই নিয়ে জনতা পার্টিতে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। শেষাবধি ১৯৮০ খ্রি এপ্রিল মাসে জনসংঘীরা জনতা পার্টি থেকে সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে এসে ভারতীয় জনতা পার্টি (সংক্ষেপে বি জে পি) গঠন করেন। পার্টির সভাপতি হন অটলবিহারী বাজপেয়ী।

দলের ১৯৯১ খ্রি নির্বাচনী ইস্তাহার এবং সারনাথ অধিবেশনের (১৯৯২) সিদ্ধান্ত

অনুযায়ী জাতীয় অখণ্ডতা, মূল্যবোধভিত্তিক গণতন্ত্র ও রাজনীতি, প্রত্যক্ষ (পজিটিভ) ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র বি জে পি-র লক্ষ্য। জাতীয় ঐতিহ্য এবং গান্ধীজি ও দীনদয়ালজীর ভাবধারায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার নবরূপায়ণ তার আদর্শ। স্বরাজ ও স্বদেশি প্রত্যয়ের উপর তারা গুরুত্ব আরোপ করে। বি জে পি-র দৃষ্টিতে সারা ভারতের জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে জাতীয় সুসংবদ্ধতার অন্তর্নিহিত মূল সুর হল হিন্দুত্ব। বি জে পি-র ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলির অন্যতম হল অর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল ও ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ।

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের বিষয়টিকে বি জে পি প্রথমাবধি হিন্দু জনচিত্তে প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। ১৯৯২ খ্রি ডিসেম্বরে বাবরি মসজিদ ধ্বংসে বি জে পি-র ভূমিকা থাকার দরুন চারটি রাজ্যে বি জে পি সরকার ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়।

১৯৯৪ খ্রি এপ্রিলে দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সরিস্কাতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বি জে পি-র রণকৌশল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে হিন্দুত্ব ও রামজন্মভূমির উপর কেবল নির্ভর না করে জাতপাত ও নিম্নবর্গের মানুষের স্বার্থের উপর জোর দেওয়া হয়। ওই বছরের ডিসেম্বরে দলের নেতৃবর্গ প্রগতিশীল জাতীয়বাদ ও প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে আর এস এস অনুসৃত স্বদেশি মতাদর্শের অর্থনৈতিক বিষয়াদির সামঞ্জস্যের প্রশ্ন তোলেন। গ্যাট চুক্তির সমালোচনা, একচেটিয়া বাণিজ্য ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রবেশ রদ করার সঙ্গে কারিগরি বিদ্যার উন্নয়ন, বিকেন্দ্রীকরণ, দুর্নীতি নিবারণ এবং সর্বোপরি গান্ধীবাদী অন্ত্যোদয় আদর্শের উপর জোর দেওয়া হয়। হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদের সংমিশ্রণে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ত্রিমুখী চিহ্ন বিশিষ্ট ত্রিশূল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়। ত্রিশূলের তিনটি মুখ হল নিরাপত্তা, জাতীয় সমন্বয় এবং স্বদেশী ভাবধারা। উচ্চ বর্ণের দল হিসেবে বিবেচিত বি জে পি অনেকের দৃষ্টিতে একটি বেনিয়া প্রভাবিত দল। কর্ণাটক রাজ্যের নির্বাচনে বি জে পি-র আংশিক সাফল্য দলকে উদ্দীপিত করে। জনপ্রিয়তা অর্জনের তাগিদে রাম রোটি ও ইনসাফ ছেড়ে ছয় রাজ্যের নির্বাচনে (১৯৯৫) রোটি নিমক আউর পানি ছাড়াও নানা ধরনের আর্থিক ও জীবনযাত্রার উন্নতির প্রতিশ্রুতি দেয় বি জে পি-র কর্মসমিতি। তার আগে পানাজিতে আয়োজিত জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে দলিত, উপজাতি ও পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় সমূহের স্বার্থ-সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি নির্বাচনে ফলপ্রসূ হয়। ১৯৯৫ খ্রি এপ্রিল মাসে বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে ভিররে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে নির্বাচনে সাফল্য অর্জনের অনুকূল যাবতীয় প্রতিশ্রুতি নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত হয়। এজন্য বি জে পি-র মুসলিম সম্প্রদায়কে তোষণ করার নীতি সংঘ পরিবারের মূল সংস্থা আর এস এস-কে শঙ্কিত করে তোলে। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়কে বি জে পি-র ত্রিবিধ 'T' নামক সুবিধাদির প্রতিশ্রুতি। যথা তালিম (শিক্ষা), তনজিম (সংগঠন) এবং তিজরত (ব্যবসায় ও কর্মসংস্থান)। দিল্লি, রাজস্থান, গুজরাত ও মহারাষ্ট্র (মোর্চা) রাজ্যে ক্ষমতাসীন বি জে পি লোকসভার প্রধান বিরোধী দল হিসাবে অধিষ্ঠিত। ১৯৯৬ খ্রি অনুষ্ঠেয় লোকসভার নির্বাচনে বি জে পি বিকল্প সরকার গঠনের অভিলাষী।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress)

প্রথম ও প্রধান সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। ১৮৮৫ খ্রি ২৮ ডিসেম্বর বোম্বাইতে প্রধানত অ্যালান অকটেভিয়ান হিউম (১৮২৯-১৯১২) নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ানের উদ্যোগে আহূত প্রথম সম্মেলনে কংগ্রেস (সংক্ষেপে) দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেন ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী। কংগ্রেসের চারটি উদ্দেশ্যের কথা তিনি বলেন: ১. বিভিন্ন প্রদেশে দেশোন্নয়নে যুক্ত ব্যক্তিদের পারস্পরিক সংযোগ; ২. জাতিধর্মবর্ণের ঊর্ধ্বে ঐক্যসাধন; ৩. আলোচনার মাধ্যমে দেশের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের পথ নিরূপণ ও ৪. রাজনৈতিক উন্নয়নে পরবর্তী বছরের নীতিনির্ধারণ। ৭২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পশ্চাৎপট সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত আছে, তার অন্যতম হল যে প্রারম্ভিক প্রয়াস হিসেবে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশে যে সব আঞ্চলিক দল গঠিত হয়েছিল সেগুলির সমন্বয়ে একটি সর্বভারতীয় দল গঠনের চিন্তা অনেকের মনে দেখা দেয়; বাস্তবে সেটাই রূপায়িত করেন হিউম। তিনি চেয়েছিলেন নিয়মতান্ত্রিক পথে সরকারের সমর্থনে লোকের রাজনৈতিক চেতনা ও সংঘবদ্ধতা গড়ে তুলতে। হিউমকে পরোক্ষে উৎসাহ দেন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন। কংগ্রেসের প্রথম বাইশ বছর (১৮৮৫-১৯০৮) হিউম তার জেনারাল সেক্রেটারি ছিলেন। পুরোমাত্রায় রাজভক্তি থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ইংল্যান্ডের অনেকের মনে একটি বিদ্রোহের সংকেত বলে মনে হয়েছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব ইতিহাসসূত্রে একথাও বলা হয় যে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কলকাতায় ১৮৮৩ খ্রি ভারত সভা (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন)-এর আমন্ত্রণে যে জাতীয় সমিতির (ন্যাশনাল কনফারেন্স) অধিবেশন হয় সেটি বঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তনধারায় উদ্ভূত হয়। তাতে অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিরাও যোগদান করেন। ১৮৮৫ খ্রি বোম্বাইতে প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনের একদিন পূর্বে কলকাতায় জাতীয় সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। জাতীয় সমিতি ছিল কংগ্রেসের আদর্শ। অচিরেই জাতীয় সমিতি কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যায়।

জাতীয় আন্দোলনের ধারক ও বাহক কংগ্রেসের প্রাক-স্বাধীনতা আমলের ইতিহাস মোটামুটি চারটি পর্যায়ে বিভক্ত:

১. ১৮৮৫-১৯০৪। নরমপন্থী (মডারেট) ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পর্ব।

২. ১৯০৫-১৯২০। চরমপন্থীদের উত্থান, স্বদেশী ও হোম রুল আন্দোলন। রৌলট আইন ও সত্যাগ্রহ। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। মন্টফোর্ড শাসন সংস্কারের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের আংশিক স্বীকৃতি।

৩. ১৯২০-১৯২৯। গান্ধী প্রদর্শিত খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। স্বরাজ্য দলের উত্থান। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ।

৪. ১৯৩০-১৯৪৭। আইন অমান্য আন্দোলন। লবণ সত্যাগ্রহ। ভারত ছাড় আন্দোলন।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সরকারের কাছে দাখিলের জন্য ন'টি সুপারিশ গৃহীত হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটি উল্লেখযোগ্য:

১. ভারতের শাসনব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে তদন্তের জন্য একটি রয়াল কমিশন নিয়োগ; ২. সেক্রেটারি অব স্টেটের পরামর্শ সভার অবলুপ্তি; ৩. কেন্দ্রীয় ও

প্রাদেশিক আইনসভাগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধি ও অধিকতর ভারতীয় সদস্য নিয়োগ ; ৪. ভারতের সামরিক ব্যয় হ্রাস ও ইংল্যান্ডের সঙ্গে সমহারে ব্যয়বণ্টন ; ৫. উচ্চপদে কর্মচারী নিয়োগকালে ভারত ও ইংল্যান্ডে একযোগে পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রার্থীর ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধি করা।

সরকার কংগ্রেসের সুপারিশগুলি অগ্রাহ্য করেন। তা হলেও দেশের ক্রমবর্ধিষ্ণু রাজনৈতিক চিন্তা ও চেতনায় সেগুলি সাড়া জাগায়। কংগ্রেসের কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশন যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক হয় ; উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৪৩৪ জন। সভাপতিত্ব করেন দাদাভাই নওরোজি। এবারও কয়েকটি আবেদনমূলক সুপারিশ গৃহীত হয়। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষ করে দারিদ্র্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মাদ্রাজে ১৮৮৭ খ্রি কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হয়। সভাপতি ছিলেন বদরুদ্দীন তৈয়বজি। এই অধিবেশনে স্থির হয় যে কংগ্রেসের কর্মসূচি ও আলোচ্য বিষয়সমূহের খসড়া প্রস্তুতির জন্য একটি ছোট সমিতি গঠিত হবে। উত্তরকালে সেটাই বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে পরিণত হয়। দলের একটি নিয়মাবলি প্রস্তুতিরও সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কিন্তু সেটা পরবর্তী দু'দশক কালেও সম্পন্ন হয়নি। বদরুদ্দিন তৈয়বজি দেশের মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসে যোগদানের আহ্বান জানান। কিন্তু **সৈয়দ আহমদ**, কলকাতার **আমির আলি** প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রতিবন্ধকতায় সে-আহ্বান বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি।

আবেদন-নিবেদনের মধ্যে দিয়েই বার্ষিক অধিবেশন সাঙ্গ হত। সারা বছর কংগ্রেসের আর কোনও কাজ থাকত না। যে কারণে **বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ** প্রমুখ অনেকেই কংগ্রেসের সমালোচনা করেন। পশ্চিমি শিক্ষিত উচ্চবিত্ত, কিছু মানুষের মধ্যে কংগ্রেস আবদ্ধ থাকায় হিউম প্রস্তাব করেন যে অতঃপর জন-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণকে উৎসাহিত করে তুলতে হবে। ফলে ইংরেজ আমলাবর্গ আরও রুষ্ট হয়ে পড়েন। কারণ সরকার কংগ্রেসকে ইংরেজ-শাসনের বিরোধী বলে মনে করত। অবশ্য কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রস্তাবের আংশিক স্বীকৃতি ১৮৯২ খ্রি কাউন্সিল সংস্কারের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়।

কংগ্রেসের অনুসৃত এতদিনকার নিরুত্তাপ কর্মপন্থায় লোকে ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়েছিল— নবীনপন্থীদের মধ্যে একটা উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে উঠতে শুরু করেছিল, যার পিছনে ছিল **স্বামী বিবেকানন্দের** আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের আদর্শ এবং মহারাষ্ট্রে **টিলকের** নেতৃত্বে মুক্তি-আন্দোলনের অনুরূপ কর্মপন্থা। বিপ্লবী চিন্তার পরিচয় অরবিন্দ ঘোষের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলিতে (১৮৯৩-৯৪) ফুটে ওঠে। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে চরমপন্থী চিন্তার বিস্তার ঘটে। মহারাষ্ট্র ও বঙ্গের 'জাতীয়তাবাদী' নামে পরিচিত কর্মীরা মডারেট (নরমপন্থী) নীতির বিপরীত সংগ্রামী কর্মসূচির ভিত্তিতে কংগ্রেসেরই ভিতর থেকে ১৯০৬ খ্রি প্রকাশ্যে একটি গোষ্ঠী গঠন করেন।

নরমপন্থীরা আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে ইংরেজেরই পক্ষপুটে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন চাইতেন। তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক আদর্শ, উদারনৈতিক মনোভাব, তথ্যনির্ভর চিন্তা ও বাস্তববোধের প্রাধান্য ছিল। নওরোজি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ফিরোজশাহ মেটা, **গোপালকৃষ্ণ গোখলে** প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাদের

পুরোভাগে ছিলেন। পক্ষান্তরে লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর টিলক, বিপিনচন্দ্র পাল (লাল-বাল-পাল) ও **অরবিন্দ** প্রমুখ চরমপন্থীরা ছিলেন খাঁটি স্বাদেশিকতায় অনুপ্রাণিত ; তাঁরা চাইতেন আপসহীন প্রতিরোধ ও পূর্ণ স্বাধীনতা। আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদকে তাঁরা হিন্দু পুনর্জাগরণে পরিমিশ্রিত করেন।

বোম্বাই কংগ্রেসে (১৯০৪) চরমপন্থীদের অস্তিত্ব প্রথম অনুভূত হয় ; তাঁরা চেয়েছিলেন জাতীয় আবেগের ভিত্তিতে আরও প্রত্যক্ষ ও সংগ্রামী কর্মপন্থা ; কিন্তু তখন তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য, শক্তিতে ক্ষীণ। কলকাতা কংগ্রেসে (১৯০৬) চরমপন্থীরা অধিবেশন ছেড়ে বেরিয়ে এলেও তাঁদের চাপে চারটি বিষয়ের অনুমোদনে নরমপন্থীরা সম্মত হন, যথা স্বরাজ, জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশি পণ্যের ব্যবহার ও বিদেশি বস্তু বয়কট। সুরাট কংগ্রেসে (১৯০৭) নরম ও চরমপন্থীদের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) বিরোধী আন্দোলনের ফলে দেশের যুবশক্তি সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লবী কর্মনীতি গ্রহণ করে। সরকারি দমননীতি ও নিপীড়নও বৃদ্ধি পায়। অরবিন্দ কারারুদ্ধ হন। টিলক বর্মায় কারারুদ্ধ, লাজপৎ ও বিপিনচন্দ্র পাল দেশ থেকে নির্বাসিত হন। সরকার ফৌজদারি আইন সংস্কার ও চরমপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার করে (১৯০৮)। এরপর মর্লে-মিন্টো শাসনব্যবস্থা (১৯০৯) প্রবর্তিত হয়।

সুরাট অধিবেশনের (১৯০৭) পর কংগ্রেসে ভাঙন ধরেছিল। চরমপন্থী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব যেমন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তেমনই নরমপন্থী চালিত কংগ্রেস হীনবল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ১৯১৬ খ্রি লখনৌ কংগ্রেসে আবার ঐক্য দেখা দেয়। নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে সৌহার্দ ফিরে আসে। এই সময় টিলক ও অ্যানি বেসান্ত প্রবর্তিত **হোম রুল আন্দোলন**-এর ফলে বেসান্তের উপর অন্তরীণ আদেশ জারি হয়। তখন প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) চলছিল, দেশের জাতীয় চেতনাও ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছিল। নরমপন্থী নেতৃত্বের শক্তিও ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। জাতীয় আন্দোলনের মত ও পথও নতুনতর রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯১৯ খ্রি রৌলট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা ও মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের ত্রিবিধ অভিঘাতে জাতীয়তাবাদী শক্তি নবোদ্যমে দানা বাঁধে।

১৯২০ খ্রি মহাত্মা গান্ধী খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। 'সহযোগিতা বর্জন নীতি'র অন্যতম বিষয় জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, সালিশি আদালত প্রতিষ্ঠা ও কাউন্সিল বর্জন নীতি চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ অনেকে প্রথমে মেনে নিতে পারেননি। কংগ্রেসের ওই বছরে নাগপুর অধিবেশনের পর অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক হয়ে ওঠে। স্কুলকলেজ বর্জন, বিদেশি পণ্য বয়কট প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করেন। চৌরিচৌরা হত্যাকাণ্ড (১৯২২) ও বিপথগামিতার জন্য গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। গয়া কংগ্রেসে (১৯২২) সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব করেন। সে প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায় ও কংগ্রেসের ভিতর অসহযোগ নীতির পক্ষে ও বিপক্ষে দুটি প্রবল গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। বিপক্ষ গোষ্ঠীর প্রধান নেতা চিত্তরঞ্জন, মোতিলাল নেহরু, লাজপত রায় কংগ্রেসেরই ভিতর **স্বরাজ পার্টি** গঠন করেন। ১৯২৪ খ্রি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কোকোনাদ কংগ্রেসে (১৯২৩) স্থির হয় যে স্বরাজ পার্টি কংগ্রেসের অঙ্গ হিসেবে কাউন্সিলে তার কর্মসূচি অনুসরণ করে

চলবে। কুড়ির দশকের মাঝামাঝি সময়ে কংগ্রেস তথা জাতীয় আন্দোলনে ভাটা পড়ে। তবে এই দশকে বামপন্থী শক্তির প্রসার ঘটে। ট্রেড ইউনিয়নের ক্রমবিস্তার ও কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। **মানবেন্দ্রনাথ রায়** বার্লিন থেকে পত্রপত্রিকা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে এবং দূত মারফৎ ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন সংগঠিত করেন।

১৯২৭ খ্রি ব্রিটিশ সরকার প্রেরিত সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস আবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ওই বছরে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে **জওহরলাল** এর প্রস্তাবে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সময়ের কিছু আগে জওহরলাল ইউরোপে সমাজতন্ত্রীদের সম্মেলনে যোগদান ও সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ করে নতুন উদ্যম নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবে গান্ধীজির সায় ছিল না। তাই পরবর্তী কলকাতা অধিবেশনে (১৯২৮) কংগ্রেস ডোমিনিয়ান স্টেটাস অর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্রিটিশ সরকারের অনমনীয়তা ও যুবকর্মীদের অসন্তোষের ফলে লাহোর অধিবেশনে (১৯২৯) পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধীজি বড়লাট আরউইনের কাছে ১১ দফার একটি দাবি সনদ প্রেরণ করেন (৩০ জানুয়ারি ১৯৩০)। সেগুলি ছিল মাদকবস্তু নিষিদ্ধকরণ, ১৬ পেন্সে ১ টাকার বিনিময় হার প্রবর্তন, ভূমি রাজস্বের ৫০ শতাংশ হ্রাস, লবণ শুল্ক রদ, ৫০ শতাংশ সামরিক ব্যয় হ্রাস, সরকারি ব্যয় ও আমলাদের বেতন হ্রাস, বিদেশি বস্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক আরোপ, উপকূলবর্তী পরিবহণে কেবল ভারতীয় জাহাজ ব্যবহার, রাজবন্দিদের মুক্তি ও ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের সংশোধন, গোয়েন্দা বিভাগের অবলুপ্তি ও আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অধিকার প্রদান।

সরকার উল্লিখিত দাবিসমূহ মানতে অস্বীকার করেন। ১৯৩০ খ্রি ২ মার্চ তারিখের এক চিঠিতে গান্ধীজি সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন বলে জানান। ১২ মার্চ তিনি ৭৮জন সঙ্গীকে নিয়ে লবণ আইন ভাঙার জন্য ডাণ্ডি অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করেন। অতঃপর সারা দেশে লবণ আইন ভঙ্গ শুরু হয়ে যায়। গান্ধী গ্রেপ্তার হন। মধ্যস্থদের প্রয়াসে গান্ধী এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা ১৯৩১ খ্রি ২৫ জানুয়ারি জেল থেকে মুক্তি পান। বড়লাট আরউইনের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের আলোচনার পর ৫ মার্চ গান্ধি-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল সাত দফা চুক্তিতে সমস্ত রাজবন্দির মুক্তি, অর্ডিন্যান্সগুলির প্রত্যাহার, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি মালিকদের প্রত্যার্পণ এবং কিছু কিছু অঞ্চলে লবণ আইন শিথিল হবে। কংগ্রেস সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করে।

২৩ মার্চ ১৯৩১ বিপ্লবী ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসি হয়। ২৯ মার্চ করাচিতে অস্বস্তিকর পরিবেশে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলি গৃহীত হয়। এরপর গান্ধীজি লন্ডনে দ্বিতীয় রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগদান করেন। গান্ধীজির বক্তব্য বিশেষ করে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ফলপ্রসূ হয়নি। ১৯৩২ খ্রি ১০ জানুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটি আইন অমান্য আন্দোলনের ১২ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। সরকার সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করে দমননীতি চালায়। ১৯৩২ খ্রি এপ্রিল পর্যন্ত ৮০,০০০ সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হন। তার মধ্যে ৫০০০ জন ছিলেন নারী সত্যাগ্রহী।

ইতিমধ্যে ৪ অগস্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড পুরানো সম্প্রদায়ভিত্তিক

পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর **নীতি** বজায় রেখে **হরিজনদের** জন্যও ওই একই প্রথা প্রসারের সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। গান্ধীজি তখন পুনায় কারারুদ্ধ। নব্যনীতির প্রতিবাদে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও তফসিলিদের মুখপাত্র বি আর অম্বেডকরের সমবেত প্রচেষ্টায় মিটমাট হয়। হরিজনদের জন্য প্রস্তাবিত আসনসংখ্যা দ্বিগুণ নির্ধারিত হয়, কিন্তু যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে। এদিকে আইন অমান্য আন্দোলনও চলেছিল। সরকারি দমনমূলক ব্যবস্থা তীব্র হয়ে ওঠে। গান্ধীজি ১৯৩৩ খ্রি ৮ মে তারিখ থেকে আত্মশুদ্ধিকল্পে অনশন শুরু করেন। ওই দিনই সরকার তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেয়। জেলের বাইরে তিনি আমরণ অনশন চালিয়ে যান। ১৪ জুলাই আইন অমান্যের গণ-আন্দোলন মুলতুবি রেখে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ চালানোর সিদ্ধান্ত হয়। সে অধিকার কেবল গান্ধীকেই দেওয়া হয়। তাতে কংগ্রেসের যুবকর্মীরা রুষ্ট হন। ১৯৩৪ খ্রি মে মাসে পাটনায় অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে নিয়মতান্ত্রিক পথ অনুসরণ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।

১৯৩৪ খ্রি শেষ দিকে গান্ধীজি কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করে হরিজনদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৃত হন। ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) অনুযায়ী ১৯৩৭ খ্রি সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়ে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জওহরলাল ও বামপন্থী গোষ্ঠী সমূহের আপত্তি ছিল। ব্যতিক্রম মানবেন্দ্রনাথ, তিনি চাইতেন আইনসভার ভিতরে থেকে অচলাবস্থার সৃষ্টি। গান্ধীজির প্রভাব ও বড়লাটের হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দেবার ফলে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৩৪ খ্রি মে মাস থেকে ১৯৪০ খ্রি অবধি কংগ্রেসের কোনও সংগ্রামী ভূমিকা ছিল না। বামপন্থীরা চাইতেন আন্দোলন অবিলম্বে শুরু হোক, কিন্তু সংগ্রামবিমুখ গান্ধীজির নেতৃত্বে। মানবেন্দ্রনাথ চাইতেন গান্ধী ও দক্ষিণপন্থীদের বিকল্প বাম নেতৃত্ব গড়ে তুলতে। ১৯৩৯ খ্রি দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়ে **সুভাষচন্দ্র** যখন গান্ধীজির মতামত অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে ব্যর্থ হন, তখন মানবেন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে নিজ ক্ষমতা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী অগ্রসর হবার পরামর্শ দেন। সুভাষচন্দ্র তার পরিবর্তে পদত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক গড়লেন। রায় লিগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন গড়লেন। ১৯৩৯ খ্রি অক্টোবরে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশ থেকে মন্ত্রিসভা প্রত্যাহার করে নেয় সরকারের যুদ্ধনীতির প্রতিবাদে। এ ব্যাপারেও মানবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে প্রাদেশিক শাসনের ক্ষমতায় থেকে ইংরেজদের সঙ্গে সংগ্রাম বেশি কার্যকর হবে। মন্ত্রিসভা ছাড়ার ফলে ইংরেজ সরকার মুসলিম লিগের উপর যুদ্ধের প্রয়োজনে নির্ভর করতে বাধ্য হয়। লিগের তখন শক্তি ও সমর্থন ছিল নগণ্য।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে কংগ্রেস প্রথম দিকে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। জওহরলাল, আজাদ প্রমুখ কিছু নেতা নিঃশর্তে ফ্যাসিবিরোধী মিত্রশক্তির পক্ষ গ্রহণের সমর্থক ছিলেন। গান্ধী দোলাচল চিন্তায় আশু স্বাধীনতার দাবিতে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের নির্দেশ দিলেন। অনেক নেতাই গ্রেপ্তার হলেন। **কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট** ও অন্যান্য বামপন্থী দল দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসেবে বিচার করে মুক্তি সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন। যুদ্ধের সুযোগে ও বৈদেশিক সাহায্যের আশায়

সুভাষচন্দ্র গোপনে জার্মানি চলে যান এবং পরে জাপানের সাহায্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। যুদ্ধের ফ্যাসিবিরোধী চরিত্রে বিশ্বাসী মানবেন্দ্রনাথ মিত্রপক্ষকে সমর্থন করেন। যুদ্ধে মিত্রপক্ষের পরাজয় বিশ্বে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করবে এবং জয় হলে যুদ্ধের শেষে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা অনিবার্য বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। মিত্রপক্ষকে অনুরূপ সমর্থনের পক্ষপাতী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, রাজাগোপালাচারি, অম্বেডকর প্রমুখ ব্যক্তি।

১৯৪২ খ্রি মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে কংগ্রেসের সহযোগিতার আশায় স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠান। শাসনব্যবস্থায় অধিকতর সুযোগ-সুবিধা সংবলিত যে সব প্রস্তাব ক্রিপস উপস্থাপিত করেন সেগুলি নিয়ে কংগ্রেস, **মুসলিম লিগ**, **হিন্দু মহাসভা** প্রভৃতি দল পৃথকভাবে ক্রিপসের সঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করেন। কিন্তু যুদ্ধ সমাপ্তির পূর্বে যথার্থ ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা না থাকায় ক্রিপসের সঙ্গে কংগ্রেসের আলোচনা ভেঙে যায়। ক্রিপস প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য মানবেন্দ্রনাথ জওহরলালকে অনুরোধ করেছিলেন। সে অনুরোধ রক্ষিত হলে যুদ্ধোত্তর ভারত বিভাগ হয়তো এড়ানো যেত। ১৯৪২ খ্রি ৮ অগস্ট বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে অবিলম্বে দেশব্যাপী অহিংস সংগ্রাম শুরু করার সিদ্ধান্ত এবং গান্ধীকে সেই 'ভারত ছাড়' আন্দোলন পরিচালনের নেতৃত্ব প্রদত্ত হয়। সারা দেশের অনেক জায়গায় শাসন ক্ষমতা সরকারের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। জনগণ বিক্ষোভ, ধর্মঘট ও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়। এদিকে জাপানি বাহিনী তখন পূর্ব সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করছে। ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সমেত ষাট হাজার ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করেন। মাস তিনেক পরে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। জয়প্রকাশ নারায়ণের উক্তি অনুযায়ী প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও নেতৃত্বের অভাবে ভারত ছাড় কার্যত ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৯৪৪ খ্রি মে মাসে গান্ধীজি মুক্তি পান। অন্যেরা যুদ্ধ শেষ হবার পর মুক্ত হন। তার অনতিকাল পরে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের বিচার ও নৌবিদ্রোহ সূত্রে দেশে প্রবল আন্দোলন দেখা দেয়। ১৯৪৬ খ্রি গোড়ায় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস সফল হয়, কিন্তু মুসলিমদের সংরক্ষিত আসনে লিগ সাফল্য লাভ করে।

যুদ্ধের পর ব্রিটেনের নির্বাচনে শ্রমিক দল ক্ষমতাসীন হয়। ১৯৪৫ খ্রি জুন মাসে নতুন ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল সিমলায় এক সর্বদলীয় বৈঠকে বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের পুনর্গঠনের প্রস্তাব দেন। কংগ্রেস ও লিগের ঐকমত্যের অভাবে ওয়াভেল প্রস্তাব ভেস্তে যায়। ১৯৪৬ খ্রি ২৩ মার্চ ব্রিটেন থেকে তিন সদস্যের এক ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে এবং দীর্ঘমেয়াদী একটি ফেডারেশন গঠন ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার—এই দু ধরনের শাসন ব্যবস্থার প্রস্তাব করে, মিশনের প্রস্তাবানুসারে ১৯৪৬ খ্রি জুলাই মাসে গণপরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়। ক্যাবিনেট মিশনের মূল প্রস্তাবে লিগের খুব বেশি আপত্তি ছিল না। কিন্তু জওহরলাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে মূল প্রস্তাবের দীর্ঘমেয়াদী ফেডারেশনের বিষয় গণপরিষদে নিষ্পত্তি হবে বলে মন্তব্য করায় লিগ রুষ্ট হয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান থেকে বিরত থাকে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচি গ্রহণ করে। ফলে দেশব্যাপী তীব্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। অবশেষে অক্টোবরে লিগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ

দেয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব অনুসারে গণপরিষদের ব্যাপারে প্রদত্ত সম্মতি প্রত্যাহার করে। ডিসেম্বর মাস থেকে গণপরিষদ বসে, লিগ তাতে যোগ দেয়নি। ওয়াভেল, নেহরু, জিন্না ও বলদেব সিং সেক্রেটারি অব স্টেটের আমন্ত্রণে লণ্ডনে যান। লিগ দেশবিভাগের দাবি তোলে। কংগ্রেস আপত্তি জানায়।

১৯৪৭ খ্রি ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ভারতে পরবর্তী বছরের মধ্যে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। মার্চ মাসে ওয়াভেলের জায়গায় ভাইসরয় পদে মাউন্টব্যাটেন যোগ দেন এবং জুন মাসে ঘোষণা করেন যে, ১৫ অগস্ট তারিখে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে দেশ বিভক্ত হবে। কংগ্রেস সে প্রস্তাব মেনে নেয়। স্বাধীন ভারতের শাসনক্ষমতা কংগ্রেস দলের হাতে প্রদত্ত হয়। ১৯৪৮ খ্রি জানুয়ারি মাসে গান্ধীজি প্রস্তাব করেন যে কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শ চরিতার্থ হয়ে যাবার পর দলের অস্তিত্ব বজায় রাখা নিষ্প্রয়োজন, কংগ্রেস তুলে দিয়ে তার সদস্যদের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। গান্ধীর সে নির্দেশ নিষ্ফল হয়।

কংগ্রেস এযাবৎকাল একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করত। অতঃপর তার মতাদর্শ ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা নষ্ট হতে শুরু করে। কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস সোসালিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী দল কংগ্রেস থেকে পৃথক হয়ে যায়। প্রায় একই সময়ে কংগ্রেসে ব্যক্তিত্বের লড়াই, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও আদর্শগত সংঘাত মাথা চাড়া দেয়। আচার্য কৃপালনী, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, রফি আহমেদ কিদোয়াই প্রমুখ প্রবীণ নেতারা সর্দার প্যাটেলের একাধিপত্যে পর্যুদস্ত হয়ে কংগ্রেস ছেড়ে কৃষক প্রজা মজদুর পার্টি গঠন করেন। প্যাটেলের মৃত্যুর (১৯৫১) পর জওহরলালের একাধিপত্যের অধ্যায় শুরু হয়। ১৯৫৫ খ্রি কংগ্রেসের আবাদি অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কর্মসূচি গৃহীত হয়। জওহরলাল তাঁর পথকে নিষ্কণ্টক করার জন্য কামরাজ প্ল্যান নাম দিয়ে কিছু সংখ্যক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে পদচ্যুত করেন।

১৯৬৬ খ্রি শুরু হয় ইন্দিরা গান্ধীর যুগ। মোরারজি দেশাইকে প্রতিহত করার জন্য কামরাজের নেতৃত্বে সিন্ডিকেট নামে অভিহিত কিছু সংখ্যক নেতার এক গোষ্ঠী ইন্দিরাকে প্রধানমন্ত্রী ও মোরারজিকে উপপ্রধানমন্ত্রী করেন। মোরারজির অর্থদপ্তর সরিয়ে নিয়ে ইন্দিরা ১৯৬৯ খ্রি জুলাই মাসে ১৪ টি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেন। অতঃপর কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নিজলিঙ্গাপ্পা তথা সিন্ডিকেটের সঙ্গে ইন্দিরার বিরোধ শুরু হয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ইন্দিরা বিরোধী সিন্ডিকেট নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস থেকে তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডির পরাজয়ের জন্য ১৯৬৯ খ্রি ১২ নভেম্বর বহিষ্কৃত করে। কিন্তু দুই তৃতীয়াংশ সমর্থনের অভাবে লোকসভায় তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়নি। অচিরে কংগ্রেস দল বন্ধনীতে সংগঠন ও ইন্দিরা সমর্থকেরা বন্ধনীতে শাসকদল হিসেবে দু টুকরো হয়ে যায়। লোকসভা ভেঙে দিয়ে ১৯৭১ খ্রি নির্বাচনে গাইবাছুর প্রতীক চিহ্নে ইন্দিরা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ করেন। সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ইন্দিরা বিরোধী পরিবেশ প্রবল হয়ে ওঠে। শ্রীমতী গান্ধী ১৯৭৫ খ্রি ২৬ জুন দেশে এমার্জেন্সি ঘোষণা করেন এবং ১৬ জুলাই থেকে বিশ দফা এক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ খ্রি নির্বাচনে দিল্লীর মসনদ থেকে কংগ্রেস প্রথম ক্ষমতাচ্যুত হয়। ইন্দিরাবিরোধী কংগ্রেসের যে

অংশ বন্ধনীতে সংগঠন শব্দটি ব্যবহার করত অর্থাৎ কংগ্রেস (স) সেটি নবগঠিত জনতা পার্টিতে মিশে গিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ক্ষমতাচ্যুত ইন্দিরা পক্ষীয় কংগ্রেসের (শাসক) সভাপতি ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি ও ওয়ার্কিং কমিটি বিভিন্ন কারণ দর্শিয়ে দল থেকে ইন্দিরাকে বহিষ্কার করে। কিন্তু লোকসভায় দলের সাংসদেরা ছিলেন ইন্দিরার পক্ষে। প্রধানত তাদের নিয়ে দিল্লিতে ১৯৭৮ খ্রি ২ জানুয়ারি এক জাতীয় কনভেনশনে অপর একটি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দিরা তার সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। ইন্দিরার নাম বন্ধনীতে যুক্ত হয়ে দলের নামকরণ হয় কংগ্রেস (ই)। নির্বাচন কমিশন থেকে স্বীকৃতি ও নির্বাচনী প্রতীক পাঞ্জা চিহ্ন প্রদত্ত হয়। ১৯৮০ খ্রি ১৪ জানুয়ারি ৩৩ মাস পরে কংগ্রেস (ই) লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা পেয়ে ইন্দিরার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে।

১৯৮৪ খ্রি ৩১ অক্টোবর দেহরক্ষীদের হাতে ইন্দিরা নিহত হবার পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন ; তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বে কংগ্রেস (ই) ১৯৮৯ খ্রি নভেম্বর মাস অবধি কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতায় থাকে। তারপর ১৯৯১ খ্রি জুন অবধি প্রায় উনিশ মাস ছেদ পড়ে। জুলাই মাসে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে কংগ্রেস দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে এল, এবারে অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়াই। সর্বসম্মতিক্রমে প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হয়েছেন দক্ষিণ ভারতীয় পি. ভি. নরসিমা রাও। কংগ্রেস যে শুধু একটি পারিবারিক কুক্ষি থেকে বেরিয়ে এসেছে তাই নয়, দেশের ভগ্নপ্রায় অর্থনৈতিক জীবনের পুনরুজ্জীবনের জন্য দল নেহরুপন্থী সমাজতন্ত্রী পথ কার্যত পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জাতীয় স্বাধীনতার পর কংগ্রেস থেকে অনেক গোষ্ঠী ও প্রবীণ ব্যক্তি দল ত্যাগ করে নতুন দল তৈরি করেন। অথবা ভিন্ন দলে যোগ দেন। কিন্তু ১৯৬৯ খ্রি ইন্দিরা গান্ধী যখন কংগ্রেসে ভাঙন ধরান, তখন তাঁর গোষ্ঠী ছিল শাসক গোষ্ঠী এবং সেটাই ক্রমে জাতীয় কংগ্রেসে পরিণত হয়। এরপর যাঁরা ভাঙন ধরান তাঁরা কংগ্রেসের পরিচিতি হারান। ১৯৭৭ খ্রি জগজীবন রামের নেতৃত্বে যে কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসি গঠিত হয় সেটি পরে জনতা পার্টিতে মিশে যায়। ১৯৭৮ খ্রি দেবরাজ আরসের নেতৃত্বে যে কংগ্রেস (আরস) গঠিত হয় সেটি পরে কংগ্রেস (স) নামে অস্তিত্ব রক্ষা করে। ১৯৮৮ খ্রি ভি পি সিং, অরুণ নেহরু, আরিফ মহম্মদ প্রমুখ নেতারা কংগ্রেস ছেড়ে জনমোর্চা গঠন করেন ও জনতা দলে যোগ দেন। ১৯৯৫ খ্রি বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ বহু গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। অর্জুন সিং ও নারায়ণ দত্ত তেওয়ারির নেতৃত্বে পালটা এক গোষ্ঠী নিজেদের আসল কংগ্রেস হিসেবে দাবি করছে। তাতেও কিছু অনৈক্যের লক্ষণ ফুটে উঠছে। তবে দল ও শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে না থাকায় তাঁদের পাল্লা বেশি ভারী নয়।

ভিত্তি ও উপরিকাঠামো (Base and Superstructure)

মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তার অন্তর্গত একটি তত্ত্ব যাতে মার্কস একটি বাড়ির সঙ্গে তত্ত্বটির তুলনা করেছেন। 'প্রিফেস টু এ ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি' (১৮৫৯) গ্রন্থে তিনি সামাজিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আইনগত যে উপরিকাঠামো সেটির উপর নির্মিত হয়েছে তার পার্থক্য দেখিয়েছেন। ভিত্তির

অন্তর্গত হল বিভিন্ন মানুষ বা শ্রেণীর সম্পর্ক যেটা উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নির্ধারণ করে। সেটা হল **উৎপাদন সম্পর্ক** যার মাধ্যমে **উৎপাদিকা শক্তি** কাজ করে। উপরিকাঠামোর মধ্যে পড়ে আইন, রাজনীতি ও সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যেগুলি অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সেটিকে প্রতিফলিত এবং শক্তপোক্ত করে তোলে। মার্কসীয় দৃষ্টিতে মনে করা হয় যে ভিত্তির পরিবর্তন হলে তবেই উপরিকাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। উল্টোটা কিন্তু নয়। সেই নিরিখে ইতিহাসের মৌল গতিপ্রকৃতি হল অর্থনৈতিক। আইন ও রাজনীতির পরিবর্তন তথা ভিত্তির উপর নির্মিত উপরিকাঠামোর পরিবর্তন সেই মৌল পরিবর্তনকে অনুসরণ করে, প্রভাবিত করে না।

ভূদান আন্দোলন (Bhoodan Movement)

আচার্য বিনোবা ভাবে কর্তৃক প্রবর্তিত অভিনব ভূমি-বণ্টন পদ্ধতি। সংক্ষেপে, যে-ব্যক্তি ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক, যার অন্যের ভূমিতে চাষ করা বা ক্ষেতমজুরি ছাড়া অন্য কোনও জীবিকা নেই, তার জন্যই ভূমিদান, যে ভূমি হবে ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে মুক্ত এবং ভূমির স্বত্ব গ্রামের সর্বসাধারণের উপর ন্যস্ত থাকবে। ভূমির এই ধরনের গ্রামীকরণের ভিত্তিতে কুটিরশিল্পপ্রধান অহিংস সমাজ গড়ে উঠবে। ভূমিহীন কৃষিজীবী মানুষের ভূমিক্ষুধা থাকা স্বাভাবিক। আইনের মাধ্যমে ভূমি-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়। অনেকের মতে একমাত্র হিংসার পথে ভূমি-সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব। বর্তমান অবস্থায় সেটাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভূদানযজ্ঞ শান্তি ও প্রেমের একমাত্র পথে এই ভূমিক্ষুধা তৃপ্ত করার ভারতব্যাপী একটি প্রয়াস। মূলত তার আবেদন আধ্যাত্মিক।

১৯৫১ খ্রি ১৮ এপ্রিল সর্বোদয় আন্দোলনের এক কার্যক্রমে পদযাত্রায় বিনোবাজি হায়দ্রাবাদের নিকটবর্তী তেলেঙ্গানা অঞ্চলে পচমপল্লী গ্রামে উপনীত হন। সেখানকার ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকেরা তাঁকে সরকারি জমি তাদের পাইয়ে দেবার অনুরোধ করে। যদি সরকারি জমি পাওয়া না যায়, অথবা বিলম্ব ঘটে তা হলে গ্রামের কোনও সম্পন্ন ব্যক্তি জমি দিতে পারেন কি না সেকথা সমবেত অধিবাসীদের জিজ্ঞেস করলে জনৈক গ্রামবাসী একশো একর জমি প্রদানে সম্মত হন। আশাতীতভাবে এত পরিমাণ জমির প্রতিশ্রুতি পাওয়ায় তাঁর চোখের সামনে ভূমি সমস্যা সমাধানের শান্তিময় পথের এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। নাম দিলেন ভূদানযজ্ঞ; তার বাণী বহন করে হিংসাবিধ্বস্ত রক্তস্নাত তেলেঙ্গানার দোরে দোরে ঘোরার সংকল্প করলেন। তাতে তিনি বিপুল সাড়া পেলেন। সারা ভারতে ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন প্রবর্তিত হল। তাঁর অনুমোদনক্রমে সর্বসেবা সংঘ প্রতি প্রদেশে প্রাদেশিক ভূদান যজ্ঞ সমিতি গঠন করে দেয়।

ভূদান যজ্ঞ থেকে ক্রমে গ্রামদান, গৃহদান, শস্যদান, সমবায় ইত্যাদি যুক্ত হয়। বিনোবাজি ভূদানযজ্ঞ কর্মসূচিতে ১. খাদি ও অন্যান্য পল্লীশিল্প, ২. জাতিভেদ দূরীকরণ ও ৩. নয়ীতালিম কাজ তিনটি যোগ করেন। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাঁর এই উদ্যমকে সমর্থন জানায়। ১৯৫৭ খ্রি জানুয়ারি মাস থেকে ভূদানযজ্ঞ সমিতিসমূহের বিলোপসাধন করা হয় এবং গান্ধী স্মারকনিধি থেকে যে আর্থিক সাহায্য নিয়ে এতদিন ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনের ব্যয়নির্বাহ হচ্ছিল সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ আন্দোলনকে

জন আধারিত করা হল। আন্দোলন পরিচালনের দায়িত্ব জনসাধারণের উপর অর্পিত হল। 'গ্রামদান, গ্রামস্বরাজ ও শান্তিসেনা'— এই ত্রিপদ বিশিষ্ট মন্ত্র তখন থেকে বিনোবাজির কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকে।

ভূ-রাজনীতি (Geopolitics)

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে একটি বিদ্যা। এফ রাটজেল নামে জনৈক সুইডিস তাঁর 'পলিটিক্যাল জিওগ্রাফি' (১৮৯৭) নামক বইতে বিষয়টি সর্বপ্রথম আলোচনা করেন। তাঁর ছাত্র আর জে কেলেন প্রত্যয়টির উদ্ভাবক। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভূ-রাজনীতি বিষয়ে অনেকগুলি তত্ত্ব গড়ে ওঠে। তার মধ্যে ইংল্যান্ডে হ্যালফোর্ড ম্যাকিন্ডার, কার্ল পিয়ারসন ও ফেয়ারগ্রিভ, যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাডমিরাল মাহান ও ব্রুকস অ্যাডামস এবং ফ্রান্সে ভ্যালো ও দেমানগিন এ বিষয়ে তাঁদের তত্ত্ব তুলে ধরেন।

হ্যালফোর্ড ম্যাকিন্ডার তাঁর 'ডেমোক্রেটিক আইডিয়ালস অ্যান্ড রিয়ালিটি' (১৯১৯) বইতে লেখেন যে তিনটি সংলগ্ন মহাদেশ (এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা) নিয়ে একটি 'বিশ্বদ্বীপ' তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া হল অপর দুটি দ্বীপ। পূর্ব গোলার্ধের ছোট ছোট দ্বীপগুলি হল অন্যান্য দ্বীপের সংলগ্ন। বিশ্বদ্বীপের অভ্যন্তরে একটি মূল ভূখণ্ড আছে— সেটা হল ভলগা নদী ও পূর্ব সাইবেরিয়ার পাহাড়াঞ্চলের মাঝামাঝি জায়গা, উত্তর মেরু ও হিমালয়ের মাঝামাঝি। তার হিমবাহ পূর্ব ইউরোপের উল্লিখিত মূল ভূখণ্ডের বেশিটা রাশিয়ার অধীন। অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি পূর্ব ইউরোপ ভূখণ্ডে বিস্তারিত। ম্যাকিন্ডারের বক্তব্য ছিল : যারা পূর্ব ইউরোপে শাসন চালায় তারা মূল ভূখণ্ডে আধিপত্য করে, মূল ভূখণ্ডে যারা ক্ষমতাবান তারা বিশ্বদ্বীপের অধিকার ভোগ করে।

ম্যাকিন্ডারের তত্ত্ব জার্মানিতে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। ভূ-রাজনীতির জার্মান তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন জাতি বা রাষ্ট্র জীবসদৃশ জীবন সংগ্রামে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে সদাই ব্যস্ত। যে সব ভূখণ্ডে পৃথিবী বিভক্ত, মানুষের ইচ্ছা থাক বা না থাক ওইসব ভূখণ্ডই সংগ্রামের এলাকা নিরূপণ করে। সমস্ত জাতি একই শক্তি সমুচয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যে শক্তিকে তার ভূখণ্ড প্রভাবিত করে। এই তত্ত্বই পরিকল্পনা (envisage) করে চিরন্তন সংগ্রামের, তারা দেখাতে চেষ্টা করে যে ১৯২০ খ্রি কীভাবে জার্মানির জনগণ নিজেদের বাক্সবন্দি বলে অনুভব করত, যেকারণে জার্মানিকে চিরকাল একটা বিশ্বশক্তি হতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। ১৯২৩ খ্রি মিউনিখে জেনারেল কে হশোফের ইন্সটিটিউট অব জিওপলিটিকস স্থাপন করেন। 'লেবেনস্রম' স্লোগানের উদ্ভাবক ছিলেন তিনি। যার অর্থ হল বাসভূমি। ১৯৩৩ খ্রি থেকে জার্মান জাতীয়তাবাদী ও নাৎসিরা এই স্লোগানকে কাজে লাগায় জার্মানির জনসংখ্যা বৃদ্ধির অজুহাতে। তাই নাকি দরকার হয় আরও ভূখণ্ড দখলের, যাতে নিজেরাই প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করতে পারে। সেই যুক্তিতে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের কোনও কোনও অঞ্চল নিজেদের তাঁবেতে আনার অধিকার আছে বলে দাবি করে। নাৎসিদের বিভিন্ন ভূ-রাজনীতির তত্ত্ব ধ্বনিত হয়। নাৎসিরা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভূ-রাজনীতির বিষয়কে গুরুত্ব দেয়।

ভ

ভোটাধিকার (Franchise)

সাধারণ নির্বাচনে ভোটদানের আইনসঙ্গত অধিকার। আঠারো শতকের শেষ থেকে পশ্চিমি অনেক দেশে ভোটদানের অধিকার ক্রমে সম্প্রসারিত হয় এবং বিশ শতকের শেষ দশকে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই নরনারী নির্বিশেষে বয়স্ক ব্যক্তিদের ভোটাধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে দেশ ও কালভেদে এই অধিকারের নানারকম শর্ত দেখা যায়। যুক্তরাজ্যে উনিশ শতকে ভোটাধিকারের ন্যূনতম শর্ত ছিল স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা। বিশ শতকে প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর সেখানে সকলেই ভোটাধিকার পায় এবং নারীদের যে সীমিত অধিকার তখন প্রদত্ত হয়েছিল সেটাও ১৯২৮ খ্রি মধ্যে সর্বাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। একমাত্র সুইজারল্যান্ডে নারীদের হাল আমল অবধি ভোটাধিকার ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে ভোটদাতার বয়স অন্যূন আঠারো বছর। ভারতে ১৯৩৫ খ্রি ভারত শাসন আইন অনুযায়ী সাক্ষরতা, কর প্রদান ও সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে শতকরা ১৩ জন ভোটাধিকার পায়। স্বাধীন ভারতে সর্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকার অন্যূন ২১ বছর বয়স্ক ব্যক্তিদের দেওয়া হয়। ১৯৮৯ খ্রি থেকে ভোটদাতার ন্যূনতম বয়স ১৮ বছরে নামানো হয়েছে।

ভোটদানের নানাবিধ বিধিনিষেধের মধ্যে বহিরাগত ব্যক্তিরা এবং নাগরিক অধিকার যারা পায়নি তারা ভোটদানের অধিকারী নয়। তা ছাড়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীরা এবং উন্মাদেরা প্রায় সব দেশেই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত।

ম

মঁতেসকিয়্য, শার্ল লুই দ্য সেকঁদা (১৬৮৯ ১৭৫৫)
(Montesquieu, S L D S)

ফরাসি দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। বিদেশে ছদ্মনামে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থাদির মধ্যে ছয় ভাগে বিভক্ত একত্রিশ খণ্ডে 'দ্য স্পিরিট অব লজ' (১৭৩৪) বইতে আলোচিত বিষয়ের মধ্যে ১. সাধারণভাবে আইন ও বিভিন্ন ধরনের সরকার ; ২. সামরিক বিধিব্যবস্থা ও কর নির্ধারণ ; ৩. জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল রীতিনীতি, প্রথা ও আচরণ ; ৪. অর্থনৈতিক বিষয়াদি ; ৫. ধর্ম এবং ৬. রোমান, ফরাসি ও সামন্ততান্ত্রিক আইনকানুনের একটি পরিশিষ্ট অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রত্যেকটি খণ্ডেই ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে অল্পবিস্তর আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ওই বইতে মানবসমাজকে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করেন। নিয়ম ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে জনগণের স্বাধীনতার উপযোগী সরকারি আইনকানুনের নৈতিক ভিত্তি ও সংবিধান রচনা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল অভিনব। **লক**-এর অনুরাগী মঁতেসকিয়্য ইংল্যান্ডের সংবিধানকে স্বাধীনতার দর্পণ হিসেবে অভিহিত করেন। **ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ** এবং সরকারি কর্মপরিধি সীমিত রাখার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে রাষ্ট্রে সার্বভৌম রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও সরকার, উভয়ের মধ্যেই অন্তর্নিহিত স্বেচ্ছাচারী প্রবণতাকে নিবারণ ও ভারসাম্য বজায় রাখার পক্ষে ইংল্যান্ডের ধাঁচে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রী সরকার উপযোগী।

তাঁর দৃষ্টিতে আইন ও সংবিধান জনচিত্তের উপর নির্ভরশীল। **প্রাকৃত আইন** অবাধে প্রচলিত হলেও সংবিধানের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকা উচিত যাতে নাগরিকদের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। সর্বোপরি সংবিধানের প্রকৃতি ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও জলবায়ু ঘটিত পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। মঁতেসকিয়্যর মধ্যে প্রগতিপন্থী মনোভঙ্গি ও রক্ষণশীলতার সংমিশ্রণ দেখা যায়। তার মধ্যে সাম্য অথবা আমূল গণতন্ত্রের কোনও লক্ষণ ছিল না। তিনি সামাজিক চুক্তিতত্ত্বেও বিশ্বাস করতেন না।

তাঁর মতে প্রাকৃতিক কারণে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়। রাষ্ট্রের স্বরূপ ও বৈচিত্র্য সম্পর্কেও তাঁর স্বতন্ত্র বিশ্লেষণভঙ্গি ছিল।

মগজ ধোলাই (Brainwashing)

কোনও ব্যক্তির চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও তার মনে ভিন্ন মানসিকতা সঞ্চারকল্পে অনুসৃত প্রক্রিয়া। প্রত্যয়টি একসময়ে কমিউনিস্ট দেশে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের পশ্চিমি দুনিয়া সম্পর্কে মনোভঙ্গির পরিবর্তনসূত্রে প্রয়োগ করা হত। বর্তমানে শব্দটি শিথিলভাবে সব দেশেই বন্দিদের কাছে বিজেতাদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি ও স্বীকারোক্তি অর্জনের ব্যাপারে প্রযুক্ত হয়। মগজ ধোলাইয়ের প্রক্রিয়ায় বন্দিদের উপর দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন এবং কারও কাছ থেকে অনুকূল সাড়া পাওয়া গেলে নানাভাবে তাকে পুরস্কৃত করা হয়। এজন্য বন্দিদের কাছে কৌশলে নানারকম প্রচার চালানো হয়। তাতে সীমিত কিছু ফল হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু বন্দিদের উপর প্রতিফলিত মতাদর্শগত পরিবর্তনের স্থায়িত্ব দীর্ঘ নাও হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি সরকারি কমিটি কোরীয় যুদ্ধের (১৯৫০-৫৩) পর প্রত্যক্ষ করে যে যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত যুদ্ধবন্দিদের মনোবল ভেঙে যাওয়া ছাড়াও তাদের উপর মগজ ধোলাইয়ের ফলে তারা কমিউনিস্ট আদর্শে অনেকাংশে প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

মতবাদ (Doctrine)

ইংরেজি doctrine কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ যা ধর্মীয় পরিভাষা থেকে রাজনৈতিক ব্যবহারে স্থান পেয়েছে। উল্লিখিত দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ হল রাজনৈতিক আদর্শ ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সুসংবদ্ধ সামঞ্জস্য ; এবং লক্ষ্য হল কিছু যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্বাস ও আচরণ গড়ে তুলতে সহায়তা করা, যা নিজগুণেই জনমনে সঞ্চারিত হয়, অন্য কারও স্বার্থে তাঁর চিন্তা ও আচরণকে অনুসরণ করা নয়। প্রত্যয়টি বিতর্কমূলক, বিশেষ কোনও ঐতিহাসিক ঘটনায় উদ্ভূত হলেও তা থেকে এটিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা হয়। অবশ্য রক্ষণশীল দৃষ্টিতে মতবাদ প্রত্যয়টিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার না করে প্রকৃত সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে উদ্ভূত ও প্রযুক্ত নীতি ও কর্মপন্থা সমূহকে বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী গড়ে উঠতে দেওয়া ভাল। নিছক বিমূর্ত তত্ত্ব হিসেবে সর্বত্র সব মানুষের ক্ষেত্রে সেগুলিকে প্রয়োগ করা অর্থহীন। মতবাদের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে একটি মতবাদই পরিশেষে গড়ে ওঠে ; যেটা মানুষ সম্পর্কে পরম সত্য হিসেবে সর্বজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলত কি উদারনীতি, কি সমাজতন্ত্র সদাই একটা মতবাদের সন্ধান করে, যেটা মানবিক আদর্শ ও সর্বজনীন মূল্যবত্তার চাহিদাগুলিকে পূরণ করে।

মতাদর্শ (Ideology)

রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় ব্যবহারবহুল ইংরেজি ideology-র বাংলা প্রতিশব্দ। অভিধানে হরেক অর্থ থাকলেও এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কোনও অর্থ নেই। সাধারণভাবে মতাদর্শ বলতে কিছু সামাজিক আদর্শের ভঙ্গি বোঝায় এবং তার সারবত্তা

হল এমন এক কার্যক্রম যার সাহায্যে জনগণের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করা যায়।

শব্দটির উদ্ভব ঘটে ফরাসি বিপ্লবের সময়ে একটি দার্শনিক গোষ্ঠীর মধ্যে। শব্দটি তখনকার সামাজিক পরিবর্তনের কর্মসূচি প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হত, যার পিছনে ছিল সেই দার্শনিকদের সমর্থন। কালক্রমে 'আইডিওলজি' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে।

প্রচলিত দৃষ্টিকোণে শব্দটির অর্থ হল প্রণালীবদ্ধ ও সর্বমুখী যে রাজনৈতিক মতবাদে মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ও সর্বজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এক তত্ত্ব পাওয়া যায়, যা থেকে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি গড়ে ওঠে। এই নিরিখে একটি মতাদর্শ মানুষের যাবতীয় রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং অবস্থার নবরূপায়ণ বা পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করে। ধ্রুপদী মার্কসীয় দৃষ্টিতে তাই নির্দিষ্ট কিছু সমাজব্যবস্থায়, যেমন সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রে, মতাদর্শের প্রয়োজন থাকে। কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর সমাজ ও মানবচরিত্র সঠিক নিয়মে চলবে, পরিবর্তনকামী মতাদর্শের পরিবর্তন ঘটবে না। এই বিচারে মার্কসবাদ বলতে যা কিছু শেখানো হয় তা সবই মতাদর্শের অন্তর্গত। তাই কারও কারও মতে উদারনৈতিক গণতন্ত্রী সরকারের বিপরীত ধারায় মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়ে নিয়তই হস্তক্ষেপের সমর্থনে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী সরকারের একটি মতাদর্শ থাকে। মতাদর্শ সম্পর্কে এই মন্তব্য বিতর্কমূলক। কেউ কেউ মনে করেন যে রাজনৈতিক মতবাদকে তার উৎপত্তিস্থল তথা স্থান-কাল-পাত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না ; মতাদর্শকে সর্বমুখী ও সর্বজনীন করে তোলা কঠিন।

মার্কসীয় দৃষ্টিতে মতাদর্শ হল রাজনীতি, আইন, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, নৈতিকতা, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের সুসংবদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ এক চিন্তাভাবনা। মতাদর্শের শ্রেণীচরিত্র থাকে। কোনও এক সমাজের বিশেষ এক সময়ের মতাদর্শ হল সেই শ্রেণীর, যে-শ্রেণীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য তখন কায়েম থাকে। সমাজতন্ত্রী সমাজের মতাদর্শ হল শ্রমিক শ্রেণীর, আর পুঁজিবাদী সমাজের মতাদর্শ হল **বুর্জোয়া শ্রেণীর**। মার্কসীয় দৃষ্টিতে মতাদর্শের পিছনে থাকে বিশেষ কিছু ভাবনা যার কাজ হল নির্দিষ্ট কোনও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপুষ্টি সাধন ; অন্তর্নিহিত অন্য কোনও সত্য অথবা যুক্তিবত্তা কাজ করে না।

নানাবিধ মতবাদ যেমন **ফ্যাসিবাদ**, **সমাজতন্ত্র**, **সর্ব-আরববাদ**, **জাতীয়তাবাদ**, **জিওনবাদ** ইত্যাদিকে অনেকে মতাদর্শ হিসেবে দেখেন। অনেকের কাছে মতাদর্শের চিন্তাভাবনার চেয়ে তার সামাজিক সক্রিয় ভূমিকা বড়। গোষ্ঠীস্বার্থ দ্বারা চালিত মানসিকতাকেও অনেক সময় মতাদর্শ বলা হয়। আবার জ্ঞানের সমাজতত্ত্বে সব চিন্তাভাবনা বা মননশীল কাজ মতাদর্শ দ্বারা প্রণোদিত বলে মনে করা হয়।

মতান্ধতা (Dogmatism)

ইংরেজি dogmatism কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ, যার খ্রিস্টান ধর্ম অনুযায়ী অর্থ হল দৈববলে লব্ধ জ্ঞান এবং যাজকবর্গই হল তার ভাষ্যকার ; যিনি এই ধর্ম গ্রহণ করেন তাঁর থাকা চাই অন্ধের মতো বিশ্বাস। রাজনীতির ক্ষেত্রেও অনেক তত্ত্ব থাকে যা যুক্তিতর্কের মধ্যে দিয়ে গৃহীত ও বর্জিত হয়। আবার বিনা বিচারে বহু কিছু অনেকে

বিশ্বাস করে নেন। কারও দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্র অকাট্য সত্য, কেউ মনে করেন অবাধ বাণিজ্যই চূড়ান্ত কল্যাণকর। মতান্ধতা প্রত্যয়টির মধ্যে শেষ কথা বলে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে **মতবাদ** হল কাজ ও আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের প্রয়াস।

মতান্ধতায় কারও কোনও বিশ্বাসের উদ্ভব ও প্রকৃতি যাই হোক না কেন সেই বিশ্বাসকে যুক্তিহীনভাবে আঁকড়ে ধরা হয়ে থাকে। সেই বিশ্বাস বা ধারণার বিপরীত যুক্তি বা প্রমাণ গ্রহণ না করে নিজের মতে মতান্ধ মানুষ অবিচল থাকে। মতান্ধ ব্যক্তিও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিজ্ঞান ও নানা যুক্তির সাহায্য নেয়।

মার্কসবাদীরা মতান্ধতার নিন্দা করেন, কারণ তাতে মার্কসীয় সৃজনশীলতা ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু **সুবিধাবাদ**, শোধনবাদ প্রভৃতি অভিযোগ থেকে পরিত্রাণের জন্য মতান্ধতাই শেষাবধি আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী (Middle Class)

শব্দটির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। আঠারো শতকে শিল্পবিপ্লবের ফলে শব্দটি ইঙ্গ-মার্কিন সমাজে প্রচলন লাভ করে। শব্দটির দ্বারা সমাজের এমন এক শ্রেণীকে বোঝাত যার অন্তর্গত লোকেদের অভিজাত ও রাজন্যবর্গের মধ্যে অথবা শ্রমজীবী ও কৃষকদের কোনওটির বর্গেই ফেলা যেত না। তারা একদিকে ধনী পুঁজিপতি ছিল না, অন্যদিকে তাদের কায়িক শ্রম দিতে হত না। ইউরোপীয় ভূখণ্ডে ব্যাপক অর্থে তাদের **বুর্জোয়া** বলা হত। সঠিক অর্থে এই বর্গকে সামাজিক শ্রেণী বলা যায় না; এটিকে নানা পেশার ব্যক্তিদের একটি অসংবদ্ধ বৃহৎ গোষ্ঠী বলাই সঙ্গত। তার মধ্যে সরকারি ও সওদাগরি অফিস-আদালতের কর্মী, কারিগর, কারুশিল্পী, ছোট ব্যবসায়ী, মধ্যবর্তী কৃষক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবহারজীবী ইত্যাদি থাকে যারা সরকার অথবা পুঁজিপতিদের অধীনে কাজ করে এবং যাদের কোনও পুঁজি থাকে না। শিক্ষায় উন্নত এই স্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে অবিরাম বৃত্তিগত পরিবর্তন ও প্রসার ঘটে এবং মার্কসীয় দৃষ্টিতে তারা স্থিতিশীলতাবিহীন।

কমিউনিস্ট ইস্তাহার গ্রন্থে মার্কস ও এঙ্গেলস নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্র বিশ্লেষণসূত্রে বলেছেন যে তারা মধ্যবিত্তের অংশ হিসেবে নিজের অস্তিত্বের সংগ্রামে বুর্জোয়াজির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তারা মূলত রক্ষণশীল, বিপ্লবী নয়। বরং তাদের প্রতিক্রিয়াশীল বলা যায়, কারণ তারা ইতিহাসের চাকা পেছিয়ে দেয়। তারা বিপ্লবী হতে পারে যখন তারা সর্বহারা শ্রেণীতে মিশে যায়।

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে মার্কসীয় আন্দোলনে বিভিন্ন নিরিখে দেখা হয়েছে। ফ্যাসিবাদের উত্থান ও বিকাশের মূলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে মার্কসীয় বিচারে দেখা হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্চ ও নিম্ন স্তর এবং শ্রেণীর অন্তর্গত ছোট ব্যবসায়ী, কারিগর, কৃষকের সাবেক কালের অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে নবযুগের শিক্ষিত, সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের অন্তর্ভুক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য নিয়েও বিতর্ক ঘটে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে মননশীল সামাজিক উন্নয়ন ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপেও নেতৃত্ব তথা ঐতিহাসিক ভূমিকায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবদান অপরিমেয়।

দ্র. বুর্জোয়াজি ; বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ; শ্রেণী

মনুস্মৃতি (Manusmriti)

ঐতিহাসিকদের মতে 'মনুসংহিতা' বা মনুস্মৃতি ব্যক্তিবিশেষের লেখা নয়। আনুমানিক খ্রি পূ ২০০ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গ্রন্থটি রচিত। তাতে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশ এবং ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে যাবতীয় বিধিনিষেধ সহ বহুবিধ বিষয়ে ইতিকর্তব্যের নির্দেশ পাওয়া যায়। সুবিপুল এই গ্রন্থের বহু টীকা ও ভাষ্য আছে। এটির বারোটি অধ্যায়ের মধ্যে সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় দুটি সবিস্তারে রাজধর্ম সম্পর্কে রচিত ; শ্লোকের সংখ্যা যথাক্রমে ২২৬ ও ৪১৯।

রাজধর্ম অর্থাৎ রাজার কর্তব্য সম্পর্কে প্রথমেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ক্ষত্রিয় নরপতি ধর্মশাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে সকল প্রজাকে প্রতিপালন করবেন। প্রজাপতি রাজাকে সৃষ্টি করার আগে দণ্ড সৃষ্টি করেন। দণ্ডই চালক ও শাসনকর্তা এবং অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াকর্মের প্রতিভূ। দেশকালাদি বিবেচনা করে দণ্ড প্রযুক্ত হলে প্রজাগণ তুষ্ট থাকে, নচেৎ বিপ্লব উপস্থিত হয়। রাজা হবেন বিনয়নম্র ; তিনি দণ্ডনীতি ও রাজনীতিবিদ ব্যক্তিগণের কাছে অধ্যয়ন করবেন, তাঁকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কাছে দর্শন, কৃষি, বাণিজ্য ও অর্থ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। রাজা হবেন সর্বার্থে জিতেন্দ্রিয়। তিনি বিশেষজ্ঞ সচিবদের সঙ্গে একত্র ও পৃথকভাবে আলোচনা ও পরামর্শ অনুযায়ী যাবতীয় কাজে সিদ্ধান্ত নেবেন। রাজার অনুরক্ত, সৎ, কর্মকুশল, দেশকালজ্ঞ এবং বাকপটু ব্যক্তিকে দূত নিয়োগ করা উচিত। মনুস্মৃতিতে নানাবিধ দুর্গনির্মাণ ও তার প্রশাসন সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ আছে। রাজা অন্য রাজা দ্বারা যুদ্ধার্থে আহূত হলে তিনি যেন যুদ্ধে বিমুখ ও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করেন। যুদ্ধের কৌশল ও রীতিনীতি সম্পর্কেও নানা কথা বলা হয়েছে। যে রাজা রাষ্ট্রকে শোষণ ও পীড়ন করেন তিনি অচিরেই রাজ্যচ্যুত হন। সারা রাজ্যের গ্রাম থেকে শুরু করে ক্রমোচ্চ স্তরে বিনাস্ত প্রশাসনিক এলাকা বিভাজন এবং রক্ষী ও অধিপতি নিয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে। উৎকোচ গ্রহণ দণ্ডার্হ। রাজার রাষ্ট্র থেকে অল্প পরিমাণে কর গ্রহণ করা বিধেয়। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে পরিমাণভিত্তিক শুল্ক ধার্য করা উচিত। নানা স্তরে এবং সর্বত্র গুপ্তচর থাকবে। প্রয়োজনে রাজা যুদ্ধযাত্রা করবেন। রাজার আহারবিহার ও অবস্থানের সকল সময়ে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা বিধান হওয়া প্রয়োজন। বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কেও সবিস্তারে নির্দেশদান করা হয়েছে।

মন্ত্রগুপ্তি ও শপথ গ্রহণ (Oath of Secrecy)

আইনসভা ও মন্ত্রিসভার সদস্য, বিচারক ও সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন ও ক্ষেত্রবিশেষে সরকারি ক্রিয়াকর্মের গোপনীয়তা রক্ষা সম্পর্কে অনেক দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথবাক্য পাঠের রীতি আছে। ঈশ্বর, রাজা, সংবিধান, আইন, জনগণ ইত্যাদির কোনও কোনওটির প্রতি আনুগত্যের শপথবাক্য পাঠ করেন রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি, রাজ্যপাল স্তরের কোনও উচ্চবর্গের ব্যক্তি এবং শপথকারীকে দিয়ে সেটা গ্রহণ করিয়ে পদাদিতে তাঁদের অভিষিক্ত করেন। প্রাচীনকাল থেকেই এই রীতি বিভিন্ন দেশে প্রচলিত রয়েছে। রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে শপথগ্রহণের রূপও পরিবর্তিত হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ (Cabinet)

আইনসভার যে সব সদস্যকে সরকার পক্ষের নেতা (প্রধান অথবা মুখ্যমন্ত্রী) মন্ত্রী হিসেবে নির্বাচন করেন এবং যাঁরা নির্দিষ্ট সরকারি নীতি, কর্মসূচি ও প্রশাসনের জন্য দায়ী থাকেন সেইসব মন্ত্রীকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। যুক্তরাজ্য ও ভারতে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের আইন সভার সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক ; তাঁরা রুদ্ধকক্ষে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেইসব সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদ বহির্ভূত অন্যান্য মন্ত্রী এবং আইনসভায় শাসক দলের সদস্যদের কাছে মুখ্য সচেতকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদের কাছেই কার্যনির্বাহি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যেরা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত হন। অবশ্য সেখানকার সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদের উল্লেখ নেই ; এবং মন্ত্রীরা প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। তাঁদের যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা অর্থাৎ কংগ্রেসে সরাসরি জবাবদিহির ব্যাপারে সম্মুখীন হতে হয়। দলগত সমর্থনের নিশ্চয়তা থাকে না। তাঁরা আইনসভার সদস্য নাও হতে পারেন, সেখানে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাই বেশি, মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা থাকে প্রায় নামমাত্র। যুক্তরাজ্য, ভারত প্রভৃতি পরিষদীয় শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সর্বাধিক।

দ্র. সংসদীয় সরকার ; রাষ্ট্রপতি চালিত সরকার ; যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

মহাভিযোগ (Impeachment)

প্রাচীন গ্রিসে উচ্চপদস্থ কোনও সরকারি কর্মচারীর কোনও গর্হিত আচরণ পরিদৃষ্ট হলে তাঁকে প্রকাশ্য সমাবেশে হাজির করে তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দা জানানো ও অভিযোগ দায়ের করার রীতি ছিল। সেই রীতির সূত্র ধরে বর্তমান কালেও আইনসভায় উচ্চপদস্থ কারও বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের জন্য মহাভিযোগ উত্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য সব সময়ে পদচ্যুত করা নয়, অপরাধের দরুন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করাই হল উদ্দেশ্য। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে প্রচলিত রীতি হল দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার নিম্নকক্ষে অভিযোগ দায়ের করা হয় ; বিচার ও শাস্তিবিধানের দায়িত্ব হল উচ্চকক্ষের।

অবশ্য মহাভিযোগের উল্লিখিত প্রথা ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচারের (১৭৮৮) পর বিরল হয়ে যায়। তার পরিবর্তে মন্ত্রিসভার দায় ও প্রশাসনিক আইনের চলন দেখা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কিন্তু আইনসভা অর্থাৎ কংগ্রেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতাই হল মহাভিযোগ দায়ের করার অধিকার। তবে সেখানকার সংবিধান অনুযায়ী বিচারের পরিসীমা লাভজনক অথবা সম্মানিত পদে থাকার অযোগ্যতা জারি অথবা পদচ্যুত করার অতিরিক্ত কিছু নয়। যুক্তরাষ্ট্রে মহাভিযোগ রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় অর্থাৎ ফেডারাল পর্যায়ের বিচারপতি, উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধে এবং সরকারি ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে আইনসভার যে কী বিপুল অধিকার আছে তা রাষ্ট্রপতি নিক্সনের বিরুদ্ধে আনীত মহাভিযোগ থেকে বোঝা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস স্থাপনের পর অন্যূন তেরো বার এই অধিকার প্রযুক্ত হয় ; কংগ্রেসের সার্বভৌম ক্ষমতার এটা একটা নজির, বিশেষ করে এই কারণে যে কার্যনির্বাহের সর্বাধিক সরকারি ক্ষমতা কংগ্রেস নয়,

রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত। মধ্যযুগের ইউরোপে মাকিয়াভেল্লি মহাভিযোগ প্রথার সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ছিলেন।

মাও জে-দঙ (১৮৯৩-১৯৭৬) (Mao Ze-dong)

চীন বিপ্লবের অবিসংবাদিত নেতা ও গণপ্রজাতন্ত্রী নতুন চীনের স্রষ্টা। কুড়ির দশকের গোড়ায় মাও তাঁর বিপ্লবী জীবনের শিক্ষানবিশি শুরু করেন। অগ্রগামী সর্বহারা শ্রেণীর আধিপত্যের (hegemony) কথা যাই বলা হোক না কেন, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় তিনি প্রথমেই উপলব্ধি করেছিলেন যে কৃষিপ্রধান চীনে কৃষক শ্রেণীর উপরই কমিউনিস্টদের নির্ভর করতে হবে বেশি। তিনি ইয়েনান প্রদেশে হুনানে বিদ্রোহ পরিচালনা করেন (১৯২৭); সে বছরেই কমিউনিস্টদের সঙ্গে কুয়োমিনতাং দলের বিচ্ছেদ ঘটে। অতঃপর তিনি কিয়াংসি প্রদেশে লাল ফৌজ গড়ে তোলেন এবং ওই রাজ্যে একটি সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। ভূমিব্যবস্থার সংস্কারই ছিল তাঁর মূল কর্মসূচি। ১৯৩৪ খ্রি তাঁর নেতৃত্বে কিয়াংসি থেকে হুনান প্রদেশে তিন হাজার মাইল পথ পরিক্রমা করে লং মার্চ পরিচালিত হয়। হুনানে তিনি নতুন ঘাঁটি গড়ে তোলেন। ১৯৩৭ খ্রি চীনে জাপানের সামরিক অভিযান প্রতিরোধের জন্য তিনি কুয়োমিনতাং দলের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করেন। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের শেষে চিয়াং কাই-শেক পরিচালিত কুয়োমিনতাং সরকারের অপশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রবল গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে তাঁর চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রয়াস নিষ্ফল হয়। ১৯৪৯ খ্রি তিনি মস্কোয় যান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। তাঁর নেতৃত্বে পুনর্গঠিত লাল ফৌজ ক্রমে সারা চীনে আধিপত্য বিস্তার করে। চিয়াং ফরমোসায় জাতীয়তাবাদী চীন সরকারকে স্থানান্তরিত করেন। শাসনক্ষমতায় এসে মাও প্রশাসনিক কঠোরতার সঙ্গে আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা ও জনমুখী বিপ্লবী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াসী হন। সেইসূত্রে তাঁর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়াস (১৯৬৬-৬৭) উল্লেখযোগ্য। প্রয়োগ ও অভিজ্ঞতার নিরিখে তিনি মার্কসীয় মতাদর্শের যে নতুন ব্যাখ্যান দিয়েছেন তার পক্ষাপক্ষে বহুবিধ অভিমত আছে।

দ্র. মাওবাদ

মাওবাদ (Maoism)

চীনের কমিউনিস্ট নেতা মাও জে-দং-এর রাজনৈতিক তত্ত্ব ও প্রয়োগ, যাতে জনগণের কমিউনিস্ট বিপ্লবের আকুতি এবং তাদের উন্মুক্ত প্রভাবকে সমন্বিত করার প্রয়াস দেখা যায়। অতীব নীতিপরায়ণ হিসেবে এই মতবাদে মুনাফা অর্জনের প্রবণতাকে রদ করার জন্য নৈতিক উদ্দীপনাকে উৎসাহিত করা হয়। মাওবাদে বিরোধিতাকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের নিরিখে মান্য করা হয়; অবশ্য সেই বিরোধিতা কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে নয়। লোকসমাজ ও কমিউনকে সঠিকভাবে কেন্দ্র করে বৈপ্লবিক রূপান্তরের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাতে কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় সমগ্র সমাজ উৎপাদন শক্তির বিপুল উন্নয়ন ব্যতিরেকেই বৈপ্লবিক রূপান্তরের অভিমুখে

অগ্রসর হতে পারে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মাওবাদ অনগ্রসর কৃষিপ্রধান তৃতীয় বিশ্বের কাছে একটি আদর্শ বিশেষ। অনেকের মতে মাওবাদ **ত্রৎস্কি** প্রদর্শিত **স্থায়ী বিপ্লব** চিন্তার সমতুল। মাওবাদের প্রসারের ফলে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপরীতমুখী দুটি শিবিরে বিভক্ত। ষাট ও সত্তরের দশকে যাঁরা সোভিয়েত কমিউনিস্টদের আমলাতান্ত্রিক একনায়কত্বে বীতশ্রদ্ধ হয়ে **নববাম** আন্দোলন গড়ে তোলেন তাঁরা মাওবাদকে অনেকাংশে গ্রহণ করেন।

মাকিয়াভেল্লি, নিক্কলো (১৪৬৯-১৫২৭) (Machiavelli, N.)

ইতালীয় রাষ্ট্রদার্শনিক ও ঐতিহাসিক, যিনি আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার পুরোধা হিসেবে বিবেচিত। তিনি রাজকর্মচারী থেকে প্রজাতন্ত্রী ফ্লোরেন্সের রাজদূত হয়েছিলেন এবং আকস্মিক বিদ্রোহে সরকারের পতন ঘটলে কারারুদ্ধ হন। রাজনীতি ছেড়ে খামারে আবদ্ধ থাকবেন এই শর্তে তিনি মুক্তি পান এবং গ্রন্থাদি রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। 'দ্য প্রিন্স', 'দ্য ডিসকোর্সেস', 'আর্ট অব ওয়ার' ইত্যাদি তাঁর রচিত গ্রন্থাদির অন্যতম।

'দ্য প্রিন্স' গ্রন্থে মাকিয়াভেল্লি কীভাবে **ক্ষমতা** অর্জন ও রক্ষা করা যায় সে সম্পর্কে সবিস্তারে লিখেছেন। তাতে বাস্তব রাজনীতি মানবচরিত্রের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ তথা নৈতিকতার প্রশ্নকে উপেক্ষা করে ক্ষমতা অর্জনকে বড় করে দেখানো হয়েছে। আইনের শাসনকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে নাই ক্ষমতার প্রয়োগ, এবং অসঙ্গত উপায়েও ক্ষমতা অর্জিত হতে পারে।

রাষ্ট্রদর্শনে মাকিয়াভেল্লি ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। তাঁর মতে অতীতকালের অনুশীলন ভবিষ্যতের দিকদর্শিকার পক্ষে মস্ত সহায়ক। তাই তিনি গ্রিস ও রোমের ইতিহাস পর্যালোচনা করতেন। নৈরাশ্যজনক দৃষ্টিতে **মানবপ্রকৃতির** বিচার এবং তার ভিত্তিতে তিনি তাঁর দর্শনকে দাঁড় করিয়েছিলেন। মানবপ্রকৃতির মধ্যে তিনি স্বার্থপরতা, অব্যবস্থিত চিত্ত, প্রতারণা, ভীরুতা ও লালসার প্রাধান্য দেখতে পান। সেই নিরিখে তাঁর মতে লোকের অনুরাগ অপেক্ষা ভীতি অর্জন করা একজন রাজার কাম্য হওয়া প্রয়োজন।

সন্ত আকুইনাস ধর্ম, নৈতিকতা ও রাজনীতিকে সমন্বিত করেন। মাকিয়াভেল্লি তার বিপরীত মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি ধর্ম ও নৈতিকতাকে রাজনীতি থেকে শুধু পৃথক করেননি, রাজনীতির নীচে সে দুটিকে অবনত করেন। রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগসূত্রে তিনি বলেন যে নীতিবিচার অপেক্ষা রাষ্ট্রের ভালকে অগ্রাধিকার দেওয়াই শ্রেয়। তবে রাজনীতির সুবিধার্থে ধর্মকে কাজে লাগানো যেতে পারে। লোকের মন জয় করার জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান, ধর্মের প্রচার এবং নিজেকে ধর্মাত্মা হিসেবে তুলে ধরাও রাজার পক্ষে বিধেয়। কিন্তু সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী রাজার অবস্থান নৈতিকতা ও ধর্মের ঊর্ধ্বে।

রাষ্ট্রের ব্যাপারে তিনি মনে করতেন যে দেশ বিপন্ন হলে ন্যায়, নীতি, সংকোচ, ক্ষমতা ইত্যাদির কোনও স্থান নেই ; বরং যেকোনও প্রকারেই হোক না কেন দেশের স্বাধীনতা বজায় রাখা কর্তব্য। তাঁর দৃষ্টিতে দেশের অধিকর্তা যে প্রিন্স তিনি নিজস্ব সামর্থ ও দক্ষতার বলে দেশ জয় করেন ও ক্ষমতায় আসীন থাকেন। পুরানো সংবিধান ও আইনকানুন কার্যকর না হলে এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিলাষ থাকলে

শাসনকর্তাকে প্রয়োজনে প্রজাতন্ত্রকে পরিহার করতে হতে পারে এবং প্রজাদের বিনাশেও প্রবৃত্ত হবার প্রয়োজন হতে পারে।

'ডিসকোর্সেস' গ্রন্থে তিনি টিটাস লিভি কর্তৃক বর্ণিত রোমান সাংবিধানিক সরকারের চরিত্র বিশ্লেষণ করে আইনের শাসন ব্যবস্থার একটি আদর্শ রূপ নির্ণয় করেছেন। আরিস্তোতলের ত্রিবিধ ভাল ও মন্দ রাষ্ট্রব্যবস্থার অভিমতকে নাকচ করে মাকিয়াভেল্লি রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংমিশ্রণে একটি আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থার চিত্র উপস্থাপন করেন। তাতে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় পরস্পরের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ রেখে পরিশেষে সকলের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করবে।

তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে মতভেদ ও বিরোধিতা যতটা মনে করা হয় আদৌ ততটা ক্ষতিকর নয়। বরং যে রাষ্ট্রে স্বাধীনতা সংরক্ষণের কথা বলা হয় তার পক্ষে সেটা প্রয়োজনীয়। তাঁর ভাবনায় এ চিন্তা রোমের সেনেট ও কমনস-এর শাসনব্যবস্থা সূত্রে এসেছিল। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা নিবারণের জন্য তিনি সাংবিধানিক উপায়ে আইনের শাসন কার্যকর করার প্রস্তাব করেন। সরকারের উচ্চপদস্থ কোনও আমলার বিরুদ্ধে মহাভিযোগ দায়ের করার পক্ষে সহায়ক হিসেবে তিনি ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণকে সমর্থন করতেন।

তাঁর প্রধান দুটি গ্রন্থেই মাকিয়াভেল্লির যে ভাবনার বিস্তর সমর্থক ও বিরোধী দেখা যায় সেটা হল যে সরকার শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে গঠিত একটি যন্ত্র বিশেষ এবং সেটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যাবতীয় শক্তিপ্রয়োগ সমর্থনীয়। ঠিক তেমনি তাঁর অপর এক অভিমতের পক্ষাপক্ষে অনেকে আছেন যাতে তিনি বলেন যে প্রতি সংবিধানের কিছু নিজস্ব গুণ থাকে এবং একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার ভালমন্দ সেখানকার অধিবাসীদের চরিত্রের প্রেক্ষাপটেই কেবল মূল্যায়ন করা সম্ভব।

মানবপ্রকৃতি (Human Nature)

মানুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ চিত্তবৃত্তি থাকে, এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রত্যয়টির উদ্ভব হয়েছে। সব রাষ্ট্রদর্শনের গোড়ায় মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনার প্রয়াস দেখা যায়। প্রাচীন গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তার সময় থেকে অদ্যাবধি রাষ্ট্রদার্শনিকেরা তাত্ত্বিক আলোচনার সময় সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি ভাবনার প্রথমেই মানুষের সাধারণ প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও তত্ত্বগত ভাবভূমি প্রস্তুত করেছেন। সেগুলির মধ্যে অমিল আছে বিস্তর। পিথাগোরাস ও তৎসূত্রে প্লাতোর দৃষ্টিতে মানবপ্রকৃতি ত্রিবিধ : যুক্তি, সাহসিকতা ও ক্ষুধা, যার ভিত্তিতে প্লাতো সামাজিক শ্রেণীবিভাগ করেন। মাকিয়াভেল্লি আইনের প্রয়োগ ছাড়াও জবরদস্ত শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন ; কারণ তিনি মনে করতেন যে মানুষ হল অকৃতজ্ঞ, চপলমতি, মিথ্যাচারী, কাপুরুষ ও লোভী। সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের তিন প্রধান ভাবুকের মধ্যে হবস মনে করতেন মানুষ আত্মকেন্দ্রিক, লকের দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শুভেচ্ছা, সহযোগিতা, শান্তি ও সমন্বয়ের ভাব বিরাজ করে এবং রুসো মনে করতেন মানুষ ভাবপ্রবণ, যুক্তিশীল নয়, প্রকৃতির রাজ্যেই মানুষ সুখ ও সাম্য উপভোগ করত।

হিতবাদ দর্শনের প্রবক্তারা মনুষ্য-চরিত্রের মধ্যে সুখের অন্বেষণ ও দুঃখ পরিহারের

প্রবণতা লক্ষ করেন। সে-সব উদারতন্ত্রীরা মানবপ্রকৃতির মধ্যে মুক্তির বাসনা এবং তার মধ্য দিয়ে সুখের সন্ধান চরিতার্থের প্রবণতা দেখতে পান। ভাববাদী দার্শনিকদের মধ্যে **ইমানুয়েল কান্ট** মনুষ্যপ্রকৃতির প্রত্যক্ষবাদী এবং অতীন্দ্রিয় দুটি প্রবণতার মধ্যে প্রথমটিতে বাহ্য জগৎ সম্পৃক্ত প্রবৃত্তি ও বাসনা এবং দ্বিতীয়টিতে যুক্তি ও নীতিসম্মত অন্তরাত্মার পরিচয় উপলব্ধি করেন। **হেগেলের** দৃষ্টিতে নিয়ত প্রসারমাণ ও দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় যুক্তিশীল রাষ্ট্রের মাধ্যমে মানবপ্রকৃতির নির্ধারক ও উৎস হল পরম ব্রহ্ম। **মার্কসের** দৃষ্টিতে জৈব বিবর্তন ধারায় সৃষ্ট মানুষ হল মননশীল এবং স্বাধীনভাবে জগৎপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসী, এবং ইতিহাসের ধারায় মানুষের সৃজনশীল প্রকৃতি সমাজব্যবস্থায় প্রয়োগের (praxis) মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। মার্কসের দৃষ্টিতে বিভিন্ন পর্বে **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ** মানুষের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। **গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ** প্রমুখের অভিমত হল মানবপ্রকৃতি নৈতিকতা, নান্দনিকতা, মুক্তিকামিতা ইত্যাদি যেসব চিরন্তন মূল্যবোধে মণ্ডিত সেগুলির উৎস আধ্যাত্মিকতা। বস্তুবাদী দৃষ্টিতে **মানবেন্দ্রনাথ** মানবপ্রকৃতির স্বরূপ হিসেবে দেখিয়েছেন যে জৈব বিবর্তন ধারায় মানুষের উদ্ভব ঘটে এবং ক্রমে তার যে যুক্তিবোধ গড়ে ওঠে সেটাই হল নৈতিকতার উৎস; সর্ববিধ বাধাবিপত্তি থেকে উত্তরণের জন্য নিরঙ্কুশ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সত্যসন্ধানী প্রয়াস মানবপ্রকৃতির লক্ষণ।

মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে রাষ্ট্রদার্শনিকদের নানাবিধ অভিমত আজকের দিনে আলোচনার গভীরে নিরন্তর বিতর্কের বিষয়।

মানবতাবাদ (Humanism)

নানা অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হলেও, প্রধানত পুরানো গ্রিক প্রবচন যে 'মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি' সেই নিরিখে ঐশ সত্তার বিপরীত বা বহির্ভূত মানুষকেই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু, আধার, শক্তি ও মূল্যবোধের উৎস এবং শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের মূল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইউরোপে মধ্যযুগের শেষ তথা **রেনেসাঁস, রেফর্মেশন**, এনলাইটেনমেন্ট, **শিল্প বিপ্লব** এবং গণতন্ত্রের সংগ্রাম ও অগ্রগতির বিভিন্ন পর্বে ইহমুখী ও মানবকেন্দ্রিক এই মানসিকতা প্রবল হয়ে ওঠে। তার প্রধান লক্ষণ ছিল ধর্মীয় অনুশাসন থেকে জনজীবনের মুক্তি, বুদ্ধির স্বাধীনতা, বিজ্ঞানের চর্চা এবং অতিপ্রাকৃত শক্তির সাহায্য ছাড়াই মানুষ নিজেই যে তার ভাগ্য ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা সেই চেতনার বিস্তার এবং নিজ অবস্থার উন্নয়নে নিজস্ব কর্তব্যের বোধ ও বিশ্বাস। বুদ্ধি ও মননশীলতার সাহায্যে প্রকৃতিকে জানা ও জয় করা ছাড়াও জ্ঞানের যথোচিত ব্যবহার এবং সমাজজীবনের নৈতিক সমস্যাসমূহ যুক্তিবোধের সাহায্যে সমাধানও মানবতাবাদীর কর্তব্য। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে মানুষের প্রতি মানুষের মর্যাদা প্রদর্শন মানবতাবাদীর একটি মৌল আদর্শ। তার অন্যান্য নীতি হল ব্যক্তিস্বাধীনতা, যুক্তিবোধ, নৈতিকতা ও বিশ্বজনীন মনোভঙ্গি। মানবতাবাদ জঙ্গি নাস্তিকতা নয়, তাতে মানুষের সাধারণ ও স্বাভাবিক দুর্বলতার প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়। সব ধরনের মানুষের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি থাকা চাই। তা হলেও মানবতাবাদের বিরোধী হলেন সেইসব অন্ধবিশ্বাসপ্রবণ মানুষ যাঁরা মনে করেন ঈশ্বরের করুণা ছাড়া মানুষের সকল প্রয়াসই বৃথা।

মানবাধিকার (Human Rights)

পৃথিবীর নানা দেশে প্রায় নয় শতকের পথ পরিক্রমার পর ও নানা ব্যঞ্জনায় প্রত্যয়টি বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। ইংল্যান্ডে ম্যাগনা কার্টা (১২১৫ খ্রি) থেকে প্রত্যয়টি ক্রমে দানা বাঁধে। বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল থেকে এটি প্রাণরস সঞ্চয় করে, যেমন আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (১৭৭৬), ফরাসি বিপ্লবে মানবাধিকার সনদ (১৭৮৯) এবং বলশেভিক বিপ্লবের (১৯১৭) বাণী। ১৯৪৮ খ্রি রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে মানবাধিকার সনদ গৃহীত হবার পর প্রশ্নটি সারা বিশ্বে ব্যাপ্তি লাভ করে।

আগেকার কালে শব্দটি প্রকৃতিগত অধিকার বা মানুষের অধিকার বলে অভিহিত হত। দার্শনিক জন লক প্রত্যয়টিকে জীবন, স্বাধীনতা ও ধনসম্পত্তির অধিকার হিসেবে দেখতেন। পূর্বোক্ত আমেরিকার ও ফরাসি ঘোষণায় সুখসন্ধানকে একটি অধিকার হিসেবে দেখা হয়। ওইসব ঘোষণাদিতে মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্রুত ও নিরপেক্ষ বিচারের অধিকারের কথাও বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পূর্বে মানবাধিকার বিষয়টি এক একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় ছিল। রাষ্ট্রসংঘ সেটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এনে দেশ ও জাতি থেকে তার দৃষ্টি ব্যক্তিমানুষের প্রতি সম্প্রসারিত করে। আন্তর্জাতিক আইনের বিষয় ও বৈশিষ্ট্যেও একটা নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর রাষ্ট্রসংঘ ১৯৪৮ খ্রি ১০ ডিসেম্বর তারিখে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। তাতে ত্রিশটি অনুচ্ছেদ আছে। সেগুলির বিষয় কেবল পুরানো রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারই নয়, উপরন্তু কর্মসংস্থানের বিমা, সবেতন ছুটি প্রভৃতি অনুপুঙ্খ অধিকারও আছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের বিষয়গুলি যথাযথভাবে মান্য করা হচ্ছে কি না সেবিষয়ে নজর রাখা ও রিপোর্ট দেবার জন্য রাষ্ট্রসংঘের একটি স্থায়ী কমিশন আছে। ১৯৭৫ খ্রি হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সম্মেলনে অধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক শাস্তিদানের সিদ্ধান্ত হয়। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বিনা বাধায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হলেও, সেটি মান্য করা সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা নেই। গৃহীত হবার সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদি আরব সমেত কমিউনিস্ট দেশগুলি ভোটদানে বিরত থাকে। ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত আঞ্চলিক সংগঠনে মানবাধিকার বিষয়টি অনুরূপভাবে গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য, সর্ববৃহৎ মহাদেশ এশিয়ায় অনুরূপ কোনও আঞ্চলিক সংগঠন নেই।

মানবাধিকারের উল্লিখিত ঘোষণাবলির সঙ্গে আইনগত অধিকারের মৌলিক প্রভেদ আছে। আইনগত অধিকার সব মানুষের উপর বর্তায়, তাতে সংশয় থাকলে আইনজীবীর কাছে কিংবা আদালতে তা জানা যায়। যদি কেউ কোনও অধিকার দাবি করে এবং সেটা দেশের সর্বোচ্চ আদালতে নাকচ হয়ে যায় তা হলে কিছু করার থাকে না। মানবাধিকার কিন্তু সেগোত্রে পড়ে না। সেগুলি বলবৎ করা যায় তেমন কোনও আইন নেই; আন্তর্জাতিক কোনও আদালতও নেই যেখানে অধিকারগুলি আদায়ের পক্ষে কোনও নির্দেশ কার্যকর হতে পারে। বস্তুত মানবাধিকার সমূহ মূলত প্রকৃতিগত

বা নৈতিকতার ভিত্তিতে রচিত, সেগুলির আইনানুগ সঙ্গতি থাকে না। **জেরিমি বেনথাম** তাই ১৮৩১ খ্রি লিখেছিলেন যে **প্রাকৃত অধিকার** কথাটি "নিছক অর্থহীন"।

তাই প্রশ্ন উঠেছে যে মানুষের কোন অধিকারগুলি প্রকৃতিগত আর কোনগুলি আইনানুগ ? **প্রাকৃত অধিকার** প্রতিষ্ঠিত করা কতদূর সম্ভব ? আইনানুগ অধিকার ও প্রাকৃত অধিকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগলে কোনটিকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত ? প্রশ্নগুলির মীমাংসা হয়নি। ধর্মীয় মৌলবাদী রাষ্ট্রে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা শক্ত। গণতন্ত্র প্রত্যয়টির সঙ্গে মানবাধিকারের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। উল্লেখ্য, ভারতে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন গঠিত হয়েছে।

মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪) (Roy, M.N.)

বিপ্লবী জননেতা ও রাষ্ট্রদার্শনিক। বঙ্গদেশে অনুশীলন-যুগান্তর দলের সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান প্রয়াসে যুক্ত হন। অস্ত্র আমদানির সন্ধানে দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ পর্যটন নিষ্ফল হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপনীত হন। পরে মেক্সিকোয় চলে যান, সেখানে রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশ গ্রহণ, বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা ও মার্কসীয় মতাদর্শ গ্রহণ করেন। মেক্সিকোয় তিনি কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন, সে-খবর পেয়ে মস্কোয় অনুষ্ঠেয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের আসন্ন দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯২০) যোগদানের জন্য লেনিন তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। দ্বিতীয় কংগ্রেসে ঔপনিবেশিক বিষয়ে লেনিনের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ঘটে। তা হলেও মানবেন্দ্রনাথের অভিমত লেনিনের থিসিসের সম্পূরক হিসেবে একত্র গৃহীত হয়। অতঃপর তিনি প্রবাসী কিছু ভারতীয় বিপ্লবীদের নিয়ে তাসখন্দে **ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি** গঠন করেন এবং বার্লিন থেকে পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা, গ্রন্থরচনা এবং বিদেশ থেকে নানা মাধ্যমে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন সংগঠিত করেন। ক্রমে **কমিন্টার্নের** শীর্ষ নেতৃত্বে পৌঁছন এবং তার উপদেষ্টা হিসেবে চীন দেশের বিপ্লবে (১৯২৭) অংশ নেন। এরপর কমিন্টার্নে বুখারিন ও স্তালিনের ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে দ্বিতীয় জনের গোষ্ঠীতে যোগ না দেওয়ায় কমিন্টার্নের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯৩০ খ্রি শেষে ভারতে প্রত্যাবর্তন ও কারাবরণ করেন। মুক্তির পর জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন এবং তাতে বিকল্প নেতৃত্ব গঠনের প্রয়াসী হন। স্বাধীনতা আন্দোলনকে কার্যকর করার জন্য তিনি গণ-পরিষদের সাহায্যে ক্ষমতা দখলের প্রস্তাব করেন। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিঃশর্ত সমর্থন জানানোয় কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধ হয়। **র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি** গঠন করে (১৯৪০) কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের বিকল্প জনগণের সরকার গঠনের আহ্বান জানান। বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর গ্রীষ্মকালীন স্টাডিক্যাম্পে অনুগামীদের কাছে **রাষ্ট্রদর্শন** ও বিশ্বরাজনীতির নবমূল্যায়নসূত্রে মার্কসবাদের অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেন এবং **র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম** নামে নতুন এক রাষ্ট্রদর্শনের সূত্রাবলি তুলে ধরেন। ১৯৪৮ খ্রি র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ভেঙে দিয়ে **দলহীন রাজনীতি** তত্ত্বের প্রয়োগ এবং র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

মানবেন্দ্রনাথের মতে উৎপত্তিকাল থেকে মানুষ প্রথমে জৈব অস্তিত্বের তাগিদে পারিপার্শ্বিকের আধিপত্য থেকে মুক্ত হবার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছে। সেই জৈব

সংগ্রাম-প্রবণতার ফলে মানুষ ক্রমে অজ্ঞানতার বন্ধন ছিন্ন করে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছে। মানুষের যাবতীয় সাধনা ও সৃজনকর্মের পিছনে আছে সেই মুক্তির প্রেরণা। মুক্তি ও সামাজিক অধিকার অর্জনের অন্তরায় অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করাই বিপ্লবের একমাত্র লক্ষ্য নয়। যে-কোনও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নির্মূল করাই বিপ্লবের আদর্শ। জৈব অস্তিত্বের সংগ্রাম-প্রক্রিয়ায় ক্রমবিকশিত প্রগতি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মানুষকে নিরন্তর বিপ্লবের সাহায্যে এই সব অন্তরায়কে অপসারণের প্রেরণা যোগায়। মুক্তি ও সৃজনশক্তির আবেগসম্পন্ন মানুষের মনোভাবকে তিনি 'রোমান্টিক' আখ্যা দিয়েছেন। বিপ্লব সেই অর্থে রোমান্টিক এবং যুক্তিসঙ্গতও বটে। যুক্তিপ্রবণতা মানুষের সহজাত একটি জৈব ধর্ম। যুক্তিনির্ভর মন থেকেই মুক্তির আবেগ ও ন্যায়পরায়ণতা উদ্ভূত হয়। ন্যায়নীতির পিছনে কোনও আধ্যাত্মিক অথবা ঐশ কারণের পরিবর্তে যুক্তি প্রবণতাকেই উৎসরূপে তিনি দেখেছেন। তাঁর রোমান্টিক বিপ্লবের প্রত্যয় সম্পূর্ণ যুক্তিবহ ও নীতিসম্মত।

তাঁর মতে বস্তুবাদ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ দর্শন। তিনি মার্কসের পূর্বকালীন ভাববাদী দর্শন গ্রহণ করেননি ; আবার মার্কসের বস্তুবাদও তাঁর কাছে যুক্তিসম্মত নয় বলে মনে হয়েছে। চিন্তনকে তিনি বস্তুর নিছক প্রতিফলন স্বরূপ বিচার করেননি। তাঁর মতে ভাব ও বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব দেখা যায়, কোনওটিই কারও অগ্রবর্তী নয়। জড় ও চেতনার দ্বৈত অস্তিত্বের প্রত্যয় নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। শারীরবৃত্ত ও মনস্তত্ত্বের মাঝে এক সেতুবন্ধ রচিত হওয়ায় তিনি জড় ও ভাবের অদ্বয় প্রত্যয়ে নতুন দৃষ্টিতে বস্তুবাদকে দেখেছেন। তাঁর মতে বস্তুবাদের নতুন নামকরণ হওয়া উচিত 'Physical Realism'।

ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের উন্নয়নের জন্য তিনি ত্রিশের দশক থেকেই একটি দার্শনিক বা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন অনুভব করেন। কারণ দেশবাসীকে অশিক্ষা, কুপ্রথা, ধর্মান্ধতা, ইহবিমুখ অন্ধ বিশ্বাস, স্বাধীন চিন্তার অভাব ইত্যাদি থেকে মুক্ত করার উপর বিপ্লবের যথার্থ সাফল্য ও সার্থকতা নির্ভর করে। এজন্য তিনি ভারতে রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে একটি রেনেসাঁস আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াসী হন।

মানবেন্দ্রনাথের মতে জৈব প্রয়োজন ও স্বার্থের তাড়নায় মানুষ সমাজ সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তিমানুষই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের উৎস। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গণতন্ত্রের বনিয়াদ। নানা মত ও দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য বিধান করাই রাষ্ট্রের কাজ। সামাজিক বিবর্তনধারায় গোষ্ঠীমনের হৃদয়াবেগ গড়ে ওঠে জাতীয়তাবাদের মধ্যে দিয়ে। সেটা চিরন্তন নয়। ক্রমে সেটা বিশ্বজনীন মনোভঙ্গি ও মানব সমাজের পারস্পরিক শুভসম্পর্কে লীন হয়ে যায়। নিশ্চলভাবে থাকলে সেটা জাতিগত সংকীর্ণ দৃষ্টিতে সমষ্টিবাদী হয়ে সমাজের পক্ষে হানিকর প্রতিপন্ন হয়। তিনি তাই জাতীয়তাবাদকে পরিহার করেন।

সংসদীয় গণতন্ত্রে মানুষের অসহায়ত্ব কাটিয়ে ওঠার জন্য তিনি নাগরিক তথা ভোটদাতাদের স্থানীয় গণসমিতির মাধ্যমে সুসংগঠিত করার সুপারিশ করেন। সমিতি কোনও দলীয় প্রার্থীকে বাছাই না করে নিজেদের স্থানীয় প্রতিনিধিকে দাঁড় করাবে। বিভিন্ন আঞ্চলিক গণসমিতির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও সংবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে লোকে রাষ্ট্রের কাজকর্মে সরাসরি নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পাবে।

তাঁর মতে ক্ষমতা অর্জন রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া অসঙ্গত। অথচ সব দলই চায় ক্ষমতার দখল। দলীয় রাজনীতি তাঁর মতে গণতন্ত্রের পরিপন্থী। দল বলতে জনগণের একটি মাত্র অংশকে বোঝায়, গণতন্ত্র সমগ্র জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। দলীয় রাজনীতি ক্ষমতার কাড়াকাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি স্থানিক গণসমিতির ভিত্তিতে নিচ থেকে উপরে বিন্যস্ত রাষ্ট্রকাঠামোয় যাবতীয় নীতিনির্ধারণ ও প্রশাসনের প্রস্তাব করেছেন তাতে **প্রত্যাহ্বান** (recall) ও **গণভোটের** সুযোগ থাকবে। তিনি কেন্দ্রাভিগ রাষ্ট্রশক্তির বিরোধী সর্বাঙ্গীণ বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থার সুপারিশ করেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি যেমন সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে তৃতীয় পথস্বরূপ সুগঠিত বিকেন্দ্রিত গণতন্ত্রের পথ উদ্ভাবন করেছেন, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তেমনি ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের তৃতীয় বিকল্পস্বরূপ সমবায় অর্থনীতি সুপারিশ করেন। তাঁর মতে ভারতের শিল্পোন্নয়নকে কার্যকর করে তুলতে হলে কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। দ্রুত বর্ধিত জনসমস্যাকে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় বলে তিনি মনে করতেন।

তাঁর চিন্তায় শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। প্লাতোর আদর্শে শিক্ষাকেই তিনি গণতন্ত্রের বনিয়াদ বলে মনে করতেন। তিনি চাইতেন শিক্ষকদের প্রথমে শিক্ষিত করে তুলতে। কারণ গতানুগতিক ধারায় তাঁরা ছোটদের কলের পুতুলে পরিণত করেন; ফলে তাদের সহজাত অনুসন্ধিৎসা, স্বাধীন চিন্তা ও সৃজন সত্তা বিকশিত হয় না। মানুষ গড়ার এই মহান কারিগর সম্প্রদায়কে তাঁদের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ও সচেষ্ট করে তোলার বিশেষ প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন।

দ্র. বি-উপনিবেশন তত্ত্ব ;

মার্কস, কার্ল (১৮১৮-১৮৮৩) (Marx, Karl)

জার্মান দার্শনিক, যিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং আর্থ-রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের প্রবর্তন এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন। মননজীবনের প্রথম দিকে তিনি একজন তরুণ হেগেলপন্থী ছিলেন। সাংবাদিকতায় তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এরপর তিনি বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়ে প্যারিতে চলে যান (১৮৪৩) এবং আজীবনকালের সুহৃদ **এঙ্গেলস**-এর সান্নিধ্যে আসেন এবং উভয়ে লন্ডনে গিয়ে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা চালিয়ে যান। ১৮৪৮ খ্রি উভয়ে **কমিউনিস্ট ইস্তাহার** প্রচার করেন এবং ফ্রান্স ও জার্মানির বিপ্লবে নেতৃত্ব দেন। ১৮৫০ খ্রি থেকে আমরণকাল লন্ডনের অধিবাসী হন। নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে জীবননির্বাহ করা সত্ত্বেও তিনি গ্রন্থাদি রচনায় লিপ্ত থাকেন। লন্ডনে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস অ্যাসোসিয়েশন নামে প্রথম আন্তর্জাতিক গঠন করেন (১৮৬৪); এবং 'ডাস ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন (১৮৬৭)। এঙ্গেলস-এর সহযোগে তিনি ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি তথা রাষ্ট্রচিন্তার যে সুসংবদ্ধ তত্ত্ব প্রচার করেন তার ভিত্তিতে কালক্রমে বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে ওঠে।

মার্কসের প্রথম দিককার চিন্তাভাবনায় ছিল হেগেলের বিপুল প্রভাব। মার্কসের দৃষ্টিতে **মানবপ্রকৃতি** অপরিবর্তনীয় নয়, ইতিহাসের ধারায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটে। মানুষ নিজেই তার জীবনের পরিবর্তন ঘটায়। তার শ্রমের অবস্থার উপর মানবপ্রকৃতি নির্ভর করে। ব্যক্তিগত মালিকানা শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টি করে ; এবং উৎপাদনের ফল থেকেই মানুষ বিচ্ছিন্ন হয় ; গড়ে ওঠে বিরুদ্ধ সমাজব্যবস্থা, যেটাকে মানুষ বিপ্লবের মাধ্যমে পরিবর্তন বা অতিক্রম করে। ব্যক্তিগত মালিকানার অবসানে মানুষ আর নিমিত্তের ভাগী হয়ে থাকে না। স্বমহিমায় মানুষই হয় সবকিছুর মানদণ্ড বা লক্ষ্য। সে স্বাধীনতা পায় ; তার সামাজিক সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় শ্রেণীবিহীন।

মার্কসের পরবর্তী রচনাদিতে (বিশেষ করে প্রথম খণ্ড ক্যাপিটাল গ্রন্থে) মানুষের ঐতিহাসিক সত্তার দার্শনিক ভিত্তিভূমি মানব সমাজের বিবর্তনে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার নিরিখে নতুনভাবে রচিত হয়। তাতে দেখানো হয় যে সমাজের যাবতীয় বিধিব্যবস্থায় এমন এক প্রক্রিয়া থাকে যার দ্বারা তার অস্তিত্ব, উত্থান ও পতনের একটা ব্যাখ্যা মেলে। মার্কস ইতিহাসের একটি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাতে বলা হয় যে **উৎপাদিকা শক্তি** ও **উৎপাদন সম্পর্ক** সমন্বিত প্রক্রিয়ায় সমাজপ্রকৃতি ব্যবহারিক মূল্য ও বিনিময় মূল্যে রূপায়িত হয়। উক্ত প্রক্রিয়ায় নতুন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ও ভাঙে। এইসব বিধিব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামো সমাজের ভিত প্রস্তুত করে যার উপর দাঁড়িয়ে ওঠে বহুতল সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উপরিকাঠামো ; সমাজ-বিবর্তনের পরিভাষায় যেগুলি **সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র** ও সাম্যবাদ নামে অভিহিত। উপরিকাঠামোর অন্তর্গত আইন, প্রশাসন ইত্যাদি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সমগ্র বিধিব্যবস্থার বাঁধুনিকে শক্তপোক্ত করে তোলে, উপযোগী মতাদর্শের সাহায্যে। উৎপাদিকা শক্তির প্রবণতা হল প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্যের সঙ্গে বিকাশ লাভ করা। সেই সঙ্গে ক্রমান্বয়ে এক একটি অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে ও ভাঙে, যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল তার সামাজিক পরিকাঠামোও পরিবর্তিত হয়। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক নির্দিষ্ট এক সময়ে সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে। সমাজে বিপ্লব দেখা দেয়। **শ্রেণী সংগ্রাম** চেতনা থেকে মানুষ ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতি উপলব্ধি করে, নব্যপন্থী ও প্রাচীনপন্থীর পার্থক্য বোঝা যায়। উল্লেখ্য, বৈপ্লবিক কার্যকারণ চেতনা সৃষ্টি করে, চেতনা প্রকৃত কারণ নয়।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে মার্কস এক শ্রমভিত্তিক মূল্যতত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। বিনিময় মূল্যের সার হল শ্রম। উৎপাদনের উদ্বৃত্ত মূল্যের পুঞ্জীভবন শ্রমিকের অতিরিক্ত কাজের সময়েরই ফসল, যার দরুন প্রাপ্য মজুরি থেকে শ্রমিক বঞ্চিত হয়। পুঁজিপতির হাতে বিনিময় মূল্য জমতে থাকে ; সেটা কখনই শ্রমিকের হাতে যায় না। শোষণই ধনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য স্বরূপ। অর্থনৈতিক এই প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে মার্কস ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে উৎপাদিকা শক্তিকে ধনতন্ত্র চিরকাল আটকে রাখতে পারবে না। ধনতন্ত্রের সংকট ঘনাবেই একদিন, যার সমাধান একমাত্র বিপ্লবেই সম্ভব। বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই শাসনক্ষমতা সর্বহারার হাতে বর্তাবে। প্রকৃতির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রেণীহীন

সমাজের মধ্যে দিয়ে এমন এক অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা গড়ে উঠবে যার স্বরূপ হবে মানুষে-মানুষে সমতা।

দ্র. আন্তর্জাতিক ; দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ; ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ; মার্কসবাদ ; ভিত্তি ও উপরিকাঠামো ; বিচ্ছিন্নতাবোধ

মার্কসবাদ (Marxism)

একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রদর্শন, যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদি এবং ধর্ম, নৈতিকতা ও মতাদর্শের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ সমন্বিত হয়েছে। বিভিন্ন জনের বিশেষ করে **কার্ল মার্কস** ও **ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের** একক ও যৌথ রচনাবলির মধ্যে এই রাষ্ট্রদর্শন নিহিত। মার্কসবাদের নানান ভাষ্য ও বিশ্লেষণ দেখা যায় ; অনেকেই নিজ দেশ বা দলীয় প্রয়োজনে মার্কসবাদের একটি ব্যাখ্যা করে নিয়েছেন। মার্কসবাদের দু'টি সুস্পষ্ট দিক আছে, যথা তত্ত্ব এবং **প্রয়োগ** (praxis)। তত্ত্বগত দিকের তিনটি বিভাগ আছে :

১. একটি দ্বান্দ্বিক (ডায়ালেকটিক্যাল) দর্শন, যেটি হেগেলের চিন্তার কাছে ঋণী হলেও **দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে** রূপান্তরিত এবং সেটা থেকেই **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ** উৎসারিত।

২. একটি অর্থনৈতিক তত্ত্ব, যার সারবত্তা হল শ্রমের মূল্য ও **উদ্বৃত্ত মূল্য**— দু'টি তত্ত্বের ভিত্তিতে অর্থনীতির যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. রাষ্ট্র ও বিপ্লবের তত্ত্ব।

মার্কস **সমাজতন্ত্র** ও সাম্যবাদের একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচনা করেছেন। তাঁর তত্ত্বসমূহ নিয়মনির্দিষ্ট ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী শক্তিসমুচয়ের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর আগে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের উদ্গাতারা নিছক সদিচ্ছার দ্বারা চালিত হতেন ; ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের যুক্তিতর্ক তাঁরা খণ্ডন করতে পারতেন না। অবশ্য মার্কস নিজেও দাস ক্যাপিটাল (১৮৬৭-৯৪) খণ্ড তিনটি লেখার আগে অন্যান্য বইতে যুক্তিশীল চিন্তার পরিচয় দিলেও তাঁর সুসংবদ্ধ জগৎবীক্ষণ প্রত্যয় তুলে ধরেননি। হেগেলের পথ অনুসরণ করে মার্কস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে ইতিহাস নয়, প্রতিনয় ও সমন্বয়-এর ধারায় নিয়তই উন্মোচিত হয়, যে প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে এবং সেই সঙ্গে চলে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম, যার চূড়ান্ত পরিণতি হবে সর্বহারা অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর জয় ও সাম্যবাদী মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা।

মার্কসীয় ইতিহাসতত্ত্ব অনুযায়ী এক একটি যুগ বিশেষ কোনও শ্রেণীর স্বার্থান্বিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে। তাই দেখা যায় কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল মধ্যযুগের ইউরোপে **সামন্ততন্ত্র** বিরাজ করত, যেখানে ভূস্বামী, জায়গিরদার এবং তাদের মতাদর্শ ও আইনকানুনের ছিল একাধিপত্য। সেই শ্রেণী- কাঠামোর মধ্যে থেকেই ক্রমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রাধান্য ও পুঁজিপতিদের আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনিবার্য স্ববিরোধের ফলে সেটাও একদিন অচল প্রতিপন্ন হয়, শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রেণীকাঠামো, মূল্যবোধ এবং জীবনধারা এক একটি যুগের অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা অনুযায়ী রূপ নেয়। সংশ্লিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক শ্রেণীস্বার্থ তখনকার সামাজিক ব্যবস্থাকে রূপায়িত করে। অন্তর্নিহিত শ্রেণীস্বার্থান্বিত অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর রচিত হয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো। প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে শ্রেণী আধিপত্য করে সেই শ্রেণীই রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রেণীসংগ্রামে প্রতিপক্ষ শ্রেণীর বিরুদ্ধ ব্যবহার করে।

মার্কস পুঁজিবাদকে সাম্যবাদের অভিমুখে পৌঁছনোর পক্ষে সহায়ক হিসেবে দেখেছিলেন। নিয়মতান্ত্রিক সংস্কারপন্থী পথ তিনি পরিহার করেন। কারণ তাতে অনিবার্য ঐতিহাসিক গতি ব্যাহত হয়। সর্বহারার শাসনকালে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে শ্রেণীসংগ্রাম আর ঘটবে না। শ্রেণী অবসানের সঙ্গে মার্কস রাষ্ট্রেরও অবসান চেয়েছিলেন। কারণ রাষ্ট্রকে তিনি একটি পীড়নযন্ত্র হিসেবে দেখেন।

মার্কসবাদের পূর্বোক্ত দুটি দিকের মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সক্রিয়তার তাৎপর্য হল স্বাধীন, বিশ্বজনীন ও সৃজনশীল মানুষের ক্রিয়াশীলতা যার মধ্য দিয়ে মানুষ যাবতীয় উদ্ভাবনা, উৎপাদন, পরিবর্তন ও প্রস্তুতিকরণে লিপ্ত থাকে, যেটা মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য এবং তার মাধ্যমে সে অন্যান্য জীব থেকে স্বতন্ত্র। এই সক্রিয়তার মধ্যে অনেকে বিপ্লবকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। তবে সে বিপ্লব রাজনৈতিক পরিবর্তন মাত্র নয়। সেটার মাধ্যমে মানুষের **বিচ্ছিন্নতাবোধের** (alienation) অবসান ঘটে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ (Marxism-Leninism)

লেনিনের মৃত্যুর পর অক্টোবর বিপ্লবের যথার্থ রাষ্ট্রদর্শন কী সেটা সোভিয়েত দেশে তুলে ধরার জন্য স্তালিন প্রত্যয়টির প্রবর্তন করেন। তাতে এঙ্গেলস-কৃত মার্কসীয় পুঁজিবাদ তত্ত্বের কিছুটা সরলীকৃত ভাষ্যের সঙ্গে লেনিনের বিপ্লবী কার্যক্রম— বিশেষ করে **গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা** এবং পুরোগামী হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার তত্ত্ব সংমিশ্রিত হয়। বস্তুত মার্কসীয় মতাদর্শের ত্রিমুখী ধারা— **দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী** দর্শন, অর্থনীতি এবং বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ সমন্বিত। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনে প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তনের বিকাশ তথা ভাব ও বস্তুর সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে মজুরি, মুনাফা, ভূমির খাজনা, মালিকানা ইত্যাদি প্রসঙ্গে পুঁজিবাদী শোষণ অর্থাৎ পুঁজিপতিদের উদ্বৃত্ত মূল্যের আত্মসাৎ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মার্কসীয় বিশ্লেষণে পুঁজিবাদী উৎপাদনের রীতিনীতিতে (ব্যক্তিগত মালিকানা জনিত উৎপাদনে উদ্বৃত্ত মূল্যের আত্মসাৎ এবং উৎপাদনের সামাজিক প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ) একটা অন্তর্বিরোধ আছে, যার ফলে পুঁজিবাদের বিনাশ এবং তার পরিবর্তে সাম্যবাদের স্থলাভিষিক্ত হওয়া অনিবার্য। বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণীর রূপ, চরিত্র ও কর্মপদ্ধতির কথা বলা হয়েছে এবং সাম্যবাদী পথে ঐতিহাসিক দায়িত্বে পুঁজিবাদী শাসনের উচ্ছেদ ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় সর্বহারা শ্রেণীর ভূমিকার কথা বলা হয়েছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ একটি আন্তর্জাতিক মতবাদ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিয়তই তা প্রযুক্ত হয়। শ্রমজীবী, সাম্যবাদী ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং বিভিন্ন দেশে সমাজবাদী ও সাম্যবাদী গতি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাধারণ নানা তত্ত্বে সেটা

বিকশিত হয়। মার্কসবাদী লেনিনবাদী তত্ত্বের ভিত্তিতেই বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম নির্ধারিত হয়।

মিল, জন স্টুয়ার্ট (১৮০৬-১৮৭৩) (Mill, J.S.)

ইংরেজ দার্শনিক ; রাষ্ট্রচিন্তার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এবং যুক্তিবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব ও অর্থনীতিতে তাঁর বিশেষ অবদান আছে। পিতা জেমস মিল ছিলেন ঐতিহাসিক। তাঁর তত্ত্বাবধানে পুত্রের লেখাপড়ার সঙ্গে বেনথামের হিতবাদী দর্শনে আগ্রহ দেখা দেয়, বেনথামের দর্শন আলোচনা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে মিল হিতবাদী সমাজ নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। ক্রমে বিভিন্ন বিদ্বৎসংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে যোগ দেন। কিছুকাল তিনি পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিলেন। তাঁর লেখা গ্রন্থাদির মধ্যে 'এসেজ অন লিবার্টি', 'কনসিডারেসনস অব রিপ্রেসেনটেটিভ গভর্নমেন্ট' ও 'ইউটিলিটারিয়ানিজম' গ্রন্থে রাষ্ট্রচিন্তার উপর তাঁর তত্ত্বগুলি বেশি পাওয়া যায়।

মননশীল জীবনের প্রথম দিকে পিতা জেমস মিল ও গুরু বেনথামের চিন্তায় তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। ক্রমে তাঁর মনে নানা সংশয় জাগে। বেনথামের হিতবাদ তত্ত্বে তিনি কিছু সংশোধনী যুক্ত করে নিজস্ব চিন্তার পৃথক পথ রচনা করেন। বেনথাম বিভিন্ন সুখের মধ্যে কেবল পরিমাণগত পার্থক্যকে স্বীকৃতি দেন। মিল সে ব্যাপারে বলেন যে গুণগত পার্থক্যেরও একটা স্থান আছে। তা ছাড়া সুখ দু'রকমের, যথা : উচ্চ ও নিম্ন। লোকে খোঁজে উচ্চস্তরের সুখ। মিলের মতানুসারে হিতের পরিবর্তে উচ্চস্তরের সুখ খোঁজাই বিধেয়। পক্ষান্তরে হিতবাদ যেহেতু ভোগবাদী, সেজন্য পরিমাণ ছাড়া সুখের মধ্যে সেটা আর কোনও পার্থক্যকে স্বীকার করে না। বেনথাম নীতিগতভাবে সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক মানুষের হিতসাধনের উপযোগী আইন প্রণয়ন চাইতেন। সুখের তারতম্য পরিমাপের যে গাণিতিক পদ্ধতি বেনথাম উদ্ভাবন করেন মিলের কাছে সেটি ছিল অবাস্তব। মানুষের প্রকৃতি ও চাহিদাকে বেনথাম গুরুত্ব দিতেন। মিলের লক্ষ্য ছিল তাঁর নৈতিকতার দিকে। তাঁর মতে লোকের নৈতিক আচরণের উন্নয়নই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে বেনথাম ও মিলের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুই-ই ছিল। লোকের একটি ভোটের অধিকারে বেনথাম বিশ্বাস করতেন। মিল চাইতেন শিক্ষিত লোকেদের আনুপাতিক রীতি অনুযায়ী একাধিক ভোট। তবে গোপন ব্যালটে নয়। মিল আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ চাইতেন, বেনথাম ছিলেন তার বিরোধী। বেনথাম জনকল্যাণে রাষ্ট্রীয় উদ্যমের পক্ষপাতী ছিলেন না, যেটা মিল চাইতেন। মিল ছিলেন সাম্যবাদের সমর্থক। তিনি বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা ও কারখানা আইনের প্রবর্তন এবং একচেটিয়া ব্যবসাবাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণবিধি সুপারিশ করেন। মিল অবাধ বাণিজ্যনীতির সীমিত প্রয়োগে আস্থাশীল ছিলেন ; মনে করতেন যে তাতে ন্যায্য ও সুশৃঙ্খল অর্থনৈতিক উন্নয়নে মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে সমস্তরে বসে দর কষাকষিতে ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব বজায় থাকে। কর আরোপের মাধ্যমে মিল সামাজিক ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠার বহুবিধ সুপারিশ করেন। উত্তরাধিকার প্রথার সমালোচক হিসেবে তিনি তারও উপর কর নির্ধারণের প্রস্তাব করেন।

মিলের লেখা 'অন লিবার্টি' (১৮৫৯) এবং 'সাবজেকশন অব উইমেন' (১৮৬৯) গ্রন্থ দুটিতে আইন, অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর বহু মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একদিকে ব্যক্তি এবং অন্যদিকে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন যে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধিষ্ণু আইন প্রণয়ন ক্ষমতায় দেশবাসীকে একটা ছক কাটা মানুষে পরিণত করা হচ্ছে। রাষ্ট্রের মাত্রাতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ থেকে ব্যক্তিমানুষকে রক্ষা করা প্রয়োজন। ব্যক্তিমানুষই যাবতীয় জ্ঞান, শুভকাজ তথা মানবিক সংস্কৃতির একমাত্র উৎস। তাই পূর্ণ স্বাধীন পরিবেশে চাই ব্যক্তির বিকাশ এবং ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ। সামাজিক সুখের জন্যই চাই ব্যক্তিস্বাধীনতা। স্বাধীনতা হল ব্যক্তির নিজের উপর সার্বভৌমত্ব। তবে তার অর্থ যথেচ্ছাচার নয়। যে পরিবেশে ব্যক্তিসত্তার সমস্ত গুণাবলির সুসমঞ্জস বিকাশের সুযোগ থাকে তারই উপলব্ধি হল স্বাধীনতা। অন্যদিকে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে উভয়ের মধ্যে এমন কোনও পার্থক্য নেই যার জন্যে অধিকারের ব্যাপারে বৈষম্য থাকবে।

মিল চাইতেন নির্বাচনের বিধিব্যবস্থায় **সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব**, যাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদেরও আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব থাকে। তাতে সমস্ত নাগরিকের কার্যকর অধিকার সুনিশ্চিত হয়। মিলের রচনাদিতে আইন, সংবিধান ও অর্থনীতি গুরুত্ব পায় এবং স্বাধীনতার মূল্যবোধের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত মানবপ্রকৃতি স্বীকৃতি অর্জন করে।

মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy)

যে সমাজের অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থায় উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসা ও শিল্পবাণিজ্য যুগপৎ একত্র বিরাজ করে। উভয় প্রকার ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্যম পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং উভয় ধারার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। কার্যত সব দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অংশত মিশ্র। সমাজতন্ত্রী দেশে কিছু উৎপাদনে ব্যক্তিগত মালিকানা সরকারিভাবে স্বীকৃত ; এবং সেখানে কাজ কারবারে কালোবাজারি ক্রিয়াকলাপ দেখা যায়। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী বহু দেশে রাষ্ট্রের অধীনে অল্পবিস্তর উৎপাদন ও ব্যবসাবাণিজ্য নির্বাহ হয়। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স প্রভৃতি অনেক দেশ রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বহুলাংশে পরিত্যাগ করলেও গুরুত্বপূর্ণ ও বিপুল পুঁজিনির্ভর কিছু উৎপাদন ও বাণিজ্য রাষ্ট্রের অধীনে রেখেছে। স্থিতাবস্থাকালে বেসরকারি উদ্যমের কার্যকরতা যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি সরকারি উদ্যমের পারম্পর্য, স্থিতিস্থাপকতা, সামাজিক তাগিদে দায়িত্বশীলতা, বিশেষ করে আপৎকালে কর্মসম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ। তবে নব্বুইয়ের দশকে প্রথম থেকেই সারা বিশ্বের বহু দেশে উৎপাদন হ্রাস, মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধির নিম্ন প্রবণতাদৃষ্টে বাজারি অর্থনীতি অভিমুখে সমাজব্যবস্থার নবরূপায়ণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্র. রাষ্ট্রীয় মালিকানা ; সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি

মুসলিম লিগ (Muslim League)

উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত ভারতীয় মুসলমানধর্মীদের মধ্যে হিন্দু নবজাগরণ থেকে পৃথক খাতে স্বতন্ত্র এক সাজাত্যবোধ ও চেতনা দেখা দেয়। তার মূলে ছিল শিক্ষা ও সরকারি চাকুরিতে এবং রাজনৈতিক বিষয়াদিতে মুসলমানদের সম্প্রদায়গত সুযোগসুবিধা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। সেটাই সংগঠিত রূপ নেয় ঢাকায় ১৯০৬ খ্রি ৩০ ডিসেম্বর নবাব সলিমুল্লার প্রাসাদে নিখিল ভারত মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ছিল যে তার মাস চারেক আগে ভারত সচিব লর্ড মর্লের ঘোষণা যে অচিরে সাংবিধানিক পরিবর্তন এবং সংসদে প্রতিনিধির সংখ্যাবৃদ্ধি। এর আগে মুসলমানদের একদল প্রতিনিধি বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ব্যবস্থার দাবি জানান।

অনতিকালের মধ্যে লিগের কয়েকটি প্রাদেশিক শাখা গড়ে ওঠে। প্রথম কয়েক বছরে বিভিন্ন সর্বভারতীয় বার্ষিক অধিবেশনে যাঁরা সভাপতিত্ব করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আগা খাঁ, সার আদমজি পিরভয়, সৈয়দ আলি ইমাম, নবাব সলিমুল্লা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বঙ্গ বিভাগ রদ (১৯১২) হয়ে যাবার আগে লিগের কর্মসূচিতে কংগ্রেসের স্বরাজ, স্বদেশি ও বয়কট নীতির বিরোধিতা, বঙ্গবিভাগকে সমর্থন, পূর্ববঙ্গ ও আসামের জন্য স্বতন্ত্র হাইকোর্ট স্থাপন, সরকারি উচ্চপদে অধিকতর সংখ্যক মুসলিম প্রার্থী নিয়োগের দাবি ছিল প্রধান। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের সঙ্গে তুরস্কের যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় লিগের ভিতরে **সার্ব ইসলাম** আন্দোলনের প্রবক্তারা শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তাঁরা ছিলেন গোঁড়া ও ধর্মান্ধ ; কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের ব্রিটিশ-বিরোধিতাসূত্রে সখ্যতা দেখা দেয়। লখনৌতে কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে এক চুক্তিতে (১৯১৬) যৌথভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানানো হয় ; কিন্তু পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি থেকে লিগ সরে আসেনি। বছর কয়েক উভয় দলের একই স্থানে বার্ষিক অধিবেশন বসত। লিগের সঙ্গে কংগ্রেসের বাহ্যিক সখ্যতা ১৯২৪ খ্রি অবধি বজায় ছিল। লিগে খিলাফতিদের আধিপত্যসূত্রে লিগ গান্ধীর খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়। এম. এ. জিন্না কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তখন ওই আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। তিনি স্বরাজ দলের নেতাদের মতো বয়কট ইত্যাদিতে সায় না দিয়ে সাংবিধানিক সুযোগসুবিধা অর্জনে আগ্রহী ছিলেন। ১৯২৪ খ্রি লিগের লাহোর সম্মেলনের পর থেকে লিগ-কংগ্রেস সখ্যতায় ফাটল ধরে। জিন্না ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস আদায়ের জন্য তৎপর হন।

১৯২৮-২৯ খ্রি নাগাদ লিগ দুটি বিরোধী গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটির নেতৃত্বে জিন্না এবং অপরটির নেতৃত্বে ছিলেন মহম্মদ সফি। লিগে আরও উপগোষ্ঠী দেখা দেয়। জিন্না বছর দুয়েক রাজনীতি থেকে সরে থেকে বিলেতে বসবাস শুরু করেন। উভয় গোষ্ঠী ১৯৩০ খ্রি ফেব্রুয়ারিতে একতাবদ্ধ হবার জন্য পৃথকভাবে সক্রিয় ছিল। ১৯৩৪ খ্রি জিন্নার নেতৃত্বে দুটি গোষ্ঠী মিলে যায়। এর কিছু আগে চৌধুরী রহমত আলি নামে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র একটি পুস্তিকায় (১৯৩৩) 'পাকিস্তান' শব্দটির প্রথম ব্যবহারসূত্রে মুসলমানদের স্বতন্ত্র এক রাষ্ট্রের প্রস্তাবনা করেন। সার মহম্মদ ইকবালও প্যান-ইসলাম মতবাদে প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের একটি-রাষ্ট্রে সংবদ্ধ করার পরিকল্পনা করেন। ১৯৩৬ খ্রি বার্ষিক

অধিবেশনে লিগ ব্রিটিশ সরকারের নতুন শাসনতান্ত্রিক আইনের (১৯৩৫) প্রাদেশিক সরকার গঠনের বিষয়টি শুধু সমর্থন করে।

নিখিল ভারত মুসলিম লিগ মুসলমান সমাজের নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের দাবি জানালেও ত্রিশের দশকের মধ্যভাগে প্রদেশগুলিতে (যথা পঞ্জাব, বঙ্গদেশ) তার বিশেষ প্রভাব ছিল না। লিগে জমিদার ও শিক্ষিত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর আধিপত্য বিরাজ করত। ১৯৩৭ খ্রি সাধারণ নির্বাচনের পর লিগ স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। পঞ্জাব, অসম ও বঙ্গদেশে অন্যান্য ক্ষমতাশালী আঞ্চলিক মুসলিম দলের সঙ্গে লিগের মিতালি গড়ে ওঠে। যুক্ত প্রদেশে লিগ-কংগ্রেস কোয়ালিশনের প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় মুসলিম জনমত লিগের অনুকূল হতে শুরু করে। ১৯৪০ খ্রি ২৩ মার্চ লাহোরে লিগের সর্বভারতীয় সম্মেলনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর আগে ১৯৩৯ খ্রি ২২ ডিসেম্বর সরকারের যুদ্ধনীতির প্রতিবাদে এবং ভারতের স্বাধীনতার দাবিতে কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা প্রত্যাহার করায় লিগই সরকারের একমাত্র ভরসাস্থল হয়ে দাঁড়ায়, পাকিস্তানের পথ প্রশস্ত হয়। স্বাধীনতার আশু নিশ্চয়তা না থাকায় কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পক্ষান্তরে মুসলিম স্বার্থ ক্রিপস প্রস্তাবে সুরক্ষিত ছিল না বলে লিগও ক্রিপস প্রস্তাবে সায় দেয়নি।

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৬ খ্রি অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে লিগ কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত সব কটি আসনে এবং প্রাদেশিক আইনসভার অধিকাংশ আসনে জয়ী হয়। স্বভাবতই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ও স্বাধীনতার প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতীয় রাজনৈতিক দল সমূহের সঙ্গে আলোচনায় মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি স্থানীয় দল হিসেবে মুসলিম লিগ স্বীকৃতি পায়। স্বাধীন স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ সরকার প্রেরিত (মার্চ-জুন ১৯৪৬) ক্যাবিনেট মিশন কর্তৃক উপস্থাপিত তিনটি অঞ্চলে ভারতকে বিভক্ত করে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন, অঞ্চল তিনটির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গণপরিষদ গঠন এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাবে কংগ্রেস ও লিগের মতপার্থক্য প্রকট হয়ে ওঠে। লিগ চেয়েছিল পশ্চিম ও পূর্বের দুটি প্রান্তিক অঞ্চল-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের অনুকূল সুবিধা। ১৯৪৬ খ্রি এক ইস্তাহারে হিন্দু জমিদারদের শোষণ থেকে মুসলিম চাষীর মুক্তি এবং হিন্দু ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা থেকে স্বল্প পুঁজির মুসলমান ব্যবসায়ীদের রক্ষা এবং শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে লিগের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তোলে। কার্যত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে লিগ ছিল সর্বাংশে একটি মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল। লিগের আহ্বানে ১৬ অগস্ট ১৯৪৬ থেকে সারা দেশে প্রত্যক্ষ সংগ্রামসূত্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। অন্তর্বর্তী সরকারে লিগ পরে যোগ দেয় (২৬ অক্টোবর) বটে, কিন্তু লিগ সদস্যদের কার্যকলাপে সরকার অচল হয়ে পড়ে। ৯ ডিসেম্বরে গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয়, লিগ তাতে যোগ দেয়নি। এর আগে অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে লন্ডনে এক বৈঠক বসে। সেখানেও কোনও সুরাহা হয়নি।

১৯৪৭ খ্রি ২২ মার্চ মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় পদে নিযুক্ত হয়ে আসেন। পঞ্জাব ও বঙ্গদেশকে বিভক্ত করে ভারত বিভাগের যে প্রস্তাব তিনি দেন তাতে কংগ্রেস সম্মত হয়। ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর লিগ পাকিস্তানে কিছুকাল শক্তিসম্পন্ন ছিল। ক্রমে লিগের প্রভাব শেষ হয়ে যায়।

মে দিবস (May Day)

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপে শিল্প-বাণিজ্য ও পরিবহণে বিজ্ঞানের প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে শিল্পবিপ্লব প্রসারিত হয়। ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের ফলে বিত্তহীন এক বিরাট শ্রমিক শ্রেণী গড়ে ওঠে। একদিকে উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার, অন্যদিকে নারীপুরুষ ও অল্পবয়স্ক শ্রমিকদের উপর নানাবিধ অত্যাচার ও শোষণ চলতে থাকে। ন্যায়সঙ্গত মজুরি, সারা দিনরাতব্যাপী কাজের দীর্ঘ সময় হ্রাস ইত্যাদির দাবিতে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ক্রমে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে শ্রমিকদের কাজের সময় কমানোর আন্দোলন জোরদার হয়। ১৮৭৫ খ্রি পেনসিলভানিয়ায় কয়লাখনি শ্রমিকদের সঙ্গে মালিক পক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন খনি শ্রমিক নিহত হন। ১৮৭৭ খ্রি রেল ও ইস্পাত সমেত বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকেরা দেশব্যাপী ধর্মঘটে যোগ দেন।

উল্লিখিত পরিস্থিতিতে ১৮৮৪ খ্রি ১ মে তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে শ্রমিকেরা অনধিক ১০ ঘণ্টার কাজের সময়ের দাবিতে এক মিছিল বের করেন। শহরের কেন্দ্রস্থল হে মার্কেটে যখন মিছিলটি পৌঁছয় তখন তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেবার জন্য তাদের উপর সৈনিকেরা গুলিবর্ষণ করে। তাদের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষ বেধে যায়। সৈন্যদের গুলিতে নিহত শ্রমিকদের রক্তরঞ্জিত পোষাককে পতাকা হিসেবে ব্যবহার করে হে মার্কেটের শ্রমিকেরা বিদ্রোহের লাল পতাকা তুলে ধরেন। এই হল মে দিবস ও লাল পতাকা ব্যবহারের গোড়ার ইতিহাস।

শিকাগোতে এই আন্দোলন একটা জঙ্গি রূপ ধারণ করে। অসংগঠিত ও পশ্চাৎপদ শ্রমিকেরা এই ধর্মঘট সূত্রে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সোৎসাহে যোগদান করেন। ৩ মে তারিখে ধর্মঘটি শ্রমিকদের এক সভায় আবার পুলিশের আক্রমণে ৬ জন শ্রমিক নিহত হন। ৪ মে তারিখে হে মার্কেট স্কোয়ারে এক জনসভায় পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষে ৪ জন শ্রমিক নিহত এবং অনেকে গ্রেপ্তার হন। পরে কোনও কোনও জনকে কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তি দেওয়া হয়। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের সংগঠক আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার ১৮৮৮ খ্রি সেন্ট লুইস সম্মেলনে কাজের সময় অনধিক ৮ ঘণ্টা ধার্যের দাবিতে মে দিবস পালনের আহ্বান জানায়।

১৮৮৯ খ্রি পারিতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম অধিবেশনে ১ মে তারিখটিকে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দিবসটি নিয়ে পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশের শ্রমিক নেতাদের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটে। দিবসটির পিছনে এঙ্গেলস ও লেনিনের বিশেষ সমর্থন ছিল। ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয় ১৯২৩ খ্রি মাদ্রাজ শহরে।

মেনশেভিকবাদ (Menshevism)

রাশিয়ান সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নরমপন্থী (মডারেট) গোষ্ঠী। লন্ডনে অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯০৩) পার্টির সদস্যপদের শর্ত সম্পর্কে এক বিতর্কে ভোটাভুটি হয়। লেনিন ও তাঁর গোষ্ঠীর বক্তব্য ছিল যে সদস্যদের সক্রিয়, কেন্দ্রানুগ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে। পক্ষান্তরে প্লেখানভ, মার্টভ প্রমুখের গোষ্ঠী চেয়েছিলেন সদস্যপদের শিথিল শর্তাবলী। প্রথমোক্ত গোষ্ঠী যাঁরা ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ হন তাঁদের বলা হয় বলশেভিক। শেষোক্ত গোষ্ঠী মেনশেভিক (সংখ্যালঘিষ্ঠ) নামে অভিহিত। পার্টিতে দুটি গোষ্ঠীর বিরোধ নানা বিষয়ে দানা বাঁধে। ১৯০৫ খ্রি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শ্রেণীনেতৃত্ব, অন্যান্য দলের সঙ্গে মিতালী এবং মতাদর্শগত প্রশ্নে বিভেদ দেখা দেয়। বলশেভিকরা চেয়েছিলেন কৃষকদের নিয়ে, কিন্তু মূলত শ্রমিকদের নেতৃত্ব। মেনশেভিকদের অধিকাংশ সদস্য চান উদারনৈতিকদের নিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্ব।

১৯০৫ খ্রি বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাবার ফলে মেনশেভিকরা পার্টির গোপন ক্রিয়াকলাপ থেকে বেরিয়ে এসে প্রকাশ্য আইনসঙ্গত সংগঠনসমূহের মাধ্যমে কাজ শুরু করেন। তাঁরা প্রাথমিক সোভিয়েত সমূহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। বলশেভিকরা ১৯১২ সাল থেকে পৃথকভাবে চলতে শুরু করেন। উভয় গোষ্ঠী পার্টিতে নামেমাত্র যুক্ত ছিল। ১৯১৭ সালে মেনশেভিকরা স্বতন্ত্র পার্টি গঠন করেন। মেনশেভিকদের মধ্যেও বাম ও দক্ষিণ দুটি অংশ ছিল। অক্টোবর বিপ্লবকে মেনশেভিকরা 'ক্যু' অর্থাৎ আকস্মিক বিদ্রোহ হিসেবে নিন্দা করেন। ১৯২১ খ্রি থেকে মেনশেভিকদের নির্মূল করে দেওয়া হয়।

মতাদর্শে মেনশেভিকরা মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তাঁরা চাইতেন রাশিয়ায় আগে একটা ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন, তারপরে সর্বহারা বিপ্লব, তাঁরা লেনিনের সমাজতন্ত্রী দেশশাসনে পার্টির ভূমিকার তত্ত্ব নাকচ করেন।

মৈত্রী (Fraternity)

ফরাসি বিপ্লবের তিনটি বাণীর অন্যতম। শব্দটির দ্বারা সমাজের পারস্পরিক বন্ধনের প্রকৃতি বোঝানো এবং অপর দুটি বাণী সাম্য ও স্বাধীনতা-র অন্তর্নিহিত মূল্য হিসেবে নির্দেশ করা হয়। মৈত্রীর অর্থ হল মানুষে-মানুষে প্রেম ও প্রীতির বন্ধন। সেই বন্ধন আত্মীয়-স্বজনের গণ্ডি অতিক্রম করে পাড়াপ্রতিবেশী ও সমগ্র জাতিগোষ্ঠীকে যুক্ত এবং নির্দিষ্ট কোনও আদর্শের অভিমুখে সমপর্যায়ে সুখদুঃখের সঙ্গী অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে একসূত্রে আবদ্ধ করে। অবশ্য আধুনিক কোনও রাষ্ট্রে মৈত্রীর আদর্শ কী পরিমাণে কার্যকর সে বিষয়ে সংশয় আছে। তবে বৃহত্তর পরিসরে না থাকলেও স্থানীয় ও ব্যক্তিগত মৈত্রীর সম্পর্ক দেখা যায়। কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়তো সীমিত, কিন্তু রাজনৈতিক রচনায়, ভাষণে ও প্রচারে মৈত্রীর আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকে।

মোর্চা (Coalition)

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কিংবা সংগঠন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে যে সাময়িক মিলন বা মোর্চা গঠন করে। মোর্চা গঠনের উদ্দেশ্য স্থায়ী শক্তিশালী সরকার গড়ার জন্য মিলিতভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অথবা শাসনক্ষমতা থেকে কোনও দলকে সরানোর জন্য মোর্চার সাহায্যে সমবেতভাবে সচেষ্ট হওয়া। মোর্চার সদস্য-দলগুলির এককভাবে চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে ; অর্থাৎ মোর্চাভুক্ত কোনও দলের কর্মপন্থা অগ্রাহ্য হলে সে দল মোর্চা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তাই মোর্চা ভেঙে যাবার আশঙ্কায় তার সদস্যদের সদাই তুষ্ট রাখতে হয়।

মৌলবাদ (Fundamentalism)

কোনও ধর্মের অন্তর্গত আন্দোলন যার লক্ষ্য হল সেইসব মূল নীতি ও নির্দেশসমূহের আপসহীন সংরক্ষণ, যেগুলির ভিত্তিতে সেই ধর্ম গড়ে উঠেছে এবং বাইরে থেকে অন্য কোনও সামাজিক ও নৈতিক রীতিনীতি সঞ্চারের বিরোধিতা করা। প্রত্যয়টি রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যাতে বাইরের চিন্তাভাবনার প্রভাবে দলীয় মতাদর্শে কারও বিচ্যুতি না ঘটে।

দ্র. ধর্ম

ম্যাগনা কার্টা (Magna Carta)

লাতিন শব্দ। অর্থ মহান সনদ। ইংল্যান্ডের রাজা জন সেখানকার ভূস্বামী ব্যারনদের দাবিতে ১৫ জুন ১২১৫ খ্রি ওই সনদে স্বাক্ষর করেন। এটি উগ্র ধরনের কোনও দলিল ছিল না। ছিল শুধু রাজ্যের সরকারের স্বীকৃত ও মৌলিক কতকগুলি নীতি, যা দিয়ে রাজা ও ব্যারনদের সেগুলি প্রতিপালনের চুক্তিতে আবদ্ধ করা যায়। তার প্রধান বিষয়গুলির অন্যতম ছিল যে বিচারকের সামনে বিচার ব্যতিরেকে কোনও ব্যক্তিকে শাস্তিদান করা চলবে না, পুরানো আমলের স্বাধীনতা বজায় থাকবে এবং ভূস্বামীরা তাঁদের অধীনস্থ জমির মালিকদের (vassal) কাছ থেকে স্বীকৃত বিষয়াদির বহির্ভূত কোনও কিছু সালিশি সংস্থাকে না জানিয়ে দাবি করতে পারবে না। উত্তরকালে ম্যাগনা কার্টা ইংল্যান্ডে স্বাধীনতার এবং মৌলিক অধিকার আইনের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় এবং জনচিত্তে এখনও সেই মর্যাদা পেয়ে থাকে।

য

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Federalism)

যে-রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আইনসভা, কার্যনির্বাহী সংস্থা, বিচার বিভাগ ইত্যাদি হতে স্বতন্ত্রভাবে সংশ্লিষ্ট দেশের অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশ সমূহে যুগপৎ আইনসভা, কার্যনির্বাহী সংস্থা, বিচারবিভাগ ইত্যাদি থাকে ; যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন। ভারতও কিছুটা এই গোত্রে পড়ে। একই সংবিধান হল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহের ক্ষমতার উৎস। উভয় সরকারই নিজ নিজ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দুভাবে গড়ে ওঠে। প্রথমটি হল অন্তর্ভুক্তির মধ্যে দিয়ে ; অর্থাৎ যুদ্ধে বিজয়ী রাষ্ট্র পরাজিত রাষ্ট্রকে নিজের মধ্যে অঙ্গীভূত করে নেয়। দ্বিতীয়টি যুক্তরাষ্ট্র গড়ার উপযোগী দুটি উপাদানের প্রয়োজন ঘটে। তার প্রথমটি হল পাশাপাশি অবস্থানের দরুন ছোট ছোট রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে একটা ঐক্যের আবেগ ; দ্বিতীয়টি হল ওইসব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অধিবাসীরা একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন না হয়েও সেই রাষ্ট্রের অঙ্গ হিসেবে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইবে (ডাইসি)। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যথার্থ উপাদান হল ভৌগোলিক পার্শ্ববর্তিতা, জাতীয়তার ভাববিজড়িত ঐক্য, মিলিত হবার আবেগমণ্ডিত ইচ্ছা এবং সেই সঙ্গে আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষার আকাঙ্ক্ষা। এই মানসিকতার মূল কারণ হল বহির্দেশীয় আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সুবিধা ও রাজনৈতিক কাঠামোর সুযোগ। যুক্তরাষ্ট্র গঠনে দুটি প্রবণতা একসঙ্গে কাজ করে, একটি হল কেন্দ্রমুখিতা এবং অপরটি বিকেন্দ্রিকতা।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সমগ্র দেশের জন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম কেন্দ্রীয় সরকার থাকে। সেই সরকার সারা দেশের সাধারণ স্বার্থজড়িত নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়, যেমন প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, মুদ্রাব্যবস্থা, পরিবহণ, সংযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমগ্র দেশের উপর কর্তৃত্বের অধিকারী। অপরদিকে প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলি বাকি যাবতীয় বিষয়ে স্বয়ংশাসিত হয়ে থাকে। নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেগুলি স্বাধীন। স্বভাবতই ওইসব

রাজ্যের সমস্যা, প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেগুলির নিজ নিজ আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ইত্যাদি নির্বাহ হয়। এইভাবে পরস্পর সংঘবদ্ধ হয়ে থাকার এবং একই সঙ্গে আত্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার বিপরীতমুখী দুই আবেগ ও প্রবণতার সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একটি লিখিত সংবিধান থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা সাধারণত যে রাজ্যেই বসবাস করুন, তাঁরা সারা দেশেরই নাগরিক হিসেবে সুযোগসুবিধার অধিকারী। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকেন। যদি কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অথবা দুই রাজ্যের মধ্যে কোনও বিষয়ে বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেয় তা হলে তার মীমাংসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রে একটি স্বাধীন বিচারব্যবস্থা থাকে।

দ্র. রাষ্ট্রপতি চালিত সরকার

যুগান্তর দল (Jugantar Party)

সঠিক অর্থে যুগান্তর নামে কোনও দল ছিল না। **অনুশীলন সমিতির** অন্তর্গত বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীর অন্যতম একটি গোষ্ঠী কালক্রমে যুগান্তর দল নামে পরিচিতি লাভ করে। সমিতির কিছু সদস্যের উদ্যোগে 'যুগান্তর' নামে সাপ্তাহিক একটি পত্রিকার প্রকাশনা (মার্চ, ১৯০৬) শুরু হয়। পত্রিকা প্রকাশনায় যাঁরা ছিলেন উদ্যোগী তাঁদের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, দেবব্রত বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ কর্মীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ছাড়াও পত্রিকার লেখকদের মধ্যে ছিলেন **অরবিন্দ ঘোষ**, সখারাম গণেশ দেউস্কর, বিপিনচন্দ্র পাল, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ কর্মী। পত্রিকাটি ১৯০৮ খ্রি ৬ই জুলাই পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ভারত সরকারের সংবাদপত্র বিষয়ক আইনে (১৯০৮) সেটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। অনুশীলন সমিতির কেন্দ্রীয় সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল শরীরচর্চা, আর শাখা হিসেবে যুগান্তর গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য ছিল বিপ্লবাদর্শ প্রচার। সশস্ত্র বিপ্লব বা হিংসাত্মক সংঘর্ষের মাধ্যমে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের সংকল্প নিয়ে 'যুগান্তর' পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। ক্রমে 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর সঙ্গে সমিতির মূল প্রবাহের সংযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে। ইতিমধ্যে বরোদা থেকে অরবিন্দ ঘোষ কলকাতায় চলে এসে দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন (১৯০৬)।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় বিদেশি দ্রব্য বয়কট, স্বদেশি পণ্যের প্রচার ও জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভে দেশ যখন উত্তাল তখন থেকে 'যুগান্তর' পত্রিকা দেশের বিদ্রোহী জনরোষকে সশস্ত্র সংগ্রামের ইন্ধন যোগায়। ১৯০৬ থেকে ১৯০৯ খ্রি বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাতি, গুপ্ত হত্যা ও প্রকাশ্য হত্যার প্রচেষ্টা ঘটে। এই সময়ে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ যুগান্তর গোষ্ঠীর কর্মীরা কলকাতার মুরারিপুকুরের এক বাগানবাড়িতে বোমা তৈরির একটি গুপ্ত ঘাঁটি গঠন করেন। মজঃফরপুর বোমার মামলায় ক্ষুদিরামের ফাঁসি এবং ওই সূত্রে জড়িত প্রফুল্ল চাকির আত্মহত্যা দেশব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ব্যাপক ধরপাকড় ও সরকারি নিগ্রহ শুরু হয়। অরবিন্দ, বারীন্দ্র উল্লাসকর, প্রমুখ বিপ্লবীরা গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁদের

কারাদণ্ড দ্বীপান্তর, অন্তরিন ইত্যাদির ফলে বিপ্লবীদের কার্যকলাপে কিছুকাল ভাঁটা পড়ে। সেসময়ে অনুশীলন সমিতির বিক্ষিপ্ত যেসব বিপ্লবী গোষ্ঠী গোপনে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল সেগুলি যুগান্তর গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা (বাঘা) যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর নেতৃত্বে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ক্রমে সমন্বিত হয়ে ওঠে। অনুশীলন ও যুগান্তরের দূরত্ব কমে গিয়ে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে অনুশীলন সমিতি একটি সর্বভারতীয় বিপ্লবী সংগঠনের রূপ পরিগ্রহ করে। বহির্বিশ্বেও সমধর্মা গদর প্রভৃতি দলের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। সেদিক থেকে যুগান্তর গোষ্ঠী তথা দলের বিপ্লবী ক্রিয়াকর্ম বঙ্গেই সীমিত ছিল। যুগান্তর দলের মধ্যেও স্থানিক ভিত্তিতে কয়েকটি উপগোষ্ঠী ছিল: বরিশালের শংকর মঠ, কলকাতার বিপিন গাঙ্গুলী, অতুল ঘোষ, জ্যোতিষ ঘোষ, দক্ষিণ ২৪ পরগণার হরিকুমার চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম এন রায়), মৈমনসিংহের সাধনা সমিতি (সুরেন ঘোষের গোষ্ঠী), মাদারিপুরে পূর্ণদাস, উত্তরবঙ্গে যতীন্দ্রমোহন রায়, চট্টগ্রামের গোষ্ঠী ইত্যাদি।

প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ বেধে যাবার কিছুকাল আগে থেকেই ইউরোপে ভারতীয় প্রবাসী বিশেষত ছাত্র ও বিপ্লবীদের সঙ্গে জার্মান সরকারের নেতৃস্থানীয় কোনও কোনও ব্যক্তির হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার গোড়ার দিকে জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে সেইসব বিপ্লবীদের ভারতে সশস্ত্র সংগ্রামের উপযোগী আর্থিক ও অস্ত্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তার ভিত্তিতে ইউরোপে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স কমিটি (যেটি বার্লিন কমিটি নামে পরিচিত) গঠিত হয় (সেপ্টেম্বর, ১৯১৪)। প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সংগঠিত করে আন্দামানে কারারুদ্ধ রাজবন্দীদের মুক্তি এবং পূর্ব ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংকল্প গৃহীত হয়। বার্লিন কমিটি ও জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ ভারতের বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র অভিযানের কয়েকটি ছক প্রস্তুত করেন। যুগান্তর দলের নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী এই সুযোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

জার্মান অস্ত্র ও অর্থসাহায্যে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন যতীন্দ্রনাথ। অস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা রূপায়ণের জন্য নরেন্দ্রনাথকে ব্যাটাভিয়ায় পাঠানো হয়। দ্বিতীয়বার তাঁকে আবার জাপানে রাসবিহারী বসু ও চীনে জার্মান প্রতিনিধির সঙ্গে সংযোগের জন্য পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে বালেশ্বরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে দলপতি যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী ও তাঁর চার জন সহকর্মী নিহত হন (৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৫)। সেই সংবাদে নরেন্দ্রনাথ প্রথমে মার্টিন নামে এক পাদ্রীর ছদ্মবেশে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যান এবং মানবেন্দ্রনাথ রায় নাম গ্রহণ করেন (১৯১৬)।

যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু, অস্ত্র আমদানি প্রচেষ্টার নিষ্ফলতা এবং বিশিষ্ট কর্মীদের গ্রেপ্তার ও আত্মগোপনের ফলে যুগান্তর দলের বৈপ্লবিক উত্থানের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর গান্ধীজির নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। অন্যান্য রাজবন্দির সঙ্গে যুগান্তর দলের কর্মীরাও জেল থেকে মুক্তি পান (১৯২০)। তাঁরা চিত্তরঞ্জন দাশের মাধ্যমে কংগ্রেসের সদস্য হন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে বহু কর্মী কারাবরণ করেন। কুড়ির দশকের শেষ দিকে কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতা বনাম ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস বিতর্কে সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মধ্যে মতপার্থক্য ও বিভেদের ভিত্তিতে যুগান্তর ও অনুশীলন

দলের নেতৃবৃন্দ যথাক্রমে দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে যান। ত্রিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনে উভয়পক্ষের নেতৃবৃন্দ দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ থাকেন। ওই দশকের দ্বিতীয়ার্ধে জেল থেকে মুক্তির পর অনুশীলন দলের অধিকাংশ কর্মী মার্কসবাদে প্রভাবিত হয়ে **আর এস পি** দলে যোগ দেন। পক্ষান্তরে ১৯৩৮ খ্রি ৯ সেপ্টেম্বর একটি বিবৃতির মাধ্যমে যুগান্তর দল আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মবিলোপ করে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যায়। দলের বহু বিশিষ্ট নেতা জেল থেকে সদ্য মুক্ত (১৯৩৬) মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) সঙ্গে যুক্ত হন।

যুদ্ধ (War)

দুই অথবা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু অধিকার কিংবা দাবি সশস্ত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অর্জনের রীতি। সশস্ত্র বলপ্রয়োগ স্বভাবতই অল্পবিস্তর হিংসাত্মক হয়ে থাকে। তবে যুদ্ধের সঙ্গে কোনও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ অথবা বিদ্রোহের মিল নেই। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ স্বীকৃতি পায় ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যুদ্ধসংক্রান্ত রীতিনীতি ও নিয়মকানুন আছে। তবে যুদ্ধ কখনও নিয়ম-নির্ধারিত পথে ঘটে না। বিবদমান শক্তিসমূহের হিংসা ও প্রতিহিংসা উত্তরোত্তর বেড়ে যাবার ফলে রীতিনীতি লঙ্ঘিত হয়। যুদ্ধের আইন মেনে চলার প্রশ্ন ওঠে শান্তি ফিরে এলে এবং যুদ্ধের দায় ও অপরাধের বিচারের তাগিদে।

যুদ্ধের রকমফের আছে, যেমন **গেরিলা যুদ্ধ, ঠাণ্ডা লড়াই, বিদ্রোহ,** সীমিত যুদ্ধ ইত্যাদি। যুদ্ধে লিপ্ত না হয়েও তৃতীয় শক্তি অনেক সময়ে নিজ স্বার্থে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে সক্রিয় থাকে। সেই অনুযায়ী যুদ্ধের প্রভেদ ঘটে। ভূখণ্ডের দাবিতে **আগ্রাসন** সাধারণত যুদ্ধের কারণ হিসেবে দেখা যায়। তদ্ব্যতিরেকে অন্য কারণ যেমন ধর্মের জিগির, মতাদর্শের লড়াই ইত্যাদির ভিত্তিতেও যুদ্ধ বাধে। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে যুদ্ধের প্রবৃত্তি মানুষের অন্তর্নিহিত একটি আদিম প্রবণতা, যেটা সংঘর্ষের মাধ্যমে নিষ্পত্তি খোঁজে। তবে মানুষের সহজাত চাহিদা হল শান্তি, সেটা প্ররোচনার ফলে যুদ্ধের দিকে মোড় নেয়। জনসমাজ শান্তিপ্রিয় হলেও গোষ্ঠী, দল ও রাষ্ট্রের মতিগতির ফলে যুদ্ধে মানুষ জড়িয়ে পড়ে। ঠুনকো মানসম্মানের চ্যুতিবিচ্যুতির দরুন বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে এক সময় মরণপণ যুদ্ধ ঘটেছে।

মার্কসীয় দৃষ্টিতে পূর্বকালে যুদ্ধে বিজয়ী দেশ বিজিত দেশের উৎপাদনব্যবস্থা, ভাষা ইত্যাদি অনুসরণ করত। মার্কস ও এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে বাণিজ্য বিস্তারের তাগিদে উপনিবেশ দখলের জন্য এক সময়ে পুঁজিবাদী দেশগুলি কীভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হত। মার্কসের মতে অনেক সময় রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর হয়। উপনিবেশিক শক্তিগুলি যুদ্ধের অভিশাপ তাদের পদানত উপনিবেশগুলির উপর চাপিয়ে দেয়। তবে মার্কস ও এঙ্গেলস থেকে লেনিন পর্যন্ত কেউ কোনওকালে শান্তিবাদে বিশ্বাস করতেন না। আবার একথাও মনে করতেন না যে যুদ্ধ চিরন্তন ও অনিবার্য। মার্কস ও এঙ্গেলস বিশ্বাস করতেন যে যতদিন ব্যক্তিগত মালিকানায় শ্রেণীশোষণ থাকবে ততদিন যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দেবে। **মার্কসবাদ-লেনিনবাদে** বলা হয় যে যুদ্ধ মূলত দুই প্রকারের ১. ন্যায় ও ২. অন্যায়। যে যুদ্ধের পরিণাম হয় শোষক শ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধি এবং ধনবৃদ্ধি সে যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত

নয়। কিন্তু যে যুদ্ধের পর শ্রেণীশোষণ ও জাতীয় নিপীড়ন থেকে মানুষ মুক্তি পায় সে যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত। ওই দৃষ্টিতে একথাও মনে করা হত যে বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো একটি সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠিত হবার ফলে শান্তির পক্ষে শক্তিসম্পন্ন প্রতিরোধচিন্তা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রবল হয়েছে।

যুদ্ধবিরতি (Armistice)

যুদ্ধের নিষ্পত্তি ও শান্তিস্থাপন সাপেক্ষ লড়াইয়ের বিরতি। সাধারণত সেটা যুধ্যমান বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে অস্থায়ী চুক্তি অথবা বর্তমান অনুরূপ কোনও চুক্তির শর্তবিশেষের প্রয়োগ বোঝায়। যুদ্ধবিরতির অর্থ বিধিসম্মত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি নয় ; কিংবা শান্তি বা আত্মসমর্পণও নয়। দুই পক্ষের মধ্যে নিছক কিছু পারস্পরিক আদানপ্রদান ও সাময়িক নিবৃত্তি হল যুদ্ধবিরতির চরিত্র। যুধ্যমান বিভিন্ন দেশের উচ্চপর্যায়ে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলেও সেনাধ্যক্ষরা সেটা প্রয়োজনে অমান্য করেন। যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলে পরাজিত পক্ষের অসুবিধা প্রকট হয় না। অন্যদিকে জয়ী দেশের লাভ হয়তো সীমাবদ্ধই থাকে।

যুধ্যমান অবস্থা (Belligerency)

ঘোষিত অথবা অঘোষিত যুদ্ধে বিবদমান বিভিন্ন পক্ষের আইনসম্মত অধিকার ও অবস্থা। এর দুটি দিক থাকে : এক, সশস্ত্র সংঘর্ষ, এবং দুই, যুদ্ধের অনুকূলে ইচ্ছা, স্বীকৃতি কিংবা ঘোষণা। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মধ্যে দিয়ে যুধ্যমান অবস্থা সূচিত হয়। কিংবা কোনও পক্ষ হতে চূড়ান্ত শর্ত জানানো হয় যুদ্ধ শুরুর পূর্বে। যুধ্যমান অবস্থার স্বীকৃতির অর্থ হল আন্তর্জাতিক আইনের নিঃসন্দেহ প্রযোজ্যতা। যুধ্যমান অবস্থা সংক্রান্ত উল্লিখিত আইনে নিরপেক্ষ দেশগুলির অধিকার ও কর্তব্যের স্বীকৃতি এবং বিবদমান দেশগুলির অধিকার ও কর্তব্যসমূহ মান্য করা সম্পর্কেও নির্দেশ পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক আইনে যুধ্যমান অবস্থার রীতিনীতির সুযোগ নেবার অধিকার সব রাষ্ট্রের থাকে না। অর্থাৎ নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্রোহী বা বিপ্লবী কোনও সরকার অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হলে তবেই আইনের সুযোগ-সুবিধার অধিকার অর্জন করে।

দ্র. যুদ্ধ ; আন্তর্জাতিক আইন

যৌথ নিরাপত্তা (Collective Security)

যুদ্ধের প্রতিরোধকল্পে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে কিছু রাষ্ট্রের যৌথ সমবায়ী এক কর্মকৌশল। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ মূলত যৌথ নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান পাঁচটি সদস্য-রাষ্ট্রের পরিষদে যে-কোনও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিষেধ (veto) প্রদানের ক্ষমতা থাকায় যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে, যদি উক্ত পাঁচটি রাষ্ট্রের তাতে ঐকমত্য থাকে। নচেৎ এই নিবর্তক নীতির প্রয়োগ সম্ভব নয়।

র   র

রক্ষণশীল দল (Conservative Party)

রক্ষণশীল রাজনৈতিক ভাবধারার লক্ষণ হল প্রচলিত ও বর্তমান বিধিব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার প্রবণতা। তাঁদের দৃষ্টিতে সেইসব বিধিব্যবস্থা হল নিজগুণে সুন্দর, অন্তত সম্ভাব্য বিকল্প থেকে ভাল, নিরাপদ, সুপরিজ্ঞাত, বিশ্বাসযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী। রক্ষণশীলতাকে তিনভাগে ভাগ করা যায় : ১. সমাজের প্রতি মনোভঙ্গি ; ২. রাষ্ট্রের একটি আদর্শ এবং ৩. রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। তিন ক্ষেত্রেই রক্ষণশীলতা মৌলিক পরিবর্তন কিংবা **কল্পরাষ্ট্রের** তত্ত্ব ও আদর্শ অথবা **মানবপ্রকৃতিতে উদারতন্ত্রী** অথবা **সমাজতন্ত্রী** মানসিকতার বিরোধী।

উল্লিখিত প্রথমটির ক্ষেত্রে রক্ষণশীলরা সমাজকে মানবসভ্যতার অর্জিত এক মহৎ কীর্তি বলে মনে করেন, এবং তার দোষ-ত্রুটি যাই থাক সমাজসৃষ্টির পূর্বেকার প্রকৃতির অবস্থার থেকে ভাল। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সরকার হবে নিয়মানুগ ও আইনসিদ্ধ ; আইন বহির্ভূত কাজ সংবিধানের সাহায্যে নিবারিত হয়। ক্ষমতার বিভক্তিকরণ, সরকারি ক্ষমতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখবে। তৃতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ হবে প্রত্যক্ষ, অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও বাস্তবধর্মী বা প্রায়োগিক ; চলবে আইনের শাসন মেনে ; স্বাভাবিক সমাজ সম্পর্কে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষিত হবে, অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে আধুনিক পুঁজিবাদকে বজায় রাখতে হবে।

রক্ষণশীলতাকে শ্রেণী আধিপত্যের মতাদর্শ হিসেবে সমালোচনা করা হয়ে থাকে এবং তার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে যারা ক্ষমতাসীন তাঁদেরই টিকিয়ে রাখা হয় ; আর শাসিত ও শোষিত শ্রেণী সমূহের কাছ থেকে একটা স্বীকৃতি আদায় করা হয়।

রাজনৈতিক দল হিসেবে কনসারভেটিভ বা রক্ষণশীল দলের উদ্ভব হয় ১৮৩৪ খ্রি। আগে এর নাম ছিল টোরি। সপ্তদশ শতকে আইরিশ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত শব্দটি পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত করে খ্রিস্টান ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে শ্লেষার্থে টোরি শব্দটি প্রযুক্ত হত ; বিশেষ করে যারা দ্বিতীয় চার্লসের জায়গায় ইংল্যান্ডের

সিংহাসনে ক্যাথলিকদের দাবি ছাড়তে চায়নি। সেসময়ে প্রধান দুটি দলের একটি ছিল টোরি দল। অবশ্য রক্ষণশীল সামাজিক সংস্কার কর্মপন্থা এখনও টোরি গণতন্ত্র নামে অভিহিত। পূর্বে অভিজাত ও ভূস্বামী বনেদি বংশীয়দের নিয়ে টোরি দল গঠিত ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং হালফিল আমলে যুক্তরাজ্যের নিম্নবিত্তবর্গের মানুষও এই দলকে সমর্থন করে। বার্ক ও ডিজরেলি ছিলেন রক্ষণশীলদের তাত্ত্বিক নেতা। দলের মতাদর্শ ১৯৪৫ খ্রি থেকে পরিবর্তিত হয়। তার শিল্পোন্নয়নের নীতির লক্ষ্য হল কেন্দ্রীয় নির্দেশক্রমে ব্যক্তিগত উদ্যমের সমন্বয়, যেটাকে কল্যাণকর পুঁজিবাদ বলা হয়। দলের আধুনিক নীতি, যথা সর্বজনীন ভোটাধিকার, জাতীয় একতা, অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর সমন্বয়, আধুনিক শিল্পোন্নয়নে ক্ষতিকর বিষয়ে চেতনা ইত্যাদি বিষয়ে ডিজরেলির প্রভাব বর্তমান। দল এখন উদারনীতি ও অবাধ বাণিজ্যের পরিপোষক।

যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অন্যান্য কয়েকটি কমনওয়েলথভুক্ত দেশে কিছু প্রভাবশালী দল নিজেদের কনজার্ভেটিভ বলে। তবে সেগুলির মধ্যে সাদৃশ্য খুব কম। ইউরোপে রাজতন্ত্র বহির্ভূত কোনও দেশে এখন রক্ষণশীল দল আর নেই।

যুক্তরাজ্যে রক্ষণশীল দল চায় ধীর গতিতে সংস্কার, সালিশির মাধ্যমে মতদ্বৈধতার নিষ্পত্তি, মিশ্র অর্থনীতি এবং বিকেন্দ্রিত সংসদীয় গণতন্ত্র।

রণদিভে, ভালচন্দ্র ত্রিম্বক (১৯০৪-১৯৯০) (Randive, B.T.)

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক নেতা। কুড়ির দশকের শেষদিকে বোম্বাইতে কমিউনিস্ট-প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জঙ্গি ধর্মঘটে নেতৃত্বের মধ্যে দিয়ে ক্রমে পার্টি সংগঠনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। ১৯৩৬ খ্রি থেকে একাদিক্রমে তিনি চোদ্দ বছর ভারতের **কমিউনিস্ট পার্টির** কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সদস্য ছিলেন। বিপ্লবের নতুন কর্মসূচির ভিত্তিতে ১৯৪৮ খ্রি জেনারাল সেক্রেটারি হন এবং ব্যর্থতার ফলে ১৯৫০ খ্রি পদত্যাগ করেন। ১৯৬৪ খ্রি **কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী)** প্রতিষ্ঠার পর তিনি আমৃত্যুকাল তার পলিটব্যুরোর সদস্য ছিলেন।

ত্রিশের দশকের গোড়া থেকেই কমিন্টার্নের তদানীন্তন উগ্র কর্মপন্থা অনুসারে রণদিভে ভারতে শ্রমিক তথা সর্বহারার প্রভাব ও আধিপত্যে (hegemony) বৈপ্লবিক কর্মসূচি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্রবিশ্লেষণসূত্রে তিনি বলেন যে ওই শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরও সুযোগসুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে, যাতে ভারতীয় জনগণকে আরও বেশি অর্থনৈতিক শোষণ এবং সেই তাগিদে রাজনৈতিক শাসনে রাখা যায়। তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী পুঁজিবাদী পথে অগ্রসর হলেও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে মিতালি করে চলে এবং প্রাক-পুঁজিবাদী কৃষি ও ভূমিব্যবস্থার বিরোধিতা করে না। পারস্পরিক যোগসাজসে দেশি ও বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিবাদী শক্তি এদেশে পুঁজিবাদী উন্নয়নের অন্তরায় হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে সামন্ততন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কৃষিবিপ্লবের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন, যার পিছনে প্রভাব ও আধিপত্য থাকবে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর।

দ্র. কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) (Tagore, Rabindranath)

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশ্বের জনচিত্তে কবি যে বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাভাবনা সেরূপ প্রতিফলিত হয়নি। তাঁর রচিত গান আজ একাধিক রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেনি। জাতপাত, ভাষা, ধর্ম ও জাতীয়তার ক্রমবর্ধিষ্ণু বিরোধবিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা ও হানাহানি তার প্রমাণ।

কৈশোরেই কবির মনে স্বাদেশিকতা দানা বাঁধে। কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে ও বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে তিনি আত্মশক্তির উদ্বোধনে ও স্বাধীনতার আদর্শপ্রচারে ব্রতী হন। কলকাতা কংগ্রেসে (১৮৯৬) তিনি 'বন্দে মাতরম্' গানটি স্বয়ং-যোজিত সুরে গেয়ে শোনান। দেশের সমকালীন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে শক্তিপূজার আয়োজন ও রাষ্ট্রীয় সাধনায় সাম্প্রদায়িকতার সংমিশ্রণ ঘটানোর তিনি বিরোধী ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় তাঁর **স্বদেশী সমাজ** প্রবন্ধটি (১৯০৪) রচিত হয়। এই প্রবন্ধটিতেই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার পূর্বাভাস মেলে। পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯০৮) প্রদত্ত তাঁর সভাপতির ভাষণ কবির নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলন দেশকে যে ভুল পথে নিয়ে চলেছিল সেকথা তিনি স্পষ্টই বলেন। এরপর তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যান। ১৯১৯ খ্রি রৌলাট আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনসূত্রে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবি নাইট উপাধি পরিত্যাগ করেন। পরবর্তী দশকে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন রবীন্দ্রনাথের কাছে নেতিবাচকরূপে প্রতিভাত হয়। চরকা তত্ত্ব ও অহিংস রাজনীতির অসারতা তিনি উপলব্ধি করেন। কমপক্ষে বারো বার বিশ্ব পরিক্রমায় বিভিন্ন দেশে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা, চিঠিপত্র ও দিনলিপি সমূহ *Religion of Man, Sadhana, Personality, Nationalism,* 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি ছাড়াও তাঁর বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা ও বিশেষ করে 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থে কবির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাভাবনার কথা জানা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় ভারতের জাতীয়তাবাদীরা যুদ্ধের সুযোগে যখন ইংরেজদের হঠাতে চান, তখন রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বিজয় কামনা করেন। কারণ 'মানব ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসিজমের কলঙ্ক' তাঁর কাছে অসহ্য ছিল।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা তাঁর আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী দর্শনের অঙ্গ। মানুষকে তিনি শাশ্বত সৃজনশীল পরম সত্তার আধার হিসেবে নিরন্তর সৃষ্টি ও আনন্দের প্রতীক রূপে কল্পনা করেছেন। বিভেদ, বিদ্বেষ, শক্তিমত্ততা, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি যাবতীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে তিনি সাম্য, মৈত্রী ও সমন্বয়কারী সমাজের চিত্র তুলে ধরেন। রাজনৈতিক কার্যকারিতার তাড়নায় যেকোনো উপায় অবলম্বন বা সুবিধাবাদী ও অশুভ পথ অনুসরণের তিনি বিরোধী ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে সমষ্টির নামে ব্যষ্টির অবদমন সভ্যতার অন্তরায়, গণতন্ত্রী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেই জাতির শক্তি ও সম্ভাবনা বিকশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে **পুকসমাজ** রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে। বিচিত্রকে ঐক্যবদ্ধ করার শক্তিই হল সভ্যতার অন্যতম মানদণ্ড। ভারত বিচিত্রকে গ্রথিত করেছে সমাজের সূত্রে। ইউরোপে ঐক্য অর্জিত হয়েছে নেশন-স্টেটের মাধ্যমে। ইউরোপে নেশন-স্টেট অর্থাৎ

রাষ্ট্রই প্রধান, ভারতে প্রাধান্য পেয়েছে সমাজ। নেশনবাদের পরিপোষণ করে নেশন-স্টেট ; ভারতের জীবন সমাজকেন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষ কল্যাণকামী, মানুষের সমাজবোধের সার্থক পরিণতি বিশ্বমানবতায়। সেখানে সকল জাতি হয় একাত্মবোধে আবদ্ধ। কবি সেই মঙ্গলদায়ক সমাজ গড়তে চেয়েছেন। এ চাহিদা নেশন-স্টেট মেটাতে অক্ষম। নেশন-স্টেট ভারতীয় ভাবধারার পরিপন্থী এবং শক্তির দম্ভে মত্ত ; মিলনের পরিবর্তে নিরঙ্কুশ জবরদখলেই তার তুষ্টি ; সেখানে প্রেমের স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ পরিকল্পনায় ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন সত্তাকে সকলের সমবায়ে শক্তিশালী করার কথাই বলা হয়েছে। সমাজবন্ধনের শিথিল ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে চাই সুষ্ঠু সুসংবদ্ধ রূপ। তিনি মার্কসের মতো রাষ্ট্রের বিলুপ্তি না চাইলেও সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র পৃথকরূপে চিহ্নিত করেছেন। তিনি দেশকে ভালবাসতেন। দেশের অধিবাসী হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেই তিনি দেশবাসীর যাবতীয় দুর্গতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। দেশের ভূগোলপ্রতিমার তিনি পূজারী ছিলেন না।

ঔপনিষদ দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের মুক্তি (freedom) প্রত্যয় রচিত। তার মর্ম হল আত্মার বিকাশ ও তার চরম উপলব্ধি। মুক্ত আধ্যাত্মিক জগৎ সৃজনসত্তার অনুকূল। সেজন্য চাই মননের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। সংকীর্ণ সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও যান্ত্রিক আচারবিচার মুক্তির পরিপন্থী। সাহচর্য, সমবেদনা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আত্মশক্তির উন্মেষ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। অহংবোধ মুক্তির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। মুক্তির অর্থ বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্য নয়। মুক্তির মধ্য দিয়ে আনন্দময় সামাজিক সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হবে। সর্ববিধ সংকীর্ণ নিয়ন্ত্রণবিধি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের নামে ব্যক্তিসত্তাকে দমনের তিনি নিন্দা করেন।

তাঁর দৃষ্টিতে মুক্তির প্রধান অন্তরায় হল অবিদ্যা ও অজ্ঞতা। জ্ঞান ও সত্যের উপলব্ধি ও পরিপূর্ণ জীবনের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে প্রচলিত শিক্ষা জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে সুসমঞ্জস নয়। সুস্থ সবল মন, সক্রিয় স্বভাব, মার্জিত ব্যবহার ও জানার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে দায়িত্বে ও কর্তব্যে আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব রচিত।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের কোনওটিকে গ্রহণ না করে তৃতীয় কার্যকর পথ হিসাবে সমবায় প্রথার সুপারিশ করেন। গ্রামীণ উন্নয়ন, কুটির শিল্প, উন্নত প্রণালীতে কৃষি এবং সমবায় প্রথার উপর গুরুত্ব দিলেও ভারী শিল্পোন্নয়নে তাঁর সমর্থন ছিল। তিনি চাইতেন নগর ও গ্রামীণ জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বিকাশ। গান্ধীর চরকানীতি ও গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে রবীন্দ্রনাথের সায় ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা কেবল লেখা ও ভাবনার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাতেকলমে প্রযুক্তও হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থার জন্য তিনি একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মননের বিকাশ, সুকুমার বৃত্তির উন্মেষ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকেই ব্যবস্থাটি রচিত হয়।

রাজক্ষমা (Amnesty)

গ্রিক অ্যামনেসিয়া শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল অ্যামনেস্টি। অর্থ হল বিস্মৃতি বা ভুলে যাওয়া ; অপরাধীদের দোষ লাঘব অথবা মার্জনার মাধ্যমে ক্ষমা করা কিংবা চাপাচাপি না করার নিশ্চয়তা দান। শত্রুপক্ষীয়দের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনের এটি একটি উপায়। যুক্তরাষ্ট্রে আব্রাহাম লিঙ্কন প্রেসিডেন্ট হবার পর দক্ষিণাঞ্চলের এগারোটি রাজ্যের কনফেডারেসি গঠনসূত্রে যে গৃহযুদ্ধ ঘটে (১৮৬১-৬৫) তার ব্যর্থতার পর তাতে লিপ্ত সকলের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শিত হয়।

রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন দেশে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের কিংবা যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে লন্ডনে ১৯৬১ খ্রি পিটার বেনেনসন নামে ব্রিটেনের এক আইনজীবী অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। ওই সংস্থা বন্দি ব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে সাহায্য এবং কারাগারে বন্দি ও আটক অন্যান্যদের প্রতি আন্তর্জাতিক মান অনুসারে সরকারি আচরণ প্রদর্শনের জন্য আন্দোলন করে। রাষ্ট্র ও অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে আদর্শগত মতপার্থক্যের জন্য মানুষকে অযথা কারারুদ্ধ করা, তার উপর অত্যাচার ও তাকে হত্যা করার বিরুদ্ধে ওই সংস্থা সারা বিশ্বে তুমুল সাড়া ফেলেছে। ৫৭টি দেশে পরিব্যাপ্ত বিভিন্ন কেন্দ্রে মোট পঞ্চাশ হাজার সদস্য আছেন। ব্যক্তিগত অর্থসাহায্যে ওই সংস্থার ব্যয়নির্বাহ হয়। বিশেষ কোনও ধর্ম বা রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। যে কোনও মতাদর্শ গ্রহণ এবং বিবেকের স্বাধীনতা হল তার মূল দাবি। ১৯৭২ খ্রি এটি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল।

রাজতন্ত্র (Monarchy)

এক ব্যক্তির দ্বারা শাসিত রাজত্ব। প্রচলিত ধারণায় যে-রাষ্ট্রব্যবস্থার শীর্ষে রাজা কিংবা রানির পদাধিকার বলে কোনও একজন অধিষ্ঠিত থাকেন ; তিনি সারা জীবন ওই পদে থাকতে পারেন, আবার ক্ষমতাচ্যুত হবার অবকাশ থাকে। দু' ধরনের রাজতন্ত্র দেখা যায়, যথা চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন রাজা, অথবা সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন সাংবিধানিক রাজার শাসনব্যবস্থা। দ্বিতীয় ধরনের ক্ষেত্রে রাজা স্বয়ং রাজকার্য পরিচালনা করেন না বা প্রশাসনেও হস্তক্ষেপ করেন না ; কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশাসন কিছুটা নিয়ন্ত্রণ এবং অনুমোদন করেন। চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন রাজা এখন আর বিশেষ নেই, দেশের আইন রাজা বা রানির ক্ষমতা বেঁধে দেয়। তাই রাজা বা রানির পরিবর্তে কোনও কোনও দেশে ওই পদাধিকারী ব্যক্তি দেশের বা পার্টির চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করেন ; ওই পদ বংশানুক্রমিক হয় না ; যেটা রাজা বা রানির পদে সাধারণত হয়ে থাকে। অবশ্য, পোল্যান্ডে রাজা এক সময়ে নির্বাচিত হতেন। তবে উত্তরাধিকার আইনের সাহায্যে রাজা কে হবেন সেটা স্থির হয় কিছুটা সংশ্লিষ্ট দেশের প্রথা ও ভাবাবেগের মিশ্রণে ; এবং রাজার সঙ্গে সে দেশের ঐতিহ্যগত মানমর্যাদা ও অধিকার অঙ্গীভূত হয়। চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে দেশের পরিবর্তে পার্টির মতাদর্শ ফুটে ওঠে।

বংশানুক্রমিকভাবে রাজার পদ পূরণের প্রথা অনেকে পছন্দ করেন ; তাতে

কাড়াকাড়ির অবকাশ থাকে না। বৈধতা ও পারম্পর্য থাকায় দেশের প্রতি আবেগমণ্ডিত একটা অতীন্দ্রিয় সম্ভ্রমবোধ জনচিত্তে ফুটে ওঠে। তবে বংশানুক্রমিকভাবে অধিষ্ঠিত রাজার রাজকার্যে প্রয়োজনীয় গুণ নাও থাকতে পারে। যাই হোক, রাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তা কোনও কোনও দেশে এখনও বিপুল। কারণ রাজার কোনও ক্ষমতা বিশেষ থাকে না। পক্ষান্তরে পার্টি চেয়ারম্যানের জনপ্রিয়তার পিছনে তাঁর ব্যক্তিগত গুণগুলি কাজ করে।

সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে রাজা বা রানির ক্ষমতা দেশের সংবিধানের মাধ্যমে সীমিত থাকে। রাজা সেখানকার সার্বভৌমত্বের প্রতীক হলেও, তাঁর যাবতীয় ক্ষমতা বিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। আইন সঠিক মেনে না চললে রাজাকে সেখানে পদচ্যুত করা যায়। সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে রাজার নামে সর্ববিধ প্রশাসনিক কাজকর্ম নির্বাহ হয়, রাজা সেইসব কাজ নীরবে অনুমোদন করেন মাত্র, নাকচ করার ক্ষমতা তাঁর থাকে না। তবুও তাঁর অবশিষ্ট ক্ষমতা যেটুকু থাকে তারও গুরুত্ব দেশের সরকারের কাছে কম কিছু নয়। দেশের সরকারি কাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজার আনুষ্ঠানিক ভূমিকা আইন ও প্রশাসনকে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দান করে।

রাজদণ্ড (Mace)

রাজপদের নিদর্শনস্বরূপ রাজা যে দণ্ড হস্তে বহন করেন। বর্তমানকালে আইনসভায় রাজদণ্ড আনুষ্ঠানিক প্রতীকমাত্র। প্রতীক হল পূর্বতন রাজশক্তির, এবং বর্তমানকালে আইনসভার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ; সংসদ কিংবা রাজ্য-বিধানসভার অধ্যক্ষের আগমন ও প্রস্থানের সময় তাঁর আগে প্রধান সহকারী (সার্জেন্ট) সেটি দক্ষিণ স্কন্ধে বহন করে নিয়ে যান। অধ্যক্ষের ও আইনসভার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং অধিকার অবিভাজ্য। অধ্যক্ষের নির্দেশাধীন ওই সহকারীও (সার্জেন্ট) রাজদণ্ডের ভিত্তিতে পরোয়ানা জারির অধিকার পান ; দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, অধ্যক্ষের নির্দেশে তিনি কোনও সদস্যকে সভাকক্ষ থেকে বহিষ্কার করতে পারেন।

ইংল্যান্ডে স্মরণাতীত কাল থেকে ব্যবহারের ফলে রাজদণ্ডকে ঘিরে একটা অতীন্দ্রিয় গূঢ়তা সৃষ্ট হয়েছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রাজদণ্ড একটি রাজচিহ্ন বিশেষ। অধিবেশনকালে অধ্যক্ষের সামনে টেবিলের উপর সেটি শায়িত থাকে। ব্রিটিশ শাসনসূত্রে প্রবর্তিত রাজদণ্ডের ব্যবহার ভারতেও প্রচলিত।

রাজধর্ম (শান্তিপর্ব, মহাভারত) (Rajadharma)

প্রাচীন ভারতে রাজার দায়িত্ব ও কর্তব্য 'রাজধর্ম' নামে বিভিন্ন হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, মনুস্মৃতি এবং মহাভারতের শান্তিপর্বে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

শান্তিপর্বের বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে ৪৫তম অধ্যায়টি 'রাজধর্ম পর্ব' নামে লিখিত। ৫৫তম এবং পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম রাজার রাজকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাতব্য ও পালনীয় বিভিন্ন বিষয়ে যেসব উপদেশ প্রদান করেন সেগুলি পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে রাজনীতি সংক্রান্ত শুক্রনীতি, কামন্দকীয় নীতিসার ইত্যাদির উল্লেখ দেখে অনুমান করা হয় যে অধ্যায়টি অপেক্ষাকৃত অবাচীন।

যুধিষ্ঠিরকে প্রদত্ত ভীষ্মের রাজধর্ম বিষয়ক উপদেশ সংক্ষেপে বিবৃত হল।

রাজা দেবদ্বিজগণের সন্তোষ বিধান করবেন। পুরুষকার অবলম্বন করা সঙ্গত। ক্ষেত্র অনুযায়ী রাজার কোমলস্বভাব ও তীক্ষ্ণস্বভাব থাকবে। পাপাচারী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় নির্বিশেষে সবাই দণ্ডনীয়। প্রাণদণ্ডের অপরাধ করলেও ব্রাহ্মণকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করাই সঙ্গত। স্বপক্ষীয় বা পরপক্ষীয় লোকদের সদাই পরীক্ষা করা উচিত। রাজা নিজের প্রিয় কাজ ছেড়ে লোকের হিতকর কাজে সর্বদা প্রবৃত্ত থাকবেন। ধৈর্য, ধীরচিত্ত ও স্পষ্টতার সঙ্গে দণ্ডবিধানে ভয় উপস্থিত হয় না। ভৃত্যগণের সহিত পরিহাস ও অহেতুক নমনীয়তা ক্ষতির কারণ হতে পারে। রাজা হবেন উদ্যমী। সন্ধির যোগ্য রাজাদের সঙ্গে সন্ধি এবং বিরোধের যোগ্য রাজাদের সঙ্গে বিরোধ করাই কর্তব্য, রাজত্বের সাতটি অঙ্গ রাজা, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাজ্য, দুর্গ ও সৈন্যের যে ব্যক্তি বিরুদ্ধাচরণ করবে রাজা তার প্রতিঘাত করবেন। উৎপথে গমনশীল গুরুও দণ্ডনীয়। প্রজাদের হিতার্থে পুত্রও পরিত্যাজ্য। রাজা প্রজার ধর্ম নষ্ট করবেন না এবং সৎপথে অবিচলিত থাকবেন। রাজার গুণাবলির অন্যতম হল প্রভাব, উৎসাহ, মন্ত্রণাশক্তি এবং মন্ত্রণার গোপনীয়তা রক্ষা। শান্তিপর্বে দণ্ডনীতিশাস্ত্র অনুসরণ এবং গুপ্তচর দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লোকের বৃত্তান্ত জানার কথা বলা হয়েছে।

রাজনীতি নিস্পৃহতা (Apolitical)

রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল সম্পর্কে উদাসীন মনোভাব। মার্কসীয় মতানুসারে রাজনৈতিক চেতনায় সর্বাধিক অনগ্রসর শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে এই মানসিকতা বিরাজ করে এবং সেই সুযোগে বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রচারকেরা ন্যায্য সুবিধাদি অর্জনের জন্য শ্রেণী সংগ্রাম থেকে শ্রমজীবীদের নিবৃত্ত করে। ভিন্ন দৃষ্টিতে যে মানসিক অবস্থানে রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা তথা যেসকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা প্রযুক্ত হয় সেই সব ব্যাপারে নিরাসক্ত মনোভঙ্গি। যেহেতু যাবতীয় সামাজিক পরিবর্তনের অভিঘাত ওই সকল প্রতিষ্ঠানের উপর প্রতিফলিত হয় এবং সেগুলির সংশোধন ঘটায়, সেহেতু রাজনীতি নিরপেক্ষ হলেও সেগুলিকে রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা দেওয়া হয়। কারও কারও মতে সব ধরনের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের পিছনে রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকে। সেই সব ক্রিয়াকলাপের কোনওটির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য না থাকলেও রাজনৈতিক পরিণতি দেখা দিলে উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না। যে ব্যবস্থায় সরকারের বিরোধিতা অবৈধ, সেখানে রাজনীতি নিস্পৃহ সংস্থার অবকাশ নেই।

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন (Criminalization of Politics)

প্রত্যয়টি সম্প্রতিকালের; অর্থ হল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে দুষ্কর্ম এবং দুষ্কৃতীদের অনুপ্রবেশ। রাজনীতিক, আর্থনীতিক, পুলিশ, প্রশাসক, লেখক, সাংবাদিক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষা অনুযায়ী জানা যায় যে ভারতে নানা পর্যায়ে অন্যূন চার শতাংশ নির্বাচিত প্রতিনিধি বিভিন্ন ধরনের দুষ্কার্য ও দুষ্কৃতীদের সঙ্গে জড়িত। পঞ্চায়েত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে এই সব দুষ্কৃতীদের বেশি দেখা যায়। তাদের

মধ্যে দাগি আসামিও আছে। জন-প্রতিনিধি ওই সব দুষ্কৃতীদের মধ্যে কেউ কেউ মাফিয়া মাতব্বর ও গুণ্ডা সর্দার হিসেবে পরিচিত। দুষ্কৃতীরা নির্বাচনে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ, ভোটকেন্দ্র দখল, রিগিং, ভোটদাতাদের ভোটদানে বাধা সৃষ্টি, ব্যালট বাক্সে কারচুপি ইত্যাদি কাজে লিপ্ত থাকে। বিরোধী প্রার্থীকে নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে বিরত থাকার জন্য ভীতি-প্রদর্শন, খুন, জখম ও নিখোঁজ করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে বিস্তর। সব রাজনৈতিক দলই অল্পবিস্তর ওই সব দুষ্কৃতীকে কাজে লাগায় এবং দুষ্কৃতীরাও ক্ষেত্রবিশেষে রাজনৈতিক দলের প্রকাশ্য অথবা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই এই প্রবণতা বেশি। ভারতে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্রপ্রদেশে এই প্রবণতা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশি। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব এন এন ভোরার নেতৃত্বে ১৯৯৩ খ্রি অগস্টে এ-ব্যাপারে যে তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হয় সেটির প্রতিবেদন বর্তমানে বিবেচনাধীন রয়েছে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Political Culture)

প্রত্যয়টি যদিও নতুন, তার অন্তর্নিহিত বিষয় বা মনোভাব পুরানো। লোকের যেসব মানসিকতা, ভাবোদ্দীপনা, তেজস্বিতা, মেজাজ ও মূল্যবোধের সমষ্টি কোনও জাতি বা জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক আচারবিচার, বিশ্বাস ও প্রবণতাকে একত্র সমন্বিত করে সেটাই হল রাজনৈতিক সংস্কৃতি। আরিস্তোতল যে মনোজগতের কথা বলেছিলেন তার প্রতিফলন ঘটে রাষ্ট্রীয় স্থিতাবস্থায় কিংবা বিপ্লবে। নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকেরা লোকের আচরণের পিছনে জাতীয় চরিত্র ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন লক্ষ করেন। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সমাজতত্ত্ব, সামাজিক মনস্তত্ত্ব, পরিসংখ্যানগত সমীক্ষা কাজ করে।

বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আবেগসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির যোগফলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি দানা বাঁধে। ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে কোনটা ঠিক কিংবা কোনটা ভুল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনটা ভাল অথবা মন্দ সেগুলি একত্রে মূল্যবোধের ধরন তথা পালনীয় রীতিনীতির বা ঔচিত্যের মান নির্ধারণ করে। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধগুলি রাষ্ট্রের সামগ্রিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থাকে; রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, কর্মপন্থা ও সিদ্ধান্ত এবং যাবতীয় প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তিমানুষের অবস্থান তাতে চিহ্নিত হয়। জনসমাজের সেইসব মূল্যবোধ দেশের ইতিহাস, সামাজিক গঠন, প্রকৃতি, ঐতিহ্য এবং প্রশাসনের চালচলনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রূপায়িত হয়। রাজনৈতিক ক্রিয়াকানুন কোনও কোনও দেশে লোকে সর্বসম্মতভাবে মেনে নেয়। অনেক দেশে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষাপক্ষে পরস্পর বিরোধী শক্তি কাজ করে। শেষাবধি কোনও একটি ধারায় স্থায়ী যে বিধিব্যবস্থা গৃহীত হয় সেগুলি একটি সংবিধানের মধ্যে দিয়ে রূপ লাভ করে।

রাজনৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে নানা কিছুর সঙ্গে সরকারের কাছ থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রত্যাশা থাকে। বিভিন্ন দেশে লোকের বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের মধ্যে থাকে আইনের শাসন ও সরকারের জনহিতকর ক্রিয়াকর্মের প্রত্যাশা। রাজনৈতিক সংস্কৃতি একটি নিশ্চল মানসিকতা নয়। নবাগত চিন্তাভাবনা, আদর্শ,

শিল্পোন্নয়ন, প্রভাবশালী নতুন নেতৃত্বের উদয়, জনসংখ্যার পরিবর্তন ইত্যাদি রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন সূচিত করে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি সর্বদা একরূপ হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। একটি বৃহৎ দেশের অন্তর্গত বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতিগত জনসমষ্টি বা জাতির মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সমান নাও হতে পারে। দেশে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি আধিপত্য করে সেটা রাজনৈতিক বা সামাজিক নেতাদের দ্বারা সৃষ্ট থেকে পারে এবং সেটা হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। দুটিই আবার দেশের রাজনৈতিক দৃঢ়মূল স্থিতিশীলতাকে সুরক্ষা অথবা বিনষ্ট করে।

দ্র. সংস্কৃতিকরণ

রাষ্ট্র (State)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু রাষ্ট্র শব্দটির সংজ্ঞা জটিল এবং ব্যবহার বহুবিধ। গ্রিক ও রোমান আমলে রাষ্ট্র বলতে 'পোলিস', 'সিভিটাস', 'রেস পাবলিকা' শব্দগুলি ব্যবহৃত হত। প্রাচীন গ্রিসে **প্লাতো**, **আরিস্তোতল** প্রমুখ দার্শনিকেরা **নগররাষ্ট্রের** (City State) ভিত্তিতে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেন। বাস্তবে কোনওটাই যথার্থ রাষ্ট্র ছিল না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপে মানবতা, ধর্ম ও নৈতিকতার বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রজীবন বাঁধা থাকত। মধ্যযুগে **রেনেসাঁসের** সময় থেকে আধুনিক অর্থে রাষ্ট্র শব্দটির সূচনা ঘটে; তখন থেকে রাষ্ট্রজীবনে ইহমুখী (সেকিউলার) জীবনবোধ প্রাধান্য পায়। পরবর্তী খ্রিস্টান **রেফর্মেশন** আন্দোলনে এই গতিপ্রকৃতি প্রবল হয়ে ওঠে। এ যাবৎকাল রাজা ও রাজনীতিকে যাজকতন্ত্র (চার্চ) নিয়ন্ত্রণ করত; উল্লিখিত উভয় আন্দোলনের অভিঘাতে চার্চের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে রাজনীতি অযাজকীয় (সিভিল) ও ইহমুখী খাতে বইতে শুরু করে। যাজকতন্ত্র ও ইহমুখী জীবনকেন্দ্রিক রাজনীতির ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় পৃথক।

বস্তুত স্টেট (রাষ্ট্র) শব্দটি রেনেসাঁসেরই অবদান; কথাটি ষোড়শ শতকের গোড়ায় ইতালিতে 'স্টেটো' শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়। **মাকিয়াভেল্লি** তাঁর 'দা প্রিন্স' (১৫১৩) গ্রন্থে রাষ্ট্রীয় সংগঠন (বডি-পলিটিক) অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেন। ইংল্যান্ডে টমাস স্টার্কির লেখা 'ইংল্যান্ড ইন দ্য রেন অব কিং হেনরি দা এইট' (১৫৩৮) গ্রন্থে লেখকের ইতালি ভ্রমণসূত্রে প্রাপ্ত 'স্টেটো' শব্দটি 'স্টেট' হয়ে দাঁড়ায়। বাংলায় তার প্রতিশব্দ রাষ্ট্র।

বিভিন্ন সময়ে দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্র শব্দটির নানান সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। বিভিন্ন অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সমাজ, জাতি (নেশন), সরকার, অঙ্গরাজ্যকে অনেক ক্ষেত্রে স্টেট বলা হয়। কোনওটাই সঠিক অর্থে রাষ্ট্র নয়। সংজ্ঞা সমূহকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গিগত বিচারে মোটামুটি চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: ১. প্রাচীন ও মধ্যযুগে স্টেট অর্থাৎ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিবর্তনে একটি নৈতিক লক্ষ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত; (আরিস্তোতল); ২. ভাববাদী দার্শনিকেরা রাষ্ট্রের একটি গূঢ় উদ্দেশ্য পরিপূর্তির তত্ত্ব তুলে ধরেন (হেগেল); তাঁদের মতে একমাত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ ও নৈতিক আত্মোপলব্ধি সম্ভব; সেজন্য পৃথিবীতে দিব্য

ইচ্ছাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তির সত্তা মিলিয়ে দেওয়াই কাম্য ; রাষ্ট্র হল উন্নত নৈতিক শক্তির আধার ; ৩. তৃতীয় ধরনের সংজ্ঞায় রাষ্ট্রের মূলে গভীর আর্থ-সামাজিক কার্যকারণ সম্পর্কের কথা বলা হয়। মার্কসীয় এই দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের বিবর্তনে নিরন্তর একটি শ্রেণী সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করা হয় এবং রাষ্ট্র হল শ্রেণীগত শোষণের হাতিয়ার। মার্কসীয় মতাদর্শে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি কাম্য। ৪. চতুর্থ প্রকার সংজ্ঞা অনুযায়ী রাষ্ট্রের কতকগুলি উপাদান থাকে, যথা সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমাজ, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব, (লাস্কি, ওপেনহাইম, গার্নার)। শেষোক্ত শ্রেণীর উল্লিখিত চারটি উপাদানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইনবিদরা (হাইড, হ্যাকওয়ার্থ) পঞ্চম একটি উপাদান সংযোজন করেছেন। সেটা হল প্রতিটি রাষ্ট্রের অন্যান্য সমুদয় রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা। আন্তর্জাতিক আইনের গোত্রে সমকক্ষতা প্রমাণের বিচারে প্রতিটি রাষ্ট্রের সভ্যতার ন্যূনতম একটি মানে উপনীত হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি সমূহ পালন করা সেই রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয়।

রাষ্ট্রচিন্তা (Political Thought)

রাষ্ট্রচিন্তা প্রত্যয়টি সমাজবিজ্ঞানের অঙ্গ। প্রত্যয়টি রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রদর্শন, রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতি প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রায় সমার্থেই ব্যবহৃত হয়। খণ্ডিতভাবে বিচার করলে তিনভাবে প্রত্যয়টিকে দেখা যায় :

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞান। প্রকৃতিবিজ্ঞানের সমগোত্রীয় বিদ্যা হিসেবে এটি বিবেচিত হয়। কারণ সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণ বা সামাজিক সমস্যাদি প্রায় গাণিতিক সূত্রে বিশ্লেষণ বা পরিমাপ করা যায়, যেটা বিজ্ঞানের লক্ষণ। মানুষের আচরণ ও সমাজমনেরও কতকগুলি ধ্রুবক (constant) থাকে, যার ভিত্তিতে সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানের পর্যায়ে বিবেচনার দাবি রাখে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কসূত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতিবিজ্ঞানের সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না। তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্বগত ও দার্শনিক পটভূমিকাও থাকে। মোটের উপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত প্রভৃতি যেসব বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতির কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে সে-সবকিছুই রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার অন্তর্গত।

২. রাষ্ট্রদর্শন। বিজ্ঞান ও দর্শন পরস্পরের পরিপূরক। বিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয়ের সমন্বিত রূপই হল দর্শন। ব্যক্তি ও সমাজের গতি ও প্রকৃতির মৌল জীবনাচারের পথ নির্দেশ করে দর্শন। সাধারণ দর্শন যেমন বিজ্ঞানের যাবতীয় ধারার সমন্বয় সাধন করে, রাষ্ট্রদর্শন তেমনি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভূত জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান করে। উইল ডুরান্ট (১৮৮৫-১৯৮১) দর্শনের পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন : যুক্তিবিদ্যা, কান্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, রাষ্ট্রবিদ্যা ও অধিবিদ্যা। রাষ্ট্রবিদ্যা অর্থাৎ রাষ্ট্রদর্শনের কাজ হল সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, গতি ও পরিণতির পূর্ণাঙ্গ বিচারে অনুসরণীয় পথের নির্দেশনা ও তার মূল্যায়ন। ইতিহাস, বিশ্বতত্ত্ব ইত্যাদি স্বভাবতই তার আলোচনার পরিধিতে আসে।

৩. রাষ্ট্রতত্ত্ব। সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে রাষ্ট্র, আইন, প্রতিনিধি নির্বাচন, প্রশাসন সংক্রান্ত নানা তত্ত্ব রচিত হয়। এটি মূলত একটি বিশ্লেষণধর্মী ও তুলনামূলক বিজ্ঞান, যার দৃষ্টান্ত হল বিভিন্ন দেশের সরকার ও সংবিধানের তুলনামূলক পর্যালোচনা। রাষ্ট্রতত্ত্বে লোকের রাজনৈতিক আচরণের

গতিপ্রকৃতি ও তার মূল্যবিচার এবং সেসবের নিয়ন্ত্রণ ও রূপায়ণের ক্রিয়াকৌশল সম্পর্কিত অনুশীলন ও গবেষণা থেকে রাষ্ট্রচিন্তার নানাবিধ তত্ত্ব গড়ে ওঠে।

রাষ্ট্রদ্রোহ (Treason)

দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্যের অভাব তথা বিরুদ্ধাচরণ। যুক্তরাজ্যের আইন অনুযায়ী সার্বভৌম রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধতা কিংবা রাজ্যে তার শত্রুপক্ষীয়দের সহায়তা অথবা রাজ্যের বাইরে থেকে বিরুদ্ধপক্ষীয়দের সাহায্য ও ইন্ধন জোগানো রাষ্ট্রদ্রোহ হিসেবে বিবেচিত। যুক্তরাষ্ট্রেও সংবিধান অনুসারে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কিংবা শত্রুপক্ষকে সহায়তা করা হল রাষ্ট্রদ্রোহিতা। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রদ্রোহিতার পরিমাণ ছিল বেশি, কারণ সেদেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতাসীন দলের উপরই কার্যত বর্তাত। যুক্তরাজ্যে রাজদ্রোহিতার পরিণাম মৃত্যুদণ্ড এবং সেখানে সকলের মধ্যে রাজশক্তির প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগ দেখা যায়। তবে কেউ বিবেকের তাড়নায় স্বদেশের প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে বিদেশি সাহায্যে স্বদেশি সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে উদ্যোগী হলে তাঁকে দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক বলে দণ্ডিত করার বিষয়টি বিতর্কিত। লক এবং সামাজিক চুক্তি তত্ত্বে বিশ্বাসী দার্শনিকেরা মনে করতেন যে দেশ ছেড়ে চলে যাবার অধিকার লোকের থাকে। পরবর্তী বাসভূমির বিধিব্যবস্থা বিবেক অনুযায়ী মেনে নেবার নীতিগত প্রশ্ন স্বভাবতই থাকে। কিন্তু দেশ ছেড়ে চলে যাবার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে গমনেচ্ছু ব্যক্তি যাঁরা দেশের শাসনব্যবস্থার প্রতি বিরূপ তাঁদের দেশদ্রোহী বলাটা অনুচিত।

রাষ্ট্রপতি চালিত সরকার (Presidential form of Government)

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক চালিত সরকারের নির্বাহীবিভাগ ও আইনবিভাগ একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। এই ধরনের সরকারে যিনি শীর্ষস্থানীয়, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর সহযোগী সচিবেরা কেউ আইনসভার সদস্য নন। অথবা আইনসভার কাছে নিজেদের কোনও কাজের জন্য দায়ী থাকেন না। সরকারের যিনি প্রধান তিনি একাধারে খেতাবসর্বস্ব নির্বাহী প্রধান এবং প্রকৃত প্রধান। আইনসভা তাঁকে গদিচ্যুত করতে পারে না। সংসদীয় সরকারি ব্যবস্থার মতো রাষ্ট্রপতি চালিত ব্যবস্থাতেও এক ধরনের ক্যাবিনেট থাকে। তবে তার সদস্যরা আইনসভার সদস্য নন, দায়ী থাকেন তাঁরা রাষ্ট্রপতির কাছে। রাষ্ট্রপতি দায়ী থাকেন জনসাধারণের কাছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রাষ্ট্রপতি-চালিত ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি যে দলের প্রতিনিধি সেই দলের আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও চলে; রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। সময়টা তিনি নির্বিবাদে কাটাতে পারেন। নির্বাহী বিভাগের সঙ্গে আইনসভার তাতে সহযোগিতার অভাব হয় না।

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল সরকারের স্থায়িত্ব। অর্থাৎ সংসদীয় ব্যবস্থায় কোনও দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে সরকার গঠন ও তার স্থায়িত্বের প্রশ্ন যেমন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, সে সমস্যা রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারে থাকে না। সরকারে নির্বাহী ও আইন বিভাগদ্বয় যুক্ত থাকে বলে সংঘাতের প্রশ্ন বিশেষ ওঠে

না। জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই ধরনের সরকারের প্রধান ত্রুটি হল রাষ্ট্রপতির অপটু প্রশাসন ও স্বৈরাচারিতা। সংসদীয় ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের কাজে নেতৃত্ব মেলে মন্ত্রিসভার কাছ থেকে। রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের আইনসভা যেভাবে আইন তৈরি করে, সেটা রাষ্ট্রপতি গ্রহণ নাও করতে পারেন। আবার আইন প্রণয়নের দায়িত্ব আইনসভার উপর ন্যস্ত থাকায় রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী আইন প্রস্তুত সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রমৈত্রী (Alliance)

বিভিন্ন রাষ্ট্র পারস্পরিক স্বার্থে যেমন রাষ্ট্র সমবায় গঠন করে তেমনি অনুরূপ প্রয়োজনে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়, যেটি রাষ্ট্রমৈত্রী নামে অভিহিত। রাষ্ট্রমৈত্রী প্রতিরক্ষামূলক (defensive) অথবা আক্রমণমূলক (offensive), দুই-ই হতে পারে। সাধারণ দৃষ্টিতে মিত্র হল সেইসব রাষ্ট্র যারা একই প্রতিপক্ষ শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হবার ভয়ে মিত্রতাবদ্ধ এবং সেই শক্তির সঙ্গে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কিছু অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক চুক্তিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময় অক্ষশক্তির (Axis) বিপক্ষে জোটবদ্ধ মিত্রশক্তি (Allies) যুদ্ধোত্তরকালে ভিন্ন পরিস্থিতিতে অল্প কিছু সদস্যকে নিয়ে পশ্চিমি রাষ্ট্রমৈত্রী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সেটির পরে নাম হয় নাটো ; পূর্ববর্তী মিত্রশক্তির একদা সদস্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রজোটের (ওয়ারস চুক্তি) আক্রমণের আশঙ্কা উক্ত নাটোভুক্ত দেশগুলির জোটবদ্ধতার ছিল অন্যতম কারণ ; অন্যান্য কারণের মধ্যে ছিল অর্থনৈতিক সহযোগিতা। রাষ্ট্রমৈত্রীর ফলে কোনও নতুন রাষ্ট্র গড়ে ওঠে না, এবং মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ দেশের সার্বভৌমত্ব অটুট থাকে। যেকোনও সদস্য-রাষ্ট্র মৈত্রীচুক্তি থেকে সরে আসতে পারে।

রাষ্ট্রসংঘ (United Nations Organization)

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) পর গঠিত আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র সংগঠন। এটি পূর্ববর্তী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনের স্থান গ্রহণ করে। মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগোষ্ঠীর কয়েকটি প্রস্তুতি সম্মেলনের অন্যতম ডাম্বার্টন ওক্‌স (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪৪) সম্মেলনে, রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবিত খসড়া সনদ প্রণীত হয়। পরবর্তী ইয়ালটা বৈঠকে (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫) যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরাপত্তা পরিষদে প্রতিষেধ (veto) প্রদানের রীতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ওই তিনটি দেশ ছাড়াও পরে ফ্রান্স ও চীনকেও প্রতিষেধ প্রয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়। অতঃপর এটি আনুষ্ঠানিকভাবে সানফ্রান্সিস্কোতে ২৫ এপ্রিল— ২৬ জুন ১৯৪৫ খ্রি অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ৫১টি রাষ্ট্রকে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা (General Assembly) এবং নিরাপত্তা পরিষদের (Security Council) প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৬ খ্রি জানুয়ারিতে। ১৯৫২ খ্রি থেকে স্থায়ী সদর দপ্তর নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত। রাষ্ট্রসংঘের সনদে প্রস্তাবনা এবং ১৯টি পরিচ্ছেদে ১১১টি অনুচ্ছেদ আছে। সনদে বর্ণিত রাষ্ট্রসংঘের কাঠামো, সাধারণ

সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংসদ, অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত এবং সচিবালয়ে বিন্যস্ত। তা ছাড়া আছে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত বিশেষ কয়েকটি সংস্থা (Agency)। যেমন খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA), আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (IBRD), আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান সংস্থা (ICAO), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF), আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সংস্থা(ITU), আন্তর্জাতিক ডাক সংস্থা (UPU), আন্তর্জাতিক শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO), আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ইত্যাদি।

সনদে রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছে যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ নিবারণ, মানবাধিকার রক্ষা, মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস থাকবে যাতে সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যাদির সমাধান করা সহজ হয়। রাষ্ট্রসংঘের প্রশাসনিক কার্যনির্বাহের দায়িত্ব সচিবালয়ের উপর ন্যস্ত; তার শীর্ষে আছেন সেক্রেটারি জেনারাল এবং তাতে বিশ্বের সব দেশ থেকেই কর্মী নিয়োগ করা হয়। সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট ও নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদনক্রমে নতুন সদস্য গ্রহণ করা হয়।

সাধারণ সভায় সব সদস্যরাষ্ট্রই যোগ দিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হল পাঁচটি: চীন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া (সোভিয়েত ইউনিয়নের জায়গায়); অস্থায়ী ছ'টি দেশ দু' বছরের মেয়াদে নির্বাচিত হয়। বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হলে তার সমাধানের প্রচেষ্টা এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হয়। পরিষদের বৈঠক নিয়মিতই বসে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে পঞ্চ প্রধানের ঐকমত্য চাই; ঐক্যের অভাবে প্রতিষেধ প্রযুক্ত হয়। ইংরেজি, চৈনিক, ফরাসি, রুশ ও স্পেনীয় ভাষায় কার্যনির্বাহ হয়।

প্রথমাবধি রাষ্ট্রসংঘের কার্যক্রম নিয়তই সদস্য-রাষ্ট্রদের বেপরোয়া আচরণে বিঘ্নিত হয়ে এসেছে, বিশেষ করে বারংবার নানা কারণে প্রতিষেধ প্রয়োগের ফলে। পরস্পর-বিরোধী দুই মেরুতে প্রধান রাষ্ট্রসমূহের বিভক্ত হয়ে যাওয়া এবং স্নায়ুযুদ্ধ ও প্রবল ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা ও নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে ব্যাহত হয়। তবুও বহু আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ থামাতে এবং শান্তি ও সৌহার্দের পরিবেশ স্থাপনে ও নানাবিধ কল্যাণকর ও উন্নয়নমূলক কাজে রাষ্ট্রসংঘ সফল হয়েছে।

রাষ্ট্রসমবায় (Confederation)

কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রকে নিয়ে একটি রাষ্ট্রসমবায় গড়ে ওঠে। তার পিছনে পরস্পরসম্মত বিশেষ মাধ্যমে রূপায়ণকল্পে নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য থাকে। যেমন, পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষা; উদ্দেশ্যের সঙ্গে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির নাগরিকদের প্রত্যক্ষ কোনও সম্পর্ক থাকে না। বিভিন্ন অঙ্গরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের (Federation) সঙ্গে এর পার্থক্য হল যে যুক্তরাষ্ট্র আরও বেশি সুসংবদ্ধ হয় এবং তার অঙ্গরাজ্য অথবা প্রদেশগুলির উপর এবং সেগুলির

অধিবাসীদের উপর যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা সরাসরিভাবে প্রযোজ্য। রাষ্ট্রসমবায় থেকে তার কোনও সদস্যরাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একসময়ে (১৭৭৮-১৭৮৯) একটি রাষ্ট্রসমবায় ছিল। রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠবার আগে ১৮১৫ খ্রি থেকে ১৮৬৬ খ্রি পর্যন্ত জার্মানি একটি রাষ্ট্রসমবায়ের মধ্য দিয়ে সংবদ্ধ হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নও এক অর্থে রাষ্ট্রসমবায় ছিল। সোভিয়েত রাষ্ট্র বিলুপ্ত (১৯৯১) হবার পর তার জায়গায় পূর্বতন অঙ্গরাজ্যগুলির কয়েকটিকে নিয়ে যে কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস গঠিত হয়েছে সেটি রাষ্ট্রসমবায়ের একটি নতুন নিদর্শন।

রাষ্ট্রিক বাধ্যতা (Political Obligation)

রাষ্ট্রদর্শনের কোনও কোনও ধারায় বলা হয় যে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে একটি সামাজিক জীব এবং সমাজের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ও দায়দায়িত্ব তার জীবনের একটি অঙ্গ, কারণ সেগুলি তার আত্ম-উপলব্ধি ও আত্ম-বিকাশের সহায়ক। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ তার অধিকার দাবি করতে পারে। অধিকার ও কর্তব্য হল নাগরিকতার লক্ষণ, সমাজ সৃষ্টির পূর্বে কিংবা সমাজের বাইরে লক্ষণ দুটির কোনও তাৎপর্য নেই। সমাজে থাকা ও সুশৃঙ্খল বিধিব্যবস্থার জন্য সকল ব্যক্তিরই সামাজিক দায়দায়িত্ব পালনে বাধ্যবাধকতা থাকে ; সমাজের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার মাধ্যমে সকলে সাধারণভাবে সমান সুযোগের অধিকার পায়, **গণমঙ্গল** সাধিত হয়।

সামাজিক চুক্তি তত্ত্বে মনে করা হয় যে সমাজের সঙ্গে প্রাথমিক চুক্তিসূত্রে বাধ্যতার প্রশ্ন ওঠে এবং সেটার অন্যতম লক্ষণ হল **গণ অভীপ্সা** ; দ্বিতীয় মতে সমাজ বা রাষ্ট্র নয়, বাধ্যতার বন্ধন হল ব্যক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কে (**লক**) ; তৃতীয় মতানুসারে বাধ্যতা থাকে কেবল সার্বভৌমের প্রতি (**বদ্যাঁ**)।

চুক্তির সূত্র ধরে **সম্মতি** তত্ত্বে বলা হয় যে অকথিত সম্মতির মাধ্যমে নাগরিকেরা নিরাপত্তার তাগিদে রাষ্ট্রিক বাধ্যতার বন্ধনকে মেনে নেয় (লক)।

বার্ক, হেগেল প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকদের মতে রাষ্ট্রিক বাধ্যতার উদ্ভব স্বাধীনভাবেই ঘটে। তার পিছনে নাগরিকদের ধর্মীয় কর্তব্যনিষ্ঠার মনোভাব ক্রিয়াশীল হতে পারে, অথবা সার্বভৌম শক্তির প্রাপ্য অধিকারও থাকা সম্ভব। **বৈধতা** তত্ত্বে বলা হয় যে বৈধ সার্বভৌম শক্তির কাছে নাগরিকদের বাধ্য থাকার বিধান আছে। তেমনি **দিব্য অধিকার** সম্পন্ন নৃপতিরা প্রজাদের বাধ্যতার অধিকারী। টমাস হিল গ্রিন মনে করতেন যে রাষ্ট্রীয় বাধ্যতা দাসত্বের সমতুল নয় ; আইনকানুন ও রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার পিছনে নৈতিকতামণ্ডিত পটভূমি থাকা চাই।

নেতিবাচক তত্ত্বে বলা হয় যে রাষ্ট্রের কাছে জনগণের বাধ্যবাধকতা থাকে সেই অবধি যতক্ষণ লোকে স্বাধীনতা ও সুবিচার পায়। বৈধতা তত্ত্বেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। আরিস্তোতলও এই মত পোষণ করতেন যে ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হলে রাষ্ট্র বৈধতার অধিকার হারায়।

রাষ্ট্রীয় মালিকানা (Public Ownership)

প্রত্যয়টি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে জমি, রাস্তাঘাট, পরিবহণ, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদির সরকারি মালিকানা ; কারও দৃষ্টিতে সামাজিক ও সমাজতন্ত্রী মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ; কারও মতে সরাসরি সরকারের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ; এবং কারও মতে সরকারের আংশিক মালিকানা অর্থাৎ **মিশ্র অর্থনীতির** বিধিব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় মালিকানা হিসেবে বিবেচ্য।

সামাজিক মালিকানা সমাজতন্ত্রের গোড়ার কথা। সেটা থেকে ব্যক্তিগত (private) মালিকানা ও সরকারি মালিকানার দূরত্ব সমান। সামাজিক মালিকানা বহুলাংশে **সমবায়** অর্থনীতির সমগোত্রীয়। মার্কসীয় দৃষ্টিতে উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ে যাবতীয় ব্যক্তিগত স্বত্ব, অধিকার ও মালিকানার অবসানই হল সামাজিক মালিকানার লক্ষ্য। **স্তালিন** মনে করতেন সহিংস সর্বহারা বিপ্লবের মাধ্যমেই সেটা সম্ভব। কার্যত সেটা হয়ে দাঁড়ায় অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থায় সরকার তথা রাষ্ট্রীয় মালিকানার পত্তন। তবে তার নিয়ন্ত্রণ থাকে এক শ্রেণীর পরিচালকের হাতে অথবা শাসকদলের নির্দেশে যৌথ নিয়ন্ত্রণাধীনে। কালক্রমে তাতে পুঁজিবাদী **উৎপাদন সম্পর্কের** লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে। অনেকে বলেন যে যথার্থ সামাজিক মালিকানা নয়, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব বিরাজ করে।

মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার সহাবস্থান চোখে পড়ে। যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি হল তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উভয় স্তরেই সেখানে বৃহৎ অনেক শিল্প-বাণিজ্য দেখা যায়। কার্যত সব দেশেই এখন প্রবণতা হল মিশ্র অর্থনীতির। বৃহৎ লগ্নি, দেশব্যাপী সুসংবদ্ধ পরিচালনা ও শোষণমুক্ত জনকল্যাণমূলক কার্যনির্বাহের তাগিদে ভারী শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেলপথ, বিমান, জলপথ ও অন্যান্য পরিবহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে হিংসাত্মক বিপ্লব ব্যতিরেকেই রাষ্ট্রীয়করণ হয়ে থাকে এবং মালিকদের সেজন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ক্ষেত্র বিশেষে অনেক সময়ে ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে অংশীদারি শর্তে যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্যে রাষ্ট্র অর্থলগ্নি করে। তৈল ব্যবসায়ে পূর্বতন ইঙ্গ-ইরাণীয় যৌথ উদ্যম তার এক দৃষ্টান্ত। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নৈপুণ্যের অভাব, চুরি, দুর্নীতি, অপচয়, লোকসান ও নিরন্তর ভরতুকি-নির্ভরতার ফলে বিশ শতকের শেষ দশকে সারা বিশ্বে উদারনীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (Rastriya Swayamsevak Sangha)

একটি হিন্দু জঙ্গি সংগঠন। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড নামক সংগঠনের প্রতিপক্ষ শক্তি হিসেবে ১৯২৫ খ্রি নাগপুরে ড. কেশব বালিরাম হেদগেওয়ার (১৮৯০-১৯৪০) নামক অন্ধ্রের এক ব্রাহ্মণ এবং মহারাষ্ট্রের অধিবাসীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। দয়ানন্দ সরস্বতী ও বীর সাভারকরের চিন্তায় তিনি অনুপ্রাণিত হন। আনুষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত না হলেও **হিন্দু মহাসভার** প্রভাবাধীনে পরিচালিত হত। ১৯২৭ খ্রি মধ্য ভারতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় হিন্দুদের রক্ষার্থে হিন্দু মহাসভার নেতা ড. বি এস মুঞ্জে এই সংঘটিকে পুনর্গঠিত করেন। ১৯৩২ খ্রি মহাসভা স্বীকৃতি দানসহ সংঘটিকে সারা

দেশে শাখা স্থাপনের উৎসাহ যোগায়। ফলে এটি একটি সর্বভারতীয় সংগঠন হয়ে ওঠে। হেদগেওয়ার চেয়েছিলেন হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। তিনি মনে করতেন বহুধাবিভক্ত হিন্দু সমাজের পতনের কারণ হল সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ; এবং রাজনীতির চেয়েও সমাজ ও ধর্মের তথা হিন্দু সংস্কৃতির শুদ্ধিকরণ বেশি জরুরি। সেটাই হল কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ স্বেচ্ছাসেবী স্বয়ংসেবকদের কাজ। সংঘ হল পদগতভাবে ক্রমোচ্চ বিন্যস্ত। সর্বশীর্ষে থাকেন আধ্যাত্মিক অধিনায়ক যাঁকে বলা হয় সরসঙ্ঘালক। ১৯৪০ খ্রি হেদগেওয়ারের মৃত্যুর পর সংঘের প্রধান সংগঠক হন এম. আর. গোলওয়ালকর। তাঁকে গুরুজি বলে উল্লেখ করা হয়।

সংঘের উদ্দেশ্য হল হিন্দু যুবকদের শরীরচর্চার মাধ্যমে সুসংহত করা ; হিন্দুস্থান হিন্দুদের— এই ধ্বনির সাহায্যে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করা ; বিদেশি শাসন ও মুসলিম প্রভাব থেকে দেশের মুক্তিকল্পে একটি শক্তিশালী জঙ্গি বাহিনী গড়ে তোলা। গোলওয়ালকর সংঘের মতাদর্শ ব্যক্ত করেন। তিনি সাভারকরের 'হিন্দুত্ব' প্রত্যয় অনুযায়ী হিন্দু জাতির সংজ্ঞা নিরূপণ করেন। সমস্ত অহিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্দেশে তিনি এক পুস্তিকায় তাদের নিজস্ব যাবতীয় সত্তা হিন্দুত্বে বিলীনের নির্দেশ দেন। ধর্মনিরপেক্ষতায় তাঁর কোনও আস্থা ছিল না এবং রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করা যায় না বলে মনে করতেন। কাগজপত্রে নিজেদের একটি প্রকাশ্য সংগঠন হিসেবে দাবি করলেও সংঘের সদস্যপদ সম্পর্কে কড়া গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়। সামরিক ধাঁচে গঠিত এই সংঘের সদর দপ্তর নাগপুরে অবস্থিত ; একজন সর্বাধ্যক্ষ এবং কয়েকজন প্রাদেশিক সংগঠক আছেন। সংঘের সদস্যদের সামরিক শিক্ষা ও ব্যায়ামচর্চার সঙ্গে লাঠি ও ছোরা খেলা, তীর ছোঁড়া শিক্ষা দেওয়া এবং বাদ্য (ব্যান্ড) ও অ্যাম্বুলেন্স বিভাগ পরিচালিত হয়। শিবির শিক্ষণ ও বক্তৃতার মাধ্যমে সদস্যদের কাছে নিয়মিত সংঘের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি ব্যাখ্যা করা হয় ; তাতে হিন্দু প্রাধান্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আপাতদৃষ্টিতে অরাজনৈতিক ও আইনসঙ্গত বলে মনে হলেও সরকারি রিপোর্টে দেখা যায় যে মুসলিম বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সংঘের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে।

১৯৪৮ খ্রি মহাত্মা গান্ধীর হত্যাসূত্রে সংঘ বেআইনি ঘোষিত হয়। প্রথম পর্যায়ে হিন্দু মহাসভা, পরে জনসংঘ এবং বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মসূচিকে পরোক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ নিয়ন্ত্রণ করে।

আর এস এস-এর সর্বোচ্চ পরিচালক হিসাবে অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিং ওরফে রজ্জু ভায়া ১৯৯৪ খ্রি নতুন প্রথা অনুসারে অভিষিক্ত হন। গুপ্ত সমিতি হিসাবে পরিচালিত সংঘের সরসঙ্ঘালক নামে অভিহিত পূর্ববর্তী সংঘপ্রধান বালাসাহেব দেওরস কর্তৃক ইনি মনোনীত হন। ইতিপূর্বে আর এস এস-এর কর্মসূচিতে ব্রাহ্মণ আধিপত্য কাটিয়ে সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে জাতপাতের বিধিনিষেধ শিথিল করে দেওয়া হয়। তবে ১৯৯৫ খ্রি বিভিন্ন রাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে সংঘ পরিবারের অন্যতম বি জে পি ভোট পাবার জন্য যেভাবে মুসলিম তোষণ শুরু করেছে, আর এস এস নেতাদের তাতে সবিশেষ আপত্তি দেখা দেয়। বি জে পি দলের মধ্যে সংখ্যালঘুদের স্বার্থে স্বতন্ত্র 'সেল' খোলার বিষয়েও বিরোধিতা করেছে আর এস এস।

রিগিং (Rigging)

সাধারণ নির্বাচনে ইদানীং বহুল প্রচলিত রিগিং কথাটি ইংরেজিতে একটি চলিত শব্দ। অক্সফোর্ড অভিধানে (OED) বলা হয়েছে যে ১. কোনও কিছু গোপনে অথবা প্রতারণা কিংবা জুয়াচুরির মাধ্যমে কৌশলে হাসিল করা; ২. ব্যালট রিগিং: Fraudulent manipulation of a ballot। শব্দটি এখনও সরকারের নির্বাচনী আইনকানুন ও ক্রিয়াকর্মের পরিভাষায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এর সংজ্ঞা নিরূপিত হয়নি। তবে সংবাদপত্র, বক্তৃতা, বিবৃতি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যে অর্থ ফুটে ওঠে তা হল বিশেষ কোনও প্রার্থীর সমর্থকেরা ভোটকেন্দ্র অবরোধ করে, কর্মীদের কাছ থেকে সমুদয় ব্যালট কেড়ে নিয়ে সেই প্রার্থীর নামে ছাপ মেরে ব্যালট বাক্সে সেগুলি ফেলে দেয়। এ ছাড়া ব্যালট বাক্স পরিবর্তন ইত্যাদি ধরনের জালিয়াতির কথাও শোনা যায়।

দ্র. রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন

রিপাবলিকান পার্টি (Republican Party)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল। ১৭৯২ খ্রি প্রতিষ্ঠিত হয়। আদিপর্বে দলটি তৃতীয় প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসনের দল নামে পরিচিত ছিল। কৃষক ও অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলির স্বার্থরক্ষাই ছিল তখন প্রধান কাজ। বিবর্তনের ধারায় কখনও ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান দল, কখনও কেবল ডেমোক্রেটিক দল নামে অভিহিত হত। ১৮৫৪ খ্রি আনুষ্ঠানিকভাবে পুনর্গঠনের সময়ে রিপাবলিকান পার্টি নাম পরিগ্রহ করে। দলের প্রথম দিককার প্রধান ভূমিকা ছিল ক্রীতদাস প্রথার বিরোধিতা। ১৮৬০ খ্রি ষোড়শ প্রেসিডেন্ট পদে দলের প্রার্থী আব্রাহাম লিঙ্কনের জয়যুক্ত হবার পর দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অতঃপর দলের উগ্র বনাম নরমপন্থীদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ শুরু হয়। গড়ে ওঠে লিবারাল রিপাবলিকান পার্টি। উনিশ শতকের শেষদিকে রিপাবলিকান পার্টি স্পষ্টই একটি দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল দল হিসেবে দেখা দেয়। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়ে এবং তার পরে ডেমোক্র্যাট দলের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের শান্তি-প্রয়াসে রিপাবলিকানরা বাধাসৃষ্টি করে। তবে দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময়ে ও পরে পার্টি ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে একযোগে কাজ করে। তিরিশের দশকে প্রেসিডেন্ট হার্বার্ট হুভারের আমলে (১৯২৯-৩৩) অর্থনৈতিক মন্দার জন্য রিপাবলিকানদের দায়ী করা হয়। জেফারসনের আমলে (১৮০১-৯) যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও গ্রামীণ বিকেন্দ্রিত শাসনব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেওয়া হত তার পরিবর্তে রিপাবলিকান দল উত্তরকালে পুঁজিবাদী নগর-সভ্যতা ও অবাধ বাণিজ্যের দিকে ঝোঁকে। তবে বাস্তব রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কঠোর নীতি অনুসরণের ফলে রিপাবলিকানরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মন জয় করতে পেরেছে। তা সত্ত্বেও পার্টি শাসনক্ষমতায় একাদিক্রমে দীর্ঘকাল থাকতে সমর্থ হয়নি।

দ্র. ডেমোক্রেটিক পার্টি

রুসো, জাঁ জ্যাক (১৭১২-১৭৭৮) (Rousseau, J.J.)

ফরাসি দার্শনিক ; জন্ম জেনিভায়। জীবনের অনেকাংশ তাঁর দুর্দশাগ্রস্ত ভবঘুরে অবস্থায় কাটে। বিভিন্ন শুভার্থী, দার্শনিক দিদেরো এবং এনসাইক্লোপিডিস্টদের সহায়তায় দুরবস্থার লাঘব হয়। পারি ছেড়ে কিছুকাল তিনি ইংল্যান্ডে বার্ক ও হিউমের সান্নিধ্যে কাটিয়ে আসেন। একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় (১৭৪৯), যার বিষয় ছিল যে বিজ্ঞান ও কলার উন্নতি নৈতিকতাকে কলুষিত অথবা নিষ্কলুষ করেছে কি না, তার প্রথম পুরস্কার জয়ী রুসোর সমকালীন চিন্তাভাবনা ও প্রথাবিরোধী বক্তব্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, দেশের আইনকানুন ও রাজার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে নিন্দার ভাব ফুটে ওঠে। তাতে যেন বিপ্লবের পদধ্বনি শোনা যায়। জীবনধারা পালটে তিনি পারির উপকণ্ঠে একটি বনভূমিতে বসবাস শুরু করেন। তাঁর মধ্যে প্রকৃতির জীবনে ফিরে যাবার প্রবণতা দেখা দেয়। 'ডিসকোর্স অন দ্য অরিজিন অব ইনইকুয়ালিটি' নামক বইতে তিনি 'প্রকৃতির মাঝে ফিরে চল' মনোভাব ব্যক্ত করেন। ক্রমে তাঁর অনেকগুলি বই প্রকাশিত হয়। তাঁর বিভিন্ন বইয়ে বিশেষ করে 'এমিলি' ও 'কাঁত্রা সোসিয়েল' বই দুটিতে রাষ্ট্রচিন্তার কথা বেশি পাওয়া যায়। রুসোর রাষ্ট্রদর্শনে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ও সাম্যের আদর্শ ও দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রস্তাব ফুটে ওঠে এবং স্পষ্টতই সেটা ছিল বিপ্লবের অভিমুখী। জীবনের প্রথম দিককার রচনাদিতে রুসোর যে মনোভঙ্গি দেখা দেয় সেটা ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। পরবর্তীকালে তাঁর সমষ্টিবাদী ভাবনা প্রাধান্য পায়। তাঁর গণ অভীপ্সা (General Will) তত্ত্বের মাধ্যমে জৈবতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তিকে অঙ্গীভূতকরণের অভিমত ব্যক্ত হয়।

প্লাতোর মতো রুসো বিশ্বাস করতেন যে মানবপ্রকৃতি মূলত শুভ। দুটি প্রবণতা মানুষের জীবনে আধিপত্য করে— একটি হল নিজের প্রতি অনুরাগ ও নিজেকে রক্ষা করা, অপরটি হল যূথবদ্ধতা, সহানুভূতি ও পারস্পরিক সাহায্য। যখনই এই দুটি প্রবণতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, মানুষ তার বিবেকের দিকে তাকায়। বিবেক যুক্তি দ্বারা চালিত হয়। সেই ঠিক করে দেয় কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ। রুসো প্রত্যক্ষ করেন যে আদিম প্রবণতা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং যুক্তি মানুষকে বিভক্ত করে। মানুষ যখন তার প্রকৃতিগত প্রবণতা দ্বারা চালিত হয় তখন সে ভাল। আর যখন তার প্রকৃতিগত প্রবণতাগুলি চাপা থাকে কিংবা বিকৃত হয় তখন সে মন্দের দিকে ঝোঁকে। রুসোর দৃষ্টিতে আদিমকালে প্রকৃতির রাজ্যে শান্তি বিরাজ করত। বিবাহ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রথা উদ্ভূত হবার ফলে প্রকৃতির রাজ্যের স্বর্ণযুগ অচিরেই শেষ হয়ে যায় ; মহান বর্বর নিজের মহত্ত্ব হারায় ; অসাম্য মাথা চাড়া দেয় ; আদিম সারল্য অন্তর্হিত হয় ; প্রয়োজন পড়ে পুরসমাজ গঠনের।

সামাজিক চুক্তির প্রাক্‌কালে মানুষ যখন সাম্য ও শান্তি হারায়, সে তখন এক ধূর্ত বর্বরে পরিণত হয়। জীবনের মান অবনত হয়। "যুদ্ধ, হত্যা, বিভীষিকা, দুর্গতি" ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায়। বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য হবসের কল্পিত প্রকৃতির রাজ্যেও বিরাজ করে। পরিবার ও সম্পত্তির নবোদ্ভূত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকেও রদ করা যায় না। সেগুলির সঙ্গে মানুষকে সাম্য, স্বাধীনতা ও প্রকৃতিরাজ্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। রুসোর কাছে সমস্যাটি ছিল এমন এক সংগঠন তৈরি করার, যার কাজ হবে সাধারণের শক্তি ও সমর্থনে ব্যক্তিমানুষের জীবন ও বিষয়-আশয়ের

নিরাপত্তা বিধান এবং সংগঠনে যোগদানকারী সদস্যরা যাতে সংগঠনের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেও নিজেদের স্বাধিকার ভোগে সমর্থ হয়।

উল্লিখিত সমস্যাটির সমাধান পাওয়া গেল **সামাজিক চুক্তি** তত্ত্বের ভিত্তিতে এক রাজনৈতিক সমাজের প্রতিষ্ঠায়। যারা সেই সমাজের সঙ্গে যুক্ত হল তারা নিজেদের প্রাকৃতিক অধিকার ত্যাগ করে এই মর্মে চুক্তি করল যে সর্বশীর্ষ গণ-অভীপ্সার (General Will) নির্দেশাধীনে যৌথভাবে সকল সদস্যকে এই সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হল। সবাইকার ঐকমত্যে গৃহীত সিদ্ধান্তে সকলে সম্পূর্ণভাবে একত্র মিশে গেল।

রুসো কথিত এই চুক্তির বলে একটি নৈতিকতামণ্ডিত ও যূথবদ্ধ সংগঠন রূপায়িত হল যার সদস্যরা ভোটদান করে এবং একই দেহের মধ্যে অঙ্গীভূত হবার ফলে সবাই ঐক্য, সাদৃশ্য ও সমানাধিকার প্রাপ্ত হয়। এই সংগঠনই সদস্যদের কাছে রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিভাত। সার্বভৌম হিসেবে সক্রিয় অন্য শক্তির সঙ্গে তুলনাকালে শক্তি হিসেবে বিবেচিত। তার সদস্যদের বলা হয় নাগরিক। অবশ্য রুসো রাষ্ট্র ও সরকারকে ভিন্নভাবে দেখেছেন। তাঁর কাছে সরকার হল রাষ্ট্রের একটি এজেন্ট। রাষ্ট্রই প্রধান, সরকার যন্ত্রমাত্র। মানুষের বিকাশ একমাত্র তার স্বাধীনতায় সম্ভব। তিনি লক্ষ করেন যে সমাজের প্রতি অনুগত থেকেও মানুষ পূর্বের মতোই স্বাধীন। সেটা সম্ভব যেখানে সরকারকে লোকের কাছে জবাবদিহি করতে হয় এবং গণঅভীপ্সাকে রূপায়িত করতে হয়।

রেনেসাঁস (Renaissance)

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালি থেকে যে সাংস্কৃতিক ও মননশীল নবজাগরণ ক্রমে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং যে কালপর্বে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে ইতিহাসের উত্তরণ (১৪ শতক-১৬ শতক) ঘটে। রেনেসাঁসের কার্যকারণ ও লক্ষণ সম্পর্কে বহুবিধ মতামত আছে। রেনেসাঁসের অভিঘাত শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সীমিত ছিল না; দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে এই নবজাগরণ-আন্দোলন মানুষের সামগ্রিক মনোভঙ্গির পরিবর্তন প্রদর্শন করে। ইতালি থেকে এই আন্দোলন কয়েক শতক ধরে ক্রমে ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানি ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রসারিত হয়।

রেনেসাঁসের কার্যকারণ কেবল কনস্তান্তিনোপলের পতন, মুদ্রণ শিল্পের প্রবর্তন, আমেরিকা আবিষ্কারই ছিল না। সেগুলি ছিল তার বিভিন্ন পর্বের এক একটি প্রধান পদক্ষেপ। অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থায় উন্নতি ও বিকাশের ভূমিকাও ছিল বড়। নতুন বণিক শ্রেণীর উদ্ভব থেকে দানা বাঁধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, গড়ে ওঠে ইহমুখী জীবনবোধ তথা মানবতাবাদ। শিল্প-সাহিত্যের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ও পৃষ্ঠপোষকতায় চার্চের স্থান বহুলাংশে অধিকার করে সেই নবোদ্ভূত বণিক শ্রেণী। চার্চের দাপট থেকে মুক্ত হয়ে আর্থিক সাচ্ছল্যে ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সম্প্রদায় সৃজনকর্মে স্বাধীন হয়ে ওঠে। মধ্যযুগীয় শিল্পকলার লক্ষ্য ছিল মানুষের আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও পারলৌকিক মঙ্গল বিধান। রেনেসাঁসি শিল্প মানুষের সহজাত রসবোধ সৃষ্টি ও ইহজীবনমুখী সত্তাকে

প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে তোলে।

অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সুযোগে মানুষের জিজ্ঞাসু মন বিজ্ঞানচিন্তায় উৎসাহিত হয়। কারিগরি বিদ্যা ও যন্ত্রশিল্পের বিকাশ ঘটে। এ ব্যাপারে ইতালি আরবদেশ থেকে (কনস্তান্তিনোপলের পতনের পর) আগত বিদ্বজ্জনদের কাছ থেকে প্রাচীন গ্রিসের ও রোমের দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ইত্যাদি বিদ্যা সংক্রান্ত পুথি-পাণ্ডুলিপি দেখার সুযোগ পায়। প্রাচীন গ্রিসের দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির ওইসব পাঠ্যবস্তুর অন্তর্নিহিত মানবতাবাদী জীবনাদর্শ ইতালির মানুষকে প্রভাবিত করে। রেনেসাঁস ছিল মধ্যযুগীয় ধর্মতন্ত্রের ও যাজকদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মানবতন্ত্রী বিদ্রোহ। সমসাময়িক কালে খ্রিস্টান ধর্মে রেফর্মেশন আন্দোলন রেনেসাঁসকে ত্বরান্বিত করে।

রেনেসাঁসের কালপর্বে ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ও বুর্জোয়া শ্রেণীর উদয় ঘটে। মধ্যযুগীয় আধিদৈবিক দর্শনচিন্তার প্রভাব কাটিয়ে প্রাচীন গ্রিক ও রোমান মানবতন্ত্রী জীবনাদর্শ ও নানান বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা নবদিগন্তের নিশানা দেখায়। গ্রহতারা, পাঁজিঠিকুজি, ইন্দ্রজাল ও অপরসায়নের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ থেকে ক্রমে মুক্ত হয়ে লোকে যথার্থ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা ও বিশ্বচরাচরের বস্তুনিষ্ঠ দর্শনচিন্তার দিকে অগ্রসর হয়। ব্রুনো, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, লেওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, ফ্রান্সিস বেকন প্রমুখ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা ছিলেন রেনেসাঁসি ভাববিপ্লবের কর্ণধার।

সমকালীন অর্থনৈতিক পরিবর্তন রেনেসাঁসি কালপর্বে আর্থ-সামাজিক ভাবনাচিন্তায়ও প্রতিফলিত হয়। ইতালিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী লোকায়ত রাষ্ট্রচিন্তার প্রবক্তা ছিলেন মাকিয়াভেল্লি। চার্চের প্রভাবমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ বিভিন্ন রাজতন্ত্রী ও সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্রেরও গোড়াপত্তন হয়। ফরাসি রাষ্ট্রদার্শনিক জাঁ বদ্যাঁ (১৫৩০-৯৬) জাতীয় রাষ্ট্রের ভাবভূমি প্রস্তুত করেন। হল্যান্ডের আইনবিদ হুগো গ্রোটিয়াস (১৫৮৩-১৬৪৫) দেশের অভ্যন্তরে ক্ষমতার লোভে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পররাজ্যের সম্পদ লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি নিবারণের জন্য শান্তির আইনকানুন প্রণয়ন করেন। ইংল্যান্ডে সমাজ পরিবর্তনের তাৎপর্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে উপলব্ধি এবং আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের প্রতি জনগণের আইনানুগ আনুগত্যের প্রশ্নটিকে দাঁড় করিয়েছিলেন টমাস হবস্। ইউরোপে রেনেসাঁসি কাল-পরিবর্তনের ধারা উপলব্ধি করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রচিন্তার এক একটি বাতাবরণ সৃষ্টি করেন মাকিয়াভেল্লি, বদ্যাঁ, গ্রোটিয়াস, হবস প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকেরা।

রেফর্মেশন (Reformation)

ষোড়শ শতকে পশ্চিম ইউরোপে যে ধর্মবিপ্লব ঘটে ; সূচনা হয়েছিল ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার আন্দোলনে ; পরিণতি লাভ করে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের উত্থানে। রোমান চার্চের বিরুদ্ধে চতুর্দশ শতক থেকেই বিক্ষোভ দানা বাঁধে ; রেনেসাঁস থেকে সৃষ্ট মানবতাবাদ রেফর্মেশনকে পরিপুষ্ট করে ; মুদ্রণের আবিষ্কারে সেটি ত্বরান্বিত হয়। বিভিন্ন দেশে বিশেষত জার্মানিতে চার্চের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিরোধ, বাণিজ্যের প্রসার এবং মধ্যবিত্ত তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্থান ছিল রেফর্মেশনের প্রধান উপাদান ; সূচিত হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের অবসান। ইতিহাসে বুর্জোয়া বিপ্লবেরও বীজ অঙ্কুরিত হয় এই

সময়ে এবং ক্রমে সেটা ইউরোপের অন্যত্র বিস্তারিত হয়। রেফর্মেশন যেসব দেশে জয়যুক্ত হয়েছিল সেখানে রাষ্ট্র ও রাজনীতি চার্চ তথা ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পায় ; বিজ্ঞানচর্চা ও সেকিউলার সংস্কৃতি বিকাশের পথে অগ্রসর হয়। প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের প্রসারের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া নেশন গড়ে উঠতে থাকে। রাজন্যবর্গের পাশাপাশি খ্রিস্টান সাধারণ জনগোষ্ঠী দানা বাঁধে ; সেসব গোষ্ঠী যাজকদের বিরোধিতার সঙ্গে রাজন্যবর্গের বিরোধিতা করে এবং সম্পত্তিতে সমতার দাবি জানায়।

রেভল্যুশনারি সোসালিস্ট পার্টি (Revolutionary Socialist Party)

বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে **অনুশীলন** ও **যুগান্তর** নামে দুটি বিপ্লবী গোষ্ঠী বঙ্গদেশে সক্রিয় ছিল। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে গুপ্ত সংগ্রামী পদ্ধতিতে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন ছিল তাদের লক্ষ্য। কুড়ির দশকে অনুশীলন দল উত্তর ভারতে প্রসার লাভ করে। প্রথমে হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশন নামে এবং পরে হিন্দুস্থানের সঙ্গে সোসালিস্ট শব্দটিও যুক্ত হয় (এইচ-এস-আর-এ)। অনুশীলন গোষ্ঠীর অনেক কর্মী ত্রিশের দশকের গোড়ায় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন, এবং দীর্ঘকাল কারাগারে আবদ্ধ থাকেন। কারাগারে তাঁরা মার্কসীয় রাষ্ট্রদর্শন পাঠ ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কমিউনিস্ট মতাদর্শে আকৃষ্ট হন। ১৯৩৭-৩৮ খ্রি নাগাদ মুক্তির পর তাঁদের একাংশ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। অপরাংশ ১৯৩৮ খ্রি সেপ্টেম্বরে একটি বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী গড়ে তোলেন ; তার নেতৃত্বে ছিলেন যোগেশ চ্যাটার্জী, ত্রিদিব চৌধুরী, কেশবপ্রসাদ শর্মা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। জেলে থাকতেই তাঁরা একটি রাজনৈতিক থিসিস প্রস্তুত করেছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে সুস্পষ্ট কোনও পার্টি হয়ে না উঠে এই গোষ্ঠী কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে একযোগে কাজ শুরু করে, এই আশায় যে বৈপ্লবিক মতাদর্শে একটি কর্মসূচি কালক্রমে গৃহীত হবে। কিন্তু কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে (১৯৩৯) সি এস পি দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলানোর ফলে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদের আশাভঙ্গ হয়। তাঁরা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে একই সময়ে রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনের (১৯৪০) অদূরে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আপসবিরোধী এক সম্মেলনে যোগ দেন। এর আগে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীরা সুভাষচন্দ্রের ডাকে কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ৯ জুলাই, ১৯৩৯ তারিখে প্রতিবাদ দিবসে অংশ নেন।

রামগড়েই ১৯৪০ খ্রি মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত এক কনভেনশনে রেভল্যুশনারি সোসালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় (আর এস পি)। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধে কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধী শিবিরে অবস্থান ও অগস্ট আন্দোলনে যোগদানের জন্য আর এস পি নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হন। তাঁদের মুক্তির পর (১৯৪৫) দিল্লিতে আর এস পি দলের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মতপার্থক্যের জন্য দলের বঙ্গদেশের একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ; তাঁরা সোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টার নামে একটি দল গঠন করেন। ১৯৫০ খ্রি কলকাতায় আর এস পি দলের চতুর্থ সর্বভারতীয় সম্মেলনে শ্রীকান্তন নায়ারের নেতৃত্বে কেরল সোসালিস্ট পার্টি প্রথমোক্ত দলের সঙ্গে মিশে যায়। আবার ওই বছরেই ঝাড়খণ্ডে রাইয়ের নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশের সমগ্র শাখা

কমিউনিস্টদের অনুগত হয়ে পড়ায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ওই রাজ্য শাখাকে ১৯৫১ খ্রি ভেঙে দেন। পশ্চিমবঙ্গেও আর এস পি দলে বার দুয়েক ভাঙন ধরে (১৯৪৮-৫০)। তার একটি সোসালিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়।

ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রধানত আর এস পি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং দলের শক্তি পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলেই মূলত সীমাবদ্ধ। আর এস পি মার্কসীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে পূর্বতন যুক্তফ্রন্টের ভাঙাগড়া এবং পরবর্তী বামফ্রন্টের অন্যতম প্রধান শরিক।

১৯৬৪ খ্রি কেরলে মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রশ্ন ওঠে যে আর এস পি দলের একটি মার্কসীয় দল হিসেবে বুর্জোয়া রাষ্ট্র কাঠামোয় কী ভূমিকা হবে? ১৯৬৭ খ্রি কানপুরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সম্মেলনে উত্তর প্রদেশের নেতা কেশব প্রসাদ শর্মা এক ভিন্ন থিসিসে বলেন যে একমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এবং সাধারণ নির্বাচনে সেই নিরিখেই যোগদান সঙ্গত। ১৯৬৮ খ্রি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বিশেষ সম্মেলনে তাঁর বক্তব্য নাকচ হয়ে যাওয়ায় শর্মার নেতৃত্বে বিপ্লবী আর এস পি দলের উদ্ভব হয়। পরে শর্মা ত্রৎস্কিপন্থীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঘোষণা করেন যে তাঁর দল সংসদীয় রাজনীতির বিরোধী; দল রাশিয়া ও চীন থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখবে।

১৯৭০ খ্রি কেরলে আর এস পি মধ্যবর্তী নির্বাচনে সি পি আই (এম) বিরোধী মোর্চায় কংগ্রেসের এক বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে শামিল হয়ে অচ্যুৎ মেননের মন্ত্রিসভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে আপত্তি জানায়। কারণ শাসক বুর্জোয়া শ্রেণীপুষ্ট কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালি আর এস পি দলের মতাদর্শের পরিপন্থী। এর ফলে কেন্দ্রীয় কমিটিতে কেরলের সাতজন প্রতিনিধির দু'জন প্রতিবাদ হিসেবে পদত্যাগ করেন; এবং পরে কেরল শাখা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে স্বাধীনভাবে চলতে শুরু করে। বার দুয়েক ভাঙনের ফলে উত্তরপ্রদেশে আর এস পি কার্যত নিশ্চিহ্ন এবং কেরল থেকেও মুছে যেতে বসে। দল পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের অন্যতম শরিক।

র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (Radical Democratic Party)

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবার পর মানবেন্দ্রনাথ রায় ভারতে প্রত্যাবর্তন (নভেম্বর ১৯৩০) এবং কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে সরাসরি যোগদান করেন। তাঁকে ঘিরে 'রায় গ্রুপ অব কমিউনিস্টস' নামে একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। অনতিকালের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হন। রায় গ্রুপের সদস্যরা গোপনে সক্রিয় থাকেন। প্রকাশ্য ক্রিয়াকলাপের তাগিদে তাঁদের একাংশ কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠায় অংশ নেন। মুক্তির (২০ নভেম্বর ১৯৩৬) পর মানবেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে যোগদান করেন। নীতিগত মতপার্থক্যের জন্য রায় গ্রুপের সদস্যরা সি এস পি থেকে বেরিয়ে আসেন। ফরাসি বিপ্লবের ধাঁচে সমান্তরাল সরকার গঠনের কৌশল হিসেবে কংগ্রেস কমিটিগুলির সমন্বয়ে একটি গণপরিষদ গঠন ও বিদেশি সরকারকে উচ্ছেদের তিনি এক কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। ১৯৩৭ খ্রি সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাবকে তিনি সমর্থন করেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের

(১৯৩৯) পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে মানবেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের ভিতর লিগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন (এল আর সি) গঠন করেন। কংগ্রেসে বিকল্প বামপন্থী নেতৃত্ব গঠন ছিল লিগের অভীষ্ট বস্তু।

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ সম্পর্কে লিগের বক্তব্য ছিল যে ওই যুদ্ধ মূলত ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ ; যুদ্ধে মিত্রপক্ষের পরাজয় হলে গণতন্ত্র ও মানবসভ্যতার বিপর্যয় ঘটবে, আর জয় হলে রণবিধ্বস্ত সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের দায়দেনার ফলে উপনিবেশসমূহ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। তাই এল আর সি মিত্রপক্ষের যুদ্ধপ্রয়াসকে ফ্যাসিবিরোধী কর্তব্য হিসেবে নিঃশর্তে সমর্থনের আহ্বান জানায়। কংগ্রেস নেতৃত্ব সেজন্য মানবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের কংগ্রেস পরিত্যাগে বাধ্য করে। মানবেন্দ্রনাথ তখন এল আর সি'র পরিবর্তে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি নামে একটি দল গঠন করেন (১৯৪০)। যুদ্ধের পর জাতীয় স্বাধীনতা অনিবার্য এই স্থিরপ্রত্যয়ে তিনি স্বাধীন ভারতের একটি খসড়া সংবিধান এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের উপযোগী জনগণের যোজনা নামে একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রচার করেন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে তিনি বামপন্থী দলসমূহের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের আহ্বান জানান। সেটা নিষ্ফল হয়।

মানবেন্দ্রনাথের মনে দীর্ঘকাল যাবৎ একটি নতুন রাষ্ট্রভাবনা চলেছিল। তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে প্রচলিত যাবতীয় মতাদর্শ মানুষের যথার্থ মুক্তির পক্ষে সহায়ক হয়নি। শ্রেণী, রাষ্ট্র ইত্যাদি সমষ্টিবাদের বেদীমূলে ব্যক্তিমানুষের স্বার্থকে উৎসর্গ করা হয়। যুক্তিবোধ, নৈতিকতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা অস্তমিত। দলীয় রাজনীতি মূলত ক্ষমতার কাড়াকাড়ি। মানুষকে স্বনির্ভর ও স্থানিক জনসমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করে বিকেন্দ্রিত প্রশাসন ও সমবায় অর্থনীতি প্রবর্তনের এক বিকল্প মতাদর্শের ভিত্তিতে মানবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীরা ১৯৪৮ খ্রি র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ভেঙে দিয়ে দলহীন রাজনীতির আন্দোলন শুরু করেন।

দ্র. র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম

র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজ্‌ম্‌ (Radical Humanism)

মানবেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক প্রবর্তিত বাইশটি থিসিসে বিধৃত একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন। এটি 'নবমানবতাবাদ' নামেও প্রচারিত হয়। মানবতা কথাটি নতুন নয়। প্রত্যয়টিকে মানবেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মানুষের সৃষ্টিসত্তা মুক্তি পেয়েছে। কুসংস্কারমূলক ভ্রান্তি ও ভীতি এবং অতীন্দ্রিয় চিন্তার আধিপত্য ও আধ্যাত্মিকতার শৃঙ্খল থেকেও তার মুক্তির পথ আজ প্রশস্ত। তাঁর মতে মানবসভ্যতার সামনে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক যে সংকট দেখা দিয়েছে তার সুরাহা সম্ভব একমাত্র মানবতাবাদী মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবনে। আশু কার্যকারিতা ও সুবিধাসন্ধানী চিন্তার প্রাবল্যে মানুষের সহজাত যুক্তি ও নীতিবোধ উন্মেষিত হচ্ছে না।

বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানের আশ্রয়ে তিনি চেয়েছেন যুক্তিমুখী নীতিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। মানুষের যুক্তিপ্রবণতা উদ্ভূত হয়েছে জৈব বিবর্তনধারায়। বিবেক যুক্তিরই বিম্ব। সৃষ্টি-স্থিতির বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী একমাত্র যুক্তিনির্ভর মানবতাবাদী নীতিতত্ত্ব-আলোকিত পথই অনুসরণীয়। নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ বিশ্বজগতের

(Law-governed Universe) কোলেই যুক্তিপ্রবণ মানুষের জন্ম। মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্ব যুক্তিবহ সুশৃঙ্খল জগতের প্রতিধ্বনি। যুক্তির ভূমিতেই হয় নৈতিকতার জন্ম; সামাজিক সামঞ্জস্য ও সহিষ্ণুতার তাগিদে নীতিবোধ উন্মেষিত হয়।

'নবমানবতাবাদ' দর্শনে মানুষই সবকিছুর একমাত্র মানদণ্ড। আধ্যাত্মিক মানবতাবাদে মানুষকে ঐশ সত্তায় বিমূর্ত কল্পনায় বিশ্বাতীত মহত্ত্ব দান করা হয়। বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদে প্রাকৃতিক বিবর্তনের অংশ হিসাবে জৈব দৃষ্টিতে মানুষ বিবেচিত। নবমানবতাবাদ দর্শন সম্পূর্ণরূপে মানুষের জ্ঞান ও গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত, তার প্রেক্ষাপট একাধারে বস্তুবাদী ও গতিসম্পন্ন। সর্বার্থে বিজ্ঞানভিত্তিক এই দর্শন মানুষের সৎ, শুভ ও সৃজনশীল জৈবধর্মে আস্থাশীল। এযাবৎকালীন আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় মানবতা থেকে পার্থক্যের চিহ্ন হিসাবে 'নব' কথাটি যুক্ত হয়েছে এই অর্থে যে এতে মানুষকে নতুনভাবে দেখা হয়েছে— যে দেখার পিছনে আছে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মনোভঙ্গি। জৈব বিবর্তনধারাতেই মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে তার সহজাত গুণগুলি অর্জন করেছে। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর এই দর্শনকে নবতম জ্ঞানের সমন্বয়স্বরূপ অতিরিক্ত intergral শব্দটি দিয়েও তার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন।

নবমানবতাবাদ দর্শন ঐতিহাসিক বিবর্তনে লব্ধ অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে রচিত। এই দর্শনের মর্ম হল যুক্তি, নৈতিকতা ও স্বাধীনতা। মানুষ মূলত যুক্তিবাদী জীব হলেও অনেক সময়ে তার অপরিশীলিত মনে আদিম প্রবৃত্তি ফুটে ওঠে। সেজন্য চাই মানবমনের যথোচিত কর্ষণ। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ ও সামাজিক বিধিব্যবস্থায় যুক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ থেকেই নীতিনিষ্ঠা গড়ে ওঠে। তার লক্ষ্য সমাজবদ্ধ মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ। মানবেন্দ্রনাথ যুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে নীতিতত্ত্বে প্রবেশ করেছেন।

প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশে আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের জৈব সংগ্রামে নব-মানবতাবাদের স্বাধীনতা (freedom) প্রত্যয়টি নিহিত। স্বাধীনতাই মানুষের অবাধ বিকাশ ও সামাজিক প্রগতির মানদণ্ড। ডারউইনের ক্রমবিবর্তনের তত্ত্ব অনুযায়ী অস্তিত্বের সংগ্রাম ও আত্মসংরক্ষণেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হয়। স্বাধীনতার আবেগ সমাজ ও সভ্যতার গতিসঞ্চারক। এই দর্শনে স্বাধীনতাকে জৈব বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দেখা হয়েছে। স্বাধীনতার আবেগ প্রতি মানুষের অন্তরে নিহিত থাকে। বন্ধনমুক্ত মানুষই কেবল নতুন ও স্বাধীন সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম। সামাজিক ও রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তি একমাত্র সংস্কারমুক্ত মানুষের উপর নির্ভর করে। মানবেন্দ্রনাথের যুক্তিবাদী নীতিতত্ত্ব তার বস্তুবাদী বিশ্বতত্ত্বের অঙ্গ। তার সকল কথার মূলে একটি সুর সদাই যেন অনুরণিত— সেটি হল আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কয়েদখানা থেকে মানুষের স্বাধীনতা। মানবতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও যুক্তিনির্ভর নীতিতত্ত্ব স্বাধীনতার তিন প্রধান স্তম্ভ।

নবমানবতাবাদ মানুষের সার্বভৌমত্বের দাবি করে। মানুষের সেই সত্তা হরণ করার কোনও অধিকার কারও নেই। মানুষ এখন এক সঙ্কটের সম্মুখীন; ব্যষ্টিকে সমষ্টিতন্ত্র গ্রাস করছে; ব্যক্তিস্বাধীনতা অস্তমিত। আর্থিক সঙ্কটমুক্তি মানবতার একটি অপরিহার্য দাবি, কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিষ্পেষণে এখন ব্যক্তিমানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

র

নবমানবতাবাদ দর্শন যে বিশ্বজনীন সে কথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। জাতীয়তাবাদ সমাজ বিবর্তনের একটি নিম্নপর্যায়— শেষ ও সর্বোন্নত পর্যায় নয়। জাতিবিদ্বেষে পুষ্ট জাতীয়তাবাদ যে প্রগতির অন্তরায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে চাই বিশ্বভ্রাতৃত্ব। এই আদর্শে পৌঁছনোর জন্য সর্বাগ্রে চাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও ভাষার ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্তি ; সংস্কারমুক্ত ব্যক্তিমানুষের মনই হল উন্নত সমাজ, বৈশ্বিক মৈত্রী ও মুক্ত বিশ্বের বনিয়াদ। নবমানবতাবাদ এই মুক্ত ও মিত্রতাবদ্ধ বৈশ্বিক সংঘের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। মানবেন্দ্রনাথ যে বিশ্বসংঘ গঠনের প্রস্তাব করেন সেখানে দেশগত সীমানার প্রশ্ন গৌণ— পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, ফ্যাসিবাদী, সাম্যবাদী প্রভৃতি সকল রাষ্ট্রই ক্রমে একদিন বিশ শতকের নবজাগ্রত মানুষের তাড়নায় লুপ্ত হয়ে যাবে।

বস্তুবাদী বিশ্বতত্ত্বের স্বাভাবিক বা যুক্তিসংগত ধারায় যেমন নবমানবতাবাদ দর্শনের উদ্ভব হয়েছে, তেমনি সংগঠিত গণতন্ত্র, বিকেন্দ্রিত রাষ্ট্রকাঠামো ও দলহীন রাজনীতি উক্ত দর্শনের সামাজিক বিষয়রূপে প্রাধান্য লাভ করেছে। রাজনীতিকে সুখবহ করে তুলতে হলে শুধু জ্ঞান-নির্ভর সত্য নয়— তাতে নৈতিকতারও সংযোগ থাকা চাই। সংগঠিত গণতন্ত্রে মানুষের ভাগ্য নিয়ে দল ও নেতাদের ছিনিমিনি খেলার অবকাশ নেই। স্থানিক গণসমিতি হবে যাবতীয় বিধিব্যবস্থার নিয়ন্তা। রাজনীতির ক্ষেত্রে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর দর্শনে যেমন সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে তৃতীয় পথস্বরূপ সংগঠিত গণতন্ত্রের পথ প্রদর্শন করেছেন, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তেমনি ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কোনওটিকেই গ্রহণ না করে তৃতীয় বিকল্পস্বরূপ সমবায় অর্থনীতির যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন।

ল

লক, জন (১৬৩২-১৭০৪) (Locke, John)

ইংরেজ দার্শনিক। সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডে বিনা রক্তপাতে গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ অনুসরণ করে। গৌরবময় এই বিপ্লবের পুরোধা ছিলেন জন লক। হুইগ পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি রাজদ্রোহী ক্রিয়াকলাপে জড়িয়ে পড়ে আত্মরক্ষার জন্য হল্যান্ডে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হন। বিপ্লবের পর তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। সাধারণ দর্শনে তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষবাদী (এমপিরিক্যাল) চিন্তার-প্রবর্তক।

ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রচিন্তায় শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে টমাস হব্‌সের পরই লকের স্থান। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে 'সিভিল গভর্নমেন্ট' (১৬৯০)-এ রাষ্ট্রচিন্তার কথা বেশি আলোচিত হয়েছে। বস্তুত এই গ্রন্থই হুইগ পার্টির নেতৃত্বে গৌরবময় বিপ্লবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। লক রাজার চার্চ-নির্দেশিত দিব্য অধিকারের বিরোধী ছিলেন; পক্ষান্তরে প্রাকৃত অধিকারের মধ্যে তিনি এক ধরনের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন। অন্যদিকে তিনি হব্‌সের পরম সার্বভৌমত্বের প্রত্যয়কেও মানতেন না। তিনি চাইতেন সীমিত সার্বভৌমত্ব। যুক্তিবাদী হিসেবে তাঁর রচনাদি সব যুক্তির ভিত্তিতে রচিত। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসি বিপ্লব তাঁর চিন্তায় প্রভাবিত হয়।

মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে লকের অভিমত ছিল যে মানুষ যুক্তিপ্রবণ, তাই সে সমাজবদ্ধ হতে চায়। হব্‌সের বিপরীত দৃষ্টিতে লক মনে করতেন যে মানুষ স্বার্থপর নয়, রেষারেষি ও কলহ করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। ভালবাসা, সহানুভূতি, সাহায্য, কোমলতা, ও অন্যের প্রতি প্রীতিপরায়ণতা তার স্বাভাবিক অনুভূতি। শান্তি ও সামঞ্জস্যের মধ্যে সে বাঁচতে চায়। এই সব চিন্তার ভিত্তিতে গঠিত মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয় হব্‌সের প্রকৃতি জগৎ থেকে ছিল ভিন্ন। সমসাময়িক পরিস্থিতি হব্‌সের মনে ইংল্যান্ডের হিংসাত্মক গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে আতঙ্কের সঞ্চার করে। পক্ষান্তরে লক

গৌরবময় বিপ্লবের পর নিয়মতান্ত্রিক পথ উদ্ভাবন করেন। হব্‌স ও লকের প্রকৃতি জগৎও ছিল ভিন্ন। লকের প্রকৃতি-জগতে ভীতি ও সংঘর্ষ বিরাজ করত না। প্রকৃতির নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ মানুষ সবাই স্বাধীন ও সমান। তাঁর দৃষ্টিতে জীবন, ধনসম্পত্তি ও স্বাধীনতা সবাই সমানভাবে উপভোগের অধিকারী।

লকের অভিমত অনুযায়ী তাঁর প্রকৃতিজগৎ ছিল : ১. প্রাক-রাজনৈতিক, কিন্তু প্রাক্-সামাজিক নয় ; ২. শান্তি বিরাজ করত, যুদ্ধ নয় ; ৩. শান্তি বিরাজ করলেও পারস্পরিক মনোভাব ও সহযোগিতার কিছু বাধাবিপত্তি ছিল ; ৪. সেইসব বাধাবিপত্তিগুলি ছিল তিন ধরনের ; যাকে বলা যায় প্রকৃতি-রাজ্যের মস্ত অভাব। যথা আইন বলে কিছু না থাকা, বিচারক থাকলেও তাঁর নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্য এবং ক্ষমতাসম্পন্ন কারও কর্তৃত্ব না থাকায় বিচারের সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করতে না পারা। এই সব অভাববোধ থেকেই চুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। গড়ে ওঠে **পুরসমাজ**।

লকের মতে আদিম সমাজে মানুষ নানারকম ভয় ও নিরন্তর বিপদসংকুল জীবন থেকে আত্মরক্ষার জন্য পুরসমাজের পত্তন করে। সেটার ভিত্তি ছিল একটা সামাজিক চুক্তি। নিজেদের মধ্যেই মানুষ সেটা করে ; সে চুক্তি ছিল সকলের সঙ্গে সকলের। সামাজিক এই চুক্তির মাধ্যমে প্রকৃতির জগৎ থেকে মানুষের উত্তরণ ঘটে। তবে প্রকৃতির জগতে মানুষ যেসব প্রাকৃত অধিকার ভোগ করত সেগুলি সবই ত্যাগ করেনি। যতটা চুক্তি করে তার ছিল সীমিত ও সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য এবং সেটা সমগ্র জনগণের সঙ্গে, একজন অথবা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের সঙ্গে নয়। লকের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্বের অধিকারী সমগ্র জনসাধারণ ; আর জনসাধারণের জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব।

লকের রচনায় দুটি চুক্তির কথা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টি অবশ্য উহ্য। প্রথমটি হল সামাজিক চুক্তি। দ্বিতীয়টি হল সমগ্র জনসমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের। তাতে প্রাকৃত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে সরকার রাষ্ট্রীয় আইনকানুন তৈরি করে। অবশ্য দ্বিতীয় চুক্তিটি প্রথমটির অধস্তন। সরকারকে লক অছি হিসেবে দেখতেন। ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে তার সম্পত্তির অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করার অধিকার সরকারের নেই। আপৎকাল ছাড়া লোকের সম্মতি না নিয়ে সরকার কর চাপাতে পারে না বলে তিনি মনে করতেন। রাজশক্তি বা সরকারের ক্ষমতাকে লক সীমাবদ্ধ রাখেন। জনগণকে তিনি বিপ্লবের অধিকার দেন। তাঁর মতে জনস্বার্থ না দেখলে সরকার পরিবর্তনের অধিকার লোকের থাকে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে লকের মনোভাব ছিল যে রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে হল জনগণ। জনস্বার্থ রক্ষাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য ; লক্ষ্য অভিমুখে রাষ্ট্র মাধ্যম মাত্র। জনসম্মতির উপর রাষ্ট্র নির্ভরশীল। জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে সেই সম্মতি ব্যক্ত হয়। তাঁর মতে রাষ্ট্র নিয়মতান্ত্রিক হওয়াই সংগত। সেখানে আইনের শাসন বজায় থাকবে।

লক রাষ্ট্র ও সরকারের পৃথকীকরণে বিশ্বাস করতেন এবং বলতেন যে সরকার পালটালেও রাষ্ট্র পালটায় না। তা ছাড়া বিপ্লব সংখ্যালঘিষ্ঠের হওয়া অনুচিত। তার পিছনে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন থাকা চাই। উদারনীতির উদ্গাতা হিসেবে তিনি রাষ্ট্রের সহনশীলতা চাইতেন ; তাতে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন অভিমত সমান মর্যাদা পায়। লোকের চরিত্রের উন্নতিসাধন অপেক্ষা তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখাটাই প্রধান

কর্তব্য। লোকের স্বার্থপরতাকে জনকল্যাণ অভিমুখে পরিবর্তন করা উচিত। জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধির উন্নয়নে মানুষের প্রবণতাকে গঠনমূলক করা চাই। তিনি মনে করতেন যে শাস্তিদান পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষকে জনকল্যাণে প্রবৃত্ত করা যায়। লকের দৃষ্টিতে পুরসমাজ টিকবে না যদি লোকে আইনের বাধাবাধকতার প্রকৃত লক্ষ্য অর্থাৎ মানুষের স্বাধীনতাকে বজায় ও বর্ধনের ভূমিকাকে উপলব্ধি না করে। তাতেই আবহমানকালের স্বৈরাচারী আচরণের অবসান ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বিকশিত হবে।

লাস্কি, হ্যারল্ড যোশেফ (১৮৯৩-১৯৫০) (Laski, Harold Joseph)

ব্রিটিশ রাষ্ট্রদার্শনিক এবং লেবার পার্টির প্রাক্তন চেয়ারম্যান। পূর্বে তিনি **ফেবিয়ান সোসাইটি**-র কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য ছিলেন। বহু বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক লাস্কি লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস এ অধ্যাপনা করতেন। যুক্তরাষ্ট্রেও তিনি কিছুকাল অধ্যাপনায় যুক্ত ছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা তিনটি পর্যায়ে বিবর্তিত হয়: এক, 'গ্রামার অব পলিটিকস' গ্রন্থ রচনার সময় পর্যন্ত তিনি ছিলেন মূলত **বহুত্ববাদ**-এ বিশ্বাসী। **পুঁজিবাদ**-এর প্রতি তখন তাঁর তীব্র অনাসক্তি ফুটে উঠত। দুই, ১৯২৫-৩১ কালপর্বে তাঁর মনে ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রী আদর্শ প্রাধান্য পায়। তিন, এই পর্যায়ে তিনি মার্কসীয় মতাদর্শের অনুরাগী হয়ে ওঠেন।

লিবারেশন টাইগারস অভ্ তামিল ইলাম (LTTE)

শ্রীলঙ্কাবাসী তামিলদের গেরিলা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নামই এল টি টি ই। এই সংগঠনটির উদ্দেশ্য হল শ্রীলঙ্কায় একটি ভিন্ন তামিলরাজ্য স্থাপন। এই উদ্দেশ্য সফল করতে ১৯৮৩ সাল থেকে এল. টি. টি. ই. শ্রীলঙ্কায় সংখ্যাগুরু সিংহলীদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ করে আসছেন।

লেনিন, ভ্লাদিমির ইলিচ (ভি আই উলিয়ানভ) (১৮৭০-১৯২৪) (Lenin, V.I)

বলশেভিক বিপ্লবের অধিনায়ক, সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের অগ্রগণ্য নেতা ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্রষ্টা। মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তায় লেনিনের অবদান মার্কস ও এঙ্গেলসের সমস্থানীয়। মার্কসের রচনাবলি অধ্যয়ন ও বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে তিনি আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। বার দুয়েক সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। ১৯০০ খ্রি তিনি রাশিয়া ছেড়ে চলে যান। ১৯০৩ খ্রি লন্ডনে রাশিয়ান সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টি বলশেভিক ও মেনশেভিক নামে যে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায় তার পিছনে ছিল তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্ব ও কৌশল। দেশে ফিরে তিনি বলশেভিকদের ইম্পিরিয়াল ডুমায় অংশগ্রহণে প্রবৃত্ত করেন (১৯০৫-৭)। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের অন্তিম পর্যায় হিসাবে বিশ্লেষণ করেন এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবসানকল্পে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের

জন্য সর্বহারা শ্রেণীর কাছে আবেদন জানান। ১৯১৭ খ্রি ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়ায় বিপ্লব শুরু হয়ে যাবার পর জার্মান সরকার রাশিয়ার যুদ্ধচেষ্টাকে ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে লেনিনকে রাশিয়ায় প্রেরণ করে। ওই বছরেই নভেম্বর মাসে লেনিনের নেতৃত্বে কেরেনস্কি সরকারের পতন ঘটে। তিনি কাউন্সিল অব পিপলস কমিসার্সের চেয়ারম্যান হয়ে সর্বহারার একনায়কত্ব কায়েম করেন। গৃহযুদ্ধে (১৯১৮-২০) বিপ্লব সফল হবার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইতিমধ্যে তাঁর নেতৃত্বে নয়োয় তৃতীয় আন্তর্জাতিক হিসেবে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল (কমিন্টার্ন) গঠিত হয়েছিল (১৯১৯)। ১৯২১ খ্রি সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি নিউ ইকনমিক পলিসির (নেপ) সূচনা করেন। মার্কসীয় মতাদর্শে তাঁর বহুবিধ অবদানের মধ্যে বিপ্লবের কৌশল ও রণনীতি তত্ত্ব, পার্টি সংগঠন, শোধনবাদের সমালোচনা ও সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র বিশ্লেষণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। লেনিনের প্রবল ব্যক্তিত্ব, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও নেতৃত্বদানের অনুপম ক্ষমতা বলশেভিক তথা রুশ বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করে। তাঁর এই বাস্তব সাফল্যের ফলে লেনিনের চিন্তাভাবনা ও তত্ত্বসমূহ সারা বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলনে গ্রহণযোগ্য হয়।

দ্র. লেনিনবাদ ; মার্কসবাদ-লেনিনবাদ

লেনিনবাদ (Leninism)

স্তালিনের দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী 'সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে লেনিনবাদই হল মার্কসবাদ।' মার্কসের ভাবভূমিতেই লেনিনবাদ মূলত প্রতিষ্ঠিত। মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনার বাস্তব রূপায়ণের কথা সবিস্তারে বলে যাননি। বৈপ্লবিক আন্দোলন পরিচালনার কর্মকৌশল এবং পরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর প্রশাসনিক কার্যনির্বাহ সূত্রে রাশিয়ান সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা ভি. আই. লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। সেইসব বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে তিনি মার্কসবাদের যেসব তত্ত্বগত সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন সেটাই লেনিনবাদ, তথা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নামে অভিহিত। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বের বিভিন্ন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের এটাই হল রাজনৈতিক মতাদর্শ। এই মতাদর্শ ১৮৯৯ খ্রি থেকে বিবর্তিত হয়। 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' নামক বইতে (১৯০২) লেনিনবাদের পার্টি সংক্রান্ত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। লেনিনের তত্ত্বগুলি তথা মার্কসবাদে তাঁর অবদানের একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র হল :

১. বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ বিজ্ঞানসম্মত একটি মতবাদের উপর অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই।

২. পৃথিবীর সর্বত্রই শ্রমিকশ্রেণী তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব অর্থাৎ সমাজ-বিপ্লব সাধনের উপযোগী চেতনা অর্জন না করে ট্রেড ইউনিয়নের দাবিদাওয়াতেই তুষ্ট থাকে। ফলে আপসেই তার পরিসমাপ্তি ঘটে, বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হয় না। কাজেই সর্বহারার সমাজচেতনা বাইরে থেকে সঞ্চার করবেন আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় মননশীল ব্যক্তিরা।

৩. শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অসংগঠিত উদ্দাম বিপ্লবের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। চাই

কঠোরভাবে কেন্দ্রীভূত, গোপন, শৃঙ্খলাবদ্ধ পূর্ণ সময়ের এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত কুশলী শ্রমিক, কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত সর্বহারা নেতৃত্বের পুরোধাস্বরূপ পার্টি। পার্টি হল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী মতবাদের ধারক ও বাহক। সেই পার্টির দ্বারা জনগণ বিপ্লবের পূর্বে ও পরে পরিচালিত হবে।

৪. বিশ্ববিপ্লব সাধনের জন্য বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মপন্থা ও কৌশলের ক্ষেত্রে লেনিনের তত্ত্ব প্রযুক্ত হয়ে থাকে। কমিন্টার্নের সদস্যপদ গ্রহণের ২১ দফা শর্তাবলীর অন্যতম **গণতান্ত্রিক কেন্দ্রানুগতা** পার্টির সংগঠন সম্পর্কে গৃহীত হয়।

৫. অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রশাসন কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে তাঁর ধারণার সঙ্গে যুক্ত সর্বহারার একনায়কত্ব সম্পর্কে লেনিনের অভিমত।

৬. লেনিনের পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব, যেটা তাঁর মতে পুঁজিবাদের শেষ পর্যায় এবং নতুন বৈপ্লবিক পরিস্থিতির কার্যকারণসূত্রে যুক্ত।

৭. **দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী** দর্শনের লেনিনকৃত সম্প্রসারণ।

লেনিনের উল্লিখিত তত্ত্বগুলির মধ্যে প্রথমটি স্পষ্টতই মার্কসের মতাদর্শ থেকে উৎসারিত। বাকিগুলি সম্পর্কে রুশবিপ্লবের আগে ও পরে রাশিয়ার ভিতরে ও বাইরে সোসাল ডেমোক্রাটদের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল। অবশ্য মার্কসীয় তত্ত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল না থাকলেও লেনিনের পার্টি সংগঠন ও তার গুপ্ত কার্যপ্রণালীর তত্ত্বের সঙ্গে রাশিয়ার জাতীয় বৈপ্লবিক ধারা সঙ্গতিশীল বলে অনেকে মনে করেন।

মার্কস ও এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের বিকশিত রূপ হল লেনিনবাদ। শ্রেণীহীন সমাজ অভিমুখী মানুষ ও সমাজের সম্পর্ক তথা প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশ ও বিবর্তনের এটি একটি বিজ্ঞানবিশেষ। সংক্ষেপে মার্কসীয় মতাদর্শে লেনিনের যে অবদানসমূহ ওই আদর্শকে পরিপুষ্ট করেছে তার স্বীকৃতি হল লেনিনবাদ।

লোক আদালত (Lok Adalat)

বিচারব্যবস্থা মন্থরগতিসম্পন্ন, ব্যয়সাপেক্ষ এবং অনেক সময় অনিষ্টকর বলে দরিদ্র মানুষ তার সুফল সচরাচর পায় না। সে কারণে ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে ন্যায়বিচারের সুযোগসুবিধা নিপীড়িতদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া রাজ্যসরকারের কর্তব্য। এই নিরিখে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজ্যের আইনমন্ত্রিদের এক সম্মেলনে বিষয়টি সবিস্তারে আলোচিত হয়। ফলে লোকসভায় The Legal Services Authorities Act, 1987 নামে একটি আইন গৃহীত হয়। তাতে বলা হয়েছে যে সমাজের দুর্বল অংশকে নিখরচায় আইনসংক্রান্ত সাহায্যপ্রদানের জন্য সেবকপদে কর্তৃপক্ষ গঠনের উদ্দেশ্যে রাজ্য ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন রাজ্য সরকার লোক আদালত গঠন করতে পারেন। তদনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯২ খ্রি আইনগত বিবাদ-বিরোধ সালিশির মাধ্যমে মীমাংসার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের লিগ্যাল এড্ সার্ভিসেস নামক আইনজীবীদের একটি সংস্থার উদ্যোগে কলকাতা হাইকোর্টে লোক আদালত গঠিত হয়েছে। এটির মূল উদ্দেশ্য হল বিবদমান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ সঞ্চিত মামলামোকদ্দমার আপসে নিষ্পত্তি।

বিবাদের অন্তর্গত বিষয়গত পরিধিতে থাকবে দাম্পত্য বিরোধ, মোটর দুর্ঘটনা এবং ইন্সিওরেন্স কোম্পানি ও ব্যাঙ্কের সঙ্গে মামলা। আদালতের বৈশিষ্ট্য হল বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষকেই সমন জারি না করে অনুরোধ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হবে, কারও উপর কোনও চাপ সৃষ্টি করা হবে না। অবশ্য বিবদমান পক্ষ সমূহকে সালিশির মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় সম্মতি জানাতে হবে। শুনানি হয় ত্রিস্তরে বিন্যস্ত তিনটি চেম্বারে। প্রথম চেম্বারে সাধারণ ব্যক্তিরা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চেম্বারে জজেরা বিচার করবেন। হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, জেলা জজ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনরা বিচারপতির কাজ করবেন। লোক আদালত কোনও আইনানুগ ও সমান্তরাল বিচারব্যবস্থা নয়, আদালতের বাইরে বিবদমান সকলকে অনুরোধ ও পরামর্শের মাধ্যমে লোকের সহযোগিতা ও স্বেচ্ছায় মামলা মিটিয়ে ফেলার একটি প্রয়াসমাত্র। লোক আদালতের গঠনকালে আইনজীবীদের কাজের শিক্ষণস্বরূপ কয়েকটি ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা হয়েছিল, যেখানে অভিজ্ঞ বিচারকেরা আগামী দিনের আইনব্যবসায়ীদের সমাজতত্ত্ব, আইন, মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন। উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি এবং আরও কয়েকটি জেলা সদরে আদালতের কাজ অনুরূপভাবে শুরু হয়েছে।

লোকবাদ (Populism)

নানা ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা সাধারণ অভিধা ; সেগুলির মধ্যে মিল এইটুকু যে সবাই জনগণের কাছে একটা আবেদন রাখে, যেটা বড় ব্যবসায়ী বা স্বার্থগোষ্ঠীর পরিবর্তে সাধারণ ব্যক্তিমানুষের কাছে তুলে ধরা হয় এই বিশ্বাসে যে লোকের অনুভূতি ও উদ্যম সঠিক কাজে লাগলে সেটা নেতাদের পথের দিশারী হবে। লোকবাদীদের কাছে জনগণই রাজনৈতিক নিষ্ঠার উৎস, যেটাকে দূরবর্তী, শক্তিশালী ও অভিসন্ধিগ্রস্ত শত্রুরা বিনষ্ট করে দেয়। সাধারণ লোকের বিরুদ্ধে কল্পিত ষড়যন্ত্রের বিশ্বাসসৃষ্টি ছাড়াও লোকবাদের লক্ষণ হল উদারনৈতিক দলের মধ্যপন্থী নেতাদের কাছ থেকে সমর্থন অর্জন, রাজনীতিতে উগ্র ভাষা ও ব্যবহারের প্রচলন, সমকালীন প্রধান রাজনৈতিক ধারাকে ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে একটি উগ্র কর্মসূচি গ্রহণ যেটা বিপ্লবে পরিণত হতে পারে এবং রাজনীতির আকাশে ধূমকেতুর মতো উদিত হওয়া।

প্রাকবিপ্লব রাশিয়াতে '**নারদনিক**' নামে লোকবাদীদের যে আন্দোলন ছিল তাতে তাঁরা মনে করতেন যে সমাজের পরিবর্তনে জনগণের এক বিশেষ ভূমিকা থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৯১ খ্রি 'পপুলিস্ট পার্টি' নামে যে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয় সেটি মনে করত যে সেখানে ছোট বেসরকারি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির ঐতিহ্য রক্ষায় এবং স্বয়ম্ভর চাষাবাদে যুক্ত ব্যক্তিরা সরকারের কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করে। ইংল্যান্ডে কোলরিজ, কার্লাইল প্রমুখ রক্ষণশীল ভাবুকরা তাঁদের মূল আদর্শবাদের প্রতি আসক্ত অথচ নির্বাক জনগণের মধ্যে নিজেদের প্রেরণার বীজ সন্ধান করতেন।

শ

শক্তিসাম্য (Balance of Power)

একটি রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রগোষ্ঠী থাকলে শক্তিসাম্য বিরাজ করে। শক্তিসাম্য অর্থাৎ ভারসাম্য (equilibrium) পরিদৃষ্ট হলে একটি রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী অন্য রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীকে সহজে আক্রমণ করে না। একে অপরের উপর তার অভীপ্সা কিংবা মতবাদ চাপিয়ে দিতেও সাহসী হয় না। শক্তিসাম্যের নীতি আঞ্চলিক ভিত্তিতে অথবা সারা বিশ্বের প্রেক্ষাপটে অনুসৃত হতে পারে। শক্তিসাম্যের তাগিদে একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধির আশঙ্কায় নিজের সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শক্তিসাম্য বজায় থাকলে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে যুদ্ধের পথ পরিহার করতে বাধ্য করা যায়, ছোট রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পারে এবং কোনও শক্তিশালী রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী সারা বিশ্বে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয় না। তবে কার্যত অনেক সময় উক্ত সুফলগুলি ফলেনি। সেজন্য স্থায়ী শান্তিস্থাপনে বিশ্বাসী অনেকে শক্তিসাম্য নীতির বিরোধী। তাঁদের মতে এই প্রথা ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে বাঁচিয়ে রাখে, সামরিক প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রগুলি লিপ্ত থাকে এবং যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন শক্তিসাম্যের পরিবর্তে শান্তিকামী সংগঠিত রাষ্ট্রসমবায় স্থাপনের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। ওই মতের সমর্থক জওহরলাল নেহরু শক্তিসাম্য নীতির পথ অনুসরণ না করে নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির পথ বেছে নেন।

শান্তি (Peace)

শান্তি শব্দটির বহুবিধ সংজ্ঞা হল সামাজিক সমন্বয় ও ঐকতান, মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধন, ব্যক্তিজীবনে সন্তোষ এবং এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের যুদ্ধহীন সহাবস্থান। দর্শন ও আন্তর্জাতিক আইনের দিক থেকে শব্দটিকে নানাভাবে দেখা হয়।

ইমানুয়েল কান্ট তাঁর 'চিরস্থায়ী শান্তি' তত্ত্বে বিভিন্ন বিবদমান রাষ্ট্রের সংবিধান পরিবর্তন করে পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিবর্তনের সুপারিশ করেন। সেজন্য তিনি চাইতেন বিভিন্ন স্বাধীন দেশ নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো যার আইনকানুন হবে জনমুখী। তিনি নীতিশাস্ত্রে যে 'ক্যাটেগোরিক্যাল ইমপ্যারেটিভ' অর্থাৎ শর্তহীন নিয়ামকের বিধান প্রণয়ন করেন, তদনুযায়ী আইনকানুন সর্বজনীন অনুজ্ঞামূলক যুক্তির ভিত্তিতে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেটা যুক্তিবাদী মানুষ মাত্রেই মেনে নেবে এবং সেটা হবে যথার্থ স্বাধীনতার অভিব্যক্তি। তিনি মনে করতেন সর্বসম্মত আইনের মাধ্যমে মানুষ স্বাধীনতার আস্বাদ পেলে বিবাদ-বিসংবাদের অবসান হবে। সেই নিরিখে মনে করা হয় যে বিশ্বে অধুনা যেসব আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, যেমন মানবাধিকার সনদ, সেগুলি অংশত কান্টের প্রভাবের ফল। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ায় নবগঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিবেশী পুঁজিবাদী দেশের যুদ্ধবিরতিসূত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রত্যয়টি এঙ্গেল্‌স উদ্ভাবন করেন। সে সময় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই মনোভাব বিরাজ করত যে বিবদমান দেশসমূহের সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ও একই ধরনের শোষণহীন সমাজ প্রবর্তিত হলে তবেই চিরস্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

আন্তর্জাতিক আইনের নিরিখে শান্তির প্রকৃতি এই তিনটির যে কোনও একটি : ১. যুদ্ধের অবসান, ২. রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ বা যুদ্ধের পরিস্থিতি না থাকা, ৩. তৃতীয় কোনও পক্ষের প্রভাবাধীনে যুদ্ধের অবসান অথবা সহাবস্থান। আইনের দিক থেকে যুদ্ধের অবসান ঘটে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে। শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে বৈধভাবে পরোক্ষে অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ বিরুদ্ধ-শক্তির সাহায্যে বিপ্লব ঘটিয়ে প্রকারান্তরে যুদ্ধ চালানো যায়। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর সরাসরি যুদ্ধ না করে ঠাণ্ডা লড়াই চলে দীর্ঘকাল।

শান্তিবাদ (Pacifism)

যুদ্ধ ও সামরিক ক্রিয়াকলাপের অবসানকল্পে ব্যক্তিগত ও যৌথ উদ্যম। লক্ষ্য সকলেরই স্থায়ী ও পরিপূর্ণ শান্তি হলেও, পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকে। অনেকেই বিশ্বশান্তি চান, কিন্তু তাঁরা শোষিত পদানত জাতির ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিপ্লবের বিরোধী নন। আবার কেউ কেউ আক্রমণাত্মক না হলেও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের সমর্থক। কেউ যুদ্ধ অপছন্দ করলেও পুলিশি বিধিব্যবস্থার পক্ষপাতী। কিন্তু একদল আছেন যাঁরা কোনও রকম দমনমূলক আচরণ ও আইন বলবৎ করার জন্য শক্তি প্রয়োগ অপছন্দ করেন। নির্বিশেষ শান্তি ও শান্তিবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের সঙ্গে যুদ্ধবিরোধী আন্তর্জাতিক আন্দোলনকারীদের মধ্যে পার্থক্য আছে। মার্কসীয় রাজনীতির দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর কোনও স্বার্থ থাকে না। ধর্মীয় দৃষ্টিতে চালিত শান্তিবাদীরা যাবতীয় প্রাণহননের বিরুদ্ধে। বৌদ্ধ, জৈন এবং অনেক খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় হিংসার সম্পূর্ণ বিরোধী। মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও বাণীও অনেকাংশে শান্তিবাদী আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করেছে। মানবতাবাদীরাও শান্তিবাদের পরিপোষক। শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারের প্রচলন সুবিদিত। উনিশ ও বিশ শতকে বহু শান্তিবাদী সংস্থা ও আন্দোলন গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কায়

রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যার সমাধানে যুদ্ধ এখন একটি বহুনিন্দিত মাধ্যম। শান্তিবাদী অনেকে মনে করেন যে ভৌগোলিক সীমানা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ। সীমানা মুছে দিয়ে যথার্থ বিশ্বজনীন বিশ্বরাষ্ট্র গড়ে উঠলে যুদ্ধ-বিগ্রহের স্থায়ী সমাধান হবে। তখনও অবশ্য জাতি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে গৃহযুদ্ধ দেখা দেবে। সেটাও শান্তির অন্তরায়। সংকীর্ণ স্বার্থের সংঘাত নিবারণ একমাত্র মানুষের যুক্তিশীল প্রবৃত্তি সমূহের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সম্ভব।

দ্র. যুদ্ধ

শাস্তি (Sanction)

১. আইনের প্রত্যয়। আইন অমান্য করার শাস্তি বা তা পালন করার পুরস্কার। দৃষ্টবাদী আইনতত্ত্বে সার্বভৌম কর্তৃক প্রবর্তিত যাবতীয় আইনে শাস্তির ব্যবস্থা থাকে। কারণ আইনের কার্যকারিতা শাস্তির উপর বর্তায়।

২. আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী কোনও দেশ পূর্বতন সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ বা বর্তমান রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক অনুসৃত কোনও নীতি অমান্য করলে, বিশেষ করে যুদ্ধে লিপ্ত হলে, সেই দেশকে অর্থনৈতিক বয়কট করা হয়; যাতে সেই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আশ্রয় না নিয়ে তার মতিগতি পরিবর্তনে বাধা করা যায়। পদ্ধতিটি অনেকাংশে শান্তিপূর্ণ অবরোধের (pacific blockade) সঙ্গে তুলনীয়, যেটা শক্তিশালী রাষ্ট্র তদপেক্ষা কম শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে। তাতে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ ব্যতিরেকে নৌবন্দরসহ পোতাবরোধ করা হয়, এবং শত্রুতা নেই যেসব রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের জাহাজও আটক করা যায়। ইউরোপে উনিশ শতকে এরূপ কিছু পোতাবরোধ ঘটে। পোতাবরোধ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি আন্তর্জাতিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।

শিবসেনা (Shiv Sena)

ভারতীয় রাজনীতিতে বিশ শতকের ষাটের দশকে আঞ্চলিক নানা ধরনের দাবির ভিত্তিতে সেনা শব্দটি যুক্ত করে বিভিন্ন রাজ্যে কয়েকটি জঙ্গি বাহিনী গঠিত হয়েছিল। এক একটি রাজনৈতিক দল ওইসব আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করে। তাদের মধ্যে মহারাষ্ট্রে শিবসেনা একটি দল হিসেবে বিপুল শক্তি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছে। মহারাষ্ট্রীয়দের স্বার্থে বাল ঠাকরে নামক এক কার্টুন শিল্পী ১৯৬৮ খ্রি ২৪ এপ্রিল শিবাজির জন্মদিনে দলটি গঠন করেন। মারাঠিদের কর্মসংস্থান, ভাষার উন্নতি, ভূখণ্ডের বিস্তার ইত্যাদি দাবিতে প্রতিষ্ঠিত এই দলের প্রেরণার উৎস হলেন শিবাজি, দলটি মূলত মুসলিমবিরোধী ও কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী। বোম্বাই শহরে কর্মসন্ধানী অ-মারাঠি, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতীয়দের উপর শিবসেনা সবিশেষ খড়্গহস্ত।

বোম্বাই থেকে দলটি ক্রমে পুনে, নাসিক, বরোদা প্রভৃতি শহরে সম্প্রসারিত হয়েছে। এস এ ডাঙ্গে পরিচালিত কমিউনিস্টদের প্রভাব থেকে শ্রমিকদের রক্ষার জন্য শিবসেনা ফ্যাসিবাদী কায়দায় বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন কার্যালয় আক্রমণ করে (১৯৬৮)। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের মধ্যে সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে মহাজন কমিটির

রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর শিবসেনা প্রবল বিক্ষোভ শুরু করে। মহারাষ্ট্রীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থা হিসেবে শিবসেনা নিজেদের দাবি করে। ১৯৭৭ খ্রি শিবসেনা দলে ভাঙন ধরে ; প্রতি-শিবসেনা নামক বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন ভাই সিংরে। ইতিপূর্বে ১৯৬৮ খ্রি বোম্বাই পুরসভার বেশির ভাগ আসন শিবসেনা অধিকার করে এবং মেয়র পদে দলের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। দক্ষিণ ভারতীয়দের বিরুদ্ধে নিরন্তর আন্দোলনসূত্রে রাজাগোপালচারী শিবসেনাকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবিরোধী সংগঠন হিসাবে অভিহিত করেছিলেন।

গোড়ার দিকে শিবসেনা শাসকদলের কোনো কোনও নেতা ও মন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। ক্রমে কংগ্রেসের সঙ্গে শিবসেনার সম্পর্ক তিক্ত হয়ে পড়ে। কিছুকাল বাল ঠাকড়ে কারারুদ্ধ থাকেন। ক্রমে শিবসেনা মহারাষ্ট্রীয়দের স্বার্থরক্ষার আদর্শের অতিরিক্ত একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে। বাল ঠাকরে গণতন্ত্রের নিন্দা ও সদাশয় একনায়কতন্ত্রের জয়গান করেন ; হিটলার তাঁর আদর্শ। কলকারখানা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিবসেনার স্থানীয় লোকাধিকার সমিতি নামে একটি সংগঠন মহারাষ্ট্রীয়দের স্বার্থ সংরক্ষণে সক্রিয় থাকে।

আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বি জে পি দলের সঙ্গে মোর্চা তৈরি করে শিবসেনা বিপুল সংখ্যায় রাজ্য বিধানসভায় আসন লাভ করে, লোকসভাতেও কয়েকটি আসন পায়। নব্বুইয়ের দশকে বোম্বাই পুরসভা শিবসেনার হস্তগত হয়। দলে দ্বিতীয়বার ভাঙন ধরে। হিন্দুত্বের আদর্শে এবং জঙ্গি কর্মসূচির ভিত্তিতে বোম্বাই শহরে শিবসেনার ২২০টি শাখা চালিত হয়। দলের দৈনিক মুখপত্র 'সামনা' খোলাখুলি মুসলিমবিরোধী ক্রিয়াকলাপে ইন্ধন যোগায় এবং ১৯৯৩ খ্রি শিবসেনা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রত্যক্ষ অংশ নেয়।

শিবসৈনিক নামে দলীয় কর্মীরা ব্যবসায়ী মহলে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করে। বহু মধ্যবিত্ত এলাকার বাসিন্দারা সন্ত্রস্ত হয়ে এবং নিরাপত্তার তাগিদে শিবসেনা দলের পৃষ্ঠপোষকতা করে। ১৯৯২ খ্রি থেকেই বিধানসভা, পুরসভা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আসন ভাগাভাগী নিয়ে শিবসেনার সঙ্গে বি জে পি-র সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছিল। ১৯৯৪ খ্রি সেটা চরমে পৌঁছয়, বিশেষ করে গোয়ার সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে। শেষাবধি অবশ্য একটা আপসে নিষ্পত্তি হয়। ১৯৯৫ খ্রি মহারাষ্ট্রে উভয় দল নির্বাচনী মোর্চা গঠন করে এবং সাধারণ নির্বাচনে ওই রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। শিবসেনার নেতা মনোহর যোশীর মুখ্যমন্ত্রিত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর থেকেই পাকিস্তানি ও বাংলাদেশী মুসলমানদের অনুপ্রবেশ, বোম্বাইতে অভিবাসনে পারমিট প্রথা, বোম্বাই শহরের মুম্বই নামকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বাল ঠাকরে তথা শিবসেনার বক্তব্য দেশব্যাপী অসন্তোষ ও বিতর্কের সৃষ্টি করে। কৌশল হিসাবে সরকারে একত্রে থাকলেও বি জে পি দল শিবসেনার প্রাদেশিক সংকীর্ণ মতাদর্শ স্বীকার করে না।

শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution)

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারায় আবিষ্কৃত নানাধরনের যন্ত্র ও প্রযুক্তিবিদ্যা আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইংল্যান্ডের শিল্পোৎপাদন পদ্ধতিতে প্রয়োগের ফলে সমগ্র অর্থনীতির বিপুল সমৃদ্ধি যে যন্ত্রযুগের সূচনা করে তাকেই শিল্পবিপ্লব অভিধা দেওয়া হয়। শিল্পবিপ্লব ক্রমে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। **ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, জন স্টুয়ার্ট মিল, কার্ল মার্কস** প্রমুখের রচনায় এই অভিধার উল্লেখ দেখা যায়। শিল্পবিপ্লবের প্রধান অবদান হল মানুষের উৎপাদন ক্ষমতার উপর প্রকৃতির প্রভুত্ব থেকে মুক্তি। প্রাক-শিল্পবিপ্লব কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অপরিণত অবস্থায় মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল সীমিত। সে কারণে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রায়শই দেখা দিত। শিল্পবিপ্লব প্রকৃতির বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করে। শিল্পে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে খনিজ দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভারীশিল্পের প্রবর্তন, বস্ত্রশিল্পের যান্ত্রিকীকরণের ফলে উৎপাদনবৃদ্ধি ও মানুষের কর্মশক্তির অপচয় নিবারণ, রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে রেল ও জলপথে পরিবহণ ব্যবস্থার দ্রুত বিস্তার আর্থনীতিক উন্নয়নে নতুন দিগন্তের পথ রচনা করে। পূর্বতন কৃষিনির্ভর সমাজের রূপান্তর, সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ও নগরায়ণের প্রসার ঘটে। শিল্পবিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ও আধিপত্য এবং সেইসঙ্গে পুঁজিবাদের শ্রীবৃদ্ধি সূচিত হয়। ভূমি, বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সঙ্গে শিল্পজাত উৎপাদন পুঁজির অন্যতম প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

শিল্পবিপ্লবের অভিঘাত আঠারো শতকের শেষ দশকে ফরাসি বিপ্লবের উপর গিয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে উভয় বিপ্লবের উপাদানে নানা ধরনের রাষ্ট্রতত্ত্বের উদ্ভব হয়। শিল্পবিপ্লব যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, জীবনধারণের মান ও রীতিনীতির পরিবর্তন, ধর্ম ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে নতুন মূল্যবোধের সঞ্চার এবং রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তা ও রাষ্ট্রীয় ভাঙাগড়ার কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। নতুন অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস ও **শ্রেণীসংগ্রামের** ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। পুঁজিবাদী ও শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধনের সঙ্গে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীও সবিশেষ দানা বাঁধে। ব্যক্তিগত মালিকানা প্রাধান্য পায়, যেসব দেশে শিল্পোন্নয়ন বিলম্বে ঘটে সেসব দেশে রাষ্ট্রের ভূমিকা বড় আকারে দেখা দেয়।

দ্র. আলোকিত শতাব্দী

শুক্রনীতি (Sukraniti)

রাজনীতিবিষয়ক প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থ। গ্রন্থটির রচয়িতা যে কোন শুক্র সেটা সঠিক জানা যায় না ; অনুমান করা হয় যে তিনি ছিলেন পুরাণে কথিত দৈত্যগুরু ভৃগুর পুত্র। গ্রন্থটির রচনাকাল সম্পর্কেও মতদ্বৈধ আছে। গ্রন্থটিতে এমন বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে যার ফলে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে গ্রন্থটির রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় উনিশ শতক অবধি বিভিন্ন সময় নিরূপণ করতে দেখা যায়। মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতিতে এবং কৌটিল্য, কামন্দক প্রমুখের রচনায় শুক্রের উল্লেখ আছে। তাই মনে হয় যে পরবর্তী বিভিন্ন কালের বিষয়াদি প্রক্ষিপ্ত হবার দরুন যথার্থই প্রাচীন এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে বিভ্রান্তি ঘটেছে।

শুক্রনীতি গ্রন্থে মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রথমটিতে রাজপুত্রদের দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য, দ্বিতীয়টিতে যুবরাজের, যিনি রাজ্যের উত্তরাধিকারী, তাঁর এবং রাজন্যবর্গের কর্তব্য, তৃতীয়টিতে রাজা ও তাঁর পারিষদবর্গের পালনীয় সাধারণ নৈতিকতার বিধিনিষেধ, চতুর্থটিতে সাতটি অংশে রাজার পাত্রমিত্র, রাজকীয় ধনসম্পত্তি, কলা ও বিজ্ঞান, প্রথা ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, রাজার কর্তব্য ও দায়দায়িত্ব, দুর্গ ও সৈন্যসামন্ত এবং পঞ্চম, যেটি হল পরিশিষ্ট ও বিবিধ বিষয়ক পরিচ্ছেদ, তাতে শাস্ত্রে নির্ধারিত নৈতিকতার রীতিনীতি যেগুলি রাজ্যের উল্লিখিত সপ্ত অঙ্গের অর্থাৎ প্রজাগণের কল্যাণের বিষয়, সেগুলি আলোচিত হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ এই গ্রন্থটির দুটি অংশ আছে। রাজনৈতিক প্রথম অংশে রাজসভা, আইন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। অরাজনৈতিক দ্বিতীয় অংশে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, আচারবিচার, নৈতিকতা, শিক্ষা, অর্থনীতি ইত্যাদির আলোচনা স্থান পেয়েছে। রাজনৈতিক বিষয়াদির সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গ্রন্থটির তাৎপর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। শুক্র দেশের শ্রুতি-স্মৃতির ধারা ও ধর্মশাস্ত্র অনুসরণ করেন।

প্লাতো যেমন রাজাকে একজন দার্শনিক হিসেবে কল্পনা করেন শুক্রও তেমনি শুধুমাত্র উত্তরাধিকারের পরিবর্তে রাজার উদারনৈতিক, মননশীল ও গণতন্ত্রী মনোভাবের গুণাবলি থাকার নির্দেশ দেন। শুক্রের দৃষ্টিতে রাজনীতি ও নৈতিকতা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। নৈতিকতার উপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাজা ও প্রজাদের মধ্য দিয়ে সেই নৈতিকতা মূর্ত হয়ে উঠুক, প্রজাদের প্রতি রাজার নানাবিধ কর্তব্য তিনি যেমন নির্দেশ করেছেন, তেমনি রাজার প্রতিও প্রজাদের আচরণ ও মনোভাব কী হওয়া উচিত সে কথাও সবিস্তারে বলেছেন। রাজা নীতি থেকে বিচ্যুত হলে এবং সদ্‌গুণের অধিকারী না হলে প্রজারা তাঁকে ত্যাগ করবে। শুক্র দুষ্ট রাজা সম্পর্কে জনমত সৃষ্টির কথা বলেছেন। রাজাকে তাঁর অসৎ পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে না পারলে মন্ত্রীদেরও রাজাকে অপসারণ করা উচিত।

তিনি রাজার যাবতীয় সিদ্ধান্ত একা না নিয়ে পাত্রমিত্র ও মন্ত্রিসভার পরামর্শে গণতন্ত্রী পদ্ধতিতে গ্রহণ করার কথা বলেন। তিনি স্বেচ্ছাচারিতার নিন্দা করেন। শুক্রের মতে জনগণই শক্তির উৎস, শাসক হলেন জনসেবক। তাঁর মতে বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদের ভিত্তি হল অর্জিত নানাবিধ গুণ, জন্মগত নয়। রাজকার্যে ও সৈন্যবাহিনীতে যে-কোনও জাতির মানুষ তাঁর গুণের জন্য নিযুক্ত হতে পারেন। শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের ন্যায্য ও সমান হারে পারিশ্রমিক প্রদানের কথা তিনি বলেন। তিনি মনে করতেন যে সময়ের পরিবর্তনে প্রয়োজন অনুসারে আইন ও বিধিনিষেধ সংশোধন করা উচিত।

দ্র. কামন্দকীয় নীতিসার; অর্থশাস্ত্র; রাজধর্ম; মনুস্মৃতি।

শোধনবাদ (Revisionism)

মার্কসবাদের পরিশোধিত ও পরিবর্তিত রূপকে শোধনবাদ বলা হয়। মূলত লেনিন কর্তৃক অনুসৃত ধারা থেকে পৃথকীকরণ, বিশেষ করে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে অহিংস

পথে উত্তরণচিন্তা ও প্রয়াস শোধনবাদ নামে অভিহিত।

লেনিনের সমসময়ে প্রধান শোধনবাদী তাত্ত্বিক ছিলেন এড়ুয়ার্ড বার্নস্টিন ও কার্ল কৌতস্কি। কৌতস্কি মনে করতেন যে সংসদীয় প্রথায় সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তিত হবার ফলে সমাজতন্ত্রী বিপ্লব বিনা রক্তপাত ও বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকে সম্ভব। স্বয়ং মার্কসের প্রকৃত শিক্ষা থেকে যে বিচ্যুত হচ্ছেন সে কথা কৌতস্কি মানতেন না। অন্যদিকে বার্নস্টিন যুক্তি দেখান যে সহিংস পথে না গিয়ে, ইতিহাসকে নিজ গতিপথ অনুসরণ করতে দেওয়া উচিত, তাতে জয়ী হবার পক্ষে অনিবার্যতা সম্পর্কে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি বেশি আস্থা দেখানো হবে।

লেনিন ও ত্রৎস্কি উভয়েই শোধনবাদীদের ধনতন্ত্রের এজেন্ট বলে মনে করতেন। লেনিন বলতেন যে শোধনবাদ হল শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করার বুর্জোয়া কায়দা।

সম্প্রতি রুশদেশে স্তালিনকে বর্জন করার পরে শোধনবাদ একটি নতুন রূপ পেয়েছে। স্তালিনবাদ বাতিল করার ফলে সেই ফাঁক ভরাট করার প্রয়াস হিসেবে বিভিন্ন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মার্কসবাদকে নানাভাবে পরিবর্তন, পরিশোধন ও আধুনিকীকরণের চেষ্টা করেছেন। সবাই না হলেও অনেকেই এখন কৌতস্কি ও বার্নস্টিনের অহিংস পন্থায় সায় দিচ্ছেন।

দ্র. নবমার্কসবাদ

শ্রমিকদল (Labour Party)

শ্রমিক আন্দোলনের রাজনৈতিক অঙ্গ। যুক্তরাজ্যে ১৮৯৩ খ্রি লিবার‍্যাল দলের সঙ্গে ওই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের একটি বন্ধুত্বমূলক যৌথ সম্পর্ক থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টির উদ্ভব হয়। পরে ১৯০০ খ্রি লেবার পার্টি নামে আনুষ্ঠানিকভাবে দলটি গঠিত হয়। তাতে যুক্তরাজ্যের সমস্ত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী, ট্রেড ইউনিয়ন, ফেবিয়ান সোসাইটি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি এবং বামপন্থী সমাজতন্ত্রী গণতান্ত্রিক ফেডারেশন যুক্ত হয়। তার অনুকরণে বা আদর্শে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরে কমনওয়েলথভুক্ত দেশ এবং নরওয়ে, ইজরেল প্রভৃতি রাষ্ট্রে লেবার পার্টি গঠিত হয়। শ্রমিক দলগুলি সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি ও সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। তাদের কর্মসূচি মূলত নিয়মতান্ত্রিক, যুক্তরাজ্যে তারা রাজতন্ত্রের বিরোধী নয়। যুক্তরাজ্যে লেবার পার্টির জনপ্রিয়তা দুই বিশ্বমহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে বৃদ্ধি পায়। শহরাঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণী বিপুল সমর্থন অর্জন করে, শিল্পাঞ্চল সমূহে দল নির্বাচনে বেশি ভোট পায়। কুড়ির দশকে পার্টি দুবার (১৯২৪, ১৯২৯) মন্ত্রিসভা গঠন করে। ১৯৪৫ খ্রি বিরাট ভোটাধিক্যে দল ক্ষমতায় আসার পর নানাবিধ সমাজতন্ত্রী কর্মসূচি রূপায়ণ করে। তার মধ্যে ছিল বিস্তর ভারীশিল্প ও জনপ্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয়করণ, জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প গ্রহণ, গৃহনির্মাণ কর্মসূচি এবং অসাম্য দূরীকরণের জন্য শুল্ক ও কর-ব্যবস্থার সংস্কার ইত্যাদি। এরপর দল ১৯৬৪ এবং ১৯৭৪ খ্রি পুনরায় ক্ষমতায় আসে। মূলত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতির ফলে সমাজতন্ত্রী বিধিব্যবস্থারও অবসান সূচিত হয়। তাতে দলের ভিতরে চরমপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যান্যদের বিরোধ দেখা দেয়; ১৯৭৯ খ্রি নির্বাচনে দল পরাজিত হলে দলের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন করা

হয়, যাতে দলের সংসদীয় সদস্য সমিতির উপর নির্বাচন কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ থাকে। ফলে দলের নরমপন্থী গোষ্ঠীর অনেকে নির্বাচনে অসুবিধা ঘটার আশঙ্কায় বামঘেঁষা (সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রী) নতুন একটি দল গঠন করেন। শ্রমিক দলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন স্তরে সদস্য ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের দলের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়া। তাতে দলের মোট আয় যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি একটি শক্তিশালী ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ধারণকারী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে যারা দলের বার্ষিক সম্মেলনে ভোট নিয়ন্ত্রণ ও নীতি স্থির করে।

শ্রমিকসংঘবাদ (Syndicalism)

ট্রেড ইউনিয়নিজম কথাটির ফরাসি প্রতিশব্দ le syndicalisme থেকে ইংরেজিতে সিন্ডিক্যালিজম শব্দটি উৎপন্ন। এটি এক ধরনের সমাজতন্ত্র, যার লক্ষ্য হল শিল্পবাণিজ্যের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের পরিবর্তে শ্রমিকদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা। অ্যানার্কিস্টদের (নৈরাজ্যবাদী) সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় এই মতাদর্শ অনেক সময়ে অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিস্ট নামেও অভিহিত। ১৯০৬ খ্রি আমিয়েন্স শহরে ফরাসি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সম্মেলনে ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের প্রতিনিধি এম. লাতাপি সমাজতন্ত্র ও নৈরাজ্যবাদের মতাদর্শ ছেড়ে তৃতীয় বিকল্প হিসেবে ফরাসি এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। কার্যত শব্দটি কেবল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে আবদ্ধ নয়, তার পরিসর আরও বৃহত্তর।

সিন্ডিক্যালিজম বলতে শ্রমিক ফেডারেশনের সচিব ফার্নান্দ পেলুতিয়ের কর্তৃক প্রচারিত কিছু তত্ত্ব বোঝাত। সিন্ডিক্যালিস্ট মতবাদ কোনও সুস্পষ্ট রূপ নেয়নি ; তত্ত্ব অপেক্ষা কাজের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপিত হত।

সুসংবদ্ধ তাত্ত্বিক রূপ পরিগ্রহ না করলেও সিন্ডিক্যালিস্ট মতাদর্শে নিম্নলিখিত বিশ্বাসগুলি অল্পবিস্তর প্রাধান্য লাভ করে :

১. সুসংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ ধর্মঘটি সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে। নেতৃবর্গের কর্মকুশলতার ফলে রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না এবং রাষ্ট্র অন্তর্হিত (wither) হবে। রাষ্ট্র পীড়নের যন্ত্র, তার সাহায্যে বুর্জোয়া আইন তৈরি হয়।

২. ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো, যেটা ক্রীতদাস ব্যবস্থার চেয়েও খারাপ, সেটা ভেঙে ফেলার জন্য জঙ্গি শ্রমিক সংগ্রাম ও ধর্মঘটের উপযোগী পুরাকথার (myth) সাহায্য গ্রহণ করে।

৩. প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বিশ্বাস, যাতে ধর্মঘট ও অন্তর্ঘাত হবে প্রধান অস্ত্র।

৪. উৎপাদন ও ভোক্তাদের সমবায় সংগঠনকে সমর্থন।

৫. কারও কারও মতে শ্রমিকদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আছে—যেটা বুর্জোয়াদের সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র ও উন্নত।

৬. অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক সমাজগঠনে একটা সমন্বয়কারী কেন্দ্রীয় সংস্থা (ফেডারেশন) থাকবে।

৭. জাতীয়তাবাদ ও এমন কী দেশভক্তির বর্জন ; তার পরিবর্তে বৈশ্বিক ও

আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস।

কর্মীদের সক্রিয় উদ্যম, জঙ্গি মনোভঙ্গি, নাশকতা এবং শিল্পসংগঠন ও সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ছিল অগ্রগণ্য। সিন্ডিক্যালিস্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও স্থায়ী সম্পর্ক না থাকলেও ইতালিতে ঝর্জেস সর্ল এই মতাদর্শের সাহায্যে সংখ্যালঘু ও সংগঠিত কর্মীদের কাছে বৈপ্লবিক সাধারণ ধর্মঘটের কল্পরূপ দেখিয়ে উদ্দীপিত করেন। সর্ল-এর চিন্তাভাবনা ইতালির বামপন্থীদের প্রভাবিত করে। তাদের মধ্যে ছিলেন বেনিতো মুসোলিনি, যিনি ফ্যাসিবাদী হয়ে যান। ব্রিটিশ লেবার পার্টিতে প্রতিষ্ঠাকালে তার কিছুটা প্রভাব পড়ে।

১৯১৪ খ্রি পূর্ববিধি বিভিন্ন দেশের শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলিতে এই মতাদর্শ প্রভাব বিস্তার করে; বিশেষ করে যেসব দেশের রাজনৈতিক ধারায় নৈরাজ্যবাদী মতাদর্শ প্রবহমান ছিল। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্পেন, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে সিন্ডিক্যালিস্টদের প্রভাব দেখা যেত। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে, অনেকে কমিউনিস্ট হয়ে যায়। কালক্রমে উত্তর ইউরোপে সিন্ডিক্যালিজম-এর অর্থ হয়ে দাঁড়ায় সমাজতন্ত্রী কোনও দলের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা। কারণ তাদের দৃষ্টিতে ওইসব দল আমলাতান্ত্রিক, সংসদীয় রাজনীতিতে আবিল এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে আপসকামী। ধনতন্ত্রকে নাশ করতে হলে শ্রমিকশ্রেণীকে বরং শিল্পবাণিজ্যের সংগ্রামের ক্ষেত্রে মন দিতে হবে। এইসব যুক্তির সঙ্গে সিন্ডিক্যালিস্টরা অনেক সময় কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করত।

সিন্ডিক্যালিস্টদের সংকীর্ণ অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য **লেনিন** তাঁদের সমালোচনা করতেন। বস্তুত **বলশেভিজমের** সঙ্গে তাঁদের কোনও মিল ছিল না। সিন্ডিক্যালিস্টদের অনেকেই প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় লেনিনবাদী দলবিরোধী কার্যকলাপ ছেড়ে বলশেভিক বিপ্লবের দিকে ঝোঁকেন; যাঁরা বলশেভিকদের সঙ্গে **কমিন্টার্ন** রাজনীতিতে সায় দিতে পারেননি তাঁরা মস্কো-অনুসৃত শ্রমিক-রাষ্ট্র ও লেনিনবাদী দলনীতি নাকচ করেন। ভঙ্গ সিন্ডিক্যালিস্ট আন্দোলন ও সংগঠনের মধ্যে অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ১৯২২ খ্রি বিভিন্ন দেশের সিন্ডিক্যালিস্ট সংগঠন সিন্ডিকালিস্ট ইন্টারন্যাশনালিস্টের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু কুড়ির দশকে শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমান্বয়ে পর্যুদস্ত হবার ফলে স্পেন এবং দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়া সিন্ডিক্যালিস্টরা কমিউনিস্ট ও সোসালিস্টদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেছিয়ে পড়ে। ইদানীং কোনও কোনও দেশে শিল্প সংস্থায় শ্রমিকদের আধিপত্য ও বামপন্থী রাজনীতিতে পার্টি সদস্যদের বিকেন্দ্রিত আধিপত্য দেখা দিলেও সিন্ডিক্যালিজম কার্যত এক বর্জিত মতাদর্শে পর্যবসিত হয়েছে।

শ্রেণী (Class)

জনসমাজে লোকের জন্মস্বত্ব, সুবিধাগত অসমতা ও অবস্থানের ভিত্তিতে বিভক্ত জনসমষ্টি, যেমন জাতি, গোষ্ঠী, পদ, সম্পত্তি, মানমর্যাদা, খেতাব। সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে দেশ অনুযায়ী লোকের আচরণ, কথাবার্তা, ভদ্রতা, শিক্ষা ও বিত্তগত

শ্রেণীবিচার কিংবা ক্ষমতা, কর্তৃত্ব প্রভৃতি দ্বারা শ্রেণী নির্ণীত হয়। তবে ব্যাপকার্থে শ্রেণী বলতে এখন অর্থনৈতিক শ্রেণী বোঝায়, যার গুরুত্ব মার্কসীয় মতাদর্শে প্রবল। উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সমাজে বিভিন্ন মানুষ নানান জীবিকায় যুক্ত থাকে। বিভিন্ন জনসমষ্টির মধ্যে জীবিকার সূত্রে পার্থক্য বিরাজ করে। এই জীবিকাগত পার্থক্য থেকে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ গড়ে ওঠে। শ্রেণী বলতে এক একটি বৃহৎ জনসমষ্টি বোঝায়, যাদের পার্থক্য ইতিহাস-নির্দিষ্ট সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় তাদের উৎপাদন সম্পর্ক থেকে নির্ধারিত হয়, এবং সংশ্লিষ্ট আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় একটি জনসমষ্টি বা শ্রেণী অপর একটি শ্রেণীকে নিজেদের অবস্থানগত সুবিধার জোরে শোষণ করে (লেনিন)। তাই পরস্পরবিরোধী শ্রেণীভিত্তিক সমাজে শ্রেণীসংঘর্ষ অনিবার্য। সেজন্য মার্কসীয় দৃষ্টিতে সামন্ততন্ত্রী সমাজের মুখ্য যেসব শ্রেণী থাকে সেগুলি হল দাস ও দাস মালিক, সম্ভ্রান্ত ও অন্ত্যজ, ভূস্বামী ও কৃষক; এবং পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি এবং সর্বহারা বা শ্রমিকশ্রেণী। এ ছাড়া পুঁজিবাদী সমাজে থাকে ক্ষুদে অর্থাৎ পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী যাদের মধ্যে পড়ে কৃষক, মধ্যবিত্ত, কারিগর ইত্যাদি।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অসাম্যের পিছনে একদিকে যেমন থাকে অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষম্য, অন্যদিকে পদমর্যাদা (ওয়েবার)। সামাজিক মান অনুযায়ী কোনও শ্রেণী ওঠানামা করে না, অর্থাৎ সেগুলির অবস্থান অনড়। এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে শ্রেণীর অন্তর্গত কোনও ব্যক্তি তার নিজস্ব স্থান পরিবর্তনে সক্ষম।

দ্র. শ্রেণী সংগ্রাম

শ্রেণী সংগ্রাম (Class Struggle)

বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত থেকে নিরন্তর শ্রেণীসংগ্রাম উৎসারিত হয়। ওইসব স্বার্থের কোনও সমন্বয় সম্ভব নয়। শ্রেণী সংগ্রাম হল ইতিহাসের চালিকাশক্তি যেটা সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, আইন, নৈতিকতা, ধর্ম ইত্যাদির আমূল পরিবর্তনের পিছনে কাজ করে। মার্কসীয় দৃষ্টিতে শ্রেণী সংগ্রাম একটি অচল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভাঙনের মুখে দাঁড় করিয়ে বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে, যার ফলে সমগ্র সমাজব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে উদীয়মান শ্রেণীর আনুকূল্য করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সামন্ততন্ত্রী ও বিশেষ করে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীসংগ্রাম একটি বাস্তব অবস্থা বটে, কিন্তু অনেক সময়ে সেটা শ্রেণীচেতনার অভাবে প্রত্যক্ষগোচর হয় না; কারণ ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া শ্রেণী প্রচলিত ব্যবস্থাকে চাতুরির সাহায্যে গ্রহণীয় করিয়ে নেয়। পুঁজিবাদী ও সর্বহারা শ্রেণী ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে স্থিতাবস্থা বজায় রাখে; কিন্তু প্রকৃত সংগ্রামী শ্রেণী-চেতনা না থাকায় তার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সহায়তার প্রয়োজন ঘটে।

পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদন সম্পর্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংগ্রামে বুর্জোয়া ও সর্বহারা, এই দুটির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শ্রেণীস্বার্থ সদাই পরস্পরবিরোধী। পুঁজিবাদী বিভিন্ন দেশে সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী বেতন বৃদ্ধি, কাজের সময় হ্রাস, সবেতন ছুটি,

সংসদে প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদির দাবি আদায়ে সমর্থ হয়েছে। শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্রী বিপ্লব সাধিত হবে।

দ্র. ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ; কমিউনিজম ; কমিউনিস্ট ইস্তাহার ; মার্কসবাদ।

শ্বেতপত্র (White Papers)

সংসদে সরকার বিষয়বিশেষে যে মুদ্রিত বিবৃতি উপস্থাপন করে। ব্রিটেনে শ্বেতপত্রকে পার্লামেন্টারি পেপারস বলা হয় যা তিন ধরনের হতে পারে : ১. কম্যান্ড পেপারস ; ২. বিল-সংক্রান্ত বিবৃতি, এবং ৩. হাউস অব কমনস কিংবা হাউস অব লর্ডস-এর নির্দেশক্রমে তাদের কারও কোনও কমিটির প্রকাশিত বিবৃতি। প্রথমটি, অর্থাৎ কম্যান্ড পেপারস রাজা অথবা রানির নির্দেশে ক্রমিক সংখ্যানুসারে প্রকাশিত হয়। তাতে সরকার-আনীত কোনও বিল সম্পর্কে সরকারি পন্থা ও নীতির উপর বিবৃতি থাকে ; এ ছাড়া কমিটি ও কমিশনের প্রতিবেদন 'ব্লু বুক' নামে কিংবা আলোচনার জন্য নানাবিধ সরকারি পরিকল্পনা 'গ্রীন পেপারস' নামে উপস্থাপিত হয়। ভারতে শ্বেতপত্রের মাধ্যমে কোনও বিল অথবা বিষয়ের উপর সরকার-অনুসৃত পন্থা ও ব্যাখ্যাসহ অন্যান্য তথ্যাদি সংসদে উপন্যস্ত হয়।

স

সংখ্যালঘু (Minority)

আভিধানিক অর্থে কোনও কিছুর সংখ্যাল্প অংশ এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে মোট জনসংখ্যার দিক থেকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, ভোটদাতা ইত্যাদির ভিত্তিতে ক্ষুদ্রতর অংশ সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচিত হয়। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সংখ্যালঘুর সংজ্ঞা হল দৈহিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় লক্ষণ অনুযায়ী কোনও সংখ্যাল্প গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিভেদের আচরণ এবং সেইসব গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মনে সমাজে নিজেদের যৌথ বৈষম্যের শিকার হিসেবে হীনমন্যতা বোধ এবং সেই কারণে তাদের মধ্যে আত্মস্বাতন্ত্র্যের চেতনা ও বিচ্ছিন্নতার মতিগতি।

সংখ্যালঘুরা একটি শ্রেণীও হতে পারে, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অথবা নৃতাত্ত্বিক জাতি বিচারে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে সংখ্যালঘুরা স্বীকৃতি পায় যখন ১. তারা স্বতন্ত্র সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে এবং কালক্রমে সেটা সংখ্যাগরিষ্ঠরা মেনেও নেয় ; ২. তারা নিজেদের স্বতন্ত্র সামাজিক একরূপতা (identity) পৃথক আচরণের মধ্য দিয়ে লোকচক্ষে তুলে ধরে। বস্তুত একটি অপরের পরিপূরক। এই সামাজিক বিভাজনের মূলে থাকে ভাষা, ধর্ম, জনজাতি, অনুন্নত আদিবাসী অথবা অনুরূপ কোনও উপাদান। বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র জাতিগত আবেগে।

নানাবিষয়ে স্বতন্ত্র আইনানুগ ও সাংবিধানিক অধিকার প্রদানের দাবি এবং জাতীয় সমন্বয়ের অন্তরায় হিসেবে সংখ্যালঘু সমস্যা বৃদ্ধি পায়। ভারতে তপসিলিভুক্ত এবং অন্যান্য ধরনের সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের নানারকম বিধিব্যবস্থা এবং সে সবের পক্ষাপক্ষে বহুবিধ বিতর্ক আছে। স্বাধীনতার পর ভারতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থে একটি স্থায়ী কমিশন গঠিত হয়। সংখ্যালঘুদের স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াসও প্রবল হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সংখ্যালঘুদের সমস্যা এখন জটিল।

সংখ্যালঘুদের পাড়া (Ghetto)

ইতালীয় ভাষায় বরগেটো বা গেটো কথাটির বাংলা পরিভাষা। অর্থ হল একটি শহরের ক্ষুদ্র অংশবিশেষ। প্রাচীন কালে গেটো শব্দে বোঝাত ইতালিতে কোনও শহরের একাংশ যেখানে ইহুদিরা বসবাস করত। বর্তমানে অর্থ হল শহরের নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল যেখানকার অধিবাসীরা হল সংখ্যালঘু বিশেষ কোনও জনগোষ্ঠী বা জাতির মানুষ, যারা স্বেচ্ছায় অথবা অর্থনৈতিক চাপে কিংবা বাধ্য হয়ে নির্দিষ্ট কোনও এক স্থানে একত্রে বাস করে। স্পষ্টতই পারিপার্শ্বিক অন্যান্য অঞ্চল থেকে সংরক্ষিত অঞ্চলের পরিবেশ আশানুরূপ বাসোপযোগী নয় ; এবং গেটো এলাকার বাসিন্দারা সাধারণত সংখ্যালঘু এবং অন্যান্যদের তুলনায় সুযোগসুবিধা সমান হারে পায় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য এই জাতীয় গেটো এলাকা আছে।

সংবিধান (Constitution)

আইনানুগ কোনও সংস্থা বা সংগঠনের লক্ষ্য, কাঠামো, গঠনপ্রণালী ও কার্যনির্বাহ সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি। একটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তেমনি কিছু মৌলিক রাজনৈতিক নিয়মাবলি থাকে যার ভিত্তিতে সেখানকার নাগরিকদের অধিকার, আইনসভা, কার্যনির্বাহী কর্তৃত্ব অর্থাৎ সরকার ও বিচারব্যবস্থার গঠন প্রণালী, ক্ষমতা, প্রশাসনিক কর্মপদ্ধতি ইত্যাদির নির্বাহব্যবস্থা নিরূপিত হয়। সংবিধান লিখিত অথবা অলিখিত হতে পারে কিংবা সুস্পষ্ট আইনকানুন, নয়তো প্রথাগত রীতিনীতির উপর নির্ভর করে। সংবিধানের প্রকৃতি প্রজাতান্ত্রিক, রাজতন্ত্রী অথবা গণতান্ত্রিক হওয়া সম্ভব। সংবিধানের বাহ্যিক রূপ ও প্রকৃতি নিয়ে নানারকম মতদ্বৈধতা আছে ; অর্থাৎ লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের সুবিধা ও অসুবিধা, সংবিধানের পরিপূর্ণ রূপায়ণের বাস্তব সম্ভাব্যতা, নাগরিকদের মৌল অধিকার, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ইত্যাদি সংস্থানের প্রশ্নে মতান্তর বিস্তর। লিখিত সংবিধানের সুবিধা অনস্বীকার্য, কিন্তু তার ব্যাখ্যা ও ভাষ্য নিয়ে নানান আইনগত অভিমত দেখা দেয়। সংবিধানের সার্থকতা হল তার যথার্থ রূপায়ণে। রূপায়ণের প্রধান দায়িত্ব সরকারের হলেও জাগ্রত জনচেতনা ও আদালতের নিরপেক্ষ ভূমিকাও থাকা দরকার।

দ্র. সাংবিধানিক আইন

সংবিধি (Statute)

আইনসভা কর্তৃক লিখিতভাবে নথিভুক্ত আইন। সংবিধি ও প্রচলিত আইন সমপ্রকৃতির নয়। তবে প্রচলিত আইনের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও প্রয়োজনসূত্রে সংবিধি প্রবেশ করে এবং সংবিধির বিস্তার ঘটে। সংবিধি লিখিত হয়ে থাকে। তবে অ্যাংলো-স্যাক্সন আইনে কিছু কিছু কাব্যের আকারে অথবা মৌখিকভাবে প্রবহমান রীতিনীতি লিপিবদ্ধ থাকে ; এবং প্রয়োজনে সেগুলি পঠিত অথবা আবৃত্তি করা হয়। তবে বিরোধের সময়ে ইংল্যান্ডে মামলায় প্রচলিত কিংবা অলিখিত আইন অপেক্ষা লিখিত আইন বেশি প্রাধান্য পায়।

দ্র. আইন ; প্রাকৃত আইন ; সাংবিধানিক আইন।

সংসদীয় তদন্তকারী (Ombudsman)

সরকারি প্রশাসনে দুর্নীতি ও নানাবিধ দুর্বলতা নিবারণের জন্য আইনসভা একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন যিনি নাগরিকদের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। যুক্তরাজ্যে এই পদটি পার্লামেন্টারি কমিশনার নামে অভিহিত। ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে এই সংসদীয় তদন্তকারীর স্থায়ী পদ আছে। যুক্তরাজ্যে কোনও সংসদীয় সদস্যের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করাই নিয়ম। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে কারও মাধ্যমে যেতে হয় না। সংসদীয় তদন্তকারী বিচারক নন, অভিযোগ তদন্তের পর সংসদের কাছে সুপারিশ করতে পারেন। তদন্তকালে কোনও মন্ত্রীর দলিলপত্র দেখার অধিকার তাঁর থাকে, দুর্নীতি ও অপশাসনের কথা একটি বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ ছাড়াও সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।

ভারতে লোকপাল ও লোক আয়ুক্ত নামে সংস্থা সৃষ্টির প্রস্তাব ওঠে। ভারতে অবশ্য অপশাসন দূরীকরণের জন্য দুর্নীতি দমন বিভাগ, কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো, ভিজিল্যান্স কমিশন প্রভৃতি সংস্থা অনেকাংশে সংসদীয় তদন্তকারীর দায়িত্ব পালন করে। ১৯৬৬ খ্রি প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি লোকপাল আইনের যে সুপারিশ করেন তদনুযায়ী একটি বিল লোকসভায় উত্থাপিত হয়। কিন্তু ১৯৮৮ খ্রি সরকার সেটি প্রত্যাহার করে নেন। ১৯৯৫ খ্রি বিলটি পুনরায় সংশোধিত আকারে উত্থাপিত হয়।

সংসদীয় সরকার (Parliamentary form of Government)

নির্বাহী অর্থাৎ শাসন কর্তৃত্বের (executive) সঙ্গে আইন প্রণয়ন (legislative) বিভাগের সম্পর্কের প্রশ্নে গণতান্ত্রিক সরকারগুলির আকৃতি দু রকমের হয়ে থাকে। একটিকে বলা হয় সংসদীয় বা **মন্ত্রিপরিষদ** দ্বারা চালিত সরকার ; সংসদীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ তার যাবতীয় কাজের জন্য দায়ী থাকে আইনসভার কাছে, এবং আইন সভারও ক্ষমতা থাকে অনাস্থা ভোটে মন্ত্রিপরিষদকে গদিচ্যুত করার। অপরদিকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক চালিত সরকারের ক্ষেত্রে নির্বাহী কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সরকার আইনসভার কাছে দায়ী থাকে না।

সংসদীয় ব্যবস্থাকে যুক্তরাজ্যের ওয়েস্টমিনস্টার মডেলের অনুসারী বা পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা বলেও উল্লেখ করা হয়। তার প্রধান লক্ষণ হল যে তাতে একজন নামেমাত্র খেতাবসর্বস্ব নির্বাহী প্রধান (titular executive head) থাকেন যিনি শাসনবিভাগের প্রকৃত প্রধান (real executive head) থেকে ভিন্ন। প্রথম জন একজন সাংবিধানিক প্রধান (constitutional head); তাঁকে মন্ত্রিসভার পরামর্শ ও উপদেশ অনুসারে কাজ করতে হয়। তিনি রাষ্ট্রের প্রধান এবং সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক বিশেষ, দেশকে তিনি সরাসরি শাসন করেন না। শাসনকর্মের দায়িত্ব থাকে মন্ত্রিপরিষদের উপর ন্যস্ত, যার নেতৃত্বে থাকেন পূর্বোক্ত দ্বিতীয় জন অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিপরিষদ সহ প্রধানকে সংসদের কাছে সরকারি কাজকর্মের জন্য দায়ী থাকতে হয় ; এ ব্যাপারে রানি বা রাষ্ট্রপতিকে থাকতে হয় না। সংসদীয় এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক চালিত সরকারে সংসদের নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিপরিষদ

গঠনের অধিকারী হয়। একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলে বহুদলীয় শাসনব্যবস্থায় একাধিক দল কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। সংসদে মন্ত্রিপরিষদের পক্ষে কাজ চালানো কোনও কারণে সম্ভব না হলে মন্ত্রিপরিষদের এমন ক্ষমতা থাকে যার সাহায্যে প্রধানমন্ত্রী খেতাবসর্বস্ব নির্বাহী প্রধানকে দিয়ে সংসদ ভেঙে দিতে পারেন।

সংসদীয় সরকারের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদের সকলের সংসদের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক। সংসদীয় ব্যবস্থায় একটি বিরোধী দলের অস্তিত্ব স্বীকৃতি পায়। আইভর জেনিংস-এর দৃষ্টিতে সংসদে বিরোধী দল নিছক সহনশীল বিরক্তিকর কিছু একটা নয়, বরং শাসনতন্ত্রের একটি প্রত্যক্ষ ও অপরিহার্য অঙ্গ। সংসদীয় ব্যবস্থায় নির্বাহীবিভাগ ও আইনবিভাগ সংযুক্ত থাকে বলে উভয়ের মধ্যে সমন্বয়, আইন প্রণয়নে নির্বাহী বিভাগের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নেতৃত্ব, বিতর্কের মাধ্যমে মন্ত্রিসভা ও বিরোধী পক্ষের প্রত্যক্ষ সংযোগ, জনমত নির্ণয় ইত্যাদি কাজ সহজ হয়। জনমতের চাপে সংসদে একটি মন্ত্রিপরিষদের পরিবর্তে অন্য মন্ত্রী বা মন্ত্রিপরিষদ নিয়োগ করা চলে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থা দলীয় রাজনীতির উপর নির্ভর করে। দলীয় ব্যবস্থা পরিশীলিত হলে সংসদীয় ব্যবস্থাও উন্নত হয় ; তাতে সরকার যত কর্মকুশল হয় এবং বিরোধীপক্ষ যত সংযমী ও সৃজনশক্তিশীল হয়, দলীয় রাজনীতির প্রবণতাও সুশোভন হয় ; লোকের রাজনৈতিক চেতনা উন্নতির সুযোগ পায়।

সংযোগ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Cybernetics)

গ্রিক কুবেরনিস থেকে উৎপন্ন ইংরেজি সাইবারনেটিকস কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ। অর্থ হল মাঝি বা গাড়ির চালক। কোনও জৈব বা যান্ত্রিক ব্যবস্থা (system) যার পিছনে একটি কৃত্রিম বুদ্ধি কাজ করে, তার বিভিন্ন অংশের ক্রিয়াকর্ম পরস্পরের উপর যে মিথস্ক্রিয়া (interaction) সম্পন্ন করে সেই সম্পর্কে অনুশীলন হল এই বিদ্যার লক্ষ্য।

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধোত্তরকালে উদ্ভূত এই প্রত্যয়টি অনেক সময়ে system theory নামে অভিহিত। বলা হয় যে, সকল ব্যবস্থা বা সিসটেম বাইরের প্রভাব থেকে অল্পবিস্তর মুক্ত থাকে। কাজেই কোনও ব্যবস্থাকে বুঝতে হলে তার বিভিন্ন অংশের মিথস্ক্রিয়ায় সংঘটিত কার্যপ্রণালী অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই তত্ত্বেরই মূল প্রত্যয় হল প্রেরক-পদ্ধতি (feedback process)। তার অর্থ হল যে উৎপন্ন বস্তুর (output) কিছুটা অংশ নতুন উপাদান (input) হিসেবে ফিরে এসে মোট উপাদানকে বর্ধিত করে, নচেৎ হ্রাস করে। প্রেরক-পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত হল নিত্যব্যবহৃত রেফ্রিজারেটর মেশিন, যার অভ্যন্তরে তাপস্থাপক যন্ত্র সমগ্র মেশিনের তাপকে নির্দিষ্ট মানে ওঠানামা করে স্থির রাখে তাপের তারতম্য ঘটলে। উক্ত গতিনিয়ন্ত্রক অংশ একসময় যন্ত্রের গতি হ্রাস করে।

মানুষের সহজাত প্রবণতায় অনুরূপ অভীষ্ট আচরণ লক্ষিত হয়, কারণ মানুষ অনুমান করতে সক্ষম যে তার আচরণের ফলাফল কী হতে পারে এবং সেই কারণে পরবর্তী আচরণ পরিবর্তন করে। মানসিক প্রক্রিয়ায় সংযোগ-নিয়ন্ত্রণের এই তত্ত্ব প্রযুক্ত হয়। রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও প্রত্যয়টি প্রচলন লাভ করেছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উপর্যুপরি বৃদ্ধি ঘটলে পুঁজিবাদের সংকট দেখা দেয়। 'সিসটেম' তথা

সংযোগ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থাকেও ব্যাখ্যা করা যায় বলে অনেকে মনে করেন। সন্দিহান যাঁরা তাদের দৃষ্টিতে তত্ত্বটি সাবেকি জৈব প্রত্যয়ের নতুন রূপ মাত্র।

সংস্কৃতিকরণ (Acculturation)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত রাষ্ট্রনৈতিক প্রত্যয়, যার অর্থ হল প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে কোনও ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী অপরের সাংস্কৃতিক মানসিকতা আয়ত্ত করে। সংস্কৃতিকরণের প্রক্রিয়া একই দিকে প্রবাহিত হয়; তার ফলে একটি সংস্কৃতির মধ্যে অন্য একটি সঞ্চারিত হয়। পরস্পরের অভিমুখে উভয় ধারা প্রবাহিত হয় না, গড়ে ওঠে না কোনও মিশ্র সংস্কৃতি। প্রত্যয়টির ক্রমবর্ধিষ্ণু রাজনৈতিক তাৎপর্য হল যে যুদ্ধ, পরিবহণ, সংযোগ, ভিন্ন দেশে অভিবাসন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সব দেশের সামনেই যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে প্রভাববিস্তারী অন্যান্য দেশের সঙ্গে সীমানা খোলা থাকবে কি না। সে-প্রশ্নের সমাধানের সঙ্গে জড়িত থাকে যে, বিদেশি সংস্কৃতি কী পরিমাণে দেশকে প্রভাবিত করবে এবং সেটা সমীচীন কি না।

সত্যাগ্রহ (Satyagraha)

মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম এই অঙ্গ আধ্যাত্মিক সত্যের প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। গান্ধীর দৃষ্টিতে ঈশ্বর হলেন পরম সত্যের আধার। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে সংগ্রামের জন্য যিনি সত্যের পূজারী তাঁর চাই নিঃস্বার্থ মন ও অদম্য সংকল্প।

যাবতীয় শোষণ, নিপীড়ন ও অবিচারের বিরুদ্ধে পবিত্র আত্মশক্তির প্রয়োগই হল সত্যাগ্রহ। বিশ্বাস ও সহনীয়তা হল আত্মশক্তির উপাদান। মৌন বীরের সক্রিয় অহিংস প্রতিরোধ সহজেই হৃদয়কে স্পর্শ করে। বিপক্ষকে বিপদগ্রস্ত করার পরিবর্তে নিষ্কলুষ শক্তিতে অভিভূত করাই তার বৈশিষ্ট্য। সত্যাগ্রহের পথ তথা হৃদয়ের পরিবর্তনের কঠিন পদ্ধতি সরকার ও সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সমানভাবে প্রযোজ্য।

গান্ধী মনে করতেন যে সত্যাগ্রহ হল মানুষের একটি জন্মগত অধিকার। এটা মানুষের একটি পবিত্র অধিকারই শুধু নয়, পবিত্র এক কর্তব্যও বটে। সরকার যদি জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত না করে এবং দুর্নীতি ও সন্ত্রাসকে মদত জোগায় তা হলে তাকে অমান্য করাই উচিত। যিনি নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাঁকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হবে।

গান্ধীর সত্যাগ্রহ মতাদর্শের প্রয়োগক্ষেত্র ছিল পরিবার থেকে রাষ্ট্র অবধি বিস্তৃত। তিনি বলেন যে অহিংসার বর্ণমালা পারিবারিক বিদ্যালয় থেকে জাতীয় ও এমন কী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্প্রসারিত। তিনি মনে করতেন যে যুদ্ধে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়।

সত্যাগ্রহের বিভিন্ন কার্যপ্রণালী তিনি তুলে ধরেন। যেমন অনশন। স্বেচ্ছায় দেশান্তরি হওয়াও একটি প্রণালী; অত্যাচার ঘটলে মানুষের কুপিত হওয়া স্বাভাবিক,

তখন স্থান ত্যাগ করাই সঙ্গত ; গান্ধী হিজরাত প্রথাকে সমর্থন করতেন। তবে তিনি পরিত্যক্ত স্থানে পোড়ামাটি নীতি গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। আবার সত্য ও অহিংসার উপর মুক্তি আন্দোলনের জন্য আত্মগোপন করে থাকাকেও তিনি পছন্দ করতেন না। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিও সত্যাগ্রহের কাম্য নয়। সর্বপ্রথমেই রাষ্ট্রের নিয়মকানুনের প্রতি সত্যাগ্রহীর স্বভাবত আনুগত্য থাকা চাই। তবেই একজন সত্যাগ্রহী উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে সমাজব্যবস্থার কোনটা ভাল ও ন্যায়সঙ্গত, আর কোনটা খারাপ ও হানিকর। তখনই তিনি বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ কোনও বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণ-আইন অমান্য আন্দোলন করার অধিকারী হবেন। গান্ধী মূলত আইন মান্য করার পক্ষপাতী ছিলেন। রাষ্ট্রের সামাজিক ও নৈতিক বিধিব্যবস্থাসমূহ মান্য করার মধ্য দিয়ে আইন অমান্যের অধিকার জন্মায়। আইন অমান্যের সময় সত্যাগ্রহীকে দেখতে হবে যে সমাজের কাঠামো যেন ভেঙে না পড়ে।

গান্ধীজি সত্যাগ্রহীর নৈতিক আচরণ দৃঢ় রীতিনীতি দ্বারা বেঁধে দেন। সত্যাগ্রহীর ঈশ্বরে অবিচল বিশ্বাস থাকা চাই। নইলে সে কর্তৃপক্ষের অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হিংসা ও নিপীড়নক্ষমতা ধীরচিত্তে সহ্য করতে পারবে না। সত্যাগ্রহীর ধনলিপ্সা ও যশোলিপ্সা থাকলে চলবে না। তাঁকে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের স্থানীয় নেতাদের নির্দেশ মান্য করতে হবে। হঠযোগের মতো শারীরিক ব্যায়ামের সাহায্যে শরীরকে শক্তিসম্পন্ন করে রাখতে হবে। তাঁকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, তাঁর থাকা চাই দৃঢ় সংকল্প ও নির্ভীক চরিত্র, চাই ধৈর্য ও একাগ্রতা এবং রাগ ও মানসিক উত্তাপবশত তিনি যেন কর্তব্য থেকে বিচ্যুত না হন। ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ করা অবিধেয়। সত্যাগ্রহের প্রণালী হল ভালবাসা ; মানুষের হৃদয়ের কাছে থাকে তার আবেদন, অত্যাচারীর মনে ভীতিসঞ্চার নয়, সত্যাগ্রহের ভিত্তি হল ব্যক্তিগত শুদ্ধিকরণ। শুদ্ধতার উপর গুরুত্ব আরোপ গান্ধীর রাষ্ট্রচিন্তার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। গান্ধীর দৃষ্টিতে শুভ লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে মাধ্যম হওয়া চাই শুভ। গান্ধীর দৃষ্টিতে সত্যাগ্রহীর মননশীলতা অপেক্ষা কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসসঞ্জাত উদার হৃদয় থাকাটাই বেশি প্রয়োজন।

সত্যাগ্রহের বিভিন্ন ধরন থাকে। **অসহযোগ** হল একটি মৃদু ধরন। **আইন অমান্য আন্দোলন** হল সত্যাগ্রহের চরম রূপ। গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনেও শৃঙ্খলা, ভব্যতা ও অহিংসার অঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ। আইন অমান্য একক কিংবা গণ-আন্দোলন হতে পারে। গণ-আন্দোলন স্বতস্ফূর্ত হয়ে থাকে। সেজন্য প্রথম থেকে জনগণের যথেষ্ট প্রশিক্ষণ হওয়া কাম্য। গান্ধীর মতে সরকারের সকল আইন অমান্যের আন্দোলন খুবই শক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে। সশস্ত্র বিদ্রোহের চেয়েও সেটা বেশি বিপজ্জনক, কারণ বিরাট আকারে নিরীহ মানুষের কষ্টস্বীকারের শক্তি অপরিমেয়।

গান্ধী মানুষের অন্তরাত্মায় (soul) সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি চাইতেন যে অন্তরাত্মা থেকে উদ্ভূত বিবেকের দ্বারা চালিত ব্যক্তিমানুষ কোনও আইনকেই মানবে না যদি সেটা নৈতিকতার পরিপন্থী হয়। তাই সত্যাগ্রহ হল অন্তরাত্মার অনভিপ্রেত সব কিছুর বিরুদ্ধে একটি নিরন্তর (perpetual) প্রক্রিয়া। দ্বিতীয়ত যথার্থ সত্যাগ্রহী সত্যের তাগিদে যে-কোনও বিপদের ঝুঁকি নেবে।

অনভিপ্রেত ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ হল আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রতিরোধ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সম্পর্কে কালভিন, থোরো প্রমুখ পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-দার্শনিকদের আদর্শ কিংবা ভারতে টিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ চরমপন্থী দেশনায়কেরা বিশ শতকের প্রথম দশকে যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance) মতাদর্শ তুলে ধরেন সে সবের সঙ্গে গান্ধীর সত্যাগ্রহ দর্শনের মৌলিক প্রভেদ ছিল। সত্যাগ্রহে হিংসার আদৌ কোনও অবকাশ নেই, মানুষের মনকে সত্যাগ্রহ নিরন্তর পরিশোধিত করে। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহের প্রয়োগ সম্ভব। ঈশ্বরই সত্যাগ্রহের আশাভরসার উৎস। গান্ধীর সত্যাগ্রহ একটি জীবনদর্শন। স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থা অচল করে তোলার জন্য সত্যাগ্রহের আদর্শে প্রবল জনশক্তি সৃষ্টি সম্ভব।

সনদী আন্দোলন (Chartist Movement)

ইংল্যান্ডের একটি সমাজতন্ত্রী আন্দোলন (১৮৩৭-৫৫) যার নামকরণ হয়েছিল 'পিপল্‌স্ চার্টার' থেকে। ওই সনদে যেসব দাবি উত্থাপিত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল : ১. পুরুষদের সর্বজনীন ভোটাধিকার; ২. ব্যালটের মাধ্যমে ভোটপ্রদান; ৩. নির্বাচনকেন্দ্রের সমতা; ৪. পার্লামেন্টের বার্ষিক অধিবেশন; ৫. সাংসদদের পারিশ্রমিক প্রদান ও ৬. সাংসদদের সম্পত্তি থাকার শর্ত অবলোপ। চার্টিস্টরা ক্রিশ্চান সোসালিস্টদের সমর্থন অর্জন করে। এই আন্দোলন ব্রিটিশ শ্রমিকদের মনে এই বিশ্বাস সঞ্চার করে যে রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব; ফলে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন দানা বাঁধে, গড়ে ওঠে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, ধর্মঘটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৯, ১৮৪২ ও ১৮৫৮ খ্রি শ্রমিকদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে পার্লামেন্টে গণসাক্ষর সংবলিত সনদ পেশ করা হয়।

সন্ত্রাসবাদ (Terrorism)

রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য হিংসাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ অথবা হিংসার মাধ্যমে জনগণের মনে ভীতি ও ত্রাস সঞ্চার করা। নির্বিচারে যত্রতত্র এবং ব্যাপকভাবে ভীতি ও ত্রাসসঞ্চারকারী হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের দিকটি সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে ক্ষতিকর পরিণাম। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন বিপ্লব হল **স্বৈরাচারতন্ত্রের** (tyranny) বিরুদ্ধে সাম্য ও স্বাধীনতার **স্বৈরতন্ত্র** (despotism)। হাল আমলে বিশ্বের অনেক দেশে সরকারি কার্যকলাপে সন্ত্রাসবাদ প্রকাশ পায়।

সন্ত্রাসবাদের পিছনে ঔচিত্য হিসেবে এই যুক্তি দর্শানো হয় যে শুভলক্ষ্যে পৌঁছতে যদি অশুভ মাধ্যম অবলম্বনে আপত্তি না থাকে তা হলে সন্ত্রাসবাদ সমর্থনযোগ্য। নতুবা নিন্দনীয়। **সাম্য ও স্বাধীনতার** নামে হিংসার মাধ্যমে শোষণ ও নিপীড়নকারীরা হিংসা নিবারণের প্রয়াসী বলে সন্ত্রাসবাদীরা মনে করে।

সমধর্মী সহযাত্রী (Fellow-Traveller)

শব্দটি সাধারণত নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয়। যে ব্যক্তি মার্কসীয় মতাদর্শে বিশ্বাস করেন, কিন্তু নিজেকে কমিউনিস্ট বলতে চান না অথবা কমিউনিস্টদের কোনও কর্মপন্থা মানলেও বলে থাকেন যে তিনিও স্বাধীনভাবে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেই ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে শব্দটি প্রযুক্ত হয়। স্বমত ছেড়ে কারও বামপন্থী মতিগতি দেখা গেলেও তাদের সম্পর্কে শব্দটি শ্লেষের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রশংসাসূত্রে কেউ কমিউনিস্টদের প্রতি দরদ প্রকাশ ও এমন কী অস্বীকার করলেও সে ব্যক্তি এই বিদ্রূপ থেকে রেহাই পায় না। পরে অবশ্য শব্দটির ব্যবহার-পরিধি বিস্তৃত হয় সেইসব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যাঁরা কোনও মতবাদ অন্তরে পোষণ করলেও প্রকাশ্যে তার সঙ্গে জড়িত হন না।

সমন্বয়বাদ (Theory of Synthesis)

সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্ভাবিত মতবাদ, যে সম্পর্কে তাঁর মূল বক্তব্য ছিল যে "ন্যাশনাল সোসালিজম ও কমিউনিজমের সমন্বয়ই আমাদের রাষ্ট্রদর্শন হওয়া উচিত"। তিনি মনে করতেন "পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করে আমাদের নতুন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব করতে হবে" (মুক্তিসংগ্রাম-১)। প্রত্যয়টির তত্ত্বগত যৌক্তিকতা দেখিয়ে তিনি বলেন "হেগেলীয় বা বার্গসোনীয় বা অন্য কোনও ধরনের বিবর্তনই মানি না কেন, কোনও ক্ষেত্রেই একথা মনে করবার কারণ নেই যে সৃষ্টি শেষ হয়ে এসেছে। সকল দিক বিবেচনা করে এই মতই স্বীকার করতে হয় যে বিশ্ব ইতিহাসের পরবর্তী স্তরে কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের একটা সমন্বয় সৃষ্ট হবে" (তদেব ২)। ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজমের কল্যাণকর দিকগুলির তুলনা করে তিনি লিখেছেন, "দুটি ব্যবস্থাই গণতন্ত্র বিরোধী অথবা একনায়কতন্ত্রবাদী, দুটি ব্যবস্থাই পুঁজিবাদী-বিরোধী। কিন্তু এই মিল সত্ত্বেও কয়েকটি ব্যাপারে তাদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান... ন্যাশনাল সোসালিজম জাতীয় ঐক্য ও সংহতিবিধানে এবং জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিসাধনে সমর্থ হয়েছে।" ফ্যাসিবাদে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর সংস্কার সাধন না হওয়ায় ওই ব্যবস্থায় তাঁর আপত্তি ছিল। অপরদিকে সোভিয়েত সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রবর্তন ও ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ তাঁকে আকৃষ্ট করে। কমিউনিজমে জাতীয়তাবাদের স্থান নেই, ধর্মের কদর নেই, শ্রমিক ছাড়া অন্য শ্রেণীর মানুষের গুরুত্ব নেই ও ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকেই শুধুমাত্র গ্রহণ করায় তাতেও তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল না। তাই তিনি ওই দুটির নিষ্কর্ষ সমন্বিত করে তাঁর সাম্যবাদী বা সমন্বয়ী মতবাদ প্রচার করেন। "ফ্যাসিবাদের একটা মূল উপাদান হল জাতীয়তাবাদ। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র জাতীয়তাবাদকে যুক্ত করেছেন। এটাই সুভাষী সাম্যবাদের অন্যতম সমন্বয়" (অনিল রায়)। সুভাষচন্দ্রের সাম্যবাদ হল ভারতীয় ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নবসমাজবাদ। গান্ধীবাদ ও মার্কসবাদের আতিশয্যের বাইরে তিনি তৃতীয় মতবাদ হিসেবে এক ধরনের সমাজতন্ত্রের উদ্ভাবনা করেন।

দ্র. জাতীয় সমাজতন্ত্র; নাৎসিবাদ।

সমবায় আন্দোলন (Co-operative movement)

একটি আর্থ-রাজনৈতিক আন্দোলন। বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ে ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্রের পরিবর্তে সমবায় সমিতির মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ব্যবস্থা। উদ্দেশ্য হল মুনাফার সমবণ্টন এবং সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতার নিরসন। সমবায় সমিতিতে শ্রমিকই হল অংশীদার বা মালিক ; পুঁজিপতি বা মূলধন লগ্নিকারী বলে কিছু থাকে না। কাজেই সমবায় অর্থনীতি শোষণ থেকে মুক্ত। ক্রেতা সমবায়ে পাইকারি বাজারে জিনিস কিনে দোকানে খুচরো বাজারদরে সেটা বিক্রি করা হয়। মুনাফাটা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। উৎপাদক সমবায় সমিতির মুনাফা তার শ্রমিক অংশীদার সমান হারে পেয়ে থাকে। কৃষি সমবায়ে বীজ, সার, ঋণ ইত্যাদি সুলভ হারে সদস্যদের দেওয়া হয়। অনেকের দৃটিতে সমবায় ব্যবস্থ প্রকারান্তরে এক ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানা। তাই মার্কসীয় মতে সমবায়ী ব্যবস্থাকে আপাতদৃষ্টিতে সমতামূলক বলে মনে হলেও কার্যত সেটা ভ্রান্ত। কিন্তু সোভিয়েত দেশের কৃষি ব্যবস্থায় যৌথ চাষ আবাদের অঙ্গ হিসেবে এক ধরনের (কোলখোজ) সমবায় সংস্থা গড়ে ওঠে।

সমবায়ী ব্যবস্থার উদ্ভাবক ছিলেন **রবার্ট ওয়েন**। ১৮৪৪ খ্রি রচডেল ইকুইটেবল পায়োনিয়ার্সেরা উনিশ শতকে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ওয়েনের আদর্শ রূপায়ণের প্রয়াসী হন। সমবায় ব্যবস্থা হল সমাজতন্ত্রী বিধিব্যবস্থার আদি পর্ব এবং ১৮৩৭ খ্রি থেকে এই আন্দোলন ১৯৩৪ পর্যন্ত খুব শক্তিশালী ছিল। যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমবায় আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীকালে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলি, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে সমবায় আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষ দিকে জার্মানিতে ব্যাপক আকারে কৃষি সমবায় গঠিত হয়। যুক্তরাজ্যের সমবায় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ক্রেতা সমবায়। ইউরোপের অন্যান্য দেশে উৎপাদক সমবায়ের সংখ্যা বেশি। ১৯১৭ খ্রি সমবায় আন্দোলনের স্বতন্ত্র পার্টি গঠিত হয়। ইংল্যান্ডে ১৯১৮ খ্রি থেকে সমবায় আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা **শ্রমিক দলের** সঙ্গে যুক্ত ফ্রন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পরে আন্দোলনের স্বাতন্ত্র্য বলে কিছু থাকে না। ভারতে সমবায় ব্যবসা-বাণিজ্য দীর্ঘকাল যাবৎ সীমিতভাবে বিস্তারলাভ করে। **রবীন্দ্রনাথ, মানবেন্দ্রনাথ** প্রমুখ মনীষীরা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে সমবায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুপারিশ করেন।

সমাজ (Society)

বিবর্তনধারার আদিপর্বে জৈব অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য মানুষ সংগ্রাম করেছে। ক্রমে বুদ্ধি, চেতনা, সৃজনীশক্তি প্রভৃতি মানবিক সত্তার বিকাশে সেই সংগ্রামের মান ও ধারা বিকশিত হতে থাকে। জৈব প্রয়োজন নিবৃত্তির সঙ্গে অপরের মানবিক সত্তার স্ফুরণ অব্যাহত রেখে ব্যক্তিমানুষ নিজ সত্তার পরিপূর্তির জন্য সমাজবন্ধনের তাগিদ অনুভব করে। মানুষের জৈব প্রয়োজন ও স্বার্থের তাগিদে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সুবিধার্থে সমাজবন্ধনের উদ্ভব হয়েছিল। পারস্পরিক আদান-প্রদানের নিয়মিত সম্পর্কে আবদ্ধ জনসমষ্টিই হল সমাজ। এবং মানুষই হল সমাজের স্রষ্টা।

তার উৎপত্তির পিছনে কোনও ঐশ নির্দেশ নেই।

সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কে অন্যতম আরও দুটি তত্ত্ব হল সামাজিক চুক্তি (রুসো, হবস, লক) এবং জৈব তত্ত্ব (স্পেনসার)। প্রথমটিতে বলা হয় যে সমাজসৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির রাজ্যে বাস করার সময়ে একটি চুক্তির মাধ্যমে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়; দ্বিতীয়টিতে বলা হয় যে সমাজ হল জীবদেহ সদৃশ। সমাজদেহ ও জীবদেহের মধ্যে এই তত্ত্ব একটি মিল খুঁজে পায়। ব্যক্তি ও সমাজের বিচিত্র ও জটিল গতিপ্রকৃতির সবিশেষ ব্যাখ্যা এই তত্ত্ব দুটিতে পাওয়া যায় না।

"মানুষ সামাজিক প্রাণী" (আরিস্তোতল)। তার প্রধান লক্ষণ হল মানুষের মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকার প্রবণতা। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে একদিকে যেমন আছে সম্প্রীতি, অন্যদিকে তেমনি বৈরিতার ভাব। সম্প্রীতি থেকে গড়ে ওঠে সহযোগিতা, আবার বৈরিতা থেকে সংঘাত। সমাজও তাই উভয় ধারার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। সেই সমন্বয় থেকে যেটা তৈরি হয় তাকে বলে সামাজিক উত্তরাধিকার। সেই উত্তরাধিকারের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সম্ভাবনা মানুষের জীবনকে বিকশিত করে তোলে। স্বাধীন বিকাশের যাবতীয় সুযোগসুবিধা থেকে মানুষের অধিকার (rights) প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের পরিপূরক। সমাজ ব্যতিরেকে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সম্ভব নয়, অন্যদিকে ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ গড়া যায় না। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যেমন সমাজ সার্থক হয়ে ওঠে, তেমনি সমাজকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটে (ম্যাকাইভার)। ব্যক্তিসত্তা সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী যাঁরা তাঁরা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যে সম্পর্কের কথা বলেন সেটা পূর্বোক্ত সম্পর্কের চেয়েও অনেক গভীর। তাই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক একটি গতিসম্পন্ন মৌল নির্ভরশীলতা লক্ষিত হয়।

সমাজতন্ত্র (Socialism)

মূলত একটি অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা, যেখানে উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ হল রাষ্ট্র তথা জনসাধারণের; সকলের আত্মবিকাশ ও উন্নতিসাধনের থাকে সমান সুযোগ ও অধিকার; সামাজিক সম্পদ বণ্টনের থাকে সুষম ব্যবস্থা।

সোসালিজম ও কমিউনিজম প্রায় সমার্থক। মার্কসীয় দৃষ্টিতে প্রভেদ স্তরগত। উন্নত স্তর কমিউনিজম অভিমুখে, সমাজতন্ত্র হল প্রাথমিক স্তর। প্রথম স্তরে মানুষ তার কাজ অনুযায়ী এবং দ্বিতীয় স্তরে প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক পায়। ধনতন্ত্রবাদের অবসান ও তার স্থান অধিকার করে সমাজতন্ত্র।

'সোসালিজম' শব্দটি ১৮২৭ খ্রি. ইংল্যান্ডে রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) কো-অপারেটিভ ম্যাগাজিনে প্রথম ব্যবহার করেন। ওয়েন ছিলেন একজন মিল মালিক ও সমাজ-সংস্কারক। তিনি ক্রেতা-সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং সাধারণের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে কলকারখানার প্রবর্তন করেন। শব্দটি ফ্রান্সে ও তারপর ইউরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত হতে থাকে।

সমাজতন্ত্র মূলত **অবাধ বাণিজ্যের** (laissez-faire) বিরোধী। তাতে ব্যবসাবাণিজ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মুনাফার কোনও অবকাশ থাকে না। সমাজতন্ত্র স্পষ্টতই ধনতান্ত্রিক ও বাজার অর্থনীতির বিকল্প চিন্তা হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং নীতিগত ও কার্যকরতার দিক থেকে আরও উন্নত ব্যবস্থা হিসেবে কোনও কোনও মহলে বিবেচিত। অবাধ বাণিজ্যের কুফল হিসেবে বলা হয় যে তাতে মাঝে মাঝে সংকট ও বেকার-সমস্যা দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের পুঁজিবাদী মালিকদের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তৃতীয়ত, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টনের লক্ষ্য হল মুনাফা, লোকের ব্যবহারের প্রশ্ন থাকে গৌণ। সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন যে ব্যবসায়ের সংকট ও বেকার-সমস্যার প্রতিকার হল পরিকল্পিত (planned) অর্থনীতি। তাতে মানুষের ব্যবহার্য মৌল জিনিসপত্র উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দেওয়া যায়, বিলাস-সামগ্রীর পরিবর্তে। শ্রমিকদের আর মালিকদের খেয়ালের উপর নির্ভর করতে হয় না।

উনিশ শতকে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জমির অভাব ছিল না, তখন ওয়েন কিংবা ফরাসি সমাজতন্ত্রী ফুরিয়ারের দৃষ্টান্তে অনেকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমাজতন্ত্রী উপনিবেশ গড়ে তোলেন। নানা কারণে সেসব প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। পরে **গিল্ড সোসালিস্টরা** ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই মুনাফা ব্যতিরেকে উৎপাদনকল্পে যেসব কারিগর সমিতি গঠন করেন সেগুলিও ব্যর্থকাম হয়। সেজন্য উনিশ শতকের মাঝামাঝি বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়ায় তখনকার সমাজব্যবস্থায় সামগ্রিক পরিবর্তন—সংস্কারপন্থী ও বৈপ্লবিক—উভয় পথেই। বৈপ্লবিক পরিবর্তনকামী আন্দোলনের দীক্ষাদাতা ছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস।

মার্কসীয় মতানুসারে বলা হয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। কারণ পুঁজিবাদী সমাজ নিজ সংকট ও স্ববিরোধের ফলে শেষ হয়ে যায়—যে প্রক্রিয়ায় সর্বহারা শ্রেণী পুঁজিবাদীদের ক্ষমতাচ্যুত করে—উৎপাদন-বণ্টন-বিনিময় ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের অধীনে আনে—সেখানে সরকারের অথবা মানুষের দ্বারা মানুষের নিপীড়ন ঘুচে যায়। মার্কসীয় ধারায় সমাজতন্ত্রকে একাধারে পুঁজিবাদ-বিরোধী মতাদর্শ এবং সর্বহারা শ্রেণী দ্বারা ক্ষমতা দখল হিসেবে দেখা হয়, যাতে পুঁজিবাদের অবসানের সঙ্গে মানুষ তার কাজের যথোপযুক্ত মূল্য অর্জন করে।

ইউরোপের কোনও কোনও দেশের সমাজতন্ত্রী যাঁরা মার্কসীয় বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন তাঁরা পরে সাংবিধানিক আন্দোলনের পথ অনুসরণ করেন; রাষ্ট্রের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে তাঁরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন। ব্রিটেনের **ফেবিয়ান সোসাইটি** (১৮৮৪ খ্রি স্থাপিত) এই ধারার প্রধান নিদর্শন। উনিশ শতকে ব্রিটেনে সরকার কলকারখানায় শ্রমিকদের কল্যাণে নানান বিধিনিষেধ আরোপ করে। ফেবিয়ান সোসালিস্টরা সিভিল সার্ভিস চাকুরেদের দ্বারা বড় বড় কারখানার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দাবি তোলেন। পরে তাঁরা বলেন যে কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত না হলে সেসবের মালিকেরা গণতন্ত্রের পথে যেতে সরকারকে বাধা দেবে। তাই দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর সংস্কারপন্থী সরকার বেশ কিছু ভারী শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেয়। **গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীরা** অতঃপর বলেন যে শুধু মালিকানা রাষ্ট্রায়ত্ত হলেই চলবে না, চাই পরিকল্পিত (planned) অর্থনীতি যাতে সম্পদের বণ্টন আরও ন্যায়সঙ্গত হয়, এবং

উৎপাদনে জনস্বার্থের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠা যায়।

দ্র. কমিউনিজম ; মার্কসবাদ।

সমাজতান্ত্রিক আইনানুগতা (Socialist Legality)

ত্রিশের দশক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যবহৃত অভিধা। প্রথমে সরকারের নানাবিধ কার্যকলাপের সমর্থনে, তারপর **আইনের শাসন** হিসেবে কথাটির প্রচলন বৃদ্ধি পায়, তাতে পার্টির ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা হয় যে মার্কসীয় মতাদর্শের এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান ভূমিকার স্বীকৃতি হল আইনের শাসন অভিধার গোড়ার কথা।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র (Social Democracy)

ইউরোপে উনিশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে উদ্ভূত একটি রাজনৈতিক ধারা। গোড়ার দিকে সোসাল ডেমোক্র্যাটরা সবাই বিপ্লবী কর্মসূচির ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রী আদর্শের প্রচার এবং শ্রমিকশ্রেণীর গণসংগঠন তৈরির কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে যুক্ত সমস্ত দলই সোসাল ডেমোক্র্যাট নামে পরিচিত ছিল। আধুনিক অর্থে নামটির প্রচলন ঘটে ১৯০৫ খ্রি., যে সময়ে রাশিয়ান সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টি **বলশেভিক** ও **মেনশেভিক** নামে দুটি স্বতন্ত্র ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। শান্তিপূর্ণ, জনপ্রিয় ও ক্রমান্বয়িক সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী মেনশেভিকরা সোশাল ডেমোক্র্যাট নামে নিজেদের পরিচয় দেন। অক্টোবর বিপ্লবের (১৯১৭) পর লেনিনের অনুগামী সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ বলশেভিক সদস্যরা ওই দল ছেড়ে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকেও পৃথক হয়ে গিয়ে তৃতীয় (কমিউনিস্ট) আন্তর্জাতিকে (১৯১৯-৪৩) ওই পার্টি যোগদান করে। সোশাল ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের বিরোধ দীর্ঘকাল চলেছিল।

আধুনিক অর্থে সোশাল ডেমোক্র্যাটরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, কিন্তু বিপ্লবের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক উপায় অনুসরণের পক্ষপাতী। গণতান্ত্রিক বহুদলীয় নির্বাচনেও তাঁরা বিশ্বাস করেন। তাঁদের দৃষ্টিতে গণতন্ত্রী পার্টি জনগণের নামেই শুধু নয় জনগণের দ্বারা শাসন চালায়। স্বভাবতই সে ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকবে, যারা কোনও সময়ে ক্ষমতাতেও আসতে পারে। বেশির ভাগ দেশে সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলি মার্কসবাদে বিশ্বাস করত। জার্মানিতে শাসক সোশাল ডেমোক্রেটিক দল সর্বপ্রথম মার্কসবাদ থেকে সরে আসে (১৯৫৯)।

সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি (Socialist Market Economy)

এই প্রত্যয় অনুযায়ী বাজার হল একটি আত্মনিয়ন্ত্রণকারী যান্ত্রিক ব্যবস্থা। তাতে স্বৈরাচারতন্ত্রী মাধ্যম ব্যতিরেকে উৎপাদনী সম্পদ (resources) বণ্টিত হয়। সাধারণ বাজারভিত্তিক ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উৎপাদন ব্যবস্থায় শোষণ অব্যাহত থাকে ও

মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে মূলধন পুঞ্জীভূত হয়। পক্ষান্তরে সামাজিক মালিকানায় বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে অবিচার ঘটবে না। তাই উৎপাদনী ব্যবস্থায় কেউ কেউ সমবায়ী মালিকানার সুপারিশ করেছেন। সমবায়গুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় থাকলে পণ্যের বণ্টন ও বিনিময় সুসংহত হবে। চাহিদা ও সরবরাহ যথারীতি দরদাম নির্ধারণ করবে। রাষ্ট্র প্রয়োজন অনুযায়ী চাহিদা এবং সরবরাহের গরমিল ঘটলে সামঞ্জস্য বজায় রাখবে। সামাজিক মালিকানায় উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ে সুসংবদ্ধ সম্পর্ক গড়ে তোলাই ছিল মার্কসের আদর্শ। সেই দৃষ্টিতে ওই তিনটির কোনও একটিকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে আনা অসঙ্গত। ত্রিশের দশকে পোল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ অস্কার ল্যাঙের চিন্তায় বাজারভিত্তিক সমাজতন্ত্রী তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর যুগোস্লাভিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। ভারতে মানবেন্দ্রনাথ রায় যে সমবায় অর্থনীতির কথা বলেন তাতে উৎপাদনের লক্ষ্য হল ব্যবহার, মুনাফা নয়।

নব্বুইয়ের দশকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি নিয়ে অন্তর্দলীয় দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ১৯৯২ খ্রি পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসে একটি সর্বসম্মত চিত্র উপস্থাপন করেন প্রবীণ নেতা দেঙ-সিয়া পিঙ। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। তাতে দেঙ একথা স্পষ্টই বলেন যে বাজার অর্থনীতি তথা ব্যক্তিগত মালিকানার যতই সুযোগ দেওয়া হোক না কেন, কমিউনিস্টদের একচ্ছত্র শাসন বজায় থাকলে পুঁজিবাদ আর কায়েম হবে না। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক মতাদর্শের কাছে নতি স্বীকার ছাড়াই বাজার অর্থনীতি সম্ভব। তা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাজার অর্থনীতি খাপছাড়া কিছু নয়।

দেঙ-এর সমাজতান্ত্রিক নববিধানের পাঁচটি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য : ১. রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পবাণিজ্য ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যতিরেকেও বাজারের রীতিনীতি অনুসরণ করতে পারে ; ২. অযৌক্তিক অর্থনৈতিক বৈষম্য ঘটলে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে ; ৩. গ্রামাঞ্চলে চুক্তির ভিত্তিতে বিগত দশকে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত যৌথ কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে জমি ও কলকারখানায় ব্যক্তিগত মালিকানাসহ সমবায় ব্যবস্থার ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে ; ৪. যেসব কোম্পানির শেয়ার, বাজারে কেনাবেচার মাধ্যমে জনগণের মালিকানায় থাকে সেগুলি জনগণের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে ; রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানা ও জনগণের মালিকানার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই ; ৫. চীনের কমিউনিস্ট পার্টি পিপলস লিবারেশন আর্মির সহযোগে একচেটিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকবে ; ক্ষমতার অংশ অবশ্য অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলও পাবে যারা বিপ্লবের সময় কমিউনিস্টদের সহায়তা করেছিল।

দ্র. বাজার অর্থনীতি ; মিশ্র অর্থনীতি

সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ (Socialist Realism)

কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থায় পার্টির প্রতি শিল্পী ও সাহিত্যিকের কর্তব্য। প্রত্যয়টির উদ্ভাবক ছিলেন ম্যাক্সিম গর্কি, ক্রিস্টোফার কডওয়েল প্রমুখ লেখকেরা ; শিল্পীকে বুর্জোয়া ধারাবাহী যাবতীয় কলাকৈবল্যবাদী আদর্শ ত্যাগ করতে হবে। সর্বহারার

মানসজগৎকে তার আপন মহিমা, মর্যাদা, আশা ও সাধারণের কাছে বোধগম্য আকৃতিতে তুলে ধরা শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব, যাতে বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন বস্তুগত মানসিকতা গড়ে তোলা যায়। 'শিল্পীর কাজ বিশ্বের ব্যাখ্যা নয়; পার্টি-মনস্কতা সৃষ্টির উপযোগী পরিবর্তনসাধন তাঁর প্রধান কর্তব্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণতন্ত্রী চীনে এই আদর্শ অনুসরণের জন্য সরকারি নির্দেশ ছিল।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation)

এক ধরনের নির্বাচন পদ্ধতি যার মাধ্যমে ভোটে প্রতিটি দলের প্রতিনিধিত্ব নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে তার আনুপাতিক সমর্থনের ভিত্তিতে নিরূপিত হয়। তাতে সংখ্যালঘিষ্ঠ নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধিও আনুপাতিক হারে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এই পদ্ধতির সমর্থনে যুক্তি হল যে সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোটদাতাদের প্রতিনিধিত্ব না থাকলে তাঁদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা থাকে। আইনসভা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়, পৌরসভা ইত্যাদি কোনও কোনও প্রতিষ্ঠানে এই প্রথা দেখা যায়। প্রথাটির প্রবক্তা ছিলেন **জন স্টুয়ার্ট মিল**, যিনি মনে করতেন যে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করলেও সমগ্র জনগণের গণতান্ত্রিক সরকারে সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্ব না থাকাটা অনুচিত। আইন যদি সর্বজনের অভীপ্সাকে প্রতিফলিত করে তা হলে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের নয়, সংখ্যালঘিষ্ঠদের অভীপ্সাকেও রূপায়িত করতে হবে; নইলে প্রতিনিধিত্ব একদেশদর্শী হয়ে পড়ে এবং জন-অসন্তোষ ও বিক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মিল চাইতেন সংখ্যার অনুপাতে লঘিষ্ঠ সংখ্যক নাগরিকদেরও প্রতিনিধিত্ব।

সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্বের বিরোধী পক্ষের মূল বক্তব্য হল প্রস্তাবিত প্রতিনিধিত্বের নির্বাচন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। আনুপাতিক হারে সমস্ত দলকে প্রতিনিধিত্ব দিলে তারা দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থকেই তুলে ধরবে বেশি। আইনসভা দলীয় বিবাদবিসংবাদের স্থানে পরিণত হবে। মন্ত্রিসভা দুর্বল হয়ে পড়বে। বিরোধীদের যুক্তি যাই হোক নীতিগতভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠদের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা ও বক্তব্যকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন এবং সেই নিরিখে সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন উপেক্ষণীয় নয়।

যুক্তরাজ্য বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয় না। তবে ইউরোপের কোনও কোনও দেশে এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এই পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রার্থীরা সদস্যপদে নির্বাচিত হন। পক্ষান্তরে শতকরা ৪০ ভাগ ভোট পেয়েও যে প্রার্থী পরাজিত হন আইনসভায় তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর কার্যত কোনও প্রতিনিধিত্ব থাকে না।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিরূপণের দু ধরনের পদ্ধতি দেখা যায়। বেশি পরিচিত প্রথমটি হল একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট (single transferable) পদ্ধতি। এই পদ্ধতির (১৮৫১) উদ্ভাবক ছিলেন টমাস হেয়ার। দ্বিতীয়টিকে বলে তালিকা পদ্ধতি (list system)। তুলনায় প্রথমটি বেশ জটিল।

প্রথমটির লক্ষ্য হল নানান দল কিংবা সম্প্রদায়ের নির্বাচক সংখ্যা ও মোট প্রতিনিধি সংখ্যার মধ্যে অনুপাত অনুযায়ী সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধি সংখ্যা নিরূপণ করা। নির্বাচক সংখ্যা মোট নির্বাচকমণ্ডলীর এক তৃতীয়াংশ হলে তারা আইনসভার এক

তৃতীয়াংশ আসনের অধিকারী হবে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী দুভাবে প্রয়োজনীয় কোটা (quota) নির্ধারণ করা হয়। প্রথমটিতে যত ভোট প্রদত্ত হয় সেই সংখ্যাকে যত প্রার্থী নির্বাচিত হবে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ভাগফলকে কোটা হিসেবে গণ্য করা হয়। অপরটি হল মোট ভোটের সংখ্যাকে মোট আসন সংখ্যার সঙ্গে অতিরিক্ত একটি বেশি সংখ্যা যোগ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফলের সংখ্যাটি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে একজন প্রার্থীর অর্জন করা আবশ্যক বলে ধরা হয়। এটিকে বলা হয় Droop Quota। ভোটদাতাকে ব্যালট পেপারে প্রার্থীর নামের পাশে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা তার ক্রমিক পছন্দ অর্থাৎ মনোনয়ন প্রকাশ করতে হয়। যে প্রার্থী প্রথম মনোনয়ন সর্বাপেক্ষা বেশি পান স্বভাবতই তাঁকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। নির্বাচিত ওই প্রার্থী তাঁর প্রথম মনোনয়ন ভোট নির্দিষ্ট 'কোটা' অপেক্ষা যত বেশি পান, সেগুলি যে যে প্রার্থী দ্বিতীয় মনোনয়ন পান, তাঁদের হিসাবে জমা পড়ে। এভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পেয়ে আরও কয়েকজন প্রার্থী নির্বাচিত হন। নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনসমূহ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ভোটদাতাদের পূর্বোক্ত মনোনয়নের ভিত্তিতে গণনার কাজ চলে।

দ্বিতীয় আর একটি যে পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হল তালিকা পদ্ধতি। সেটি একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটদান পদ্ধতি অপেক্ষা কিছুটা সরল এবং কম ব্যয়সাপেক্ষ। এই পদ্ধতিতে সমস্ত রাজনৈতিক দল তাদের মনোনীত প্রার্থীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে। প্রার্থীর সংখ্যা ও মোট আসনের সংখ্যার সমান হতে হবে। সংশ্লিষ্ট নির্বাচনকেন্দ্রে যে কটা আসন থাকে ভোটদাতা সেই কটা ভোট দিতে পারবেন। ফলে ভোটদাতা যখন ভোট দেবেন তখন তাঁকে প্রার্থী অনুযায়ী ভোট না দিয়ে বিভিন্ন দলের মনোনীত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী ভোট দিতে হবে। প্রত্যেক তালিকাতে যতগুলি ভোট পড়বে, তত সংখ্যক প্রার্থী ওই তালিকা থেকে নির্বাচিত হল বলে ঘোষিত হবে। এখানে মোট ভোটসংখ্যাকে মোট আসনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ভাগফলই হয় কোটা। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল যে এতে সমস্ত দলের অস্তিত্ব স্বীকৃতি পায় এবং সব দলই নিজেদের সংখ্যার অনুপাতে আইনসভায় প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ পায়।

সম্পত্তি (Property)

অর্থনৈতিক মূল্য আছে এমন বিষয় বা বস্তু যাতে কারও মালিকানা থাকে। স্থাবর সম্পত্তি এবং ব্যক্তিত্ব বা অস্থাবর সম্পত্তি সমার্থক নয়। জমি এবং তার উপর নির্মিত বাড়ি হল স্থাবর সম্পত্তি। অস্থাবর বা জঙ্গম বস্তুর মালিক সেগুলিকে সহজে বিক্রয়, দান ও বিনিময়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে পারেন। সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে জটিল আইনকানুন এবং **অধিকার** প্রত্যয় গড়ে উঠেছে। সম্পত্তির অধিকারসূত্রে **ক্ষমতা** এবং **বৈধতা** প্রত্যয় দুটিও জড়িত। মার্কসীয় দৃষ্টিতে সম্পত্তির আইনগত অধিকার সামাজিক শোষণকে কায়েম ও বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে বৈধতা দান করে।

ব্যক্তিগত মালিকানার পক্ষে ও বিপক্ষে আবশ্যকতা, সুবিচার, স্বাধীনতা, যৌক্তিকতা ইত্যাদি নানাবিধ দিক থেকে মতদ্বৈধতা আছে। তাতে সম্পত্তির নানারকম মালিকানার প্রস্তাব ওঠে: ১. সর্বজনীন সামাজিক মালিকানা; ২. ছোট ছোট গোষ্ঠীগত মালিকানা; ৩. ছোট পরিবারগত কিংবা কোম্পানির মালিকানা; ৪. ব্যক্তিবিশেষের

মালিকানা। সমাজতন্ত্রীদের কাছে প্রথম দুই ধরনের মালিকানা গ্রহণযোগ্য। তাঁরা মনে করেন সমস্ত মানুষের প্রয়োজন সমান এবং সেসব প্রয়োজন চরিতার্থ করার অধিকারও সকলের সমান ; তা ছাড়া যেহেতু সমস্ত জমি ও তার উৎপাদন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অছি হিসেবে কিছু ব্যক্তি সেসবের কার্যনির্বাহ করেন, সেকারণে সর্বজনকে তাদের ন্যায্য স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রচলন অনুচিত।

ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থকদের মধ্যে জন লক মনে করতেন নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বত্ব থাকতে পারে। নিজের শ্রমে কেউ কিছু প্রস্তুত করলে তাতে তাঁর একটা **প্রাকৃত অধিকার** গড়ে ওঠে। তাঁর মতে পৃথিবীতে যাবতীয় পণ্যের ভিতর নয় দশমাংশ হল মানুষের শ্রম। সম্পত্তির উৎস তথা অর্থনৈতিক মূল্যের ভিত্তি যে শ্রম, তাঁর এই তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে দেড় শতাব্দী পরে মার্কসের শ্রমভিত্তিক মূল্যতত্ত্ব গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে। লকের মতে **পুরসমাজে** সম্পত্তির সমানাধিকার ছিল, কালক্রমে তাতে ব্যক্তিগত স্বত্ব প্রাধান্য পায়। রক্ষণশীল রাষ্ট্রদার্শনিক এডমান্ড বার্ক মনে করতেন সম্পত্তির মালিকানায় চিরকাল বৈষম্য ছিল এবং সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তায়। হেগেল মনে করতেন যে ব্যক্তিগত মালিকানার বিষয়আশয়কে সুচিহ্নিত না করে নীতিগতভাবে মালিকানার আইনগত অধিকার স্বীকৃত হওয়া সমীচীন। হেগেলের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রচলন ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকারকে দৃঢ়মূল এবং ব্যক্তির বিকাশ ও সত্তাকে পরিবর্ধন করে। সামাজিক মালিকানার সমর্থকেরা ব্যক্তির বিকাশ বা উপভোগের (consumption) বিরোধী নন। তাঁদের দাবি উৎপাদন বণ্টন ও বিনিময়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে রদ করা।

প্রাচীন সমাজে উভয় ধরনের মালিকানা ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যাপারে প্লাতো ও আরিস্তোতলের মধ্যেও বিতর্ক দেখা দিত। রোমের গণরাজ্যগুলিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। উত্তরকালে সেই ধারায় পুঁজিবাদ বিকশিত হয়। মধ্যযুগে সার টমাস মোর তাঁর 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থে ব্যক্তিগত মালিকানার অশুভ দিকগুলি তুলে ধরেন, যার সাদৃশ্য পাওয়া যায় পরবর্তীকালে মার্কস-এঙ্গেলসের **কমিউনিস্ট ইস্তাহার** গ্রন্থে।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা আর এইচ টনি তাঁর 'অ্যাকুইসিটিভ সোসাইটি' (১৯২১) গ্রন্থে সম্পত্তিকে এক ধরনের ক্ষমতা তথা সীমিত সার্বভৌমত্ব হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। সেই ক্ষমতা তাঁর মতে পীড়নমূলক। অকেজো সম্পত্তির মালিকানার জোরে ক্ষমতা পেয়ে পীড়নকারীরা নিজেরা কাজ করে না, কিন্তু অপরের কাজে খবরদারি করে। টনির দৃষ্টিতে অকেজো সম্পত্তি বৈধ সম্পত্তির শত্রু।

গান্ধীজি উপলব্ধি করেন যে মানুষ তার শ্রম ও মেধার সাহায্যে সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার পায়, সেই অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করলে উৎপাদনের ক্ষতি অনিবার্য। সোনার ডিম যে-হাঁস দেয় তাকে মেরে ফেললে ক্ষতি হবে। মানুষকে তার বিত্ত ও মেধা থেকে সহিংস উপায়ে বঞ্চিত করার অর্থ ঘৃণা, শ্রেণী সংঘর্ষ, সর্বহারার একনায়কত্ব এবং শক্তিসম্পন্ন দমনমূলক এক রাষ্ট্র স্থাপন। তাই তিনি সম্পত্তির মালিকদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পত্তির অছি হিসেবে খাড়া করেন এবং প্রয়োজনের বেশি সম্পত্তি থাকাকে শোষণ হিসেবে গণ্য করেন। ধনবৈষম্য রদ এবং অর্থনৈতিক সমতা

বজায় রাখার জন্য গান্ধীজি তাঁর **অছিবাদ** তত্ত্বটিকে তুলে ধরেন।

সম্পূর্ণ ক্রান্তি (Total Revolution)

জয়প্রকাশ নারায়ণের (১৯০২-৭৮) শেষ জীবনে উদ্ভাবিত রাষ্ট্রচিন্তা। ১৯৩৪ খ্রি **কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির** প্রতিষ্ঠাকালে মার্কসীয় মতাদর্শে তাঁর ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। সে বিশ্বাস বিবর্তিত হয় **গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী** আন্দোলনে। তাঁর উপর গান্ধীবাদী জীবনদর্শনের প্রভাব মূর্ত হয়ে ওঠে পঞ্চাশের দশকে যখন তিনি সর্বোদয় ও ভূদান আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি লিখেছেন যে জীবনের শুরু এবং শেষ পর্যায়ে তিনি **মানবেন্দ্রনাথ** রায় কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিলেন। মানবেন্দ্রনাথের **দলহীন রাজনীতির** প্রত্যয় থেকে জয়প্রকাশের দলহীন গণতন্ত্রের চিন্তা দানা বাঁধে। সত্তরের দশকে ভারতীয় রাজনীতির এক সংকটকালে তিনি আবার গণ-আন্দোলনের পুরোভাগে সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁরই প্রত্যক্ষ প্রভাবে গড়ে ওঠে **জনতা পার্টি**। অনতিকাল পরে তিনি তাঁর নতুন প্রতীতি ব্যক্ত করেন।

বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক জীবনে নানা অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে জয়প্রকাশ শেষ জীবনে উপলব্ধি করেন যে বৃহৎ অনুন্নত দেশে যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রসারে ভারসাম্যের যথেষ্ট অভাব দেখা যায় সেখানে কেবল দলীয় রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় শক্তির ক্ষেত্রে জনগণের নানাবিধ অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষার যথোচিত প্রতিফলন ঘটে না। রাজনৈতিক অকর্মণ্যতা ও দুর্নীতি এবং সামাজিক ভ্রষ্টাচারের আমূল পরিবর্তনের জন্য চাই লোকশক্তির সংগঠন ও প্রসার এবং নিরন্তর লোক-আন্দোলনের ব্যবহার। দলীয় রাজনীতির মাধ্যমে রাজশক্তি দখল করা সম্ভব, কিন্তু মৌল পরিবর্তনের নিশ্চয়তা থাকে না তাতে। যদিও তাঁর দৃষ্টিতে রাজশক্তি লোকশক্তিরই অঙ্গ।

জয়প্রকাশ জনজীবনের ভিত্তিমূল থেকে লোকচেতনা ও লোকসংগঠনে চিরকাল সক্রিয় ছিলেন ; যাতে জনগণ তাদের নিজ প্রচেষ্টায় নিজেদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে। সেজন্য তিনি মনে করতেন যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে জনসাধারণের সক্রিয় সংযোগ থাকা একান্তই প্রয়োজন। তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে সংগঠিতভাবে লোকশক্তির বিকাশ ঘটেনি। সাময়িকভাবে যেসব গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে লোকশক্তি প্রকাশ পায়, সেটা হয়তো তখন অল্পবিস্তর নাড়া দেয়। সরকারের মতিগতিও পালটায়। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার স্থায়িত্ব ও পরিণাম স্বল্পকালীন। তাই তিনি চেয়েছিলেন একটা স্থায়ী বিপ্লব, যেটা মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে নিরন্তর বৈপ্লবিক পরিবর্তনসাধনে সক্ষম হবে।

ষাটের দশক থেকেই জয়প্রকাশ দল ও সরকার গঠনের রাজনীতি পরিহার করে জনগণের রাজনীতি, যেটাকে তিনি বলতেন লোকনীতি, তার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করেন এই বিশ্বাসে যে জনগণই গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তা। শুধুমাত্র রাজনীতিভিত্তিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে লোকনীতিকে সুসংগঠিত ও প্রকাশমান করা যাবে না। লোকশক্তির বৃহত্তর স্বার্থের তাগিদেই তিনি রাজশক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন। তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল উল্লিখিত সম্পূর্ণ ক্রান্তির মাধ্যমে সমাজের প্রতি স্তরে

মৌলিক পরিবর্তনের উপযোগী কাঠামোর নবনির্মাণ— যেটা এক নতুন সভ্যতার পথনির্মাণের সোপান হিসাবে গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক হবে।

সম্মতি (Consent)

আভিধানিক অর্থে সম্মতি কথাটির অর্থ হল স্বাধীন যুক্তিশীল মানুষের কোনও কাজ বা যৌথ উদ্যমে যোগদানে রাজি হওয়া। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক চুক্তিতত্ত্বে **লক** এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে রাষ্ট্র ও তার কর্তৃত্বের ভিত্তি হল সম্মতি। সম্মতি ব্যতিরেকে কোনও ব্যক্তিকে অপরের কর্তৃত্বাধীনে গণ্য করা যায় না। **পুরসমাজ** সম্মতি পেলে সেই ব্যক্তিকে সমাজের সদস্য করে নিতে পারে। সম্মতি প্রকাশ্য অথবা অকথিত হতে পারে। যতকাল পুরসমাজ থাকবে ততকাল সম্মতির ভিত্তিতে চুক্তি মেনে চলতে হবে। সমাজের অধিবাসী যাঁদের সম্মতি থাকে তাঁরা মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করেন। নতুন প্রজন্মের ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিনিময়ে প্রকাশ্য অথবা অকথিত সম্মতি জানায়। সম্মতি ছাড়া সরকার কারও সম্পত্তি কেড়ে নিতে পারে না। এই নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে প্রতিনিধিত্বের শর্তে কর প্রদানের রীতি। কার্যত সম্মতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনের প্রকৃত অর্থ ব্যক্তিগত সম্মতি নয়, সমবেত প্রতিনিধিদের সম্মতি, অর্থাৎ সংবিধানসম্মত সরকার। সম্মতি বিষয়টিকে রাষ্ট্রতত্ত্বে অনেক সময় **বৈধতা** অথবা **রাষ্ট্রিক বাধ্যতা** প্রত্যয়ের দৃষ্টিতে দেখা হয়।

আইনের দিক থেকে নানারকমের শর্ত বা সম্পর্ক, যেমন কোনও ব্যাপারে চুক্তি, বিবাহ, যৌন মিলন ইত্যাদি কার্য সম্পাদনের পিছনে সম্মতি থাকে। বিবাহের বয়স নির্ধারণে সম্মতির (age of consent) যে আইন আছে সেটি স্বাধিকার ও যুক্তিশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং ওই দুটি গুণ স্বভাবগত প্রক্রিয়ায় পূর্ণতাপ্রাপ্তির সহিত সঙ্গতিশীল বলে অনুমিত। অপরের কোনও কাজে বিরোধিতা না করা এবং বিশেষ করে শক্তিপ্রয়োগ না করা বিধেয়। সম্মতি যদি জবরদস্ত আদায় করা হয় তাহলে সেটাকে সম্মতি বলা যায় না। সম্মতিদাতা সংশ্লিষ্ট কাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থাকলেও সম্মতি প্রদানে দায়িত্ব থাকে সংশ্লিষ্ট কাজের পরিণামে। অশুভ পরিণামের জন্য দায়ী বলে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি অবিচারের প্রশ্ন ওঠে না যদি তিনি কোনওভাবে সম্মতি দিয়ে থাকেন। রাষ্ট্রতত্ত্বে সম্মতির বিষয়টি জটিল। সম্মতি নির্ণয়ের সুস্পষ্ট কোনও পদ্ধতি নেই।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (League of Nations)

বর্তমান রাষ্ট্রসংঘের (UNO) পূর্ববর্তী আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসংগঠন। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর ১৯১৯ খ্রি পারিতে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বে শান্তি রক্ষা, আন্তর্জাতিক বিরোধে নিষ্পত্তি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উন্নতি সাধন করা। ভার্সাই সন্ধিপত্রের অন্তর্গত ২৬ দফা চুক্তির ভিত্তিতে লিগ গঠিত হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন জেনারাল স্মাটস, লিয়ঁ বুর্জোয়া, লর্ড রবার্ট সিসিল ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন। জেনিভায় লিগের সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। সকল সদস্যকে নিয়ে গঠিত সাধারণ পরিষদের (Assembly) অধীন

১৫টি সদস্যকে নিয়ে গঠিত কার্যনির্বাহী সংসদের (Council) স্থায়ী সদস্য ছিল প্রধান পাঁচটি রাষ্ট্র, যথা : ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। বিশ্ব আদালত, আন্তর্জাতিক শ্রম পরিষদ (ILO) প্রভৃতি জাতিপুঞ্জের শাখা হিসেবে গঠিত হয়। ২৬ দফা চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো ছাড়াও লক্ষ্যের মধ্যে ছিল নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজন, অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রমণের প্রতিকার স্বরূপ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের স্বাধীন ও সার্বভৌম স্থিতাবস্থা রক্ষা করা, সালিশি ও বিরোধের মীমাংসা এবং আক্রমণকারী যে-কোনও দেশকে শাস্তিদান ইত্যাদি। উল্লিখিত চুক্তিগুলির মধ্যে সন্ধিস্থাপন, আজ্ঞাপিত (Mandatory) অঞ্চলের শাসন, শ্রম ও মানবিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হয়।

সংসদকে ঐকমত্যানুসারে চলতে হত। নানাবিধ অসুবিধার অন্যতম ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যপদ গ্রহণে বিরত থাকা এবং শক্তিশালী দেশগুলির লিগকে অমান্য করা। লিগের অনেক সদস্যরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে বয়কট করে। ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের সমর্থন ছিল অর্ধমনস্ক। জার্মানি, ইতালি ও জাপান তাদের দায়দায়িত্ব মানতে নারাজ হয়। তবুও লিগ ছোটখাট আন্তর্জাতিক অনেক সমস্যার সমাধানে সমর্থ হয়। গণভোট গ্রহণ, জনবিনিময়, শরণার্থীদের পুনর্বাসন, শ্বেতকায় ক্রীতদাস প্রথার অবসান, আফিঙের চোরা বাণিজ্য দমন, বিভিন্ন দেশে স্বাস্থ্য সমীক্ষা পরিচালনা ইত্যাদি কাজে লিগ সফল হয়। নিষ্ফলতার নিরিখে চোখে পড়ে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের আয়োজনে ব্যর্থতা ইত্যাদি। দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধে (১৯৩১) জাপানের বেপরোয়া আচরণ ও মাঞ্চুরিয়া অধিকার (১৯৩৭), বলিভিয়া ও প্যারাগুয়ের যুদ্ধ, নাৎসি আগ্রাসন অথবা ফ্যাসিবাদি ইতালির ইথিওপিয়ায় সম্প্রসারণের আচরণ ইত্যাদির মধ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তোষণ নীতি মিউনিক চুক্তিতে (১৯৩৮) পরিণত হওয়ার মধ্য দিয়ে লিগের অসারতা প্রমাণিত হয়। ১৯৪৬ খ্রি লিগ ভেঙে দিয়ে তার ভূমিকা ও বিষয়সম্পত্তি নবগঠিত রাষ্ট্রসংঘে বর্তায়।

সরকার (Government)

রাষ্ট্র ও সরকার সমার্থক নয়। সরকার হল রাষ্ট্রের একটি উপাদান বা অঙ্গ। বাস্তবক্ষেত্রে সরকারের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহ হয়। সে কারণে সাধারণ দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও সরকার অভিন্ন বলে বিবেচিত হয়। অবশ্য তত্ত্বগত পার্থক্য থাকলেও **লাস্কি**, জি ডি এইচ কোল্ প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কার্যক্ষেত্রে উভয় প্রত্যয়কে একার্থেই ব্যবহার করেছেন। লাস্কির মতে 'বাস্তব প্রশাসনে রাষ্ট্রই হল সরকার'। কোল্ অবশ্য কথাটা ভিন্ন প্রকারে ব্যক্ত করেছেন : 'লোকসমাজে সরকারের প্রশাসন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কলাকৌশলের বেশি কিছু নয়'। যাই হোক তত্ত্বগতভাবে সরকারের উপাদানগুলি দেখা যাক :

১. রাষ্ট্র হল এক বিমূর্ত সত্তা, যেটা সরকারের মধ্য দিয়ে ধরাছোঁয়ার একটা রূপ নেয় ;

২. রাষ্ট্র সার্বভৌমত্বের আধার ও দেশবাসীর অধিকারের উৎস, সরকারের কাজ হল ওই দুটিকে রক্ষা করা ;

৩. রাষ্ট্রের হয়ে সরকার কাজ করে, সরকারের বিরুদ্ধে লোকের অসন্তোষ থাকলে সেটা রাষ্ট্রের উপর বর্তায় না ;

৪. রাষ্ট্রের প্রাথমিক কল্পনা একটি ভূখণ্ডের ভিত্তিতে দানা বাঁধে ; সরকারের ধারণার ভিত্তি হল আইনসভা, প্রশাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ ;

৫. রাষ্ট্র একটি স্থায়ী সত্তা, যার সচরাচর পরিবর্তন ঘটে না ; পক্ষান্তরে সরকার পরিবর্তনশীল ;

৬. দেশের সমস্ত মানুষই রাষ্ট্রের সহজাত সদস্য ; কিন্তু সরকার গঠিত হয় **আইনসভা, বিচার বিভাগ ও প্রশাসন বিভাগের** সঙ্গে যুক্ত সকল সদস্য ও কর্মীকে নিয়ে ;

৭. রাষ্ট্রের বাঁধাধরা প্রধান উপাদান চারটি : জনসমাজ, ভূখণ্ড, সার্বভৌমতা ও সরকার। সরকারের বৈশিষ্ট্য দেশভেদে ভিন্ন হতে পারে, যেমন গণতন্ত্রী, স্বৈরতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী, এককেন্দ্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয়, সংসদীয় ইত্যাদি।

সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ (Totalitarianism)

একনায়কতন্ত্রী ও একদলীয় সরকার যার ভিত্তি হল ব্যক্তি ও সমগ্র জনজীবনের নিয়ন্ত্রণকারী রাষ্ট্রসর্বস্বতা। এর বিপরীত হল উদারনৈতিক মনোভঙ্গি, যেখানে রাষ্ট্রের কাজকারবার থাকে সীমিত ও নির্দিষ্ট, বাকি অন্যান্য সব বিষয় থাকে ব্যক্তিমানুষের সিদ্ধান্তসাপেক্ষ। রাষ্ট্রসার্বিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব ব্যক্তিগত ও জনজীবনের সর্বত্র প্রসারিত হয়। এবং তার দাবির কাছে সকলের সব সত্তাই থাকে বাঁধা। প্রত্যয়টি সাধারণত ইতালি ও জার্মানি যথাক্রমে মুসোলিনি ও হিটলারের ফ্যাসিবাদী ও নাৎসিপন্থী সরকারের প্রতি প্রযুক্ত হত।

বিশ শতকের কুড়ির দশকে শব্দটির চলন দেখা দেয় এবং সোভিয়েত দেশের (বিশেষ করে স্তালিন আমলের) প্রতিও প্রযুক্ত হয়। পঞ্চাশের দশকে প্রত্যয়টিকে অন্যান্য স্বৈরতন্ত্রী ধারা থেকে পৃথকীকরণের জন্য তার ছ'টি বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়, যথা : সার্বিক মতাদর্শ ; মতাদর্শের রূপায়ণে একটিমাত্র দলের স্থিরসংকল্প ; সুসংগঠিত গুপ্ত পুলিশ বাহিনী ; তিনপ্রকার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ : জনসংযোগ, অস্ত্রাদির ব্যবহার ও সর্বপ্রকার সংগঠনের (উৎপাদন সমেত) উপর খবরদারি।

সর্বহারা (Proletariat)

লাতিন শব্দ proles থেকে উৎপন্ন ইংরেজি proletariat কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ। অর্থ সন্তানসন্ততি (দরিদ্র শ্রেণীর গুচ্ছের ছেলেপুলে)। মার্কসীয় দৃষ্টিতে মজুরির আয়ে জীবন কাটানো এই শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্পত্তি বলে কিছু থাকে না। শ্রমবিক্রয়ের উপর তারা নির্ভরশীল। শ্রম মূলত কায়িক। বুর্জোয়া শ্রেণী দ্বারা শোষিত হয়। বুর্জোয়া শক্তির বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা বড় চালিকা শক্তি এবং কৃষক ও অন্যান্য শোষিত শ্রেণীকে সর্বহারা শ্রেণী নেতৃত্বদান করে।

সর্বোদয় (Sarvoday)

ইংরেজ লেখক জন রাসকিনের লেখা 'আনটু দিস লাস্ট' বইখানি মহাত্মা গান্ধীর মনে গভীর রেখাপাত করে। বাইবেলের সেন্ট ম্যাথুজ অধ্যায়ের একটি ছোট গল্পের অনুসরণে বইটি লিখিত। গান্ধীজি বইটি গুজরাতিতে অনুবাদ করে নাম রাখেন 'সর্বোদয়'। তার অর্থ সর্বজনের কল্যাণ। মানবসমাজের বিকাশে প্রথম প্রবণতা ছিল 'আপনি বাঁচ'; অর্থাৎ নিজের কল্যাণচিন্তা। পরবর্তীকালে সেটা হল, 'নিজে বাঁচ, ও অপরকে বাঁচার সুযোগ দাও (live and let live);' অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের কল্যাণবিধান; সেটা থেকেই এসেছে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের বিরোধ। তাই সর্বোদয় মতাদর্শে বলা হয়েছে সর্বজনের কল্যাণ, সকলের উদয়ের কথা। এ-নীতি নিছক 'নিজে বাঁচ ও অপরকে বাঁচাও' নয়। সর্বোদয়-সমাজের প্রাথমিক আদর্শ হল সমষ্টির কল্যাণচিন্তা। সমষ্টির কল্যাণেই ব্যক্তির কল্যাণ সাধিত হয়। অর্থাৎ নিজের কল্যাণ যেন অপরের অকল্যাণের কারণ না হয়ে ওঠে। গান্ধীজির মতে সর্বোদয় সমাজে উপনীত হবার পথ হল অন্ত্যোদয়। অর্থাৎ সমাজের সব শেষের লোকটির উদয়। সর্বোদয় দর্শনের মধ্যেই গান্ধীর বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি তথা গ্রামস্বরাজের কর্মসূচি নিহিত। জীবনের শেষ দিকে গান্ধীজি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে এক সমাজ গঠনের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু জীবদ্দশায় সেই ভাবনাকে সবিস্তারে বিবৃত ও রূপায়িত করতে পারেননি। ১৯৪৮ খ্রি ১৩-১৫ মার্চ তারিখে সেবাগ্রামে অনুষ্ঠিত গঠনমূলক কর্মীদের এক সম্মেলনে গান্ধীর ভাবধারায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের নিয়ে 'সর্বোদয় সমাজ' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। তার উদ্দেশ্য ছিল সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে এমন এক সমাজ গঠন যেখানে শোষণ ও জাতিভেদ থাকবে না; শ্রেণীহীন সমাজে প্রতি অধিবাসীর আত্মবিকাশের সমান সুযোগ সৃষ্টি ও ভারত রাষ্ট্রের অধিবাসীদের গ্রাম্যজীবনের অভিমুখী করা। গান্ধীজি সমস্ত গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের একীকরণ চেয়েছিলেন। তদনুযায়ী ১৯৪৮ খ্রি নিখিল ভারত সর্বসেবা সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাতে কয়েকটি সংস্থা মিশে যায়। ১৯৫১ খ্রি সংঘের পক্ষ থেকে সর্বোদয় পরিকল্পনা হিসেবে সর্বোদয় ভাবধারা অনুসারে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি গৃহীত হয়। ১৯৫২ খ্রি সেটি বিনোবা ভাবে কর্তৃক প্রবর্তিত ভূদান আন্দোলনে অঙ্গীভূত হয়। সর্বসেবা সংঘের কুড়ি দফা উদ্দেশ্যের মধ্যে সাম্প্রদায়িক একতা, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা নিবারণ, খাদি ও গ্রামশিল্প-দ্রব্য ব্যবহার, কৃষির উন্নতি, নঈ তালিম শিক্ষা, গ্রাম সাফাই, নারীপুরুষের সমানাধিকার, শ্রমিক ও ছাত্রদের উন্নতি, নীরোগতা, নেশাবর্জন, প্রাকৃতিক চিকিৎসা ইত্যাদি অন্যতম।

দ্র. গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ ; অহিংসা ; হিন্দ স্বরাজ ; সত্যাগ্রহ।

সহাবস্থান (Co-existence)

শব্দটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্তর্গত। অর্থ হল যে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী রাষ্ট্র পরস্পরে বিবাদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে

যে অবস্থা অনুযায়ী পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে। অর্থের দিক থেকে অনেকটা সাদৃশ্য থাকলেও **শান্তি** শব্দটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিভাষায় সুস্পষ্ট কিছু সহযোগিতার তাৎপর্য বহন করে। সহাবস্থান আরও কিছু বেশি অর্থবহ এইদিক থেকে যে রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধ হতে বিরত থাকে। সাধারণভাবে একথাই মনে করা হয় যে সহাবস্থানকে পাকাপোক্ত করতে হলে পরস্পরসম্মত কিছু রীতিনীতি থাকা চাই যাতে কার্যকালে অর্থবিপত্তি না ঘটে।

সহাবস্থান দ্বিপাক্ষিক চুক্তি তথা **বিবাদাবসান** (detente) প্রথার একটি রকমফের মাত্র, অনেকটা যেন বিদ্বেষী সম্পর্কের অবসান। তবে দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর শব্দটি নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। প্রথমত কমিউনিস্ট এবং অকমিউনিস্ট দুই শিবিরের মধ্যে সম্পর্কের মালিন্য তীব্র হয়ে ওঠে, যেটা মার্কসবাদী দৃষ্টিতে অবধারিত। দ্বিতীয়ত পারমাণবিক অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব যার বিনাশশক্তি থেকে বিজেতা ও বিজিত কারও রেহাই থাকে না।

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিশ্বের প্রধান দুই শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধের পরিবেশ কাটিয়ে ওঠার গুরুত্ব অনুভব করতে শুরু করে। ১৯৫৬ খ্রি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে দলের প্রথম সচিব নিকিতা ক্রুশ্চেভ শান্তির পথে কমিউনিজমের অগ্রগতির তত্ত্ব তুলে ধরেন।

তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই বলে এসেছে যে সহাবস্থান নীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য, কোনও দেশের শ্রেণী সংঘর্ষের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নয়। ১৯৬০ খ্রি মস্কোয় ৮১টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে বলা হয়েছিল যে 'বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির অর্থ এই নয় যে সোশালিস্ট ও বুর্জোয়া মতাদর্শের সমন্বয়। পক্ষান্তরে একথাই বোঝায় যে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম আরও তীব্র হবে, যাতে সোসালিস্ট চিন্তাধারা জয়ী হয়।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও পূর্বপশ্চিমের মধ্যে স্থিতাবস্থার (status quo) সম্পর্ক সৃজনের মনোভাব আন্দোলনের আকার লাভ করে।

১৯৫৪ খ্রি ভারত ও চীনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি **পঞ্চশীল** নামে অভিহিত। সেগুলি ১৯৫৫ খ্রি এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে ২৯টি আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রের সম্মেলনে সবিস্তারে গৃহীত হয়।

সহাবস্থান প্রত্যয়টি দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর কমিউনিস্ট এবং অকমিউনিস্ট দেশগুলির মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছে বটে, কিন্তু তার অভিঘাত অনেক বেশি বর্তায় আঞ্চলিক সংঘর্ষ নিবারণ ও উত্তেজনা প্রশমনে। যেমন ভারত পাকিস্তান কিংবা ইজরেল ও আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে।

সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law)

দেশের সংবিধানে প্রশাসন সম্পর্কিত বিষয়াদি, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের একটি বিভাগের সহিত অপর বিভাগের, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, নাগরিকগণের বিভিন্ন অধিকার,

নির্দেশমূলক রীতিনীতি, স্বীকৃত বিভিন্ন ভাষা, জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যেসব নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ থাকে। লিপিবদ্ধ সংবিধানে যদিও বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে অনেক কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু সংবিধান-বহির্ভূত বিভিন্ন আইন (যেমন প্রশাসনিক আইন) সময়-বিশেষে বিতর্ক সৃষ্টি করে। যুক্তরাজ্যের অলিখিত সংবিধানও আদালতে সাংবিধানিক আইন সম্পর্কে নানাবিধ ব্যাখ্যাদানের সুযোগ দেয়।

দ্র. সংবিধান

সাংস্কৃতিক বিপ্লব (Cultural Revolution)

সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তির বৈপ্লবিক রূপান্তরের সহায়ক মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারী বৈপ্লবিক চেতনায় বস্তু ও আদর্শগত যেসব ভুলভ্রান্তি থাকে তার মানসিক তথা সাংস্কৃতিক পরিমার্জনের জন্য লেনিন কর্তৃক প্রবর্তিত একটি প্রত্যয়। বস্তুগত অবস্থা ও আত্মগত অবস্থা, উভয়েরই পূর্ণতাপ্রাপ্তির উপর বিপ্লব নির্ভর করে; অর্থাৎ বাস্তব পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সুসমঞ্জস মনোগত ভাবভঙ্গির যুগপৎ রূপান্তর চাই। উপযোগী মনোগত অবস্থা আত্তীকরণের একটি আবশ্যকীয় মাধ্যম হল সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যার ফলে বুর্জোয়া সংস্কৃতিগত রীতিনীতি ও অভ্যাসগুলি ভেঙে পড়ে; এবং তাতে পুরানো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমির মাটিও যেন পায়ের তলা থেকে সরে যায়।

আধুনিক পর্যায়ে প্রত্যয়টি অনেকটা বিস্তারিত হয়েছে **গ্রামশির** তত্ত্বে এই অর্থে যে সাংস্কৃতিক **আধিপত্য** (hegemony) নিশ্চিহ্ন না হলে বিপ্লব সফল হয় না। এ ছাড়া এ শতকের ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব বাস্তবক্ষেত্রে প্রত্যয়টির প্রয়োগের অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে। চীনে আমলাতন্ত্র ও শিক্ষিত উচ্চবিত্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল; বলা বাহুল্য উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের অনুকূল মনোগত অবস্থা সৃষ্টি করা; কিন্তু আন্দোলনের ধারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়; উলটে পুরানো রীতিনীতির প্রতি লোকের আসক্তি সুদৃঢ় হয়। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিক্ষাব্যবস্থায় পশ্চিমি সংস্কৃতি ও বুর্জোয়া প্রভাব থেকে মুক্তির সংগ্রামী প্রয়াসের সময় যাঁদের পশ্চিমি ধারার প্রতি প্রবণতা বেশি ছিল তাঁদের নিগ্রহ ও পদাবনতির ক্ষমতা দেওয়া হয় অবচীন রেড গার্ডদের।

সামন্ততন্ত্র (Feudalism)

সাধারণ দৃষ্টিতে এটি হল ইউরোপে অভিজাত, সামরিক ও ধর্মীয় সম্পর্কের মিশ্রণে এক সমাজব্যবস্থা যার ভিত্তি ছিল প্রায় সর্বাংশে ভূমিব্যবস্থা। কারণ অর্থনীতি সে সময়ে মূলত কৃষিভিত্তিক ছিল। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে প্রাচীন স্যাক্সন আমল থেকে প্রাক্-আধুনিক সময় অবধি সামন্ততন্ত্রী সমাজব্যবস্থা দেখা যেত। মোটামুটি ভাবে ফরাসি বিপ্লবের কাল ১৭৮৯ পর্যন্ত ইউরোপে সামন্ততন্ত্র প্রবল ছিল। ইংল্যান্ডে ক্রমওয়েলের (১৬৬০) আমলে একটি আইনের সাহায্যে ও রাশিয়াতে অক্টোবর বিপ্লবের (১৯১৭) পর সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটে। বস্তুত আধুনিক শিল্পবাণিজ্যের

অগ্রগতি এবং বুর্জোয়া (নগরবাসী) শ্রেণীর আধিপত্যবৃদ্ধি সামন্ততন্ত্রের সমাধি রচনা করে। তাহলেও তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশে বিশ শতকের শেষ দশকেও সামন্ততন্ত্র অল্পবিস্তর বিরাজ করে। শব্দটি কোন বিষয়াধীন— অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি ও আইন— কোনটির অন্তর্গত সে ব্যাপারে মতানৈক্য আছে।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে বিচার করে ম্যাক্স ওয়েবার বলেছেন যে সামন্ততন্ত্র হল এক ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা "যার ভিত্তি হল নিরন্ত্র ও পদানত জনসমষ্টির শ্রমিকদের খাজনা কিংবা শ্রমের উপর নির্ভরশীল এমন এক শাসকশ্রেণী যারা ভূমির সুবিধা ভোগ করে এবং তার বিনিময়ে যুদ্ধ ও রাজশক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ করে"। এই শাসকশ্রেণী ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে কার্যত বিকেন্দ্রিত স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী ছিল। মার্ক ব্লক তাঁর 'ফিউডাল সোসাইটি' গ্রন্থে বলেছেন যে সামন্ততন্ত্রের নৃপতিরা কখনও দুর্বল, কখনও বা শক্তিশালী ছিল। কেন্দ্রীয় রাজশক্তি সামন্ততন্ত্রের মৌল বিধিব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করত না। মৌল ব্যবস্থাধীনে যুদ্ধ করার বিনিময়ে পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি বা জায়গীর (fief), সামন্ত (vassalage) এবং তালুক (manor) প্রথায় বিভক্ত ছিল। সামন্তদের অস্ত্রশস্ত্র ও অনুচর থাকত। লর্ড খেতাবধারী অভিজাত অর্থাৎ ভূস্বামীরা নিজেদের গৃহে কিংবা জমিজমা দিয়ে সামন্তদের পোষণ করত। জমির স্বত্ব (fief) ক্রমে বংশধরদের উপর বর্তায়, দুর্বল নৃপতিদের আমলে স্থানিক স্বায়ত্তাধিকার বৃদ্ধি পায়। ভূস্বামীদের খাস প্রজারা তালুকে বাস করত। ক্রীতদাসবৎ দায়বদ্ধ কৃষকেরা (serf) ভূস্বামীদের জমি চাষ করে উদ্বৃত্তের একটা মোটা অংশ ভূস্বামীকে দিত। জমি হস্তান্তরের সময় তারাও হস্তান্তরিত হত। ব্যবস্থাটি ছিল খুব জটিল। ছোট ভূস্বামীরা বড় ভূস্বামীদের সামন্ত ছিল, আবার বড় সামন্তরা ছোট সামন্তের ভূস্বামী ছিল। সমগ্র ব্যবস্থার অর্থনৈতিক বনিয়াদ অনুগত কৃষক ও কারিগরদের উপর নির্ভর করত।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কস সামন্ততন্ত্রের উৎপাদনব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করেন। ক্রীতদাসবৎ কৃষকদের উপর সামন্তবর্গের শোষণ তথা তাদের সঙ্গে ভূস্বামী ও সামন্ততন্ত্রী রাষ্ট্রের সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামের উপর মার্কস গুরুত্ব আরোপ করেন। অর্থনীতিবিদ মরিস ডব-এর বক্তব্য হল যে সামন্ততন্ত্র বুঝতে হলে কৃষকদের কৃষিজাত পণ্যের উদ্বৃত্ত ভূস্বামীরা কীভাবে গ্রাস করত এবং কৃষকেরা কীভাবে তার প্রতিরোধ করত তা দেখা দরকার।

আইনগত দৃষ্টিকোণেও সামন্ততন্ত্রের বিচার করা হয়েছে। বিভিন্ন বিধিব্যবস্থা সংকলিত হয়েছে। তার মাধ্যমে নানারকম দায়দায়িত্ব ও পরিষেবা নিয়ন্ত্রিত হয়। যতভাবেই সংজ্ঞা ও চরিত্র নিরূপিত হোক না কেন সামন্ততন্ত্র মূলত ইউরোপের একটি সমাজব্যবস্থা। তা হলেও অন্যান্য দেশের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে তার কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে।

মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের বিচারে সমাজবিবর্তনের একটি পর্যায় হল সামন্ততন্ত্র। তার পূর্বে ছিল ক্রীতদাস-প্রথা এবং পরে বুর্জোয়া ধনতন্ত্র। সামন্ততন্ত্রে ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে মোটামুটি দু ধরনের উৎপাদনব্যবস্থা লক্ষিত হয়। তার মধ্যে প্রথমটি হল বেগারশ্রম (corvee)। তাতে ভূস্বামী ও কৃষক— উভয়েই জমির স্বত্বাধিকারী ছিল। তাতে কৃষক ভূস্বামীর জমি সপ্তাহে ৩ থেকে ৬ দিন চাষ করত। তার পুরো ফসলই চলে যেত ভূস্বামীর ঘরে। বাকি দিন ও সময়ে কৃষকেরা দিবারাত্র নিজস্ব জমিতে চাষ

করত। দ্বিতীয়টি হল ভাগে চাষ (quit rent) প্রথায় ভূস্বামী সব জমি কৃষকদের বিলি করে দিত। কৃষকেরা নগদে কিংবা পণ্যে উৎপাদনের বৃহদংশ ভূস্বামীকে দিতে বাধ্য থাকত।

সামন্ততন্ত্রী জনসমাজ তিনটি শ্রেণীতে (estates) বিভক্ত ছিল : ১. মানুষের ধর্মীয় প্রয়োজন মেটাত যাজকশ্রেণী ; ২. দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল সম্রাট ও ছোটবড় রাজারাজড়াকে নিয়ে ; ৩. তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রধানত উৎপাদনকারী লোকেরা, অর্থাৎ কৃষক, কারিগর ও শ্রমজীবীরা। সর্বশ্রেণীর মানুষই পারস্পরিক দায়দায়িত্বের সম্পর্কে নির্ভরশীল ও সংবদ্ধ ছিল।

সামন্ততন্ত্রের তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবী হল ঈশ্বরের। লোকের ধর্মীয় বিষয়াদির দায়িত্ব পোপকে ঈশ্বর দিয়েছেন এবং জাগতিক ক্রিয়াকর্মের অধিকার সম্রাটকে প্রদান করেন। রাজত্বের অধিকার রাজারাজড়াদের এবং ভূমির অধিকার ভূস্বামীদের (ডিউক, কাউন্ট, ব্যারন) মধ্যে বিতরিত হয়। উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত ভূস্বামী ও সামন্তদের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থে নানাবিধ দায়দায়িত্ব থাকত। খ্রিস্টীয় মঠের মোহন্তরা চার্চের নিজস্ব জমি ছাড়াও ভূস্বামীদের জমিও নিয়ন্ত্রণ করত। জীবন ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য কৃষকেরা রাজন্যবর্গের জমিতে বসবাস করত।

সামরিক শাসকচক্র (Junta)

লাতিন junta থেকে উৎপন্ন ইংরেজি junta কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ। ইতালি ও স্পেনে প্রশাসনিক সংসদ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১৮০৮ খ্রি স্পেনে এই নামে নাপোলিয়ঁ-র অভিযানকে প্রতিরোধ করার জন্য একটি সংসদ গঠিত হয়। ক্ষমতাসীন কোনও গোষ্ঠী বা উপদল বোঝাতেও শব্দটির প্রচলন আছে, বিশেষ করে যেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে সেনানী গোষ্ঠী বলপ্রয়োগ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতাসীন সেনানী সংসদ এককভাবে সামরিক সরকারের মাধ্যমে যাবতীয় আইন প্রণয়নের ও নির্বাহী বিভাগের কাজ করে।

সামাজিক চুক্তি (Social Contract)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন যে-সব তত্ত্ব আছে তার অন্যতম হল সামাজিক চুক্তিতত্ত্ব। যে তিন দার্শনিক এই তত্ত্বের উদ্ভাবক তাঁরা হলেন **টমাস হব্‌স্** (১৫৮৮-১৬৭৯), **জন লক** (১৬৩২-১৭০৪) এবং **জাঁ জ্যাক রুসো** (১৭১২-১৭৭৮)। তত্ত্বটির মূলকথা হল যে সমাজ-বিবর্তনের আদি পর্বে মানুষ এক অলিখিত চুক্তির মাধ্যমে তার কাজকর্মের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সমর্পণ করেছিল এই শর্তে যে সমাজও মানুষের কিছু অধিকারকে রক্ষা করবে। সেই অধিকারগুলি হস্তান্তরযোগ্য নয়, কিন্তু কালক্রমে সেগুলি সব স্বীকৃতি পায় না। জন্মাবধি মানুষ স্বাধীন হলেও সর্বত্র সে শৃঙ্খলাবদ্ধ। সেজন্য সেই সব মানবাধিকারগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজ সৃজনের জন্য যথোচিত ব্যবস্থাগ্রহণ সঙ্গত।

এই তত্ত্ব অনুসারে বিশ্বের ইতিহাস দুটি কালপর্বে বিভক্ত। একটি হল রাষ্ট্রসৃষ্টির পূর্বের অধ্যায় এবং অপরটি তার পরবর্তী অধ্যায়। প্রথমটি প্রাকৃতিক পর্ব হিসেবে

অভিহিত, যে সময়ে রাষ্ট্র বা সরকারের মতো কোনও রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি হয়নি। স্বভাবতই আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ এবং বিচারালয় বলে কিছু ছিল না। আইন না থাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলাও ছিল না। মানুষ সেই অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকতে চায়নি। কালক্রমে তারা রাষ্ট্র ও সরকার গঠন করে। সেজন্য তারা পারস্পরিক চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ হয়।

হবস, লক ও রুসো এই ব্যাপারে একমত ছিলেন যে রাষ্ট্র মূলত মানুষের সৃষ্টি। তাঁদের মধ্যে পার্থক্যের বিষয় ছিল রাষ্ট্রসৃষ্টির পূর্বে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ কীভাবে থাকত ? কীসের তাগিদে মানুষ চুক্তিবদ্ধ হল ? কী শর্তে বিভিন্ন লোকে চুক্তিতে আবদ্ধ হল ? এবং চুক্তি কাদের মধ্যে হয়েছিল ?

সমালোচকদের মতে চুক্তিসম্পাদনের তত্ত্ব অবাস্তব ; তাঁদের মতে আইনের মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (Communal Award)

প্রাক্-স্বাধীন ভারতে প্রাদেশিক আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব এবং কর্মসংস্থানে ধর্মীয় এবং হিন্দু বর্ণব্যবস্থা-গত সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন ও আসন সংরক্ষণবিধি। ভারতে মুসলিম নাগরিকদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিধিব্যবস্থা মর্লে-মিন্টো সংসদীয় শাসনসংস্কারে (১৯০৯) সর্বপ্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের লাখনৌ চুক্তিতে (১৯১৬) কংগ্রেস সেই পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল। কুড়ি ও ত্রিশের দশকে পঞ্জাবে অকালি দল, দক্ষিণ ভারতে জাস্টিস পার্টি, হিন্দু মহাসভা, বি আর অম্বেডকরের নেতৃত্বে হিন্দু অনুন্নত সম্প্রদায় প্রভৃতি সংগঠন নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি জানায়। গোল টেবিল বৈঠকেও সেই মনোভাব প্রতিফলিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩২ খ্রি ১৬ অগস্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড পার্লামেন্টে আসন্ন ভারত সংসদীয় শাসনসংস্কারের (১৯৩৫) মধ্যে 'রিপ্রেসেন্টেশন অব দ্য ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান কমিউনিটিজ ইন দ্য প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেচার্স' নামে এক গুচ্ছ প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। সেটি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নামে খ্যাত।

এই বাঁটোয়ারায় মুসলমান, শিখ, ক্রিশ্চিয়ান, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর সংস্থান করা হয়। ওই সব বর্গবহির্ভূত ভোটদাতারা সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর তালিকাভুক্ত হন। হিন্দু অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী থাকলেও সাধারণের ক্ষেত্রেও তাঁদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। বঙ্গদেশের আইনসভায় মুসলমানদের ৪৮.৪ শতাংশ এবং হিন্দুদের ৩৯.২ শতাংশ আসন প্রদত্ত হয়। অনুন্নত শ্রেণীর জন্য আসন পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে গান্ধীজি অনশন শুরু করেন। তখন তিনি পুনায় য়েরবাদা কারাগারে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য বন্দি ছিলেন। অম্বেডকরের সঙ্গে তাঁর বিখ্যাত পুনা চুক্তির মাধ্যমে ওই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়।

সরকারের এই নববিধান সম্পূর্ণ মনঃপূত না হলেও মুসলিম লিগ সেটা মেনে নেয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে (জুন, ১৯৩৪) সেটা গ্রহণ বা বর্জন

কোনওটাই করা সম্ভব হয়নি। বছর তিনেক পরে এ আই সি সি অধিবেশনে (অক্টোবর, ১৯৩৭) কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ব্যবস্থার বিরোধিতা করে।

সাম্প্রদায়িকতা (Communalism)

ভারতে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় ব্যবহারবহুল ইংরেজি কমিউন্যালিজম-এর বাংলা প্রতিশব্দ। ইংরেজিতে শব্দটির আভিধানিক অর্থের সঙ্গে ভারতীয় রাজনৈতিক পরিভাষায় নিত্যব্যবহৃত এই শব্দটির মিল নেই। শব্দটি ভারতীয় রাজনীতিতে প্রধানত হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিরোধ ও বিদ্বেষসূত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জাতপাতের সংঘর্ষকে কিংবা ইসলামধর্মীদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি ইত্যাদি দাঙ্গাহাঙ্গামাকে কোনও কোনও লেখক সাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত করেন। সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বিস্তর আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় আজকাল। কিন্তু কথাটির সংজ্ঞা বিশেষ তৈরি হয়নি। সমসাময়িক লেখকদের রচনা থেকে শব্দটির সংজ্ঞা ও তাৎপর্য নিরূপণ করা যাক।

আবু সয়ীদ আইয়ুব সাম্প্রদায়িকতা বলতে বুঝতেন ধর্মের চেয়ে ধর্ম-সম্প্রদায়কে এবং ব্যক্তির চেয়ে গোষ্ঠীকে বড় করে দেখা। যে নিজেকে সব সময়ে হিন্দু বা মুসলমান বলে ভাবতে অভ্যস্ত, অন্যের সঙ্গে পরিচিত হলে তার চরিত্র, বিদ্যাবুদ্ধি, রাজনৈতিক মতাদর্শ ইত্যাদির খোঁজ না নিয়ে প্রথমেই জানতে চায় লোকটি ব্রাহ্মণ না শূদ্র, হিন্দু না মুসলমান, ইহুদি না খ্রিস্টান, সে সাম্প্রদায়িক মানুষ। বদরুদ্দীন উমরের দৃষ্টিতে কোনও ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয় যখন সে এক বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্ম-সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচারণ এবং ক্ষতিসাধন করতে প্রস্তুত থাকে।

যে অর্থে শব্দটি ভারতে চলে আসছে সেটি একান্তই এদেশের নিজস্ব। তার মূলে আছে ধর্মগত বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ এবং সেটাও প্রধানত হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে। সাম্প্রদায়িকতার কারণস্বরূপ তার পশ্চাতে অনেকে একমাত্র অর্থনৈতিক বৈষম্য ও রেষারেষি প্রত্যক্ষ করেন। অর্থনৈতিক বৈষম্য ঘুচে গেলে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য থাকবে না বলে তাঁদের বিশ্বাস। দ্বিতীয়ত জওহরলাল নেহরু প্রমুখ অনেকের অভিমত হল যে সাম্প্রদায়িক সমস্যাটি ইংরেজ শাসকদের ভেদনীতির পরিণাম।

উল্লিখিত উভয় ধারণা যাঁদের কাছে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয় ও অতিসরলীকৃত হিসেবে বিবেচিত তাঁদের অভিমত হল যে সাম্প্রদায়িকতা বিষয়টি জটিল এবং ভারতীয় সমাজের একটি দীর্ঘকালের মজ্জাগত ব্যাধি। ব্রাহ্মণ্য তথা হিন্দুধর্মের বর্ণাশ্রম হতে বর্ণবিভেদ ও বর্ণসংঘর্ষ উদ্ভূত, যেটা প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। বর্ণগত অসমতার দরুন হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে এসেছে, আর্থিক অসাম্যের প্রশ্ন সেদিক থেকে নিতান্তই গৌণ। ঠিক তেমনি হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ সহস্রাধিক বছরের পুরানো। হিন্দুদের উপর মুসলমান শাসকদের অত্যাচার, ধর্মান্তরকরণ ইত্যাদি তার আদি কারণ। আসল কারণ অবশ্য আরও মূলে নিহিত।

সামাজিক ক্রিয়াকানুনের দিক থেকে হিন্দু সমাজ অনমনীয়, কিন্তু ধর্মের বিষয়ে হিন্দুরা উদার। মুসলমানদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা তার বিপরীত। তারা ধর্মের ক্ষেত্রে

কঠোর, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে উদার। শহুরে হিন্দুদের নিজেদের মধ্যে বর্ণাশ্রমের সামাজিক প্রাচীর ভাঙা অতি সামান্য শুরু হলেও, মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের কোনও ক্ষেত্রেই সামাজিক সম্পর্ক, অর্থাৎ খানাপিনা ও বিবাহ সম্পূর্ণ অচল। তা ছাড়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গোমাংস পারস্পরিক সংমিশ্রণের (fusion) এক মস্ত বাধা।

কোনও অর্থনৈতিক সাম্যবাদ ভারতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংমিশ্রণের সেতুবন্ধ রচনা করতে সক্ষম নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ শতকের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কাল সোভিয়েত দেশে অর্থনৈতিক সাম্য থাকা সত্ত্বেও সেখানেও সাম্প্রদায়িক বিরোধ তীব্র। ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিদ্বেষ যে ইংরেজের সৃষ্ট নয় সে-কথা উপরের আলোচনায় বলা হয়েছে। তবে ভারতীয়দের মধ্যে যাবতীয় বিভেদ ইংরেজ তার প্রশাসনিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে। ভারতে ভাষা, প্রদেশ, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি যাবতীয় বিভেদের ধারাকে ইংরেজ কাজে লাগিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রাপ্তির এতকাল পরেও সেসব বিভেদ, বিশেষ করে হরিজন-পীড়ন, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা অব্যাহত আছে।

মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকদের মতে ভারতে একটি রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রয়োজন, যার মূল কথা হল মানুষই সব কিছুর মানদণ্ড, ঈশ্বর নয়; এবং ধর্মতন্ত্রের পরিবর্তে চাই যুক্তিবোধ, নৈতিকতা ও ইহমুখী জীবনবোধের সঞ্চার, যার ফলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী ও মৌল সমাধান ঘটবে।

সাম্য (Equality)

সাম্যের আদর্শ ও মনোভঙ্গি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। আরিস্তোতল মানুষে-মানুষে বৈষম্য-রীতির নিন্দা করেন। উত্তরকালে সমতা তথা সাম্যের আদর্শে অন্যান্য দার্শনিকেরাও উৎসাহিত হন। সামাজিক সাম্য মোটামুটি তিন ধরনের: ১. সুযোগের সমতা, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে যাবতীয় প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক পদমর্যাদার অধিকার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নারীপুরুষ, জাতি, ধর্ম, ভাষা ও অর্থনৈতিক শ্রেণী নির্বিশেষে প্রবেশে সমানাধিকার; ২. অবস্থার সমতা। জীবন ও জীবিকার মান এবং উপার্জনে সমতা। সুযোগের সমতা নিষ্ফল হয় যদি জীবনযাত্রার মান মানুষ নির্বিশেষে সকলের সমান না হয়। সমান সুযোগ যাঁরা চান তাঁরাও ব্যক্তিবিশেষের মেধা ও যোগাতার সাহায্যে অর্জিত বিষয়আশয় ও সাংস্কৃতিক সুবিধা পরবর্তী প্রজন্মে যখন বর্তায়, তখন সেটাকে উপভোগ করেন। মানুষে-মানুষে জীবনমানের অসাম্য সুযোগের সাম্যকে বাধাদান করে। সবাই একই জায়গা থেকে জীবনযাত্রা শুরু করে না; ৩. ফলাফল ও পরিণামের সমতা। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী অনুযায়ী ভিন্ন রীতিনীতি ও কর্মপন্থা অনুসৃত হয়, যাতে প্রথম পর্যায়ের বৈষম্যকে শেষ পর্যায়ে সাম্যে রূপান্তরিত করা যায়। নারী, শিশু ও পশ্চাৎপদ নিম্নবর্ণের মানুষের কল্যাণে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে যেসব অতিরিক্ত সুবিধা প্রদত্ত হয় সেটা অনেকটা ক্ষতিপূরণের মতো ঘটে, অন্যথায় সাম্যের প্রশ্ন প্রহসনে পরিণত হয়।

সামাজিক সাম্য ছাড়াও আরও তিন রকমের সাম্য আছে: ১. আইনের দৃষ্টিতে সমতা। যখন কোনও ব্যক্তি একটি সার্বভৌম দেশের নাগরিক, তখন তার অধিকার সেখানকার বিধিবদ্ধ যাবতীয় আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তা হলেও সবাই সেখানে

সমান সুযোগের অধিকারী নয়, মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীরা সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্কের মতো সমান অধিকার পায় না। ক্রীতদাস প্রথা যখন ছিল তারাও সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে। নারীর সমান অধিকারের প্রশ্ন এখনও অনেক দেশে অমীমাংসিত। আইনত সমানাধিকার থাকলেও কার্যত সবসময়ে থাকে না। ধনী ও দরিদ্র উভয়েই আইনের চোখে সমান। কিন্তু দরিদ্রের পক্ষে আইনের সুযোগ গ্রহণ সহজ নয়; ২. রাজনৈতিক সমতা। সাধারণ ভোটদান ও প্রার্থী হবার সমান অধিকার। এক্ষেত্রেও বিভিন্ন ব্যক্তির গুণাগুণ ও কর্মক্ষমতার প্রশ্ন থাকে, যার অভাবে অসমতা ফুটে ওঠে। রাজনৈতিক প্রাধান্যের শীর্ষে আরোহণ অর্জিত-গুণ ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে। অবশ্য রাজতন্ত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা ও পদমর্যাদা লাভ করা যায়; ৩. বিত্তগত সমতা। সমাজ-ব্যবস্থায় বিত্তের সাম্য বিষয়টি বিতর্কের অতীত নয়। কীভাবে সেটা কার্যকর করা যায়? অর্থাৎ নিরন্তর পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে হবে কি না। তার সঙ্গে স্বাভাবিক সুবিচারের এবং নিজের বিষয়সম্পত্তির উপর কারও স্বাধীন অধিকারের প্রশ্ন উঠতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধনের মাধ্যমে সাম্য প্রবর্তনের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। উল্লেখ্য, বিত্তগত সাম্যের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সাম্য জড়িত, সেক্ষেত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যের মূল্যবোধের নিরিখে বিষয়টির নিষ্পত্তি সহজ নয়।

পরিশেষে উল্লেখ্য, সাম্য ও শ্রেণীহীনতা এক কথা নয়। শ্রেণীর সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু শ্রেণীর বিলোপ হলেই সামাজিক ও অন্যান্য অসাম্যের অস্তিত্ব চলে যায় না।

সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism)

সাধারণ দৃষ্টিতে একটি দেশ কর্তৃক অপর একটি দেশের উপর প্রভুত্ব ও শাসন কায়েম করাকে সাম্রাজ্যবাদ বলে। মানবসভ্যতার গোড়া থেকেই মিশর, মেসোপটেমিয়া, আসিরিয়া, পার্সিয়াতে সাম্রাজ্য দেখা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রোমান, বাইজানটাইন, অটোমান, মোগল সাম্রাজ্য ছিল। বর্তমানকালে ইউরোপে শিল্পোন্নয়নের পর আধুনিক নেশন-স্টেটের উদ্ভব ঘটে। সেগুলির বাণিজ্যিক প্রয়োজনে সারা পৃথিবীতে পঞ্চদশ শতক থেকে নতুন দেশ আবিষ্কার ও উপনিবেশ স্থাপনসূত্রে সাম্রাজ্যবাদ নতুন আকারে গড়ে ওঠে। বলপ্রয়োগ করে ইউরোপীয় কিছু দেশ দুর্বল অন্যান্য দেশে আধিপত্য ও শাসন বিস্তার করে। স্পেন ও পোর্তুগাল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ব্যবসাবাণিজ্যের তাগিদে পদানত দেশগুলিতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সৃষ্টি করে। উনিশ শতকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিমণ্ডলীতে হল্যান্ড ও বেলজিয়াম যুক্ত হয়। ওই শতকে জাতীয় শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে বিলম্বের দরুন জার্মানি, জাপান ও ইতালি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি। তাই বিশ শতকে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়োজনে সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। উল্লেখ্য, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদ অনেকাংশে সমার্থক হলেও প্রত্যয় দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। অধীনস্থ উপনিবেশগুলিতে রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার কম দেওয়া হয়। দাসপ্রথা সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গ হলেও, প্রাচীনকালে বিজিত ভূখণ্ড মূল সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গে একীভূত হয়ে যেত। ফলে সেগুলি আর

উপনিবেশ হিসেবে বিবেচিত হত না।

সাম্রাজ্যবাদ শব্দটির সংজ্ঞা নিরূপণ সহজ নয়। নিন্দার্থে শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার চলে। সামরিক অভিযান ও ভিন্ন দেশ দখল না করেও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ গড়ে উঠেছে। তাহলেও সর্বগ্রাহ্য প্রচলিত অর্থে একটি দেশ অপর একটি দেশের উপর আত্মগরিমা জাহির ও অর্থনৈতিক শোষণের জন্য সশস্ত্র শক্তি নিয়ে নিজের সার্বভৌমত্ব আরোপ করে। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিষয় হিসেবে গুরুত্ব পাবার ফলে ইংল্যান্ডে সাম্রাজ্যবাদের স্বেচ্ছাচার ও উৎপীড়নের চেহারা ক্রমে বিভিন্ন রাজনীতিক ও সাংবাদিকের চোখে প্রকট হয়ে পড়ে। ১৯০২ খ্রি ইংল্যান্ডের একজন অর্থনীতিবিদ জন অ্যাটকিনসন হবসন (১৮৫৮-১৯৪০) তাঁর 'ইম্পিরিয়ালিজম' নামক গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আনুপূর্বিক আলোচনা করেন। আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধ থেকে হবসনের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের সাহায্যে হবসন দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ এশিয়া ও আফ্রিকাতে সামরিক শক্তির সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী যেসব লুঠতরাজ চালিয়েছে তার পিছনে ছিল তাদের নিজেদের ধনী শিল্পপতিদের উৎপন্ন শিল্পসামগ্রী বেচার উপযোগী নতুন বাজার খুঁজে বের করা এবং সেইসঙ্গে শস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহের অভিসন্ধি। হবসন প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সচেতনভাবেই যে পন্থা অনুসরণ করত সেটা একচেটিয়া পুঁজিবাদেরই লক্ষণ। হবসনের চিন্তার সূত্র ধরেই লেনিন ১৯১৬ খ্রি. লিখিত তাঁর *Imperialism the highest stage of Capitalism* গ্রন্থে বলেন যে একচেটিয়া পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ পর্যায় হিসেবে বিগত শতকের শেষে সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ঘটেছে যখন একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও আর্থিক মূলধন তাকে রাজনৈতিক দিক থেকে সর্বশক্তিমান করে তুলেছে এবং পৃথিবীকে প্রধান কয়েকটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে। পুঁজিবাদের অসমান উন্নয়নের ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে উৎপন্ন সামগ্রী ও উদ্বৃত্ত মূলধন রপ্তানি ও কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য বাজার তথা অনুন্নত দেশগুলিকে পদানত করা এবং নিজেদের বিশ্বের সেরা শক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। তার পরিণাম স্থানীয় বিনাশ ও বিশ্বযুদ্ধ। লেনিনের মতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটবে।

সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ছাড়াও অন্যান্য কারণও থাকতে পারে বলে অনেকের বিশ্বাস। জাতীয়তাবাদী আগ্রাসী নীতি, নেতাদের রাজনৈতিক আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা এবং বিশেষ কোনও মতাদর্শ প্রচার অথবা রক্ষার তাগিদেও অপর দেশ দখলের নজির দেখা গেছে।

দ্র. বি-উপনিবেশন তত্ত্ব

সার্ক (SAARC)

সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন-এর সংক্ষিপ্ত নাম। দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি রাষ্ট্রের এক আঞ্চলিক সংগঠন। সদস্য হল বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ভূটান, নেপাল, মালদ্বীপ ও ভারত। উদ্দেশ্য হল দারিদ্র্য,

নিরক্ষরতা, অপুষ্টি, রোগ প্রভৃতি সমস্যার সমাধানে সম্মিলিত আত্মনির্ভরশীল প্রয়াস এবং পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের উন্নতিবিধান। সার্কের স্থায়ী সদর দপ্তর কাঠমাণ্ডুতে অবস্থিত। সার্কের সনদ অনুযায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলির সরকারি প্রধানেরা বছরে একবার শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হন। সার্কের উদ্বোধন অধিবেশন হয়েছিল ১৯৮৫ খ্রি ডিসেম্বর মাসে ঢাকা শহরে। ১৯৯৩ খ্রি এপ্রিল মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সপ্তম শীর্ষ সম্মেলনে পারস্পরিক বাণিজ্যিক উদারনীতি প্রবর্তনকল্পে সাপ্টা (সাউথ এশিয়ান প্রেফারেনসিয়াল ট্রেড অ্যারেঞ্জমেন্ট) নামে একটি নীতি গৃহীত হয়। এ ছাড়া উগ্রপন্থী নিবর্তক আইন প্রবর্তনের জন্যও সদস্যদের অনুরোধ জানানো হয়।

সার্ব-ইসলাম (Pan-Islam)

উনিশ শতকের আশির দশকে অটোম্যান সাম্রাজ্যে উদ্ভূত আন্দোলন, যার উদ্দেশ্য ছিল সারা বিশ্বের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সহযোগ স্থাপন ও পুনর্জাগরণের প্রয়াস। কালক্রমে এই আন্দোলন ইহুদি-বিদ্বেষী, কমিউনিস্ট-বিরোধী এবং পশ্চিমি শোষণ ও সংস্কৃতি বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। একজন ধর্মগুরু তথা খলিফার অধীনে সমগ্র ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের রাজনৈতিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করাই ছিল তার বাণী। তুরস্কের খিলাফতি কর্তৃত্বের অধিকারী সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ছিলেন এই আন্দোলনের মূল অধিনায়ক। তাত্ত্বিক প্রবক্তা ছিলেন জামালউদ্দিন আফগানি (১৮৩৮-১৮৯৭) ; তিনি ১৮৯২ খ্রি নাগাদ কলকাতায় প্রচারসূত্রে আসেন এবং আবদুল লতিফ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের মনে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ সঞ্চার করেন। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময়ে পশ্চিমি মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে খলিফার পবিত্র জিহাদ ঘোষণা মুসলিম জনচিত্তে বিশেষ দাগ কাটেনি। বরং যুদ্ধের কিছুকাল পরে পরাজিত তুরস্কের অটোম্যান সাম্রাজ্যের অবসানের ফলে তুরস্কে যে ধর্মনিরপেক্ষ নবজাগরণ সূচিত হয় তার নায়ক **কেমাল আতাতুর্ক** খিলাফতি ক্ষমতাকে নির্মূল করে দেন। সার্ব-ইসলাম মতবাদ সেই থেকে আরব দেশগুলিতে আশ্রয় নেয়। ১৯২৬ খ্রি মক্কা ও কায়রোতে অল মোসলেম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। অনেক রাষ্ট্রনায়কই খলিফা পদের দাবিদার হন। কোনও ঐকমত্যে পৌঁছানো যায়নি। পরবর্তী দশকে ইরাক, ইরান, সিরিয়া, সৌদি আরব, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে ; কিন্তু সেটি বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি।

দ্র. তরুণ তুর্কি ; ইসলামি রাষ্ট্র ; বাথ পার্টি ; আরব লিগ।

সার্বভৌম কর্তৃত্ব (Suzerainty)

ফরাসি ভাষায় সুজরেন শব্দের অর্থ সামন্ততন্ত্রী লর্ড বা অধিরাজ এবং সুজরেনটির অর্থ সর্বোচ্চ বা সার্বভৌম কর্তৃত্ব। আন্তর্জাতিক আইনে প্রত্যয়টির অর্থ হল : একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর কোনও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব। সামন্ততন্ত্রে অধিরাজের অধীনে ভূস্বামীদের (vassal) অবস্থান এক্ষেত্রে তুলনীয়। ভূস্বামীদের রাজ্য স্বায়ত্তশাসনের সুবিধাদি ভোগ করে, কিন্তু সেগুলি অধিকতর শক্তিশালী সামন্ততন্ত্রী অধিরাজের

অধীনতা তথা সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকার করে। প্রাক স্বাধীন ভারতে দেশীয় রাজা সমূহের উপর ইংরেজ সরকারের সার্বভৌম কর্তৃত্ব বিরাজমান ছিল (কুপল্যান্ড)।

সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সার্বভৌমত্ব বলতে স্বশাসিত ও স্বাধীন রাষ্ট্র বোঝায়। superanus অর্থাৎ সর্বোচ্চ এবং sovrano অর্থাৎ ক্ষমতা— এই দুটি লাতিন শব্দ থেকে ইংরেজি Sovereignty শব্দটি উৎপন্ন। বাংলা প্রতিশব্দ হল সার্বভৌমত্ব বা সার্বভৌমিকতা, অর্থাৎ সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দেশ বা রাষ্ট্র, যেটা স্বাধীন।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একমাত্র দাবি হল সার্বভৌম সত্তা। সার্বভৌমত্বের অন্তঃসার হল স্বাধীনতা; রাষ্ট্রব্যবস্থায় **আইন** ও **অধিকারের** (authority) প্রকৃত উৎস হল সার্বভৌমত্ব। ফেডারাল রাষ্ট্রব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার হল আইন ও অধিকারের প্রকৃত উৎস। তার অধীনে অঙ্গরাজ্যগুলির সার্বভৌমত্ব সংকুচিত হয়ে পড়ে।

প্রাচীন কালে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হতেন রাজা বা নৃপতিরা। রাজাদের সার্বভৌম অধিকার নিয়ে যা কিছু আলোচনা চলত। ষোলো ও সতের শতকে ইউরোপে কোনও কোনও রাষ্ট্রদার্শনিক, বিশেষ করে ফরাসি দার্শনিক **জাঁ বোদাঁ** ও ইংরেজ দার্শনিক **টমাস হবস** এই অভিমত প্রকাশ করেন যে রাজার সার্বভৌমত্ব অসীম ও অবাধ হওয়া উচিত। রাজার সার্বভৌম অধিকার খর্ব করার কথা তখন ইউরোপে ভাবা হত না। রাজার থাকত সার্বভৌম ক্ষমতা, রাজার থাকত চূড়ান্ত ক্ষমতা। তবে রাজার স্বেচ্ছাচারী আদেশ দেবার ক্ষমতা থাকত না। রাজাকেও কিছু আইন ও রীতিনীতি মেনে চলতে হত। তাতে আইনানুগ স্বাধীনতার সঙ্গে একচ্ছত্র অবাধ অধিকারের পার্থক্য ফুটে উঠত। রাজশক্তির একচ্ছত্র ক্ষমতার যুগে (age of absolutism) কোনও কোনও রাজা নিরঙ্কুশ শাসনাধিকার প্রয়োগ করতেন, তাঁদের মধ্যে কারও কারও শিরশ্ছেদ ঘটে। গ্রোটিয়াস তাই চাইতেন সার্বভৌমত্বের উপর আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ন্ত্রণ।

রাজার একচ্ছত্র সার্বভৌম অধিকার ভোগের বিরুদ্ধে **প্রজাতন্ত্র** মতাদর্শের উদ্ভব ঘটে। এই মতাদর্শে বিশ্বাসীদের অন্যতম **জাঁ জ্যাক রুসো** মনে করতেন যে সার্বভৌমত্বের প্রকৃত অধিকারী রাজা নয়, প্রকৃত অধিকারী হল জনগণ। তবে প্রজাতন্ত্রীরা জনগণকে আইন সাপেক্ষ সার্বভৌমত্বের অধিকারী করেননি; করেছেন বাধাহীনভাবে। তাতে রবসপীয়েরের মতো ফরাসি জননেতারা জনগণের কাছ থেকে সার্বভৌমত্বের অধিকার নিজেদের হাতে নিয়ে আইনের উপর নিজেদের খাড়া করেছেন।

রুসোর মতো দার্শনিকেরা রাজার পরিবর্তে জনগণকে সার্বভৌমত্বের অধিকারী করায় জনগণের স্বাধীনতা স্বীকৃতি পায়, বিশেষ করে পরাধীন দেশের অধিবাসীদের তুলনায়। অবশ্য কার্যত ফরাসি বিপ্লবের পর বিশ্বের বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রী দেশ লোকের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বৃদ্ধি না করে সেটা বরং হ্রাস করেছে। প্রজাতন্ত্রী অনেক রাষ্ট্রশাসক সরকারকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলে। সেদিক থেকে অনেক সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে

লোকে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে।

ইংরেজ আইনজ্ঞ জন অস্টিন সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন যে, রাষ্ট্র আইন অনুসারে গড়ে ওঠে এবং আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত সংসদ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সেই অধিকার অবাধ, অসীম, চূড়ান্ত ও অবিভাজ্য।

সি আই এ (C I A)

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি নামক সংস্থার সংক্ষিপ্ত নাম। ১৯৪৭ খ্রি স্থাপিত এই সংস্থার উদ্দেশ্য হল প্রেসিডেন্টের জ্ঞাতার্থ বৈদেশিক তথ্য ও খোঁজখবরের সমন্বয় ও বিশ্লেষণ। এটির ডিরেক্টর হলেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সভাপতি। সংস্থাটি সরাসরি প্রেসিডেন্টের কর্তৃত্বাধীন। জন ফস্টার ডালেস যখন এটির ডিরেক্টর ছিলেন (১৯৫৩-৬১) তখন তার আগেকার উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে শত্রু ভাবাপন্ন দেশের, যেমন গুয়াটেমালা ও ইরান (১৯৫৩-৪) সরকার উলটে দেবার গোপন পরিকল্পনার কাজ যুক্ত হয়। ১৯৬১ খ্রি কিউবার অভ্যুত্থান বানচাল করে দেওয়া হয়।

পরবর্তী ডিরেক্টর জন ম্যাককেনের আমলে (১৯৬১-৬৫) উল্লিখিত ক্রিয়াকলাপ কমিয়ে দিয়ে তথ্যসংগ্রহের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অবশ্য ডিরেক্টরের অগোচরে বিদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র চলে। প্রেসিডেন্ট জনসন ও নিকসনের আমলে রিচার্ড হেলম ছিলেন ডিরেক্টর (১৯৬৬-৭৩)। সেসময়ে ওইসব গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ আবার শুরু হয়। ওয়াটারগেট আড়িপাতার কেলেঙ্কারিতে সি আই এ সংস্থাটির বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংকোচনের অভিযোগ ওঠে। ১৯৭৬ খ্রি নিযুক্ত একটি সেনেট কমিটি সি আই এ কার্যকলাপের কড়া নিয়ন্ত্রণ এবং মার্কিন কংগ্রেস ও জনসাধারণের কাছে জবাবদিহির সুপারিশ করে। ১৯৭৯ খ্রি সি আই এ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ হিসেবে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী সংসদ তেহরানে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের কর্মীদের দীর্ঘকাল গৃহবন্দি করে রাখে। প্রেসিডেন্ট রেগানের আমলেও দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় কোনও কোনও দেশে হস্তক্ষেপের অভিযোগ ওঠে।

সুবিধাবাদ (Opportunism)

ফরাসি মধ্যপন্থী জননেতা লিয়ঁ গামবেতা সম্পর্কে প্রত্যয়টি ১৮৭৬ খ্রি প্রথম প্রয়োগ করা হয়। তারপর থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে শব্দটি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। সাধারণ দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি নিজ স্বার্থে সর্ববিধ সুযোগ গ্রহণে আপস, ছলচাতুরি, অথবা বিশ্বাসভঙ্গ করতে দ্বিধা বোধ করে না তাকে সুবিধাবাদী বলা হয়। কমিউনিস্ট দৃষ্টিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী এবং শ্রেণী সমন্বয়কারী পন্থা হল সুবিধাবাদ। শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদ বিপ্লবী সংগ্রামের কৌশল পরিহার এবং পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কমিউনিস্ট আন্দোলনে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের লক্ষণ হল বুর্জোয়া প্রভাবিত শ্রমিক আভিজাত্য ও পুঁজিবাদী সমাজে মধ্যপন্থী ধারায় স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলনের উপর নির্ভরতা,

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিহার এবং শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের প্রয়োজন অস্বীকার। পক্ষান্তরে বামপন্থী সুবিধাবাদ হল অত্যুৎসাহী ও হঠকারী বিপ্লবীপনা, যার মূলে থাকে শ্রেণীচ্যুত ব্যক্তি ও পাতি বুর্জোয়াসুলভ সর্বশক্তিমান বৈপ্লবিক হিংসায় বিশ্বাস। কমিউনিস্ট আন্দোলনে বামপন্থী সুবিধাবাদীরা শ্রমিক শ্রেণীকে জুয়ার ঘুঁটির মতো অর্থহীন আত্মত্যাগ ও অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দেয়।

সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-) (Bose, Subhas Chandra)

ভারতীয় রাজনীতির বামপন্থী ধারায় **শীর্ষস্থানীয়** নেতা ও **ফরওয়ার্ড ব্লক** দলের প্রতিষ্ঠাতা। কংগ্রেসের তিনি দুবার সভাপতি নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়ে অক্ষশক্তির সাহায্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ এবং ভারতের পূর্ব সীমান্তে সশস্ত্র অভিযান করেন।

একাধারে তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী ও সমাজতন্ত্রী ; চাইতেন পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে আপসহীন সংগ্রাম ; আচরণেও দেখা যেত তাঁর অদম্য মনোভাব। লেনিন, মুসোলিনি প্রমুখ বিচিত্র মনীষী ছিলেন তাঁর আদর্শ। বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের চিন্তা তাঁকে আকৃষ্ট করে। রাজনৈতিক জীবনে তাঁর গুরু ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। নিজে তিনি কোনও পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রতত্ত্ব রচনা করেননি। তাঁর বিভিন্ন রচনাদির মধ্যে 'অ্যান ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম' এবং 'দা ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' বই দুটিতে সুভাষচন্দ্রের মৌল চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

গান্ধীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পার্থক্য ছিল কেবল ভিন্ন পথে একই লক্ষ্যে পৌঁছনো। উভয়ের প্রেরণার উৎস ছিল গীতার বাণী। দুজনেই তাঁরা দেশের সনাতন ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক মূল্যবত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্য ও ভাবধারার সমন্বয়ে দুজনেই সামাজিক পুনর্গঠনের কথা চিন্তা করেন, তাঁদের সমন্বয়ী আদর্শ কেবল রূপায়ণের ভিন্ন পথ খোঁজে। তবুও সুভাষচন্দ্র গান্ধীবাদীতে পরিণত হননি। তার কারণ যত না মতাদর্শগত, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যবহারিক রাজনীতি।

সংসদীয় গণতন্ত্রে তাঁর আস্থা ছিল না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে তিনি কর্তৃত্বসম্পন্ন একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভব করেন। তাঁর মতে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়ে একটি নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন হওয়া চাই। তাই **ফ্যাসিজম** ও **কমিউনিজমের** এক তুলনামূলক আলোচনায় উভয়ের ভাল ও মন্দ দিকগুলি তুলে ধরেন। দুটি মতাদর্শই গণতন্ত্র বিরোধী ও পুঁজিবাদ বিরোধী ; ফ্যাসিজমে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিবিধান এবং কমিউনিজমের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রবর্তন ও ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান হল উভয়ের ভাল দিক। সেই নিরিখে তিনি ওই দুটির সারবস্তু যুক্ত করে তাঁর সাম্যবাদী তথা **সমন্বয়বাদ** রাষ্ট্রদর্শন প্রচার করেন।

সোভিয়েত (Soviet)

রুশদেশে ১৯০৫ খ্রি বিপ্লবে বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্ভূত শ্রমিক সংসদ। ১৯১৭ খ্রি সেগুলি বিপ্লবের মূল সংগঠনে পরিণত হয়। পরে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের স্তরবিন্যস্ত কাঠামো হয়ে দাঁড়ায়। দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা

সোভিয়েতগুলির উপর গিয়ে পড়ে, যাতে তৃণমূল স্তরে **গণতন্ত্র** প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ; কার্যত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি শাসনকাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরে সুপ্রিম সোভিয়েতের হয়ে কার্যনির্বাহ করে। দুই কক্ষে বিভক্ত সুপ্রিম সোভিয়েতে লোকে একদলীয় সমর্থনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

বিপ্লবের আগে সোভিয়েতগুলির উপর **মেনশেভিকদের** প্রচণ্ড আধিপত্য ছিল। কিন্তু **বলশেভিকদের** ক্ষমতা দখলের পর মেনশেভিকদের নির্মূল করে দেওয়া হয়। নিম্ন পর্যায়ের লোকেরা পার্টির সদস্য না হয়েও সোভিয়েতের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে, যদি পার্টি তাঁকে সমর্থন জানায়।

১৯৩৬ খ্রি আগে জেলা, আঞ্চলিক ও রাজ্যপর্যায়ে নীচ থেকে উপরে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সোভিয়েত গঠিত হত। উল্লিখিত সাংবিধানিক ব্যবস্থায় দেশের রাজনৈতিক প্রশাসনে সর্বসাধারণ যুক্ত হতে পারত। তাতে আইনসভা ও প্রশাসনের ক্ষমতা একত্র সংযুক্ত থাকত। রাজ্য ও স্থানীয় কর্তৃত্বের মধ্যেও সুসংবদ্ধ সম্পর্ক বিরাজ করত। ১৯৩৬ খ্রি নতুন সংবিধানে পরোক্ষ নির্বাচনের অবসান ঘটে। স্তর নির্বিশেষে সোভিয়েতগুলি জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে গঠিত হত।

সৈয়দ আমির আলি (১৮৪৯-১৯২৮) (Syed Amir Ali)

ভারতে মুসলমান সমাজে মননশীল আধুনিকতার সঞ্চার এবং মুসলিম জনমানসে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির সঙ্গে তাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠনের পুরোধা। হুগলি মহসিন কলেজের ছাত্র আমির আলির জন্ম কটকে এক শিয়া পরিবারে। ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি পাঠ সাঙ্গ করে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভার মনোনীত সদস্য হিসেবে এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে তিনি নিযুক্ত হন। সমকালীন নানান আন্দোলনে তাঁর ছিল সক্রিয় ভূমিকা। তিনি কলকাতা ন্যাশনাল ম্যাহোমেডান অ্যাসোসিয়েশন নামে মুসলমানদের প্রথম একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন (১৮৭৭)। আমির আলির বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে 'দ্য স্পিরিট অব ইসলাম' (১৮৯১) এবং 'এ সর্ট হিস্ট্রি অব দ্য স্যারাসেনস' (১৮৮৯) বিশেষ সমাদর লাভ করে।

তিনি চাইতেন নবম শতকের কিছু ব্যক্তির ব্যাখ্যানে নির্ভর না করে মুসলমানেরা তাদের স্বাধীন বিচার (ijtibad) ক্ষমতা প্রয়োগ এবং আধুনিক জীবনের প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তারা ইসলামকে বিশ্লেষণ করুক। তিনি মানতেন না যে নমাজ কেবল আরবি ভাষাতেই পড়তে হবে। ইসলামকে আমির আলির আধুনিকীকরণের প্রয়াস সাধারণের কাছে স্বভাবতই গ্রহণযোগ্য হয়নি। তিনি মনে করতেন যে ভারতের মতো একটি মধ্যযুগীয় আর্থনীতিক সমাজব্যবস্থায় একটি আধুনিক সংবিধান চাপিয়ে দিলে বর্ণহিন্দুরা নিচু জাতের হিন্দুদের উপর প্রভাব খাটাবে এবং অনুন্নত মুসলমানদের উপর যাবতীয় আধিপত্য চালাবে। মর্লে-মিন্টো শাসনসংস্কারের (১৯০৯) মাধ্যমে স্বতন্ত্র মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলী প্রবর্তনের পিছনে আমির আলির ছিল প্রত্যক্ষ ভূমিকা।

তিনি মনে করতেন যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম দুটি পরস্পর-বিরোধী মানসিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু সমাজব্যবস্থা অতি জটিল ও দুর্ভেদ্য ; তাতে জাতপাতের

বিধিব্যবস্থা কঠোর ও অলঙ্ঘনীয় ; শত শত বছর যাবৎ যাবতীয় সংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখা সেই সমাজে বহিরাগতদের প্রবেশ অসম্ভব। পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্ম গণতান্ত্রিক এবং সমাজতন্ত্রের অনুকূল। অসামান্য পাণ্ডিত্য ও সার্থক লেখনীশক্তির অধিকারী আমির আলি ছিলেন হিন্দু-মুসলিম বিভেদচিন্তার তাত্ত্বিক প্রবক্তা।

সৈয়দ আহমদ খাঁ (১৮১৭-১৮৯৮) (Syed Ahmed Khan)

উনিশ শতকে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা ও চেতনার বোধন ও স্বতন্ত্র ধারায় মুসলিম নবজাগরণের পুরোধা, মুসলিম রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আলিগড় আন্দোলনের প্রবর্তক এবং রাষ্ট্রচিন্তায় মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের জনক। কর্মজীবনে তিনি একজন করণিক থেকে মুনসেফের পদে উন্নীত হয়েছিলেন (১৮৪১)। ইংল্যান্ড পরিভ্রমণ, দিল্লির দরবারে (১৮৭৭) যোগদান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, বড়লাটের সংসদ ও ভারতীয় আইনসভার সদস্য হিসেবে কার্যনির্বাহ তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পশ্চিমি শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে তিনি ইসলামেরও নবরূপায়ণ চাইতেন। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি অনুবাদের জন্য তিনি গাজিপুরে একটি অনুবাদ সমিতি গঠন করেন (১৮৬৪)। আলিগড়ে মহমেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপনা (১৮৭৫) তাঁর সর্বপ্রধান কীর্তি। 'তাহজিবুল আখলাক' নামে তিনি একটি মাসিকপত্র বের করতেন ; তাতে তিনি ইসলামি সমাজের সংস্কারের প্রস্তাব করেন। সেজন্য তিনি সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ও মননশীল চেতনা সৃজনের উদ্দেশ্যে মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। কোরানকে তিনি যুক্তিশীল দৃষ্টিতে নতুনভাবে দেখতেন। প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয় ছিল তাঁর আদর্শ। হাজি শরিয়তউল্লাহ, দুদু মিঞা প্রমুখ রক্ষণশীল ইসলামি পুনঃপ্রবর্তনবাদীদের আন্দোলন থেকে আলিগড় আন্দোলন ছিল স্বতন্ত্র। সৈয়দ আহমদ চাইতেন ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ইসলামি ধর্মতত্ত্বের যুগপৎ প্রতিষ্ঠা।

প্রথম জীবনে সৈয়দ আহমদের মনে কোনও সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি ছিল না। তাঁর মতে একদিকে উচ্চবর্ণের আর্যহিন্দু এবং অন্যদিকে মুসলমানেরা ভিনদেশ থেকে এসে এদেশে বসবাস করছে। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধে চালিত না হলে একত্রে সহৃদয় সম্প্রীতির সঙ্গে তারা সুখ ও শান্তিতে জীবন নির্বাহ করতে পারে।

পরে তাঁর মনোভাব পরিবর্তিত হয়। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় তিনি তা থেকে মুসলমান সমাজকে সরে থাকার পরামর্শ দেন। ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে কোনও রকম সংঘাত তিনি চাইতেন না। জনপ্রিয় দেশীয় সরকার গঠন সম্পর্কে তাঁর ভয় ছিল যে তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠরা স্বৈরাচারী শাসন সৃষ্টি করবে ; সংখ্যালঘু তথা মুসলমানের স্বার্থ চাপা পড়ে যাবে।

স্তালিন, যোশেফ (১৮৭৯-১৯৫৩) (Stalin, Joseph)

বলশেভিক বিপ্লবে লেনিনের অন্যতম প্রধান সহকর্মী যোশেফ স্তালিন শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থপতি হিসেবে বিবেচিত। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী

ক্রিয়াকর্মে যুক্ত হন এবং ১৯০৪ খ্রি সোশাল ডেমোক্রেটিক আন্দোলনসূত্রে লেনিনের সান্নিধ্যে আসেন। জীবনে বহুবার তাঁর গ্রেপ্তার, কারাবরণ ও নির্বাসন ঘটে। ১৯১৭ খ্রি অক্টোবর বিপ্লবের পর বলশেভিক পার্টির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁকে দেখা যায়। ১৯২২ খ্রি তিনি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারির পদে অধিষ্ঠিত হন। লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪) পর তিনি একের পর এক ত্রৎস্কি, জিনোভিয়েভ, বুখারিন প্রমুখ পার্টির প্রবীণ ও শীর্ষস্থানীয় নেতাদের দল থেকে অপসারণ করেন। ১৯২৯ খ্রি মধ্যে তিনি পার্টি ও রাষ্ট্রের মধ্যে নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেন।

ত্রিশের দশকে কৃষিতে তাঁর কর্মপন্থা রূপায়ণসূত্রে যৌথ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দলে বিরোধী নেতাদের নির্মূল করেন তিনি। সামরিক শক্তি বৃদ্ধির তাগিদে তিনি দেশে ভারী শিল্পোন্নয়ন করেন। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধে নাৎসি বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার ফলে তাঁর অসামান্য কর্মনৈপুণ্য প্রশংসিত হয়। সমস্থানীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে একমাত্র তিনি আমরণকাল ক্ষমতায় আসীন ছিলেন।

স্তালিনের কর্মকুশলতা এবং কঠোর ও নির্মম প্রশাসনের ফলে একটি কৃষিপ্রধান অনুন্নত দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়। তাঁর পক্ষাপক্ষে নানারকম অভিমত আছে। যে মানসবস্তু শক্তিসম্পন্ন সোভিয়েত ও তার অনুগামী রাষ্ট্রগোষ্ঠীকে সুসংবদ্ধ ও আবিষ্ট করে সেটা ছিল স্তালিন-প্রবর্তিত সর্বনিয়ন্ত্রণকারী এক মতাদর্শ।

দ্র. স্তালিনবাদ

স্তালিনবাদ (Stalinism)

রুশ নেতা **যোশেফ স্তালিনের** জীবনকালে বা তাঁর জীবনাবসানের পর সরকারিভাবে তাঁর নামে কোনও মতবাদ প্রচলিত হয়নি। তিনি স্বয়ং **লেনিনবাদকে** নিজের মতাদর্শ হিসেবে তুলে ধরতেন। বস্তুত ১৯৫৬ খ্রি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যত্র লেনিনবাদের বিচ্যুতি স্বরূপ শ্লেষের সঙ্গে তাঁর সমালোচকেরা স্তালিনবাদ প্রত্যয়টি শিথিলভাবে ব্যবহার করে আসছেন।

১৯২৮ খ্রি নিরঙ্কুশভাবে ক্ষমতাসীন হবার পর ১৯৫৩ খ্রি তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্তালিনের ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ ও একচ্ছত্র ক্ষমতা। স্বভাবতই সেই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের যাবতীয় রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মপন্থা, ক্রিয়াকৌশল রূপায়ণের রীতিনীতি ও পদ্ধতি স্তালিনবাদ হিসাবে পরিগণিত। তবে স্তালিনবাদ নামে যা চলে আসছে তা সবই স্তালিন একা সৃষ্টি করেননি; রাশিয়ার ইতিহাস ও যে-রাজনৈতিক ধারায় বলশেভিক বিপ্লব ঘটে, বিপ্লবের পরবর্তী তথা স্তালিনের কার্যকালের পূর্ববর্তী পর্যায়ের পরিস্থিতি ও সমস্যা এবং স্তালিন আমলের আড়াই দশক কালের অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে স্তালিনবাদের মূল্যায়ন হওয়া ভাল। নইলে কেবল তাঁর স্বৈরাচার ও নৃশংসতার উল্লেখ একদেশদর্শিতা হয়ে দাঁড়ায়।

তত্ত্বগত দিক থেকে স্তালিনবাদের প্রথম ও প্রধান বিষয় হল তাঁর 'একদেশে সমাজতন্ত্র', (ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রি) সৃষ্টির তত্ত্ব। এর বিপরীত তত্ত্ব ছিল ট্রটস্কির বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্ন। স্তালিন চেয়েছিলেন বিশ্ব বিপ্লবের পথে পা বাড়াবার আগে একটি দেশে অন্তত সমাজতন্ত্র শক্ত মাটির উপর দাঁড়াতে সক্ষম হোক। অনেকের দৃষ্টিতে এটা ছিল স্তালিনের অন্ধ স্বাদেশিকতা। এ ব্যাপারে স্তালিন তাঁর বেশির ভাগ সহযোগীর অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিলেন।

প্রথম পর্যায়ে স্তালিনবাদের কৌশল স্তালিনেরই ভাষায় ছিল "উপর থেকে বিপ্লব" সাধন। তার ভিত্তি হিসেবে তিনি কৃষিপ্রধান সোভিয়েত দেশে দ্রুত শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হন। সেজন্য দেশের সমগ্র কৃষি ব্যবস্থাকে যৌথ খামারের আওতায় আনেন। কৃষকদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ দেখা দেয়। স্তালিন নির্মমভাবে সেসব দমন করেন। ভারী শিল্পব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তিনি ১৯২৯ খ্রি থেকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তন করেন। দ্রুত অর্থনৈতিক রূপায়ণের জন্য তাঁকে ক্ষমতার চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ, ব্যক্তিস্বাধীনতা রদ এবং দেশের সমগ্র জীবনধারাকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসতে হয়। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিকেও স্তালিনের আজ্ঞাবহ করে তোলা হয়। বিদেশের কমিউনিস্ট দল সমূহকেও স্তালিনের কর্মপন্থা অনুসরণ করতে হয়। ১৯২৮ খ্রি থেকে **কমিন্টার্ন**-এর সর্বময় কর্তৃত্ব স্তালেনের হাতে চলে যায়।

সোভিয়েত দেশে স্তালিনীয় বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। সন্ত্রাসের কাল হিসেবে অভিহিত এই সময়ে লক্ষ লক্ষ নাগরিকের জীবনহানি ঘটে ; অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম সারির নায়ক ও স্তালিনের একদা ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বুখারিন, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, রাডেক প্রমুখ প্রবীণ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে হত্যা করা হয়। ১৯৩৯ খ্রি মধ্যে দেশের যে শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে তাতেই বিদেশে সোভিয়েতের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ১৯৩৬ খ্রি স্তালিন নতুন সংবিধান রচনা করেন।

লেনিন অনুসৃত যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি ১৯২৮ খ্রি কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে বাতিল করে স্তালিনের নেতৃত্বে অন্যান্য দেশের সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলিকে সামাজিক ফ্যাসিস্ট আখ্যা দিয়ে সংকীর্ণ উগ্র নীতি গ্রহণ করা হয়। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি ফ্যাসিবাদ প্রবল হয়ে ওঠায় কমিন্টার্ন তার পরিত্যক্ত নীতি গ্রহণ এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে ওইসব লিবারাল ও সোসাল ডেমোক্র্যাটদের সহযোগে পপুলার ফ্রন্ট গঠন করে। স্তালিন বিরাট এক ফ্যাসিবিরোধী হিসেবে প্রতিপন্ন হন। কিন্তু লোকচক্ষে সোভিয়েতের সেই ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে যায় যখন নাৎসি জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন অনাক্রমণ চুক্তি করে (১৯৩৯)। সামরিক সুবিধা ও কৌশলের প্রয়োজনে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পোল্যান্ডের পূর্বাংশ ও তিনটি বাল্টিক দেশ দখল করে নিতে হয়। যুদ্ধে সোভিয়েতের প্রচুর জীবনহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়। যুদ্ধোত্তরকালে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবাধীনে স্তালিনীয় কঠোর রীতিনীতি অনুসরণ করে। ১৯৩৮ খ্রি স্তালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস রচনা করেন। বস্তুত স্তালিনবাদ হল ফলিত **মার্কসবাদ**। তবে অনেকের মতে রাষ্ট্রকে সমাজের নিয়ন্তা ও নিপীড়ক করে তুলে স্তালিন মার্কসবাদ থেকে সরে যান।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (Local Self-Government)

দেশের ছোট ছোট অঞ্চলে নির্দিষ্ট কিছু জন-পরিষেবা কাজের জন্য স্বশাসিত সংগঠন যেগুলি রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়। যুক্তরাজ্যে একসময় রাজকীয় সনদের সাহায্যে সীমিত শাসনক্ষমতাসম্পন্ন এক এটি অঞ্চলে 'বারো' নামক পৌরসভা গঠিত হত। বস্তুত ১৮৩৪ খ্রি 'পুওর ল' আইন প্রবর্তনের পর ইংল্যান্ডে স্থানীয় বোর্ড অব গার্ডিয়ানসগুলির উপর জনকল্যাণকর কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত হতে থাকে। ওই আইনে পৌরসভার সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয় এই বলে যে স্থানীয় অধিবাসীদের একটি আইনানুগ প্রতিভূ হল পৌরসভা যেটি নির্বাচিত একটি সংসদের মাধ্যমে অধিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করে ও তাদের কাছে দায়ী থাকে। ইংল্যান্ডের মতোই প্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৌরসভা গঠিত হয়, তবে কেন্দ্রের পরিবর্তে রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। স্থানীয় সরকার নামে সেখানে সেগুলি কথিত। পৌরসভা আইন প্রবর্তন করতে পারে, নানারকম কর বসাতে পারে, কিন্তু সরকারের সম্মতি অনুসারে। সরকারের অর্থবরাদ্দের উপর এইসব সংস্থাগুলিকে বেশ কিছুটা নির্ভর করতে হয়। ফ্রান্সেও নাপোলিয়ঁর আমল থেকে পৌরসভার মেয়রের উপর প্রভূত দায়িত্ব অর্পিত আছে। সাধারণভাবে পৌর এলাকায় রাস্তা নির্মাণ, জল সরবরাহ, রাস্তায় আলো জ্বালা, জঞ্জাল অপসারণ, গৃহনির্মাণবিধি বজায় রাখা ইত্যাদি পরিষেবাই প্রধান কাজ। পৌরসভার সংসদ রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্য হতে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়। তাদের দলীয় সচেতকও থাকেন। বিকেন্দ্রিত রাষ্ট্রকাঠামোয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা (বা সরকার) ক্রমোচ্চ বিধানসভা ও সংসদের রাজনীতিতে প্রবেশের সর্বনিম্ন প্রথম সোপান। কোনও কোনও পৌরসভার নিজস্ব নিয়মকানুন ও কার্যনির্বাহের জন্য আদালত, পুলিশ, রেলপথ, শিক্ষাবিভাগ আছে। স্থান ও সময়বিশেষে সরকারের সঙ্গে পৌরসভার বিরোধ হতে দেখা যায়, বিশেষ করে যেগুলি ভিন্ন দলের দখলে থাকে। স্থানীয় স্বার্থ তাতে অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হয়। সেকারণে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দলহীন প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে অনেকে মনে করেন। ভারতে পৌর এলাকার বাইরে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আছে। অবশ্য সেগুলির দায়িত্ব ও কাজের পরিসর আরও প্রশস্ত।

স্নায়ু যুদ্ধ (War of Nerves)

দুটি বিরোধী পক্ষ একে অপরের মনোবল ভেঙে দুর্বল করে দেবার উদ্দেশ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। পারস্পরিক কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ি ও মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে ভীতির সঞ্চার করা হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অথবা একই রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য সংগঠনের মধ্যেও স্নায়ুযুদ্ধ ঘটে।

স্যাঁ-সিমঁ, ক্লোদ-আঁরি দ্য (১৭৬০-১৮২৫) (Saint-Simon, Claude-Henri de)

ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রী চিন্তার প্রথম প্রবক্তা। উনিশ শতকের ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থার আলোচনায় অর্থনৈতিক ও বস্তুবাদী দৃষ্টিতে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের সূত্রপাত

করেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে লোকের ধর্মীয় নৈতিকতায় আস্থা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য তার পরিবর্তে তিনি বিজ্ঞানসম্মত **দৃষ্টবাদী** নৈতিকতা অনুসরণের সুপারিশ করেন। তাঁর মতে সমকালীন শিল্পোন্নয়নের ভিত্তিতেই নৈতিক বোধ গড়ে উঠবে এবং সমাজকে নতুন জীবনে উজ্জীবিত করবে। অনেকাংশে তাঁর ভাবভূমিতেই **অগ্যুস্ত কঁৎ** দৃষ্টবাদী দর্শন ও অর্থনৈতিক উদারতার মতবাদ গড়ে তোলেন। স্যাঁ-সিমঁ মনে করতেন যে রাজনৈতিক বিশ্লেষণের গোড়ার কথা হল অর্থনৈতিক উৎপাদন। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে উৎপাদন তথা অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ জড়িত। পরবর্তীকালে ওই চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় **মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ** এবং **শ্রেণীসংগ্রামের** অনিবার্যতার প্রত্যয়ে। স্যাঁ-সিমঁ ফরাসি বিপ্লবকে শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তাঁর সেই দৃষ্টিতে উৎপাদনকারী প্রধান শ্রেণীসমূহকে পরগাছা শ্রেণীগুলি থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়। তিনি মনে করতেন যে সমাজের পরিবর্তন বা বিপ্লব প্রচেষ্টার পিছনে একটি তত্ত্বগত ভাবাদর্শ থাকা উচিত। কল্পনাবিলাসী সমাজতন্ত্রকে নাকচ করে বাস্তব দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক পরিবর্তনের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের সঙ্গে তিনি আদর্শ সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের সংবিধান রচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সংবিধানে তিনটি পরিচ্ছেদের সুপারিশ থাকে : উদ্ভাবনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রতিনিধিত্ব। প্রথমটিতে কলা-শিল্পী ও উদ্ভাবক, দ্বিতীয়টিতে অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী এবং তৃতীয়টিতে শিল্পপতি যারা শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। জনস্বার্থে তিনি উক্ত বিন্যাসের কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু সেসব রূপায়ণের বিষয়ে তাঁর কোনও সুপারিশ ছিল না। তিনি মনে করতেন যে সামাজিক সুবিচার হিসেবে এই সাংবিধানিক বিন্যাস এবং উৎপাদন ও বন্টনে জনমালিকানার সমন্বয়ে ভাবীকালের সমাজ তাঁর কল্পিত সমাজতন্ত্রের পথে ঐতিহাসিক নির্দেশনায় অগ্রসর হবে।

স্বদেশী সমাজ (Swadeshi Samaj)

একটি প্রবন্ধ। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ৭ শ্রাবণ ও ১৬ শ্রাবণ ১৩১১ বঙ্গাব্দে চৈতন্য লাইব্রেরির দুটি সভায় পাঠ করেন। প্রবন্ধটির মর্মকথা হল যে ভারত ও চীন সমাজপ্রধান দেশ ; সেজন্য সেখানে রাজায় রাজায় রাজত্ব নিয়ে এবং বিদেশি রাজারা এসে সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি ও লুঠপাট যতই করে থাকুক না কেন সমাজ তার প্রাণশক্তি দিয়ে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়েছে। সেটা না থাকায় গ্রিস, রোম প্রভৃতি রাষ্ট্রপ্রধান দেশের পতন ঘটেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য রাজার শাসনে এসে ভারত তার পূর্বেকার প্রাণশক্তি হারিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটিতে বলেছেন যে ইংরেজের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে সেবা ও ত্যাগের দ্বারা এবং দেশের বুদ্ধিশক্তি ও কর্মশক্তিকে সংঘবদ্ধ আকারে দেশে বিস্তীর্ণ করার আদর্শ অনুসরণ করাই শ্রেয়। এদেশের কল্যাণশক্তি সমাজে নিহিত। সেটা ধর্মরূপে এদেশীয় সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে। সেজন্য ধর্মকে ও সমাজকে বাঁচানোই ভারতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় বলে লোকে জেনে এসেছে। সমাজের স্বাধীনতাই ভারতের যথার্থ স্বাধীনতা। বঙ্গদেশের জলকষ্ট নিবারণ সম্পর্কে সরকারি মন্তব্য প্রকাশসূত্রে প্রবন্ধটি লিখিত হয়। সময়টা ছিল

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তথা স্বদেশি আমল।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে আমরা আজ ক্রমেই সর্ববিষয়ে রাষ্ট্রনির্ভর হয়ে পড়ছি। সামাজিক নানা প্রথাকেও আইনের দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে বিদেশি ভাষায় কার্যনির্বাহের তিনি সমালোচনা করেন। সম্মেলনকে তিনি দেশি ধাঁচে একটা মেলায় পরিণত করার সুপারিশ করেন। তাঁর মতে স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে উপলব্ধির জন্য সমাজের প্রতিমাস্বরূপ একজন সপার্ষদ সমাজপতির প্রয়োজন, পূর্বের আমলের রাজার মতো তিনি সমাজের অধিপতি হবেন, যিনি সমাজমনের চাহিদাকে কার্যে রূপায়িত করবেন। তাঁর অধীনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একজন করে নায়ক নিযুক্ত থাকবেন যাঁর কাজ হবে সমাজের সমস্ত অভাবমোচন, মঙ্গলকর্মচালনা, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যহ কিছু পরিমাণে শ্রম স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করবে। বিবাহাদি শুভকর্মে গ্রামভাটি প্রভৃতির ন্যায় দান আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে। দেশে মধ্যে মধ্যে যে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ দেখা দেয় তখন উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতিশান্তি স্থাপন করা সমাজের কর্তব্য হওয়া উচিত। আত্মরক্ষার জন্য সমাজকে জাগ্রত থাকতে হবে। কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে 'স্বদেশী সমাজ' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। সেজন্য তিনি একটি বিস্তারিত সংবিধান প্রস্তুত করেন।

স্বয়ম্ভরতা (Autarky)

গ্রিক autarkeia কথা থেকে উৎপন্ন ইংরেজি autarky শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। অর্থ হল স্বয়ংসম্পূর্ণতা। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে কথাটির তাৎপর্য হল—যে-কোনও রাষ্ট্র তার প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু স্বদেশে উৎপাদন করবে, বিদেশ থেকে কোনও পণ্যসামগ্রী আমদানির উপর যাতে নির্ভর করতে না হয়। লক্ষ্য হল খাদ্য ও অন্যান্য মাল স্বদেশে উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় স্বয়ম্ভরতা অর্জন। স্বয়ম্ভরতার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিশ্বপটভূমিকায় বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ অবস্থান এবং অবাধ বাণিজ্যের প্রতিরোধ। স্বয়ম্ভর রাষ্ট্র অন্যান্য দেশের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্ভরতা থেকে মুক্ত থাকতে চায়। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পূর্বে নাৎসি জার্মানিতে স্বয়ম্ভরতার নীতি প্রবল ছিল, যাতে তাকে কোনও অর্থনৈতিক অবরোধের সম্মুখীন হতে না হয়।

স্বরাজ (Swaraj)

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা, উভয় অর্থেই স্বরাজ ব্যবহারবহুল একটি শব্দ। শব্দটির উৎস ও অর্থ নিয়ে বিভিন্ন নেতার নানান মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। টিলক শব্দটি হিন্দু শাস্ত্র থেকে চয়ন করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পালের মতে শব্দটি বেদান্তে আছে, যার অর্থ হল এমন এক আধ্যাত্মিক অবস্থা যেখানে ব্যক্তি পরমের সঙ্গে একদিকে যুক্ত হয়, অন্যদিকে শুধু মুক্তি নয়, জাগতিক সব কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে স্বায়ত্তশাসনের অর্থে ধারণাটি দাদাভাই নৌরজির কল্পনাতে প্রথম আসে (১৮৯৯)। তাঁর মতে স্বায়ত্তশাসন

দেশের দুঃখ ও দারিদ্র্য মোচনের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন। কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (১৯০৬) সভাপতির ভাষণে তিনি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেন। তার আগে সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁর দেশের কথা (১৯০৪) বইতে শব্দটি ব্যবহার করেন। লখনৌ কংগ্রেসে (১৯১৬) টিলক শব্দটি রাজনৈতিক ব্যঞ্জনাপ্রদান করে বলেন স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার।

নানা অর্থে শব্দটিকে বিভিন্ন নেতা দেখে থাকলেও লাল-বাল-পাল ও অরবিন্দ প্রমুখ চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ শব্দটির দ্বারা বিশ শতকের প্রথম দশকের গোড়ায় যুক্তরাজ্যের অধিকার থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি তথা পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থে ব্যবহার করতেন, ডোমিনিয়ম স্টেটাস নয়। পরে বিপিনচন্দ্র ইংরেজ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সমবায়ী সম্পর্কে নতুন এক রাষ্ট্রচিত্র কল্পনা করেন।

জওহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে দেশের বেশিরভাগ নেতার কাছে স্বরাজ বিষয়টি স্বাধীনতার চেয়ে কিছু কম ছিল। মোতিলাল নেহরুর কাছে স্বরাজ ও ডোমিনিয়ন স্টেটাস সমার্থক ছিল। মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ প্রত্যয়টিকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখেছিলেন। তিনি তার উপর একটি নৈতিক ব্যঞ্জনা আরোপ করেন। তিনি সত্যাগ্রহ ও সর্বোদয়ের সমন্বয়ে স্বরাজ প্রত্যয়কে রূপায়িত করেন।

বিপিনচন্দ্র স্বরাজ বলতে জনগণের স্বরাজ এবং তার তত্ত্বগত প্রেক্ষাপট হিসেবে 'দিব্যগণতন্ত্র' নামে এক প্রত্যয় দাঁড় করান, যার পথপ্রদর্শক ছিলেন শ্রীচৈতন্য। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রে সংঘর্ষ ও হানাহানির বিকল্প হিসেবে তিনি দিব্যগণতন্ত্রের মাধ্যমে স্বরাজের কথা চিন্তা করেন। অরবিন্দ স্বরাজ বলতে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে মনে করতেন না। স্বরাজের মধ্যে দিয়ে তিনি ভারতের সনাতন ভাবধারা এবং রাজনীতিতে বৈদান্তিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দেশপ্রেম ছাড়াও চাই আত্মদান। স্বরাজ সাধনার অঙ্গস্বরূপ তিনি আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার মাধ্যমে ভারতের সনাতন অন্তরাত্মার পুনরুজ্জীবন কামনা করতেন। অনুরূপ চিন্তা ছিল চিত্তরঞ্জন দাশের : "কেবল স্বাধীনতায়ই স্বরাজ লাভ হইবে না... স্বরাজ ও স্বায়ত্তশাসন এক নহে... যে স্বায়ত্তশাসন আত্মকল্যাণের জন্য বিধিবিধান, তাহা কতকটা স্বরাজের নিকটবর্তী। জাতীয় সর্বাঙ্গীণ বিকাশলাভের অবাধ প্রয়াসই খাঁটি স্বরাজসাধনা।" (ফরিদপুর ভাষণ, ১৯২৫)।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, "বিশ্বে বিধাতার যে অধিকার আছে সেই হচ্ছে তাঁর স্বরাজ অর্থাৎ বিশ্বকে সৃষ্টি করবার অধিকার। আমাদেরও স্বরাজ হচ্ছে সেই ঐশ্বর্য, অর্থাৎ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে তোলবার অধিকার।" স্বরাজসাধনায় তিনি গান্ধীজির চরকাতত্ত্বের বিরোধিতা করেন।

স্বাধীনতার পূর্বাবধি স্বরাজ প্রত্যয়টি দেশবাসীর মনে গভীর ভাবাবেগ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করে। গয়া কংগ্রেসের (১৯২২) পর চিত্তরঞ্জন, মোতিলাল প্রমুখ পরিবর্তনকামী নেতারা এই শব্দটি দিয়ে স্বরাজ পার্টি গঠন করেন। 'স্বরাজ' নামে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পত্রপত্রিকার প্রকাশনা হয়।

স্বরাজ পার্টি (Swaraj Party)

অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের (১৯২২) ফলে কংগ্রেসের কর্মসূচির পরিবর্তন-বিরোধী এবং পরিবর্তনকামী পরস্পরবিরোধী দুটি প্রবল মনোভঙ্গি দেখা দেয়। প্রথম গোষ্ঠীতে ছিলেন গান্ধীর অনুগামী রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাগোপালাচারী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তাঁরা সরকারের অন্যান্য নীতিসহ নতুন সাংবিধানিক আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে কৃতসংকল্প থাকেন। পরিবর্তনকামী দ্বিতীয় যে গোষ্ঠী, তার নেতৃত্বে ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য, লাজপত রায় প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা। ওই বছরে চিত্তরঞ্জনের সভাপতিত্বে গয়া কংগ্রেস অধিবেশনে তুমুল বিতর্কে পরিবর্তন-বিরোধীরা জয়ী হন। সেজন্য ১৯২৩ খ্রি জানুয়ারিতে পরিবর্তনকামী চিত্তরঞ্জন ও মোতিলালের নেতৃত্বে স্বরাজ পার্টি নামে একটি দল গঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং আইনসভায় প্রবেশ করে ভিতর থেকে সরকারের পীড়ননীতির বিরোধিতা করা। দলের পুরো নাম ছিল কংগ্রেস-খিলাফত স্বরাজ পার্টি, যার সভাপতি ও সচিব পদে যথাক্রমে চিত্তরঞ্জন ও মোতিলাল বৃত হন। দিল্লিতে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে এবং পরবর্তী কোকনদ অধিবেশনে (১৯২৩) এই মর্মে ঐকমত্য হয় যে স্বরাজ পার্টি নিজস্ব প্রয়াসে নির্বাচনে অবতীর্ণ হবে এবং কাউন্সিলে প্রবেশ করবে। অতঃপর কংগ্রেস ও স্বরাজ পার্টির মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়। কাউন্সিলে স্বরাজ পার্টির সদস্যদের কর্মপন্থা ছিল: ১. বাজেট গ্রহণে বিরোধিতা, ২. দমনমূলক আইন গ্রহণে বাধা দেওয়া, ৩. সমাজ কল্যাণকর কার্যবিধি সমর্থন, ৪. প্রয়োজনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা, এবং ৫. কংগ্রেস নির্দেশ দিলে কাউন্সিলের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেওয়া। ফলত আইনসভার মাধ্যমে জাতীয় সংগ্রামের একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়।

১৯২৩ ও ১৯২৬ খ্রি সাধারণ নির্বাচনে স্বরাজ পার্টি বিশেষ সাফল্য লাভ করে। ১৯২৩ খ্রি বাংলা ও মধ্যপ্রদেশে পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। চিত্তরঞ্জন মন্ত্রিসভা গঠনের পরিবর্তে বাংলার আইনসভায় বিরোধীনেতা হিসেবে থাকাই পছন্দ করেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় মোতিলাল বিরোধীদলের নেতা নির্বাচিত হন।

১৯২৩ খ্রি কেন্দ্রীয় আইনসভায় ২৪ জন সদস্যকে নিয়ে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি ছিল। স্বরাজ পার্টির ৪৩ জনকে নিয়ে আইনসভায় ন্যাশনাল পার্টি নামে এক যুক্তদল গঠিত হয়। ১৯২৪ খ্রি স্বরাজ পার্টি একটি গোল টেবিল বৈঠক ডাকার প্রস্তাব দেয়। নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যরা প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। ১৯২৫ খ্রি মোতিলাল জাতীয় দাবি হিসেবে ইংরেজদের কাছে ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রদানের প্রস্তাব করেন। সরকার সে প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। ওই সালেরই সেপ্টেম্বরে মোতিলাল প্রতিনিধিস্থানীয় একটি সরকার গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ খ্রি অবধি স্বরাজ পার্টি সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও বাধাদানের নীতি অনুসরণ করে। ভাইসরয়ের বিশেষ ক্ষমতা ও কিছু সংখ্যক নির্বাচিত সদস্যসহ মনোনীত সদস্যদের সাহায্যে এবং বিরোধীপক্ষের আপত্তি সত্ত্বেও সরকারের অনেক আইন কাউন্সিলে গৃহীত হয়। তবে ১৯২৯ খ্রি আইন ও আইনসভার কাজে প্রতিরোধের উদ্দেশ্য থাকলেও কল্যাণকর সরকারি আইন গ্রহণে স্বরাজ পার্টি বাধা সৃষ্টি করত না।

ফরিদপুরে বঙ্গীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে (১৯২৫) হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উদ্দেশ্যে একটি চুক্তিপত্র রচনার পর চিত্তরঞ্জন ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি আপসে আসতে চেয়েছিলেন। অচিরে তাঁর মৃত্যুর ফলে সে সংকল্প রূপায়িত হয়নি। এরপর স্বরাজ পার্টিতে ভাঙন ধরে। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্র শাখা বোম্বাইতে ন্যাশনাল পার্টিতে যোগ দেয়। ১৯২৬ খ্রি আগস্টে লাজপত রায় ও মালব্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট কংগ্রেস পার্টি (ন্যাশনালিস্ট পার্টি) নামে নতুন একটি দল গঠন করেন। তাহলেও কেন্দ্রীয় আইনসভায় পার্টি যথোচিত সক্রিয় থাকে। ১৯৩০ খ্রি কংগ্রেসের নির্দেশে স্বরাজ পার্টির সদস্যরা আইনসভা বর্জন করেন। মোতিলালের মৃত্যুর (৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১) পর স্বরাজ পার্টি কার্যত বিলুপ্ত হয়ে যায়।

দ্র. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

স্বশাসন (Autonomy)

প্রাচীন গ্রিক রাজনৈতিক ধারা অনুযায়ী নিজস্ব তৈরি আইনের অধীনে বসবাসের ব্যবস্থা স্বশাসন বা স্বায়ত্তশাসন নামে অভিহিত। স্বশাসনের প্রকারভেদ আছে : ১. ব্যক্তির স্বশাসন ; যেখানে যুক্তিবাদী মানুষ ক্ষুধাতৃষ্ণার মতো স্বআরোপিত আজ্ঞার ডাকেও সাড়া দেয়। এই দৃষ্টিতে ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির প্রকৃতিগত দর্শন যুক্ত হয়। ২. রাষ্ট্রের স্বশাসন ; প্রত্যয়টি কিছুটা ক্ষমতাগত, অর্থাৎ রাষ্ট্রের দেশ ও বিদেশ সংক্রান্ত আইন প্রবর্তনের ক্ষমতা এবং কিছুটা তার নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে অবস্থিত বৈধ সরকারের প্রতি অন্যান্য দেশের স্বীকৃতি। একটি অনুগামী কিংবা আশ্রিত রাষ্ট্রের স্বশাসন ক্ষমতা সীমিত থাকে, তবে অন্যান্য দেশের স্বীকৃতির ব্যাপারটি সার্বভৌমত্বের বিষয়। সার্বভৌমত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রের আইনগত অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত থাকে। ৩. আঞ্চলিক স্বশাসন ; প্রসঙ্গটি মূলত বিকেন্দ্রিত শাসনের সঙ্গে জড়িত। স্থানীয় পৌরসভা, অঙ্গরাজ্য ইত্যাদিকে স্বশাসনের অধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। দেশের একটি রাজ্যের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সেদেশের কেন্দ্রীয় সরকারের নীরব সম্মতি পায়, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশে। ৪. গোষ্ঠী ও সংখ্যালঘুদের স্বশাসন। এক্ষেত্রে অঞ্চল ও ভূখণ্ড থাকে না। কিন্তু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের পালনীয় আইনকানুন প্রস্তুত করে। ৫. প্রতিষ্ঠানগত স্বশাসন। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনৈতিক দল, পেশাগত, সাংস্কৃতিক, খেলাধুলা ইত্যাদি নানা বিষয়ের প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে। রাষ্ট্রীয় আইনকানুনের সঙ্গে অমিল ঘটলেও এইসব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আইন সরকারি বিধিনিষেধের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া হয়।

স্বশাসনের বিষয়টি ইদানীং বৃহৎ ও বহুজাতি সমন্বিত অনেক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য আঞ্চলিক স্বশাসন থাকা বিশেষ প্রয়োজন ; নইলে জাতিগত অসন্তোষের সুযোগে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতা (Freedom)

ইংরেজি 'ফ্রিডম' এবং লাতিন থেকে উৎপন্ন 'লিবার্টি' শব্দ দুটি সমার্থক ; বাংলায় তার প্রতিশব্দ হল স্বাধীনতা ; মুক্তি শব্দটিও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্রতত্ত্বে শব্দটির অর্থ নিয়ে বিস্তর মতপার্থক্য আছে। শব্দটির নানান সংজ্ঞাকে নেতিবাচক ও ইতিবাচক— উভয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। নেতিবাচক দৃষ্টিতে একজন মানুষ তখন স্বাধীন যখন তার কোনও কাজে কেউ বাধা সৃষ্টি করেন না (হবস, লক, মিল)। ইতিবাচক দিক থেকে যাঁরা প্রত্যয়টিকে উপস্থাপনা করেন তাঁরা শর্ত যোগ করেন এইভাবে যে একজন মানুষের কাজের স্বাধীনতা থাকে ; সে কাজ নীতিসঙ্গত বা যুক্তিসম্মত এবং কাজটা যিনি করছেন তাঁর পক্ষে প্রকৃত স্বার্থবহ কি না (রুসো, হেগেল)। স্বাধীনতার সংজ্ঞার নানা মতের মধ্যে থাকে বিচিত্র বিধিনিষেধ। নেতিবাচক প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে একজন মানুষের কোনও কাজে অক্ষমতা কিংবা সঙ্গতিহীনতা তার স্বাধীনতাহীনতা প্রকাশ করে না ! ঠিক তেমনি যদি কোনও ব্যক্তিকে কোনও কাজে, সেটা অন্যায়, যুক্তিহীন ও তার নিজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে করতে বাধা দেওয়া হয় তাহলে সেটাও স্বাধীনতাহীনতা নয় ; বাধা না দিলেই বরং কাজটা স্বাধীনতার পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারিতা হয়ে দাঁড়ায়।

বিভিন্ন স্থান, কাল ও পরিস্থিতিতে 'স্বাধীনতা' শব্দটির ব্যবহারসূত্রে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল যে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক ধারার প্রবক্তাই স্বাধীনতার প্রশ্নে পঞ্চমুখ। অবশ্য শব্দটি সবাই ব্যবহার করলেও সম অর্থ বা দৃষ্টিতে করেন না। শব্দটির অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের উপলব্ধি থেকেই সকলে স্বাধীনতার অনুরাগী।

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক স্বাধীনতার তুলনামূলক বিচার করেছেন। তাঁদের কারও কারও দৃষ্টিতে অবারিত স্বাধীনতা নেতিবাচক হিসেবে বিবেচিত। অ্যাংলো-স্যাক্সন ইতিহাসের ধারায় রাজনৈতিক স্বাধীনতার এই প্রবণতা দেখা যায়। সেখানে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকে রক্ষার প্রশ্ন থাকে। স্বাধীন বলে মানুষকে শাসক বা সরকারের নিপীড়ন, অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হতে হবে এমন নয়। ইতিবাচক স্বাধীনতা ভিন্ন চরিত্রের। এই নিরিখে স্বাধীন মানুষ স্বশাসিত। জনগণের নিজস্ব রাষ্ট্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকে। সেখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সংকোচন করে জনগণের স্বাধীনতা প্রসারের প্রয়োজন ঘটে না। কারণ রাষ্ট্র জনমনের আধার, রাষ্ট্রের আচরণে জনগণের স্বাধীনতা অভিব্যক্তি লাভ করে।

অনেক রাষ্ট্রই উল্লিখিত ইতিবাচক রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বাঙ্গীকরণ দাবি করে। উনিশ শতকে জার্মানি ও ইতালি স্বাধীন সার্বভৌমত্বের মধ্যে দিয়ে ইতিবাচক স্বাধীনতা চেয়েছিল। ফরাসি সাধারণতন্ত্রীরা ইতিবাচক স্বাধীনতা বলতে মনে করত শাসন ক্ষমতা রাজার কাছ থেকে জনগণের কাছে হস্তান্তর। কমিউনিস্টরা শ্রমিক রাষ্ট্রে ইতিবাচক স্বাধীনতা দেখতে পান।

ইতিবাচক স্বাধীনতার প্রত্যয় রূপায়ণ অপেক্ষা তত্ত্বেই বেশি উজ্জ্বল, অনেকে মনে করেন যে স্বাধীনতার নেতিবাচক প্রত্যয় ছেড়ে তার ইতিবাচক প্রত্যয়ের প্রতি ধাবিত হওয়ার ফলে মূল স্বাধীনতার দাবি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। জনগণের নামে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র কিংবা

জাতীয়তা, গণতন্ত্র, জনপ্রিয় বা শ্রমিকের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র কার্যত জনস্বাধীনতার পরিবর্তে মুষ্টিমেয় মানুষের তথা পেশাদার রাজনীতিক, জঙ্গি শাসক প্রভৃতির হাতে শাসন ক্ষমতা কায়েম করেছে।

উদারতন্ত্রী দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির নিজ সত্তার প্রতিষ্ঠার অধিকার বা ক্ষমতার মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিহিত থাকে ; (মিল)। রাষ্ট্রক্ষমতার উৎস . আইন ; সেক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরিমাপ হবে আইনের অবকাশে, শৈথিল্যে নয়। ব্যক্তিজীবনের কোনও বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু আইনে বলা থাকে না, যেটা তার নিয়ন্ত্রণ গণ্ডির বাইরে। উদারতন্ত্রী মতে স্বাধীনতার সংরক্ষণই হল আইনের কাজ। স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার (লাইসেন্স) পার্থক্য হল যে আইন-ভিত্তিক কিছু বিধি-নিষেধের সাহায্যে স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করা হয় ; স্বেচ্ছাচারিতার স্বাধীনতা অপরের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। স্বেচ্ছাচারিতার নিবারণ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বাড়িয়ে তোলে (লক)।

রক্ষণশীলেরা অন্যান্য মূল্যবোধের সঙ্গে একটা ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতার প্রশ্নকে আইনসঙ্গত ভাবেই কিছুটা বেঁধে রাখার পক্ষপাতী। একটি সমাজব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কের দিক থেকেই লোকের এক ধরনের মূল্যবোধ গড়ে ওঠে ; স্বাধীনতার শর্ত হল সমাজব্যবস্থার সংরক্ষণ, তার জন্য চাই যথোচিত আইন।

কল্যাণরাষ্ট্রের প্রবক্তারা মনে করেন যে আইনের বিধিনিষেধের অভাবে কর্মসম্পাদনের উপযোগী ক্ষমতা থাকে না এবং সেটা চাই মানুষকে তার জীবনধারণের উপকরণ যোগাবার জন্য। লোকের শ্রমের মধ্য দিয়েই এইসব উপকরণের সংস্থান ঘটে। কাজেই লোকের ইতিবাচক স্বাধীনতা বিধান করতে হলে তাদের শ্রমের সদ্ব্যবহার ও উৎপাদনের সন্তোষজনক বন্টন অর্থাৎ সমতার জন্য কিছুটা বিধিনিষেধের সম্মুখীন হয়ে স্বাধিকার ত্যাগ করতে হবে। ফলে লোকের স্বাধীনতায় ব্যাপক বাধাবিপত্তি ঘটে ; তাতে উদারতন্ত্রী এমন কী রক্ষণশীলেরাও স্বাধীনতাকে একটি প্রকৃতিদত্ত অধিকার হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রয়াসী হন, যেটা কোনও অবস্থাতেই কেড়ে নেওয়া অন্যায় ও অবিচারের কাজ।

রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারায় নাগরিকদের কিছু মৌল অধিকার প্রদানই হল প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা। কোনও কোনও মতবাদে মানবাধিকার বা প্রকৃতিগত অধিকারকে স্বাধীনতার সারবত্তা বলে মনে করা হয়েছে। আইনের মধ্যে দিয়েও চেষ্টা হয়েছে অধিকার সমূহ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়। আধুনিক নিয়মতান্ত্রিকতায় স্বাধীনতার অনুকূলে সরকারি বিধিনিষেধ বেঁধে দেবার চেষ্টা করা হয়। জনজীবন ছাড়াও ব্যক্তিগত জীবনেও মানুষের কতকগুলি মৌল স্বাধীনতা থাকে, যেগুলিকে সবসময় লিপিবদ্ধ করা যায় না, যেমন কথা বলা, উপাসনা, সমিতি গঠন, সমাবেশ আহ্বান, চুক্তি করা, আন্দোলন গড়ে তোলা ইত্যাদি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট উপাসনা ও বাক-স্বাধীনতা ছাড়াও দারিদ্র্য ও ভীতি থেকেও মানুষের মুক্তি চেয়েছিলেন।

স্বার্থবাহী গোষ্ঠী (Interest Group)

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে গঠিত কোনও সমিতি বা সংঘ যার কাজ হল বিশেষ কোনও বিষয় বা স্বার্থে জনমত গঠন ও সরকারের নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার কিংবা চাপ সৃষ্টি করা। নিজস্ব নিয়মাবলি, সদস্য, অর্থভাণ্ডার, প্রকাশনা, প্রতিবেদন ইত্যাদি সহ সুসংগঠিত ওইসব গোষ্ঠী নিয়তই নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থে প্রচারকার্যে লিপ্ত হয়। পরোক্ষে জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে অথবা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংযোগের সাহায্যে সেগুলি সক্রিয় থাকে। দেশের রাজনীতিতে এইসব স্বার্থবাহী গোষ্ঠীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এগুলির মধ্যে দিয়ে সরকার, রাজনৈতিক দল ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ ঘটে। সরকার গঠনে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার এবং সরকারি নীতি নির্ধারণে **উপশালা** হিসেবে কাজ করে। স্বার্থবাহী গোষ্ঠীকে ক্ষমতার বেসরকারি বাহক বলা যায়। স্বার্থবাহী গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে চেম্বার অব কমার্স, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, ধর্মসংস্থা, বৃত্তিগত সংস্থা, ছাত্র ও যুব সংগঠন ইত্যাদি নিজ নিজ গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষায় তৎপর থাকে। সময়বিশেষে সেগুলি সরাসরি সংগ্রামে নামে। সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকলে সরকার সেগুলির স্বার্থে বিধিবিধান প্রণয়ন করে।

স্বেচ্ছাতন্ত্র (Autocracy)

আত্ম-নিয়োজিত ব্যক্তির একক শাসন, যিনি সমস্ত ক্ষমতা নিজের কুক্ষিগত করে রাখেন এবং স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে রাজত্ব করেন। সংশ্লিষ্ট দেশে হয়তো আইনকানুন ও সংবিধান থাকে, যার সাহায্যে ওই শাসন-কর্তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় ; কিন্তু কার্যত নিজের ইচ্ছামতো তিনি ওইসব বিধি-ব্যবস্থাকে নাকচ ও অমান্য করতে পারেন ; কারণ স্বতন্ত্র কোনও প্রক্রিয়ায় বিধিব্যবস্থাগুলিকে প্রয়োগের অবকাশ থাকে না। বেশির ভাগ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে প্রকৃত স্বেচ্ছাতন্ত্রে ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতেই কেন্দ্রীভূত থাকে ; দল বা চক্রের হাতে ততটা নয়। অবশ্য দলও আইনকে অবজ্ঞা করে শাসন চালাতে পারে ; নানারকম অধস্তন আধিকারিকদের কার্যনির্বাহসূত্রে দলীয় স্বেচ্ছাচারিতার গতি কিছুটা বাধা পায়। কোনও কোনও দেশের একদলীয় সরকার ও সেসব দেশের পূর্ববর্তী স্বেচ্ছাচারী রাজা ও সম্রাটের শাসনের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। উভয়েই স্বেচ্ছাতন্ত্রী। লক্ষণ একই, অর্থাৎ শাসক দল বা ব্যক্তির আচরণে যে-কোনও নাগরিকের জীবন যে-কোনও সময়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে এবং তার কোনও সুরাহা নেই। চরম স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে স্বেচ্ছাতন্ত্রের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়।

স্বৈরতন্ত্র (Despotism)

গ্রিক ভাষায় 'ডেস্পটিস' কথার বাংলা প্রতিশব্দ। প্রাচীন আমলে কথাটির অর্থ ছিল পরিবার অথবা ক্রীতদাসদের মালিক বা প্রভু। কথাটি ক্রীতদাস-সদৃশ জনগণের একচ্ছত্র শাসকের প্রতি এবং বর্তমানে যথেচ্ছাচারী স্বৈরতন্ত্রী সরকারের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, বিশেষ করে যে-সরকার কার্যত কোনও আইন, বিরোধীপক্ষ অথবা প্রথা দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত হয় না ; ফলে ক্ষমতাসীনেরা যখন ও যেখানে ইচ্ছা অপরের অধিকার খর্ব করতে পারে। **মঁতেসকিয়্য** তাঁর 'স্পিরিট অব লজ' (১৭৪৮) গ্রন্থে স্বৈরতন্ত্রের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে এই ধারায় ক্ষমতা ব্যক্তিবিশেষ, সংগঠন অথবা রাজনৈতিক প্রতিনিধির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। ক্ষমতার কেন্দ্রানুগতা ব্যক্তিবিশেষের হাতে নাও থাকতে পারে ; একটি সংস্থাধীনে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকা সম্ভব। মূল গ্রিক অর্থানুসারে শাসিত মানুষের মধ্যে কোনও তারতম্য থাকে না। মঁতেসকিয়্য ক্ষমতার **পৃথকীকরণ** চেয়েছিলেন এই ধারণায় যে স্বৈরতন্ত্র যতটা সম্ভব বিভক্ত হয়ে মানুষের কাছে সহনশীল হবে।

স্বৈরতন্ত্রে বিরোধীপক্ষ থাকে না, তার অবস্থান আইনের ঊর্ধ্বে। কোনও কোনও রাষ্ট্রচিন্তায় সদাশয় ব্যক্তির স্বৈরতন্ত্রের কথা বলা হয়, যিনি একচ্ছত্র অধিকারপ্রাপ্ত নৃপতি। তিনি মানুষের কল্যাণে তাঁর সর্বাধিক ক্ষমতা ব্যবহার করেন। জনগণের সার্বভৌমত্ব ও শ্রেণীহীন সাম্যের ভিত্তিতে তকভিল গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের এক প্রস্তাব করেন (১৮৫৬), যেখানে জনসাধারণের কোনও ক্ষমতা নেই, তাদের হয়ে শক্তিধর ও সদিচ্ছাসম্পন্ন জনৈক প্রতিনিধি লোকের মতামত ব্যতিরেকে তাদের কল্যাণ বিধান করেন।

স্বৈরাচারতন্ত্র (Tyranny)

গ্রিক ভাষায় tyrannos শব্দ থেকে আগত, যার অর্থ যদৃচ্ছ ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক। স্বৈরতন্ত্রের সমার্থক এই শব্দটিতে বোঝায় এমন এক দমনকারী, নিষ্ঠুর সরকার যা **আইনের শাসন** মেনে চলে না এবং কোনও ব্যক্তি অথবা একটি দলের হাতে ক্ষমতা থাকে কেন্দ্রীভূত। গ্রিসে স্বৈরাচারী সরকার সবক্ষেত্রে মন্দ ছিল না, কিন্তু শাসনক্ষমতা একজনই ভোগ করত, অবশ্য পুরুষানুক্রমে নয়। রাজতন্ত্র আর স্বৈরাচারতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য ছিল কেবল নৈতিকতার। আরিস্তোতলের দৃষ্টিতে **গোষ্ঠীতন্ত্র** ছিল অপেক্ষাকৃত ভাল। তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে স্বৈরাচারী চায় সম্পদ, আর রাজা কামনা করেন সম্মান। বেতনভুক দেহরক্ষীরা স্বৈরাচারীকে ঘিরে থাকে ; রাজাকে রক্ষা করে নাগরিকেরা। স্বৈরাচারী ক্ষমতায় থাকার জন্য ছলে বলে কৌশলে এবং গুপ্তহত্যার সাহায্যে বিরাজ করে। **টমাস হবস** মনে করতেন নৈরাজ্যবাদ অপেক্ষা স্বৈরাচার ভাল এবং রাজা ও স্বৈরাচারীর মধ্যে পার্থক্য নেই। তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতাসম্পন্ন রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন।

স্বৈরশাসকের প্রতি একটি আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য কবি ও দার্শনিকেরা স্বৈরশাসকের উপর দেবত্ব আরোপের প্রয়াসী হন। দার্শনিক নীটসে সকলকে নিজের পছন্দমতো আইন তৈরি করে নিতে বলেন যার চূড়ান্ত নিদর্শন হবেন একজন স্বৈরশাসক। **সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী** রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় স্বৈরাচারতন্ত্রের আধিপত্য স্বাভাবিক। ফরাসি রাষ্ট্রদার্শনিক আলেক্সি দ্য তক্‌ভিল (১৮০৫-৫৯) মনে করতেন যে সরকার রাজতন্ত্রী, প্রজাতন্ত্রী বা গণতন্ত্রী যাই হোক না কেন তার হাতে সীমাহীন ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা যদি বর্তায় তাহলে স্বৈরাচারতন্ত্রের পথ প্রশস্ত হয়।

হ

হবস্, টমাস (১৫৮৮-১৬৭৯) (Hobbes, Thomas)

ইংরেজ রাষ্ট্রদার্শনিক। গৃহযুদ্ধ বাধায় তিনি ইংল্যান্ড ছেড়ে ফ্রান্সে আশ্রয় নেন ; এগারো বছর পর রাজশক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। দ্বিতীয় চার্লস ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক। হবস্ কয়েকটি রাজনৈতিক গ্রন্থ রচনা করেন ; তার মধ্যে 'লেভিয়াথান' গ্রন্থটি চিরবিখ্যাত। তাতে তিনি চারটি অধ্যায়ে মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি, ধর্ম ও দর্শনের আলোচনাসূত্রে সবিস্তারে **মানবপ্রকৃতি, সার্বভৌমত্ব, আইন, রাষ্ট্রিক বাধ্যতা** ইত্যাদি প্রত্যয়ের নিজস্ব মতামত তুলে ধরেন। তাঁর লেখনী ধারণের উদ্দেশ্য ছিল যে গৃহযুদ্ধে দীর্ণ ইংল্যান্ডকে অশান্তি ও অস্থিরতা থেকে রক্ষা করা। তিনি মনে করতেন যে পরম ও স্বৈরশক্তিসম্পন্ন একজন রাজা দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।

রাষ্ট্রচিন্তার প্রারম্ভে হবস্ মানবপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বলেন যে মানুষ হল স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক, সে তার সুখ ও বাসনা চরিতার্থের চিন্তায় সদাই ব্যস্ত থাকে। মানুষ তার নিজের মানসিক চৌহদ্দির মধ্যে বন্দি থাকে বলে সে নিঃসঙ্গ। অবশ্য তার যুক্তিপ্রবণতা তাকে পশুদের থেকে পৃথক করেছে। তার যুক্তিবোধ নিষ্ক্রিয় এবং আবেগ সক্রিয় থাকে বেশি। জ্ঞান ও সম্মান এবং ধনসম্পত্তি অর্জনের জন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় সবাই মত্ত থাকে। ক্ষমতা ও আধিপত্যের নেশায় মানুষের মধ্যে নিরন্তর এক সংগ্রাম চলে। আচরণে পারস্পরিক ঈর্ষা ও ঘৃণা ফুটে ওঠে। অন্ধের মতো লোকে আত্মতুষ্টি ও আত্মগৌরবে মশগুল থাকে।

প্রাক্-সামাজিক প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষের করুণ অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে হবস্ বলেন যে ওই সময় মানুষ তার যুক্তিবোধ অপেক্ষা ক্ষুধা, বাসনা ও আবেগ দ্বারা চালিত হত। একের সঙ্গে অপরের দ্বন্দ্ব সদাই লেগে থাকত। আইন ও সুবিচারের স্থান ছিল না। ভাল ও মন্দ সম্পর্কে কোনও জ্ঞান ছিল না। করুণা, সহযোগিতা, সহানুভূতি অজ্ঞাত ছিল। ক্ষমতার লালসা ও বলপ্রয়োগ তথা জঙ্গলের রাজত্ব বিরাজ করত।

উৎপাদন, কৃষি, গৃহনির্মাণ, যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও সমাজজীবন বলে কিছু ছিল না। ছিল কেবল নিরন্তর ভীতি এবং হিংসাত্মক জীবনহানি। সব কিছু সত্ত্বেও যুক্তিবোধ ও অভিজ্ঞতার ফলে কালক্রমে মানুষ শান্তি, নিরাপত্তা ও সহযোগিতার পথে অগ্রসর হয়। হবস্ তাই বলেন যে মানুষ পারস্পরিক স্বার্থে নিজেদের প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ পরিহার করে একজন বা যৌথ কয়েকজনের সার্বভৌম শক্তির অধীনে একটি সামাজিক চুক্তি রচনা করে। সেই থেকে ক্রমে পুরসমাজ গড়ে ওঠে। যাকে তিনি কমনওয়েলথ আখ্যা দিয়েছেন।

হবসের দৃষ্টিতে উল্লিখিত চুক্তি সম্পাদনের প্রধান কারণ হল মানুষের ভীতি; অপরদিকে উচ্চ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তির দাপটে মানুষ চুক্তিবদ্ধ থাকে। উচ্চ কর্তৃত্বে একজন বা কিছু সংখ্যক যেসব ব্যক্তি চুক্তির মাধ্যমে যুক্ত হন তিনি বা তাঁরাই হলেন সার্বভৌম শক্তির অধিকারী এবং সকল বাদানুবাদের ঊর্ধ্বে। সার্বভৌমকেই বলা হয়েছে লেভিয়াথান। লেভিয়াথানই হলেন আইনকানুনের উৎস ও ব্যাখ্যাকারী। তাঁকে আইন মেনে চলতে হয় না। তিনিই হলেন যাবতীয় অধিকার ও সুবিচারের স্রষ্টা। সার্বভৌম বা লেভিয়াথানের নির্দেশই হল আইন। হবসের লেভিয়াথানের উপর অভ্রান্ত, রাজতন্ত্রী ও পরম বা চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে।

হবসের রাষ্ট্রদর্শনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমষ্টিবাদ সমন্বিত হয়েছে। লোকে সমাজবদ্ধ হলেও যে যার নিজের স্বার্থ দ্বারা চালিত হয়। রাষ্ট্র সবাইকে কেবল একত্র আবদ্ধ রাখে। রাষ্ট্রের প্রতি লোকের অখণ্ড আনুগত্য যেমন চাওয়া হয়, তেমনি সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাবার অধিকারও লোকের থাকে। লোকের নিরাপত্তা বিধান রাষ্ট্রের দায়িত্ব, তাই লোকের জীবনহানি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যবিরুদ্ধ। তা হলেও হবস্ লোকের সাধারণভাবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ চাইতেন না। মানুষে-মানুষে স্বাভাবিক সমতারও তিনি সমর্থক ছিলেন।

রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র এই তিন ধরনের সরকারকে হবস্ স্বীকৃতি দিয়েছেন। স্বীকৃতি নির্ভর করে কতজনকে নিয়ে সার্বভৌম কর্তৃত্ব গঠিত তার উপর। রাষ্ট্রে একজনই যখন সর্বশক্তিমান তখন সেটা রাজতন্ত্র, যৌথভাবে অনেকে হলে গণতন্ত্র, আর অল্প কয়েকের হাতে ক্ষমতা সীমিত থাকলে সেটা হয় অভিজাততন্ত্র। অন্য কোনও প্রকার বা মিশ্র কোনও সরকারে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। নিজে তিনি রাজতন্ত্রের অনুরাগী হলেও যে-সরকার শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় সেটাই ছিল তাঁর কাছে সর্বোত্তম।

হরিজন আন্দোলন (Harijan Movement)

শব্দটির স্রষ্টা মহাত্মা গান্ধী এটিকে অস্পৃশ্য কথাটির পরিবর্তে ব্যবহার করেন। হরিজন কথাটির অর্থ ঈশ্বরের আপন জন। ১৯৩২ খ্রি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ভারতের আসন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অস্পৃশ্য হিসাবে পরিগণিত অনুন্নত জাতিসমূহের জন্য পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলী ও আইনসভায় স্বতন্ত্র আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব করেন। সে সময়ে পুনায় যেরবেদা

জেলে আবদ্ধ গান্ধী ওই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অনশন শুরু করেন। অতঃপর তফসিলি সম্প্রদায়ের নেতা বি আর অম্বেডকরের সঙ্গে গান্ধীর বিখ্যাত পুনা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর পর গান্ধী নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা-বিরোধী লিগ গঠন করেন। গান্ধী লিগের নতুন নামকরণ করেন হরিজন সেবক সংঘ। সেই সময় থেকে 'হরিজন' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশনাও শুরু করেন (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩)।

হিংসা (Violence)

অন্যের হানি করা বা করার প্রবণতা। মানুষে-মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে একের উপর অপরের জবরদস্ত আচরণ থেকে শুরু করে বলপ্রয়োগ ও রক্তক্ষয়ী হানাহানি হিংসারূপে বিবেচিত। সভ্যতার আদিপর্ব থেকে অদ্যাবধি বিষয়টির পক্ষাপক্ষে নানা অভিমত আছে।

মানবেতিহাসের পাতায় পাতায় হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ তথা যুদ্ধ ও হানাহানির সীমাহীন উল্লেখ দেখা যায়। তারই সমান্তরাল ধারায় ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা, মনোবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে হিংসা সম্পর্কে নানান আলোচনা চোখে পড়ে। অহিংসার আদর্শে প্রাণও দিয়েছেন অনেক সাধুসন্ত ও রাজনৈতিক নেতা।

রাষ্ট্রচিন্তার দুই দিকপাল হবস্‌ ও রুসো হিংসা সম্পর্কে বিপরীতমুখী চিন্তা পোষণ করতেন। হবসের দৃষ্টিতে প্রাকৃতজীবনে মানুষের হিংসার প্রকৃতি ছিল স্বাভাবিক ; সেটা দাবিয়ে রাখার পক্ষে একটা কেন্দ্রীভূত, শক্তিশালী ও কঠোর সরকারই হল উপযোগী। পক্ষান্তরে রুসো মনে করতেন প্রকৃতির কোলে মানুষের জীবন ছিল সুস্থ, সুন্দর ও প্রেমময়। সভ্যতার শৃঙ্খলেই মানবজীবনের নাভিশ্বাস ঘটেছে।

মার্কসীয় দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে হিংসার প্রসঙ্গ বিবেচিত হয়েছে। তাঁদের মতে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় হিংসার বীজ নিহিত। কার্যত দেখা গেছে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ হয়ে গিয়ে থাকলেও হিংসার আচরণ হ্রাস পায়নি। একদা মার্কসের শিষ্য ও পরে মুসোলিনির দীক্ষাদাতা ঝর্জেস সর্ল মনে করতেন যে সহিংস সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সৃজনশীল পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত হয়।

সিগমুন্ড ফ্রয়েড হিংসার পিছনে যৌন বিকৃতি ছাড়াও প্রত্যক্ষ করেন প্রাণীহত্যার প্রতি জন্মগত এক আকর্ষণ। তাঁর মতে একজনের উপর অপরজনের ক্ষমতা থাকলে সেটা পীড়ন, শোষণ ও হত্যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। কার্ল ইয়ুং অনুরূপ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন যে মানুষের অবচেতন মনের কোণে ঘন অন্ধকারের মতো বিরাজিত একটি অংশ হিংসার রূপ নেয়। হিংসার প্রবণতাকে দার্শনিক এরিক ফ্রম লোকের এক ধরনের মৃত্যুপ্রীতি হিসাবে দেখেছেন ; সেটা কর্তৃত্ববাদী, আধিপত্যকামী ও দমনমূলক সমাজের চরিত্রকে বিম্বিত করে এবং তার উৎস হল কিছু লোকের সমগ্র জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, ব্যক্তিগত ও সামাজিক মানসিকতার ধ্বংসাত্মক ও নেতিবাচক প্রবণতা। একই সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যোহান গালটুন বলেছেন মানুষের আত্মোপলব্ধির পরিহার্য প্রতিবন্ধকতাই হল হিংসা। আত্মোপলব্ধির অর্থ হল মানুষের শারীরবিদ্যা, প্রাকৃতিক ভারসাম্য, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মিক চাহিদার পরিপূর্তি। গালটুনের ব্যাখ্যা পীড়নকারীকে কেন্দ্র করে নয়, পীড়িতজনকে নিয়েই তাঁর হিংসা প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা।

হ

ধর্ম, দর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তার তত্ত্বগত আলোচনার পাশাপাশি ব্যবহারিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে হিংসার প্রশ্নকে আধুনিককালে বিশ্ব-সমক্ষে সবচেয়ে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন মহাত্মা **গান্ধী**। গান্ধীর দৃষ্টিতে হিংসার অর্থ ও প্রয়োগ আরও মৌল গভীরে, যেটা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রায় ব্যাপ্ত। তাঁর মতে যাবতীয় পীড়ন, দমন, শক্তিমত্ততা ও জবরদস্ত শাসন হল হিংসা। তিনি চাইতেন চিন্তায়, কথাবার্তায় ও কাজে কারও প্রতি আঘাত না হানা; দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ ও সংঘর্ষ অনুচিত। জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও সুফি ভাবধারায় স্নাত গান্ধী রাজনৈতিক জীবনে তলস্তয়ের চিন্তায় বিশেষ প্রভাবিত হন। তলস্তয়ের প্রভাবে গান্ধীও রাষ্ট্রকে পীড়নকারী যন্ত্র হিসেবে দেখতেন; তাই তিনি চাইতেন শাসনহীন সমাজ, যেটা **নৈরাজ্যবাদের** নামান্তর।

হিতবাদ (Utilitarianism)

শব্দটি মূলত মনুষ্যচরিত্রের প্রবণতা সম্পর্কিত এবং নীতিশাস্ত্রের অন্তর্গত। মানুষ একটি সামাজিক জীব। সামাজিক রীতিনীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ লোকের সামাজিক ও রাজনৈতিক আচরণে প্রতিফলিত হয়। সেদিক থেকে শব্দটির সঙ্গে রাজনীতির সুবাদ প্রত্যক্ষ। হিতবাদের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণ কঠিন। কারও একক প্রচেষ্টায় হিতবাদী দর্শন গড়ে ওঠেনি। পরিবর্তনশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক প্রভৃতি পরিস্থিতির অভিঘাতে প্রত্যয়টি কয়েক শতকে দানা বাঁধে।

সপ্তদশ থেকে উনিশ শতক অবধি ইউরোপে শিল্পবিপ্লব, বুদ্ধিবিভাসিত আন্দোলন, ইংল্যান্ডে এভাঞ্জেলিকাল আন্দোলন, ফরাসি বিপ্লব ইত্যাদির মাধ্যমে মননশীলতার উন্নয়নের সঙ্গে অর্থনৈতিক শোষণ, সমতা, রাষ্ট্রক্ষমতার কাড়াকাড়ি ইত্যাদির মিশ্রিত পরিস্থিতিতে দার্শনিক **আমূল পরিবর্তনবাদী** নামে অভিহিত ইউটিলিটারিয়ান আন্দোলন ক্রমে গড়ে ওঠে, যার মূল আদর্শ ছিল ব্যক্তিমানুষের জীবনে সুখের সঞ্চার।

হিতবাদের ভিত্তি ছিল ভোগবাদ। সবাই চায় সুখ, দুঃখ নয়। গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাস ছিলেন এই ভোগবাদী চিন্তার আদি প্রবক্তা। তখনকার আমলে চাওয়া হত ব্যক্তির সুখ, বর্তমানে চাওয়া হয় সর্বজনের সুখ।

সপ্তদশ শতকে রিচার্ড কামবার্ল্যান্ড সর্বপ্রথম আধুনিক হিতবাদী প্রত্যয়ের সূত্রপাত করেন। সেই সূত্র ধরে ফ্রান্সিস হাচিসন সর্বাধিক মানুষের জন্য সর্বাধিক হিতসাধনের কথা বলেন। তবে হিতবাদী দর্শনকে পূর্ণাঙ্গ ও সুসংবদ্ধ মতাদর্শে রূপায়িত করেন **জেরেমি বেনথাম**। তিনিও অবশ্য গডউইন, প্রিস্টলে, **হবস**, ডেভিড হিউম প্রমুখ পূর্বসূরীদের দ্বারা প্রভাবিত হন। সংখ্যায় সীমিত হিতবাদীদের চিন্তাভাবনা ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে তুলে ধরতেন গ্রোট, বাটলার, **জন স্টুয়ার্ট মিল** প্রমুখ ব্যক্তিরা।

হিতবাদের নৈতিক ও দার্শনিক ভিত্তি তৈরি করেন বেনথাম। তার রাজনৈতিক তত্ত্বগুলিকে রূপ দিয়েছিলেন হিউম। হিতবাদী চিন্তাধারার গোড়ার দিকে অনেকেই উদারনীতির (লিবারালিজম) প্রতি আকৃষ্ট হন। মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও ক্রিয়াকর্মে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের তাঁরা বিরোধী ছিলেন। হিতবাদী সমাজতত্ত্ব হার্বার্ট স্পেনসারকে প্রভাবিত করে। আইনগত দিক থেকে একটি মাত্রা যোগ করেন অস্টিন; এবং ডেভিড রিকার্ডো প্রমুখ অর্থনীতিবিদরা হিতবাদের অর্থনৈতিক দিকগুলি দাঁড় করান।

উল্লেখ্য, হিতবাদী দর্শনের সঙ্গে যুগপৎ অর্থনীতি বিদ্যার উদ্ভব ঘটে। মিল ছিলেন প্রধানাংশে বেনথামের অনুসারী এবং হিতবাদকে স্বমহিমায় গতিশীল করেছিলেন তিনি।

হিতবাদ সর্বজনীন ভোগবাদী, সর্বজনের সর্বাধিক সুখ তার কাম্য। হিতবাদীরা মনে করেন যে রাজনৈতিক নেতা ও সাংসদদের কর্তব্য হল এমন সব বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন যার দ্বারা লোকের দুঃখ মোচন ও সুখ বর্ধন করা যায়। স্পষ্টতই ব্যক্তিমানুষ সদাই সুখের সন্ধানী। রাষ্ট্রের উচিত লোকের কল্যাণে মনোযোগী হওয়া ; সুখের অন্তরায় যাবতীয় বাধাবিঘ্ন অপসারণ করা।

হিতবাদীরা ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। পীড়ন ও অবিচারের তাঁরা বিরোধী ছিলেন। তাঁরা চাইতেন সামাজিক পরিবর্তন। জনকল্যাণের জন্য সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনে তাঁদের সমর্থন থাকত। মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্বার্থে তাঁরা প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনে পেছপাও ছিলেন না। তাঁদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ ভাল কি মন্দ সেটা বিচার্য মানুষের পরিমেয় সুখদুঃখের নিরিখে। নৈতিকতা কোনও কিছুতে অন্তর্নিহিত নয়, সুখদুঃখের পরিণামের মধ্য দিয়ে সেটা প্রকাশ পায়। নির্বিশেষ ন্যায় ও ভালমন্দ বলে কিছু থাকে না। যেহেতু সুখ ও দুঃখ পরিমাপ করা যায়, তাই হিতবাদীরা চাইতেন পদার্থবিজ্ঞানের মতো নৈতিকতামণ্ডিত রাজনীতির একটি সুস্পষ্ট চরিত্রনিরূপণ।

হিন্দ স্বরাজ (Hind Swaraj)

মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম আকর গ্রন্থ। ১৯০৯ খ্রি ইংল্যান্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেরার পথে জাহাজে কথোপকথন আকারে লিখিত। দ্বিভাষিক 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রিকায় ওই বছর ১১-১৮ ডিসেম্বর গুজরাতি ভাষায় দুটি সংখ্যায় এবং ১৯১০ খ্রি জানুয়ারি মাসে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। বোম্বাই সরকার ১৯১০ খ্রি সেটিকে নিষিদ্ধ করে। তখন গান্ধীজি ইন্ডিয়ান হোম রুল নামে তার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। প্রথম ভারতীয় ইংরেজি সংস্করণ ১৯১৯ খ্রি মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯২১ খ্রি 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় 'হিন্দ স্বরাজ অব ইন্ডিয়ান হোম রুল' নামে প্রবন্ধাকারে কয়েক সংখ্যায় এবং পরে কয়েকটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কুড়িটি অনুচ্ছেদে আলোচনাসূত্রে ভারত থেকে ইংরেজ শাসকদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিতাড়নের রাজনৈতিক প্রশ্ন ওঠে, কিন্তু তদপেক্ষা বৃহত্তর অর্থে নৈতিক শক্তির মাধ্যমে জাতীয় পুনর্গঠনের প্রসঙ্গে তিনি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। হিন্দুশাস্ত্র উদ্ধৃত করে স্বাধীনতা বলতে তিনি মানুষের আত্মশক্তির মুক্তির যৌক্তিকতা দেখান। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় ও সুদূরপ্রসারী নৈতিক সারবত্তার নিরিখে তিনি স্বরাজ কথাটির অর্থ নিরূপণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেটা শাসনব্যবস্থার শুধুমাত্র পরিবর্তন নয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে হরেক রকম দাসত্ব থেকে নৈতিক মুক্তিও চাই। কী সেই নৈতিক দাসত্বের লক্ষণ ? উত্তরে বলেন যে মেশিনের বর্ধিষ্ণু ব্যবহার এবং বৃত্তিগত শ্রেণীসমূহ যেমন আইনজীবী, ডাক্তার, প্রশাসক যাঁরা জেনে বা না জেনে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে টিকিয়ে রেখেছে, তাদের সঙ্গে হাত

মিলিয়ে জনগণকে শোষণ করছে এবং প্রভুদের নজিরে এমন এক জীবনধারা সৃষ্টি করেছে যেটা দেহকে তোয়াজ করে, কিন্তু আত্মাকে শুকিয়ে মারে। তাঁর মতে নৈতিক মুক্তি বলতে কতকগুলি ধার করা চাকচিক্যময় আদর্শে মোহাবিষ্ট না থেকে নিজেদের নৈতিক বোধ ও ঐতিহ্য অনুসারে ও নৈতিক শক্তির সাহায্যে আত্মবিকাশ ও পরিশুদ্ধি সাধন এবং তদনুযায়ী নিজ দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের রূপায়ণ বোঝায়।

স্পষ্টতই 'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থে ভারতের রাজনীতি ও শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়িক আধুনিকীকরণের তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। গান্ধীজি খুব ঘনিষ্ঠভাবে পশ্চিমি সভ্যতা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং সেই অনৈতিক শিল্পোন্নত ও প্রতিযোগিতামূলক সমাজের দিক থেকে তাঁর সশঙ্কিত দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেন যে এই চাতুর্যেভরা বিষময় প্রবণতা থেকে নিজেকে রক্ষার অনেক সময় আছে ভারতের। সেটা সম্ভব হলে যথার্থ স্বাধীনতা অর্জন সহজ হবে।

ভারতের স্বায়ত্তশাসন তথা সে সময়কার হোম রুল আন্দোলনে হিউম, ওয়েডারবার্ণ, নওরোজি, গোখলে প্রমুখের ভূমিকার উল্লেখ এবং তাঁদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন যে স্বায়ত্তশাসন অর্জন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, রাতারাতি সেটা সম্ভব নয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দেশবাসীর ভীতি দূর করেছে, জাগিয়েছে দেশপ্রেম; নরম ও চরমপন্থীদের বিরোধ নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজ ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসেছে। ভারতীয়দের অনৈক্যই তাদের শাসন কায়েম করার পক্ষে প্রধান সহায়ক।

সভ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে তিনি প্রচলিত দৃষ্টিতে পোশাকপরিচ্ছদ, ঐশ্বর্য, মেশিনের ব্যবহারবৃদ্ধি ইত্যাদি মানদণ্ডের উল্লেখ করেন এবং বলেন যে সমগ্র এই গতিপ্রকৃতির মধ্যে ধর্ম ও নৈতিকতা বলে কিছু নেই। তাঁর দৃষ্টিতে বিলেতের পার্লামেন্টও একটা দাসত্ব বিশেষ। সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা না থাকলেও নৈতিক সদাচারকেই তিনি সভ্যতা বলে মনে করতেন। মেশিন ছিল তাঁর কাছে এক অভিশাপ বিশেষ।

দেশের দুর্গতির দরুন তিনি রেলপথ, আইনজীবী ও ডাক্তারদের দায়ী করেন। রেলপথ না থাকলে ইংরেজরা ভারতকে এতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না। রেলপথ ব্যতিরেকেই ভারত একটা নেশন হিসেবে দিব্যি বিরাজ করত। আদতে নেশন হিসেবে বিকাশের অন্তরায় এবং হিন্দু-মুসলিম বিরোধের কারণ হল ইংরেজ। রেলপথের মাধ্যমেই মহামারি হিসেবে প্লেগ ছড়িয়েছে চতুর্দিকে, বাড়িয়েছে দুর্ভিক্ষ; বদলোকেরা খারাপ মতলবে সর্বত্র যাতায়াত করে। পবিত্র স্থান সব কলুষিত হয়ে পড়ছে। পূর্বকালে মানুষ অনেক কষ্টে তীর্থভ্রমণ করত। এখন পাপীদের কাছেও সেসব স্থান সুগম হয়ে পড়েছে। মানুষ ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিপরীত দিকে গেছে।

আইনজীবীদের মধ্যে অনেক সৎ মানুষ থাকলেও সাধারণভাবে তাদের অধিকাংশের কাজ হল বিবাদ বিসংবাদ ও মামলায় অর্থের লোভে কোনও এক পক্ষের হয়ে বিবাদকে বাড়িয়ে তুলে নিজস্বার্থ চরিতার্থ করা। ঠিক তেমনি সব ধরনের চিকিৎসাবিদ্যা মানুষকে তার শরীরস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন ও যত্নশীল করে না। ওষুধের প্রতি আসক্তি এবং নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা নীতিবিগর্হিত আচরণ। মাদক বস্তু মিশিয়ে

ওষুধ তৈরি হয়। অথচ সব ধর্মেই সেটা নিষিদ্ধ। তাঁর মতে ডাক্তারেরা সম্মান ও অর্থের লোভে চিকিৎসাবিদ্যা জাহির করে, আর সেজন্যে মোটা টাকা আদায় করে। লোকে নিজদোষেই প্রতারিত হয়। হাতুড়ে চিকিৎসক বরং ভাল ; তাদের মধ্যে একটা মানবিকতা থাকে।

গান্ধীজি ইতালির জননেতা মাৎসিনির অনুরাগী ছিলেন, বিশেষ করে এই দৃষ্টিকোণে যে মাৎসিনি নিছক বিদেশি শাসনের অবসান চাইতেন না, তিনি চাইতেন যথার্থ জনগণের হাতে ক্ষমতা বর্তাক। হিন্দ স্বরাজ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ব্যবহৃত সত্যাগ্রহ ও আত্মশক্তির পরিবর্তে সংশোধিত নতুন সংস্করণে তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে বিনা রক্তপাতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে নির্ভয়চিত্তে সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করা যায়।

শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলিত রীতিকে বিভ্রান্তিকর বলে মনে করতেন। পরিবর্তে ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষার উপর তিনি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। নাগরি এবং আরবি হরফে হিন্দি ভাষার তিনি সর্বাত্মক প্রচার চাইতেন ; তাঁর দৃষ্টিতে ইংরেজি ভাষাশিক্ষা দাসত্বের নামান্তর।

হিন্দু মহাসভা (Hindu Mahasabha)

১৯০৬ খ্রি ঢাকায় মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা এবং কংগ্রেসের মডারেট নেতৃবৃন্দের মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১৯০৭ খ্রি পঞ্জাবে হিন্দু সভা নামে একটি সংস্থা গঠিত হয় ; সেটি ১৯০৯ খ্রি থেকে একটি বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করত। ওই সংস্থার প্রচেষ্টাতেই ১৯১৫ খ্রি ৯ এপ্রিল হরিদ্বারে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। গোড়ার দিকে হিন্দু সভা একটি ধর্মীয় সামাজিক সংস্থা হিসাবে কাজ করত ; হিন্দু সমাজে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের বিরুদ্ধে জনমত গঠন, সনাতন বর্ণাশ্রম প্রথা সমর্থন এবং নাস্তিক ও মুক্ত চিন্তকদের সমাজসংস্কার প্রয়াসের বিরোধিতাই ছিল তার লক্ষ্য। টিলক, খাপার্দে প্রমুখ যাঁরা বিবাহযোগ্যা নারীর বয়স দশ থেকে বারো বছরে বর্ধনের বিরোধিতা করেন তাঁরা ছিলেন মহাসভার প্রথম পর্যায়ের শীর্ষস্থানীয় নেতা।

হিন্দু সমাজের সংহতিসাধন ঘোষিত নীতি হলেও হিন্দু মহাসভা প্রথম থেকেই রাজনীতির বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে। প্রথমাবধি গান্ধীজি, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, রামভুজ দত্ত, লালা হংসরাজ, তেজ বাহাদুর সাপ্রু, আশুতোষ মুখার্জী, মতিলাল ঘোষ, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ নেতারা কংগ্রেস ও মহাসভা উভয়েরই সদস্য ছিলেন। একই স্থানে দুটি সংস্থার বার্ষিক সম্মেলন বসত। জমিদার, ব্যবহারজীবী, শিক্ষক, ছাত্র, সরকারি চাকুরে প্রভৃতি সর্ববিধ স্তরের ব্যক্তিকে নিয়ে মহাসভা গঠিত হয়। অসহযোগ ও খিলাফত্ আন্দোলনের সময়ে মুসলিত নেতারা সার্ব-ইসলাম জিগির তুলে সংকীর্ণ খাতে ধর্মীয় আবিলতায় জাতীয় আন্দোলনকে পরিচালিত করেন, মহাসভাও ধর্মান্তরিত হিন্দুদের শুদ্ধি আন্দোলন ও উগ্র ধর্মীয় রাজনীতির সূত্রপাত করে। মহাসভার বেলগাঁও অধিবেশনে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার উপর লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়, সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জয়াকর, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জয়রামদাস

দৌলতরাম প্রমুখ ব্যক্তিরা। এই সময় থেকে মহাসভা স্পষ্টই একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী নীতির বিরোধিতা শুরু করে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। মহাসভার ক্রমবর্ধিত জনপ্রিয়তা ও শক্তি কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রতিফলিত হয় (১৯২৬)।

ত্রিশের দশকে মহাসভার আন্দোলনে অর্থনৈতিক নানা সমসাময়িক প্রসঙ্গ স্থান পায়। ভি. ডি. সাভারকরের সভাপতির ভাষণে (১৯৩১) কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার সঙ্গে কিছু কিছু শিল্পের জাতীয়করণের দাবি উত্থাপিত হয়। চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময়ে মহাসভা **মুসলিম লিগের** প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে। যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে মহাসভার সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ব্রিটেনের সঙ্গে ক্ষমতার হস্তান্তরের ব্যাপারে অন্যান্য দলের (কংগ্রেস ছাড়া) সঙ্গে অগ্রসর হন। ভারত বিভাগের সময় মহাসভা বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের অনুকূলে জনমত গঠন করে। গান্ধী হত্যার পর মহাসভার জনপ্রিয়তা প্রায় শেষ হয়ে যায়।

ভারতে একটি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই মহাসভার আদর্শ। দেশবিভাগ নাকচ করে দেশের ঐক্যসাধন ও একটি অখণ্ড ভারত রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল মহাসভার লক্ষ্য। রাজনীতিতে হিন্দু আদর্শের সঞ্চার এবং একটি জঙ্গি হিন্দুরাজ গঠন হবে তার পূর্বপ্রস্তুতি। সিন্ধু উপত্যকা থেকে পূর্বে সমুদ্রের উপকূলবর্তী সমগ্র ভূখণ্ড যিনি নিজের পবিত্র পিতৃভূমি হিসাবে জ্ঞান করেন তিনিই হিন্দু। মহাসভার আদর্শ অনুযায়ী নতুন সমাজব্যবস্থার ভিত্তি হবে হিন্দুত্ব। শ্রেণী সমন্বয় ও সামাজিক চেতনার সৃষ্টি এবং পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর পরিবর্তে শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের সামগ্রিক উন্নতির উপর মহাসভা গুরুত্ব আরোপ করে (নির্বাচনী ইস্তাহার ১৯৭১)। বর্ণাশ্রম প্রথার বিরোধিতা না করে ধর্মান্তরিতদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য শুদ্ধি আন্দোলন মহাসভার অন্যতম কর্মসূচি। মিশ্র অর্থনীতিতে বিশ্বাসী হিন্দু মহাসভার কর্মসূচির অন্যতম অঙ্গ হল হিন্দু সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

হেগেল, জর্জ উইলহেলম ফ্রিডরিখ (১৭৭০-১৮৩১) (Hegel, G. W. F.)

জার্মান দার্শনিক, যাঁর জটিল ভাববাদী দর্শন উত্তরকালে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে কাজের সঙ্গে তাঁর মননশীল সৃষ্টিশীলতা অতিবাহিত হয়। হেগেলের বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে 'ফিলসফি অব রাইট' এবং 'ফিলসফি অব হিস্ট্রি' তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা অনুশীলনের পক্ষে প্রধান সহায়ক।

হেগেলের দৃষ্টিতে যাবতীয় বিকাশ ও বিবর্তন সরলরেখার পরিবর্তে ঘূর্ণায়মান ঊর্ধ্বমুখী পথে এগিয়ে চলে, যার মধ্যে নয় (thesis), প্রতিনয় (anti-thesis) ও সমন্বয়ের (synthesis) একটি দ্বন্দ্বমূলক নিত্য প্রবহমান গতি লক্ষিত হয়, যেটা সহজ কথায় হল দুটি বিপরীতধর্মী বিষয়ের বিরোধের ফলে একটি সমাধানে পৌঁছানো। প্রতিটি ক্রিয়াকে অনুসরণ করে একটি প্রতিক্রিয়া, যে দুটির সংঘাতে উৎপন্ন হয় একটি সমন্বয়। এই ধারাটি শুধু রাজনীতি নয়, মানবজীবনের সর্বত্র নিত্যই ঘটে চলেছে। হেগেলের মতে প্রগতি হল একটি বৈশ্বিক মানসপ্রক্রিয়া যেটা নিরন্তর উন্মোচিত

হচ্ছে। প্রগতি বা বিবর্তন স্বেচ্ছাধীন নয়, সেটা যুক্তিসিদ্ধ। বিশ্ব ও মানবপ্রগতির একটি লক্ষ্য হল জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও উৎকর্য সাধন। রাষ্ট্রের মধ্যেই জাগতিক মানস অঙ্গীভূত থাকে ; বিবর্তনের সর্বশেষ ধাপ হল মানুষ। যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানুষের উপর আধিপত্য করে তার মধ্যে পরিবারের চেয়েও বড় হল সমাজ আর সমাজের উপর হল রাষ্ট্র। জাতীয় রাষ্ট্র মানুষের চেয়েও বড় ও মহত্তর ; বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ উপকারী ও অনিবার্য।

তিনি মনে করতেন রাষ্ট্রের উৎস হল দৈব ; শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে রাষ্ট্রকে দেখা উচিত। একার্থে পূর্বকালে রাজার দিব্য অধিকারতত্ত্বের বিকল্পবিশেষ। হেগেলের ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক। হেগেলের সমাজের উৎপত্তির পশ্চাতে তিনি কোনও 'চুক্তি' বা 'সম্মতি' তত্ত্ব মানতেন না। আরিস্তোতলের অভিমত অনুসরণ করে হেগেল বলেন যে মানুষ সামাজিক জীব, তার মধ্যে একটা দৈবসত্তা (জাগতিক মানস) বিরাজ করে, যেটা মানুষকে রাজনৈতিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রবৃত্ত করে। রাষ্ট্র দীর্ঘ বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হয়। বৈশ্বিক মানসের প্রভাবে পরিবার থেকে গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী থেকে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রের স্রষ্টা ঈশ্বর, মানুষ নয়।

হেগেলের বিশ্বাসে কালপ্রবাহে মানবেতিহাস ঈশ্বরেরই অগ্রগমন ; বিশ্ব-ইতিহাসে ঘটে বিশ্বের বিচার। এক রাষ্ট্র কর্তৃক অপর রাষ্ট্রের বিজয় সেই বৈশ্বিক মানসের আত্ম-উন্মোচন এবং তার বীর নায়কেরা বৈশ্বিক মানসের প্রতিভূ। ভূমণ্ডলে স্থিত রাষ্ট্র হল দৈব অভিপ্রায়। হেগেলের মতে ব্যক্তিমানুষ সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের অধীন। রাষ্ট্রের অভিপ্রায় বা ইচ্ছার কাছে ব্যক্তিমানুষের কোনও ইচ্ছা থাকে না। পরম শক্তিধর রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত এবং মানুষ একটি মাধ্যম বা নিমিত্ত মাত্র ; রাষ্ট্রের স্থান সর্ববিধ বিষয়ের উপরে। ব্যক্তির তুলনায় রাষ্ট্রের অধিকার অনেক উঁচুতে। ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রের একজন সদস্য হতে পারে। রাষ্ট্রের সত্তা সবার উপরে, সে সত্তা হল অতিমানবিক। হেগেলের দৃষ্টিতে বাস্তব রূপে রাষ্ট্র হল স্বাধীনতার আধার। রাষ্ট্রের অধীনে সকল প্রকার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বাঁধা থাকে।

প্রাকৃত আইন ও অধিকারকে হেগেল অস্বীকার করেছেন। রাষ্ট্রের কাছেই সমুদয় আইন ও অধিকারকে বাঁধা রেখেছেন। তাঁর কাছে নৈতিকতা একটি আপেক্ষিক বিষয় এবং ব্যক্তিভেদে নৈতিকতার হেরফের ঘটে। মানুষের নৈতিক চিন্তাভাবনা সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে গড়ে ওঠে।

পরিবার ও বিবাহ সম্পর্কে হেগেলের মনোভঙ্গি ছিল অভিনব। তিনি চাইতেন ছোট পরিবার ; একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের তিনি বিরোধী ছিলেন। সন্তান-সন্ততি সাবালক হয়ে গেলে পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকাই তাঁর দৃষ্টিতে বিধেয়। তাঁর চোখে কৌমার্য সর্বোত্তম আদর্শ হলেও, নৈতিক কর্তব্য হিসাবে তিনি বিবাহপ্রথা সমর্থন করতেন। তবে বহুবিবাহের তিনি বিরোধী ছিলেন। বিবাহকে তিনি দিব্য বিধান ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে মনে করতেন। তাঁর মতে বিবাহবিচ্ছেদ-বিধি কঠিন হওয়া সঙ্গত। পরস্পরের সম্মতি সাপেক্ষে বিবাহ অভিভাবকদের দ্বারা স্থির হওয়াই ভাল, প্রেমের মাধ্যমে নয়। পণপ্রথার তিনি সমর্থক ছিলেন। হেগেলের মতে নারীর স্থান অন্তঃপুরে, তাদের উচ্চশিক্ষাদানে কোনও আপত্তি নেই। সরকারি কর্মে নারীর অংশগ্রহণ বিপজ্জনক।

হেগেল ছিলেন সকল অর্থেই স্বৈরতন্ত্রী। জনমত নিয়ে সরকার গঠিত হবে না। শাসনকর্মে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতার উৎস জনগণ নয়। শাসনক্ষমতা নীচে থেকে উপরে নয়, উপর থেকে বিন্যস্ত হবে। আইনসভা ও প্রশাসনিক কর্তৃমণ্ডলী থাকলেও তিনি সর্বোপরি চাইতেন রাজতন্ত্র। বিচার বিভাগ নির্বাহি শাসন বিভাগের অধীনে থাকবে। তাঁর দ্বান্দ্বিক মতানুসারে আইনসভা হল নয়, নির্বাহি শাসন বিভাগ হল প্রতিনয় এবং রাজতন্ত্র হল সমন্বয় বা সিনথিসিস। একনায়কতন্ত্রের অনুরাগী হেগেল ছিলেন আলেকজান্ডার, জুলিয়াস সীজার ও নাপোলিয়ঁর গুণগ্রাহী।

দ্র. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

হোম রুল লিগ (Home Rule League)

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে নরমপন্থী যে গোষ্ঠী উদারতন্ত্রী ও মডারেট নামে পরিচিত ছিলেন তাঁরা ইংরেজ সাম্রাজ্যের মধ্যে হোম রুল নামে এক ধরনের স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব তুলেছিলেন। ১৯১৫ খ্রি ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের আগে অনুষ্ঠিত এক সভায় আনি বেসান্ত ভারতে আইরিশ ধাঁচে একটি হোম রুল লিগ গঠনের প্রস্তাব করেন। চার্লস স্টুয়ার্ট পার্নেল নামে পার্লামেন্টের জনৈক আইরিশ সদস্য ১৮৭০ খ্রি হোম রুল আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। কালক্রমে তার ফলে উত্তর আয়ার্লান্ড পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। ন্যাশনালিস্ট নামে পরিচিত কংগ্রেসের চরমপন্থী অপর এক গোষ্ঠী যাঁরা সুরাট কংগ্রেসে (১৯০৭) নরমপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর কংগ্রেস থেকে সরে গিয়েছিলেন তাঁরা এবং কিছু সংখ্যক মুসলিম নেতৃবৃন্দ বেসান্তের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বাদানুবাদ এবং স্বায়ত্তশাসনের রূপ কী হবে তাই নিয়ে এবং মুসলিম লিগের সঙ্গে ঐকমত্যের প্রশ্নে বিষয়টি পেছিয়ে যায়। ন্যাশনালিস্ট গোষ্ঠীর পুনা ও বেলগাঁওয়ের সভা ও সম্মেলনে (১৯১৬) ইন্ডিয়ান হোম রুল লিগ গঠনের সুপারিশ করা হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও উদারতন্ত্রী নিয়মতান্ত্রিকতার সমন্বয় ঘটে। উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে সর্ববিধ নিয়মতান্ত্রিক পথে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠা এবং সেই অনুযায়ী জনমত গঠন করা। বোম্বাই প্রাদেশিক সম্মেলনে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে একটি আপস এবং সরকারকে হোম রুল মঞ্জুর ও বন্দিমুক্তির অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯১৬ খ্রি যোসেফ ব্যাপতিস্তার সভাপতিত্বে গঠিত লিগে জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত (১৯১৪) বাল গঙ্গাধর টিলক যোগ দেন। সেপ্টেম্বরে শ্রীমতী বেসান্ত অপর একটি হোম রুল লিগ প্রতিষ্ঠা করেন। টিলক এবং বেসান্ত পৃথকভাবে তাঁদের লিগ চালিয়ে যান এবং একত্র তাঁদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেন। উভয় লিগের কংগ্রেস থেকে দূরত্ব থাকত। বেসান্তের অন্তরিন (১৯১৭) এবং টিলকের মৃত্যুর (১৯২০) পর হোম রুল আন্দোলন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। গান্ধী ছিলেন টিলকের লিগের সভাপতি। স্বরাজ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হোম রুল আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

প রি ভা ষা

Absolutism পরমবাদ
Acculturation সংস্কৃতিকরণ
Adhikari, G. M অধিকারী, গঙ্গাধর মোরেশ্বর
Administrative Law প্রশাসনিক আইন
African National Congress এ. এন. সি. (আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস)
Aggression আগ্রাসন
Akali Dal অকালি দল
Alienation বিচ্ছিন্নতাবোধ
Alliance রাষ্ট্রমৈত্রী
Amnesty রাজক্ষমা
Anarchism নৈরাজ্যবাদ
Anna DMK আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্র কজগম
Annexation অন্তর্ভুক্তি
Anti-Semitism ইহুদি বিদ্বেষ
Anusilan Samiti অনুশীলন সমিতি
Apartheid বর্ণবৈষম্য
Apparatchiki দলীয় কর্মিবর্গ
Apolitical রাজনীতি নিস্পৃহতা
Arab League আরব লিগ
Aristocracy অভিজাততন্ত্র
Aristotle আরিস্টোটল
Armistice যুদ্ধবিরতি
Arthasastra অর্থশাস্ত্র
Asiatic Mode of Production এশীয় উৎপাদনপদ্ধতি
Aurobindo Ghose (শ্রী) অরবিন্দ
Autarky স্বয়ম্ভরতা
Authoritarianism কর্তৃত্ববাদ
Authority প্রাধিকার
Autocracy স্বেচ্ছাতন্ত্র
Autonomy স্বশাসন

Bakunin, M বাকুনিন, মিখাইল
Balance of Power শক্তিসাম্য
Bande Mataram বন্দে মাতরম
Base and Superstructure ভিত্তি ও উপরিকাঠামো
Bath Party বাথ পার্টি
Belligerency যুধ্যমান অবস্থা
Bentham, Jeremy বেনথাম, জেরিমি
Bharatiya Janata Party ভারতীয় জনতা পার্টি
Bhoodan Movement ভূদান আন্দোলন
Blockade অবরোধ
Bodin, Jean বদ্যাঁ, জাঁ
Bolshevism বলশেভিকবাদ
Bonapartism বনাপার্তীয় মতাদর্শ
Bose, Subhaschandra সুভাষচন্দ্র বসু
Bourgeois Democracy বুর্জোয়া গণতন্ত্র
Bourgeoisie বুর্জোয়াজি
Boycott বয়কট
Brainwashing মগজ ধোলাই
Bureaucracy আমলাতন্ত্র

Cabinet মন্ত্রিপরিষদ
Cadre দলকর্মী

Capitalism পুঁজিবাদ
Caste বর্ণব্যবস্থা
Chartist Movement সনদী আন্দোলন
Chatterjee, Bankimchandra
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
Checks and Balances নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য
Christian Democrat খ্রিস্টীয় গণতন্ত্রী
Christian Socialism খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্র
CIA সি আই এ
Citizen নাগরিক
City State নগররাষ্ট্র
Civil Disobedience Movement
আইন অমান্য আন্দোলন
Civil Rights পৌর অধিকার
Civil Society পুর সমাজ
Civil War গৃহযুদ্ধ
Class শ্রেণী
Class Struggle শ্রেণী সংগ্রাম
Coalition মোর্চা
Co-existence সহাবস্থান
Cold War ঠাণ্ডা লড়াই
Collective Security যৌথ নিরাপত্তা
Colonialism ঔপনিবেশিকতাবাদ
Comintern কমিন্টার্ন
Common Good গণমঙ্গল
Common Law প্রচলিত আইন
Communal Award সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা
Communalism সাম্প্রদায়িকতা
Commune কমিউন
Communism কমিউনিজম
Communist Manifesto কমিউনিস্ট ইস্তাহার
Communist Morality কমিউনিস্ট নৈতিকতা
Communist Party কমিউনিস্ট পার্টি
Communist Party of India
কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া
Communist Party of India (Marxist) কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী)
Comte, Auguste কঁৎ, অগ্যুস্ত
Confederation রাষ্ট্রসমবায়
Congress Socialist Party কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি
Consensus ঐকমত্য
Consent সম্মতি
Conservative Party রক্ষণশীল দল
Constitution সংবিধান
Constitutional Law সাংবিধানিক আইন
Co-operative Movement সমবায় আন্দোলন
Corporate State নিগমবদ্ধ রাষ্ট্র
Counter-revolution প্রতিবিপ্লব
Coup d'Etat আকস্মিক বিদ্রোহ
Criminalization of Politics
রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন
Cultural Revolution সাংস্কৃতিক বিপ্লব
Cybernetics সংযোগ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

Decentralization বিকেন্দ্রীকরণ
Decolonization Theory
বি-উপনিবেশন তত্ত্ব
Deficit Budget ঘাটতি বাজেট
Delegation of Power ক্ষমতা অর্পণ
Democracy গণতন্ত্র
Democratic Centralism গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা
Democratic Party ডেমোক্রেটিক পার্টি
Democratic Socialism গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র
Despotism স্বৈরতন্ত্র
Detente বিবাদাবসান

Dialectical Materialism দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ
Dictatorship একনায়কতন্ত্র
Diplomacy কূটনীতি
Direct Democracy প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র
Disarmament নিরস্ত্রীকরণ
Divine Right দিব্য অধিকার
Doctrine মতবাদ
Dogmatism মতান্ধতা
Dravida Munnetra Kazagam দ্রাবিড় মুন্নেত্র কজগম

Election নির্বাচন
Electoral College নির্বাচক বর্গ
Electorate নির্বাচকমণ্ডলী
Elite প্রবর
Empiricism অভিজ্ঞতাবাদ
Engels, F এঙ্গেলস, ফ্রিডরিখ
Enlightenment আলোকিত শতাব্দী
Equality সাম্য
Eurocommunism ইউরোকমিউনিজম
Executive প্রশাসন বিভাগ
Extradition বহিঃসমর্পণ
Extremism চরমপন্থী

Fabian Society ফেবিয়ান সোসাইটি
Faction উপদল
Fascism ফ্যাসিবাদ
Federalism যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা
Fellow-Traveller সমধর্মী সহযাত্রী
Feminism নারী আন্দোলন
Feudalism সামন্ততন্ত্র
Fifth Column পঞ্চম বাহিনী
Forward Bloc ফরওয়ার্ড ব্লক
Franchise ভোটাধিকার
Frankfurt School ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুল
Freedom স্বাধীনতা
Fundamentalism মৌলবাদ

Fraternity মৈত্রী

Gadar Party গদর পার্টি
Gandhi, M. K. গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ
General Will গণ-অভীপ্সা
Genocide and Holocaust গণহত্যা ও গণপ্রজ্বালন
Geopolitics ভূ-রাজনীতি
Ghetto সংখ্যালঘুদের পাড়া
Gokhale, G. K. গোখলে, গোপালকৃষ্ণ
Government সরকার
Gramsci, Antonio গ্রামশি, আন্তনিয়ো
Guerrilla War গেরিলা যুদ্ধ
Guild Socialism গিল্ড সমাজতন্ত্র

Habeas Corpus বন্দিপ্রদর্শন
Harijan Movement হরিজন আন্দোলন
Hegel, G W F হেগেল, জি ডবলিউ এফ
Hegemony আধিপত্য
Hind Swaraj হিন্দ স্বরাজ
Hindu Mahasabha হিন্দু মহাসভা
Historical Materialism ঐতিহাসিক বস্তুবাদ
Hobbes, Thomas হবস, টমাস
Home Rule League হোম রুল লিগ
Human Nature মানবপ্রকৃতি
Human Rights মানবাধিকার
Humanism মানবতাবাদ

Idealism ভাববাদ
Ideology মতাদর্শ
Impeachment মহাভিযোগ
Imperialism সাম্রাজ্যবাদ
Indian National Congress ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

Individualism ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ
Industrial Revolution শিল্পবিপ্লব
Initiative গণউদ্যোগ
Inner-Party Democracy অন্তর্দলীয় গণতন্ত্র
Inquilab Zindabad ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ
Institution অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান
Insurgency বিদ্রোহ
Intelligentsia বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়
Interest Group স্বার্থবাহী গোষ্ঠী
International আন্তর্জাতিক
International Law আন্তর্জাতিক আইন
Iqbal, A M ইকবাল, আল্লামা মহম্মদ
Islamic State ইসলামি রাষ্ট্র

Jacobinism জ্যাকোবাঁবাদ
Janata Dal জনতা দল
Janata Party জনতা পার্টি
Jeffersonian Democracy জেফারসনীয় গণতন্ত্র

Jinnah, M. A. জিন্না, মহম্মদ আলি
Judiciary বিচারবিভাগ
Jugantar Dal যুগান্তর দল
Junta সামরিক শাসকচক্র
Jurisprudence আইনশাস্ত্র
Justice ন্যায়বিচার

Kamandakiya Nitisar কামন্দকীয় নীতিসার
Kant, Immanuel কান্ট, ইমানুয়েল
Kemal Ataturk কেমাল আতার্তুক
K. G. B. কে. জি. বি.
Khaksar Movement খাকসার আন্দোলন
Khilafat Movement খিলাফত আন্দোলন
Khudai Khidmatgar খুদাই খিদমদগার
Kuomintang কুয়োমিনতাং

Labour Party শ্রমিক দল
Laissez-faire অবাধ বাণিজ্য
Laski, H. J. লাস্কি, হ্যারল্ড যোশেফ
Law আইন
League of Nations সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ
Leftism বামপন্থা
Legislature আইনসভা
Legislature : unicameral and bicameral আইনসভা : এককক্ষ ও দ্বিকক্ষ
Legitimacy বৈধতা
Lenin, V.I. লেনিন, ভি আই
Leninism লেনিনবাদ
Liberal Democracy উদারনৈতিক গণতন্ত্র
Liberalism উদারনীতি
Lobby উপশালা
Local Self-Government স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন
Locke, John লক, জন
Lok Adalat লোক আদালত
Loyalty আনুগত্য
L. T. T. E. লিবারেশন টাইগারস অভ তামিল ইলাম
Lumpen-Proletariat ছন্নছাড়া সর্বহারা

Mace রাজদণ্ড
Machiavelli, N. ম্যাকিয়াভেল্লি, নিকোল্লো
Magna Carta ম্যাগনা কার্টা
Mandate আজ্ঞা
Manusmriti মনুস্মৃতি
Mao Ze-dong মাও জে-দঙ

Maoism মাওবাদ
Market Economy বাজার অর্থনীতি
Marx, Karl মার্কস, কার্ল
Marxism মার্কসবাদ
Marxism-Leninism
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ
Masses জনতা
Materialism বস্তুবাদ
May Day মে দিবস
Menshevism মেনশেভিকবাদ
Meritocracy গুণতন্ত্র
Middle Class মধ্যবিত্ত শ্রেণী
Mill, John Stuart মিল, জন স্টুয়ার্ট
Minority সংখ্যালঘু
Mixed Economy মিশ্র অর্থনীতি
Mode of Production উৎপাদন ব্যবস্থা
Moderate নরমপন্থী
Monarchy রাজতন্ত্র
Montesquieu মঁতেসকিয়্য
Multi-National Corporation
বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান
Muslim League মুসলিম লিগ

Narayan, Jayaprakash জয়প্রকাশ
নারায়ণ
Narodnik নারদনিক
Nation জাতি
National Socialism জাতীয় সমাজতন্ত্র
Nationalism জাতীয়তাবাদ
Nationality জাতিত্ব
Natural Law প্রাকৃত আইন
Natural Rights প্রাকৃত অধিকার
Naxal Movement নকশাল আন্দোলন
Nazism নাৎসিবাদ
Nehru, Jawaharlal জওহরলাল নেহরু
Neo-Colonialism নয়া-উপনিবেশবাদ
Neutrality নিরপেক্ষতা
New Left নববাম

New Marxism নবমার্কসবাদ
New Right নবদক্ষিণ
Non-Alignment Movement জোট
নিরপেক্ষ আন্দোলন
Non-Co-operation Movement
অসহযোগ আন্দোলন
North Atlantic Treaty
Organization ন্যাটো

Oath of Secrecy মন্ত্রগুপ্তি ও শপথ
গ্রহণ
Oligarchy গোষ্ঠীতন্ত্র
Ombudsman সংসদীয় তদন্তকারী
Opportunism সুবিধাবাদ
Owen, Robert ওয়েন, রবার্ট

Pacifism শান্তিবাদ
Pakistan Movement পাকিস্তান
আন্দোলন
Palace Revolution প্রাসাদ বিপ্লব
Palestine Liberation Organization
প্যালেস্টাইন লিবারেশন
অর্গানিজেশন
Pan-Islam সার্ব-ইসলাম
Panchayat পঞ্চায়েত
Panchsil পঞ্চশীল
Parliamentany form of
Government সংসদীয় সরকার
Party দল
Partyless Politics দলহীন রাজনীতি
Peace শান্তি
People জনগণ
People's Democracy জনগণতন্ত্র
Peréstroika পেরেস্ত্রোইকা
Permanent Revolution চিরস্থায়ী
বিপ্লব
Petit Bourgeois পেটি বুর্জোয়া
Petrodollars পেট্রোডলার
Philosopher King দার্শনিক রাজা

Philosophical Radicals দার্শনিক আমূল পরিবর্তনবাদী
Plato প্লাতো
Plebiscite নির্বিশেষ গণভোট
Pluralism বহুত্ববাদ
Plutocracy ধনিকতন্ত্র
Political Culture রাজনৈতিক সংস্কৃতি
Political Obligation রাষ্ট্রিক বাধ্যতা
Political Thought রাষ্ট্রচিন্তা
Polyarchy বহুশাসন প্রথা
Populism লোকবাদ
Positivism দৃষ্টবাদ
Poverty Line দারিদ্র্যসীমা
Power ক্ষমতা
Pragmatism প্রয়োগবাদ
Praxis প্রয়োগ
Presidential Form of Government রাষ্ট্রপতি চালিত সরকার
Productive Forces উৎপাদিকা শক্তি
Productive Relations উৎপাদন সম্পর্ক
Progress প্রগতি
Progressive প্রগতিবাদী
Proletariat সর্বহারা
Propaganda প্রচারণা
Property সম্পত্তি
Proportional Representation সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব
Protectorate আশ্রিত রাজ্য
Proudhon, P J প্রুদঁ, পিয়ের ঝসেফ
Public Opinion জনমত
Public Ownership রাষ্ট্রীয় মালিকানা

Quisling কুইসলিং
Quit India Movement ভারত ছাড় আন্দোলন

Racialism জাতিকুলবাদ
Radical আমূল পরিবর্তনবাদী
Radical Democratic Party র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি
Radical Humanism র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম
Rajadharma রাজধর্ম
Randive, B T রণদিভে, বি টি
Rashtriya Swayamsevak Sangha রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ
Reactionary প্রতিক্রিয়াশীল
Realpolitik বাস্তব রাজনীতি
Recall প্রত্যাহ্বান
Referendum গণভোট
Reformation রেফর্মেশন
Religion ধর্ম
Renaissance রেনেসাঁস
Renegade দলত্যাগী
Republic প্রজাতন্ত্র
Republican Party রিপাবলিক্যান পার্টি
Revisionism শোধনবাদ
Revolution বিপ্লব
Revolutionary Socialist Party রেভল্যুশনারি সোসালিস্ট পার্টি
Rigging রিগিং,
Right to Work কাজের অধিকার
Rights অধিকার
Rightism দক্ষিণপন্থা
Rousseau, Jean Jack রুসো, জাঁ জ্যাক
Roy, M N মানবেন্দ্রনাথ রায়
Rule of Law আইনের শাসন

SAARC সার্ক
Saint-Simon, C D স্যাঁ সিমঁ, ক্লোদ আঁরি দ
Sanction শাস্তি
Sarvoday সর্বোদয়
Satyagraha সত্যাগ্রহ
Secession বিচ্ছিন্নকরণ
Secularism ধর্মনিরপেক্ষতা
Self-determination আত্মনিয়ন্ত্রণ

Separation of Power ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ
Shiv Sena শিবসেনা
Social Contract সামাজিক চুক্তি
Social Democracy সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র
Socialism সমাজতন্ত্র
Socialist Legality সমাজতান্ত্রিক আইনানুগতা
Socialist Market Economy সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি
Socialist Realism সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ
Society সমাজ
Sovereignty সার্বভৌমত্ব
Soviet সোভিয়েত
Stalin, J V স্তালিন, জে ভি
Stalinism স্তালিনবাদ
State রাষ্ট্র
Statute সংবিধি
Subaltern Politics নিম্নবর্গের রাজনীতি
Sukraniti শুক্রনীতি
Surplus Value উদ্বৃত্ত মূল্য
Suzerainty সার্বভৌম কর্তৃত্ব
Swadeshi Samaj স্বদেশী সমাজ
Swaraj স্বরাজ
Swaraj Party স্বরাজ পার্টি
Syed Ahmed Khan সৈয়দ আহমদ খাঁ
Syed Amir Ali সৈয়দ আমির আলি
Syndicalism শ্রমিকসংঘবাদ
Synthesis, Theory of সমন্বয়বাদ

Tagore, Rabindranath রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Tebhaga Movement তেভাগা আন্দোলন
Technology প্রযুক্তিতন্ত্র

Terrorism সন্ত্রাসবাদ
Thatcherism থ্যাচারবাদ
Theocracy দিব্যতন্ত্র
Third World তৃতীয় বিশ্ব
Tilak, B G টিলক, বালগঙ্গাধর
Total Revolution সম্পূর্ণ ক্রান্তি
Totalitarianism সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ
Trade Union ট্রেড ইউনিয়ন
Treasom রাষ্ট্রদ্রোহ
Treaty চুক্তি
Trotsky, Leon ত্রৎস্কি, লিয়ঁ
Trotskyism ত্রৎস্কিবাদ
Trusteeship অছিবাদ
Tyranny স্বৈরাচারতন্ত্র

Unitary Government এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা
United Nations Organization রাষ্ট্রসংঘ
Utilitarianism হিতবাদ
Utopia কল্পরাষ্ট্র

Veto প্রতিষেধ
Violence হিংসা
Vivekananda, Swami বিবেকানন্দ, স্বামী

War যুদ্ধ
War of Nerves স্নায়ুযুদ্ধ
Warsaw Pact ওয়ারস চুক্তি
Welfare State কল্যাণরাষ্ট্র
White Paper শ্বেতপত্র
Woman Suffrage নারীর ভোটাধিকার

Young Turk তরুণ তুর্কি

Zero Hour জিরো আওয়ার
Zionism ইহুদি স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলন



ড. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২৮। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক। পেশাগত বিদ্যা ছাড়াও ইতিহাস, রাজনীতি ও পরিবেশবিদ্যা তাঁর মানসিক বিচরণের ক্ষেত্র। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইংরেজি ও বাংলায় বহু প্রবন্ধ এবং সেমিনারে উপস্থাপিত তাঁর নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখা বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা (১৯৬৮) গ্রন্থটির পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৮৬) দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে তাঁর গবেষণাপত্র লেফ্‌টিজম ইন ইন্ডিয়া (১৯৮৪) ও সাধারণ গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার আইন (১৯৯৬) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী ড. গঙ্গোপাধ্যায় নবমানবতাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।

প্রচ্ছদ।। সুব্রত চৌধুরী



9 788172 158063